বুদ্ধদেব বসুর জীবন

সমীর সেনগুপ্ত



বিকল্প প্রকাশনী ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও নামাঙ্কন : সমীর সেনগুপ্ত
আলোকচিত্র : দেবব্রত রায়
কম্প্যুটার গ্রাফিকস : পুণ্যব্রত পত্রী

প্রকাশক : দময়ন্তী বসু সিং
বিকল্প প্রকাশনী
১ বিধান সরণি, তিনতলা, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক :
টেক্‌নোপ্রিন্ট
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশকের নিবেদন

একটি বই প্রকাশের পেছনে যে কত মানুষের পরিশ্রম থাকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর সেই বই যদি ছাপতে হয় কোনো বিশেষ দিনে বিশেষ উপলক্ষে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে, তাহ'লে প্রকাশক-মুদ্রক-হরফবিন্যাসক-ব্লকমেকার্স-বাইণ্ডারের মধ্যে তালমিল রাখার চেষ্টায় যে তুলকালাম ঘটে সেটা রোমহর্ষক। বুদ্ধদেব বসুর নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রস্তুত এই বিশেষ স্মারক গ্রন্থের সংগ্রাহক সংস্করণটি যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো পশ্চাৎপটে প্রচ্ছন্ন কয়েকটি কর্মে নিরলস মানুষের সৌজন্যে। অনুজপ্রতিম অরিজিৎ কুমারের সাহসী নেতৃত্বে অসাধ্য সাধন করেছেন সঞ্জয় সাউ, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাদের কর্মীরা। পরমাত্মীয়ের আগ্রহে যাঁরা দায়িত্বপালন করেন তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থটির একটি ছোট্ট জন্মকথা আছে, সেটি বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

বুদ্ধদেব বসুর ৯০ বছরের জন্মদিন একটু বিশেষভাবে পালনের ইচ্ছায় আমি প্রথম আলোচনায় বসি পুরোনো বন্ধু সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে। একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের প্রসঙ্গ ওঠে; সেই গ্রন্থে সংযুক্ত করার জন্যে আমি বুদ্ধদেবের একটি জীবনীপঞ্জী তৈরি করবার প্রস্তাব করি। এ কাজের জন্য যোগ্যতম পাত্র হিশেবে দিব্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে সমীর সেনগুপ্তর নাম করেন, আমি সেই পরামর্শ লুফে নিই।

বুদ্ধদেব বসুর জীবনীপঞ্জী তৈরির যোগ্যতা যে সমীরের আছে এ বিষয়ে আমাদের সংশয় ছিল না। সে আমাদেরই মতো যাদবপুরের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে বুদ্ধদেবের সরাসরি ছাত্র ছিল, তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিল। তদুপরি, সে সাহিত্যানুরাগী, পরিশ্রমী, গবেষক এবং সুলেখক। সমীরের ইচ্ছুক হাতে এই ছোট কাজটি সমর্পণ ক'রে আমি দু'তিন মাসের জন্যে দেশের বাইরে যাই গত জুন মাসে। ফিরে এসে দেখি জীবনীপঞ্জী ফুলে ফেঁপে হ'য়ে উঠেছে বুদ্ধদেব বসুর জীবনের ইতিহাস। সমীর তার স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জ হাসি হেসে কিছুটা অপরাধী গলায় বলল, একটু বড়ো হ'য়ে যাচ্ছে।

তারপরের ঘটনাও ইতিহাস। সমীর বুদ্ধদেব বসুর জীবন নয়, জীবনের ইতিহাস গেঁথে তুলেছে এই গ্রন্থে অজস্র তথ্য ও প্রামাণ্য নথিপত্র দিয়ে। বিভিন্ন

স্মৃতিচারণ ও প্রকাশিত-অপ্রকাশিত চিঠি এই বইয়ের মূল কাঠামো, তার ওপর নিজের মননশীল ও পরিশীলিত বিচার-বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও মন্তব্য দিয়ে বুদ্ধদেবের কর্মবহুল জীবনকে সে গড়ে তুলেছে গভীর যত্নে। প্রতিদিন কতখানি পরিশ্রম করলে মাত্র চারমাসে এই মূলত গবেষণাধর্মী বিস্তৃত গ্রন্থটি তৈরি করা সম্ভব সে-কথা বুঝতে লেখক হ'তে হয় না। যে একনিষ্ঠ কর্মী-সাহিত্যিকের কথা সে লিখছিল, তিনিই হয়তো অন্তরাল থেকে সমীরকে এই পরিশ্রমের ক্ষমতা ও প্রেরণা প্রেরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সচেতন প্রত্যেক বিদগ্ধ পাঠকের কাছে এই বই আদৃত হবে, এই আমাদের আশা। বুদ্ধদেব বসুর কন্যা হিশেবে এই তথ্যসমৃদ্ধ সুসম্পন্ন সুবৃহৎ জীবনগ্রন্থটিকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বীকার করতে বাধা নেই প্রস্তাবিত দু'ফর্মার রচনা তিরিশ ফর্মার বৃহদাকার গ্রন্থের আকার ধারণ করায় প্রকাশক হিশেবে আমার রাতের ঘুম অপহৃত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, এই ব্যয়বহুল সংস্করণটি আমি "সংগ্রাহক সংস্করণ" হিশেবে সীমিত সংখ্যায় মুদ্রিত করলাম। বুদ্ধদেব বসুর নবতিতম জন্মদিনে "বিকল্পে"র সশ্রদ্ধ নিবেদন এই বিশেষ স্মারক সংস্করণটি।

৩০ নভেম্বর ১৯৯৮ দময়ন্তী বসু সিং

প্রারম্ভসূত্র

প্রথমেই, বুদ্ধদেব বসু 'মহাভারতের কথা'র ভূমিকায় যেমন বলেছিলেন, 'আমার কলকব্জার ব্যাখ্যা দেয়া দরকার'। সর্বাগ্রে বানানপদ্ধতি। নানা বিদ্বজ্জনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের বানানপদ্ধতি আলাদা আলাদা। প্রত্যেকের নিজস্ব বানান যথাযথ অনুসরণ করতে গেলে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে, তা ছাড়া কম্পোজিটারের পক্ষেও সেটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ফলে আমি এখানে দুটি বানানপদ্ধতি অনুসরণ করেছি। বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতিসমূহে ব্যবহার করেছি বুদ্ধদেব বসুর বানান—যে বানান তিনি শেষদিকে, ধরা যাক 'মহাভারতের কথা'য়, ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রায় ৫৫ বছরের লেখকজীবনে তাঁর নিজস্ব বানানপদ্ধতি অনেকবার বদলেছে, তার বিশদ আলোচনার জন্য কৌতূহলী পাঠক সুবীর রায়চৌধুরীর 'বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতি' প্রবন্ধটি দেখতে পারেন (দ্র : 'কবিতাভবন বার্ষিকী', ১৯৮৬)। একটি উদাহরণ দিই। বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতার বইয়ের নাম ছিল 'মর্ম্মবাণী', কিন্তু বুদ্ধদেব পরবর্তীকালে উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বদাই লিখেছেন 'মর্মবাণী' (দ্র : *আমার ছেলেবেলা* ১ম সং পৃ. ১০৪)। আমি 'মর্মবাণী'ই রেখেছি।

অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 'চলন্তিকা'র বানানপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আমার স্বাধীন রচনার ক্ষেত্রেও সারত তাই, তবে তার মধ্যে আধুনিক বানানচিন্তারও কিছু কিছু প্রতিফলন আছে— যেমন 'কাহিনী' স্থলে 'কাহিনি'।

উদ্ধৃতির উৎস উল্লেখ করার সময় আন্তর্জাতিক প্রচল অনুযায়ী, গ্রন্থের নামে বাঁকা হরফ (ইটালিক্স) ব্যবহার করেছি— কিন্তু প্রবন্ধের নামে ব্যবহার করেছি একক উদ্ধৃতিচিহ্ন যুক্ত সাধারণ হরফ। যেমন, *আমার যৌবন* কিন্তু 'আমাদের

কবিতাভবন'— কেননা শেষোক্ত রচনাটি বই হয়ে বেরোয়নি, সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ আছে। গ্রন্থের ক্ষেত্রে সংস্করণ-সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক, পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রকাশকাল, সর্বত্র উল্লেখ করে দিয়েছি।

পাদটীকা যথাসম্ভব পরিহার করে, উপবক্তব্যগুলিকে মূল পাঠ্যাংশের অন্তর্গত করে দেবার চেষ্টা করেছি। পাদটীকা সাবলীলতার শত্রু— কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টাতেও তাকে একেবারে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব হয়নি, কোথাও কোথাও রাখতেই হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অজস্র মানুষের অকৃপণ সাহায্য না পেলে এই কাজ করে ওঠা অসম্ভব ছিল। যার কাছে যা চেয়েছি, তিনি নিজের কাজ বাদ দিয়ে যেন তা পূরণ করে দিয়েছেন। সুমিতা চক্রবর্তী, টেলিফোনে অনুরোধ পেয়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার ব্যবহারের জন্য ; সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ চেয়েছিলাম, সেটি তাঁর নিজের সংগ্রহে না পেয়ে, অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনে নিজব্যয়ে জেরক্স করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি বাড়িতে বসে পেয়ে গেছি। তাঁকে কী বলে ধন্যবাদ জানানো যায়? জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছিলাম প্রগতি আন্দোলন ও ভারতে সাম্যবাদের প্রথম যুগ বিষয়ে জানতে চেয়ে ; তিনি স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে, ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে, নিজের কাজ সরিয়ে রেখে ধৈর্য ধরে আমার প্রশ্নের উত্তরে কূটতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। নানা অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন নরেশ গুহ, দিনের পর দিন ধরে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন বুদ্ধদেব-চরিত্র ; ব্যবহার করতে দিয়েছেন তাঁকে লেখা বুদ্ধদেবের অতুলনীয় পত্রসম্ভার, পুরোনো খবরের কাগজের কর্তিকা। মাতৃসমা আচার্যানী প্রতিভা বসু অবিরলভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর অমূল্য স্মৃতিভাণ্ডার, যা পেয়েছি কুড়িয়ে নিয়েছি। আছেন সর্বার্থসাধক শঙ্খ ঘোষ, যে বই চাই তা-ই তাঁর অসাধারণ সংগ্রহ থেকে বার করে দেন— যে বইয়ের কথা জানতুম না তাও বার করে দেন সেই সঙ্গে। যদি তাঁর কাছে দৈবাৎ না থাকে জোগাড় করে দেন। তা ছাড়া, যে কোনো লেখা, তিনি যদি একবার শুধু চোখ বুলিয়ে দেন, নিশ্চিন্ত হওয়া যায় তার মধ্যে কোনো তথ্যগত ভ্রান্তি অথবা যুক্তিগত শৈথিল্য থাকবে না। এ-বইয়ের প্রথম কয়েক বছরের বৃত্তান্ত রচনা করে সসংকোচে দেখতে দিয়েছিলাম তাঁকে ; তাঁর অনুমোদন পাওয়ায় বইটি শেষ করে ফেলবার মতো আত্মবিশ্বাস মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল।

এ ছাড়াও নানা গ্রন্থ, পত্রিকা, নথি ও তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন, নতুন

চিন্তাব উৎসসন্ধান দিযেছেন স্বপন মজুমদাব, উত্তবা বসু, হাসান মনসুব মিলন, বিশ্বজিৎ পণ্ডা, সুমন গুণ, অশোক সেন, তাবাপদ আচার্য, সৌবীন ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায। আমাব চিঠি পেযে ব্যগ্রভাবে সাহায্য কবাব প্রস্তাব পাঠিযেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালযেব বুদ্ধদেব-বিশেষজ্ঞ ভুঁইযা ইকবাল— তাঁব ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বুদ্ধদেব-বিষযক নানা দুষ্প্রাপ্য নথি আমাকে ব্যবহাব কবতে দিতে চেযেছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাব, ডাকেব গণ্ডগোলে সেগুলি শেষ পর্যন্ত আমাব হাতে এসে পৌঁছল না।

পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে সংশোধন ও সম্পাদনা কবেছেন বুদ্ধদেব বসুব কনিষ্ঠা কন্যা দমযন্তী, রুমি নামেই যিনি সর্বত্র পবিচিত। দিনেব পব দিন, ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বসে আমবা আলোচনা কবেছি, তর্ক কবেছি— অসীম যত্নে বুদ্ধদেব বসুব চবিত্রেব সূক্ষ্মতব ভাজগুলি তিনি আমাব কাছে উন্মোচিত কবে ধবেছেন। পাণ্ডুলিপিব বর্জনযোগ্য অংশগুলি চিহ্নিত কবেছেন, যে সব অংশে বিশদীকবণ প্রযোজন ছিল তাবও পবামর্শ দিযেছেন। এই গ্রন্থেব কোথাও যদি প্রশংসাযোগ্য কিছু থেকে থাকে তাব জন্য সুযশে তাঁব একটি বড়ো অংশ আছে। তিনি এই গ্রন্থেব প্রকাশক— কিন্তু এই শব্দটিব শুধুমাত্র চলিত অর্থটি তাঁব উপব আবোপ কবলে অন্যায হবে। এই প্রকাশনাকর্মে তাব উৎসাহেব পিছনে বাণিজ্যবুদ্ধিব পবিবর্তে অন্য অভীষ্ট ক্রিযাশীল, যাকে আদর্শ বললে হযতো খুব ভুল বলা হয না। তা না হলে এই অব্যবসাযিক পুস্তকেব পিছনে তিনি এত উদ্যম ব্যয কবতেন না। যে উৎসাহ ও নিষ্ঠা নিযে, নিজেব অসুস্থ শবীবেব গ্লানিকে উপেক্ষা কবে তিনি এই গ্রন্থেব ধাত্রীব কাজ কবেছেন, তাতে কোনো সাধুবাদই তাঁব জন্য যথেষ্ট নয।

পবিশেষে পাঠকেব কাছে নিবেদন— তিনি যেন এই গ্রন্থকে তথ্যসমাকীর্ণ বেফাবেনস বই হিশেবে না দ্যাখেন। বাংলা সাহিত্যে একটি বিবল ও আশ্চর্য ঘটনাব নাম বুদ্ধদেব বসু— সেই ঘটনাব উন্মোচন, নিজে যেমন বুঝেছি, সেইমতো পাঠকেব কাছে পৌঁছে দেবাব চেষ্টা কবেছি— এই আলোচনা শুধুমাত্র সেই ঘটনাকে বোঝাব চেষ্টাব আনন্দ।

বিধাননগব, কলকাতা সমীব সেনগুপ্ত
২ নভেম্বব ১৯৯৮

বুদ্ধদেব বসুর জীবন

সূচিপত্র

ভূমিকা

যে-সময়টা ধরে একটি শিশু ক্রমে বেড়ে ওঠে, পূর্ণমনস্ক একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয়, বুদ্ধদেব বসুর জীবনের সেই সময়টা ভরে সমস্ত দেশ ছিল রাজনৈতিক অশান্তিতে উগ্র, এবং সমস্ত পৃথিবী ভাবদ্রোহে ও জাতিবৈরতায় সংকুল। ভারতে হিংস্রক রাজনীতির আরম্ভের বছরে তাঁর জন্ম— জন্মের সাড়ে তিন মাস পূর্বে ফাঁসি হয়েছিল ক্ষুদিরামের। যে শহরে তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে সেই ঢাকা ছিল সন্ত্রাসবাদের অন্যতম পীঠস্থান, এবং তাঁকে, তাঁর মতো প্রতিভাবান ছাত্র ও প্রকাশমান কবিকে দলমন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্য শহরের গোপন বিপ্লবীদের চেষ্টার যে অভাব থাকবে না তা সহজেই অনুমান করা যায়— স্মৃতিকথায় তিনি সেকথার উল্লেখও করেছেন।

তাঁর এগারো বছর বয়সে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড— তারপর সমস্ত ভারতবর্ষের উপর আছড়ে পড়ল গান্ধীবাদ। ইশকুল-কলেজ ত্যাগ, আপিশ-আদালত বয়কট— বিলিতি বর্জন— বন্দেমাতরম্ হেঁকে জেলে যাওয়া— লবণ, খদ্দর, চরকা— এক বছরের মধ্যে স্বরাজ— মহারানির রাজত্বের যে নিশ্ছিদ্র শান্তি সমস্ত ভারতবর্ষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, সন্ত্রাসবাদীদের দুটো একটা বন্দুক পিস্তলের আওয়াজে সে ঘুমের খুব একটা ব্যাঘাত হয়নি; কিন্তু এই পরিব্যাপ্ত কোলাহলে সেই নিদ্রাতুর ভারতবর্ষ চোখ কচলে উঠে বসল।

বুদ্ধদেব ইশকুল ছাড়েননি, যদিও চা ছেড়েছিলেন; খদ্দর পরতে আরম্ভ করলেন, এবং চরকা কাটতে; ঘরে গান্ধীমহারাজের ছবিওলা ক্যালেণ্ডারও টাঙিয়েছিলেন বারো বছর বয়সে। বন্দেমাতরম্ বলে জেলে যাবার মতো বড়ো তখনো হননি বলে দুঃখ হয়নি তাও নয়।

এর পিছন-পিছনই এসে গেল সাম্যবাদের যুগ। তাঁর ন-বছর বয়সে রাশিয়ায় সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। বারো বছর বয়সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হল তাশখন্দে, সতেরো বছর বয়সে তার ঢেউ ভারতে এসে পৌঁছে গেল। তাঁর বাইশ বছর বয়সের সময় একমুঠো যুবকযুবতী তিন দিন ধরে স্বাধীন করে রেখে দিল চট্টগ্রাম শহরটাকে। বিশ্বযুদ্ধের বারুদগন্ধে চাপা পড়ে গেছে উনিশ-শতকী রোমান্টিকতার শেষ সৌরভ। পৃথিবীব্যাপী মন্দা, ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ারবাজার ছারখার, কাছে-দূরে গ্রামপতনের শব্দ। তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড নম্বর পাওয়া এক ছাত্র, সামান্য একটি গৃহশিক্ষকতা সম্বল করে, ঢাকা থেকে চলে এল তার স্বপ্নের শহর কলকাতায়। কী? না, সে সাহিত্য করবে।

এই জায়গা থেকে আরম্ভ করে এই মৃতমাতৃক, ত্যক্তপিতৃক শিশুটি কেমন করে হয়ে উঠল বুদ্ধদেব বসু, সেই কাহিনিকে অনুসরণ করা বিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, সবচেয়ে দুঃসাহসী মানসিক অভিযান। তাঁর পক্ষে নিতান্ত সহজ ছিল চোরাপথে একটা ভাঙা রিভলভার জোগাড় করে, তারপর তাই দিয়ে কোনো গণশত্রু জনবৃষকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে ফাঁসি যাওয়া; অথবা গান্ধীমহারাজের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে মিছিলে গিয়ে পুলিশের লাঠি খাওয়া, তারপর হিজলি কিম্বা দেউলিতে বছরদশেক কাটিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত একটা গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে জীবন কাটানো। সবচেয়ে স্বাভাবিক হত নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির গোপন ইস্তাহার লেখা, ছোট্ট কোনো ছাপাখানায় গভীর রাত্তিরে সেটা ছাপিয়ে নিয়ে হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুদের কাছে বিলি করে বেড়ানো, তারপর দেশ স্বাধীন হলে একটা উপদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাকি জীবনটা রাজনীতির তাত্ত্বিক চর্চা করে অতিবাহিত করা। তাঁর সঙ্গে একই বছরে জন্ম হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের— এই তথ্যটি এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। নিদেনপক্ষে তিনি হতে পারতেন পরীক্ষায় পাশ করে রংচঙে আই-সি-এস, রাইটার্স বিল্ডিঙে মিহি ফাইল নাড়াচাড়া করে, অবসর সময়ে শৌখিন সাহিত্য-টাহিত্য লিখে, দিব্যি আয়েসে থ্রি-পীস সুট, ড্রেসিং গাউন ও ব্রায়ার পাইপে শোভিত হয়ে জীবনটা বাতানুকূলভাবে কাটিয়ে দিতে পারতেন।

কিন্তু এর কোনোটাই হলেন না তিনি, কোনো ছাঁচেই ধরা দিলেন না। কবিতা লিখলেন। প্রত্যেকটি রাস্তায় দু-চার পা এগিয়েও ফিরে এলেন। ধীরে-ধীরে, সমসাময়িক ইতিহাস ও আপন ব্যক্তিত্বের রহস্যময় সংঘাতে, হয়ে উঠলেন আধুনিক কবিতার ধাত্রী, আধুনিক গদ্যের প্রবর্তক, বাংলা সাহিত্যে কৈবল্যবাদের শেষ শিখা। প্রতিষ্ঠা করলেন কবিতার জন্য মঞ্চ, তুলনামূলক সাহিত্যের জন্য

ভিত্তি, রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্মোহ ভক্তিবাদ, সাহিত্যিক দৃষ্টিতে মহাভারত-পাঠের পদ্ধতি; জন্ম দিলেন কাহিনিহীন উপন্যাসের, আধুনিক কাব্যনাট্যের, আধুনিক দৃষ্টিতে অনুবাদচর্চার। চিরকাল রয়ে গেলেন সঙ্গপ্রিয় হয়েও নিঃসঙ্গ, হাস্যবিলাসী হয়েও বিষণ্ণতাময়, আড্ডাপায়ী হয়েও অন্তর্মুখী, অসূয়ার শিকার হয়েও স্বয়ং সম্পূর্ণ অসূয়াহীন। নিজের নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে, নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারার মূল্যে ছেড়ে দিলেন নিশ্চিন্ত অধ্যাপনা, লুব্ধকারী সাংবাদিকতা, নিজের মতে স্থিত থাকবার জন্য অকাতরে ত্যাগ করলেন প্রাণপ্রিয় বন্ধুগোষ্ঠী।

এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন চিন্তা, কর্ম ও জীবনযাপনের সমন্বয়ের এমন একটি আদর্শ, যা আমরা দূর থেকে শুধু সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে দেখতে পারি, কিন্তু যাকে অনুসরণ করা আমাদের সাধ্যাতীত। সাহিত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই ছিল না তাঁর অনুধাবনের যোগ্য; একটি সূর্যাস্ত অথবা একজন সুন্দরী তাঁর কাছে ততক্ষণই অভিনিবেশ দাবি করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে মিলিয়ে নেয়া যায় কোনো সাহিত্যিক অনুষঙ্গে। এবং কোনো বিষয়ই তাঁর কাছে বিষয় বলে গ্রাহ্য নয় যদি তা না হয় সাহিত্যের বিষয়। জীবনকে দেখার এই ভঙ্গি তাঁর কাছে নির্বস্তুক তত্ত্বমাত্র নয়, এটাই তাঁর কাছে সম্পূর্ণ জীবন। উদার ও মানবিক তাঁর চিন্তা, সেখানে দেশ বা ধর্ম বা গাত্রবর্ণ দিয়ে মানুষের মীমাংসা হয় না, হয় তার কাজ দিয়ে, ভাবনা দিয়ে, তার ভালোমন্দের ধারণা দিয়ে।

মনে আছে একদিন কোনো কারণে সকালবেলাই গিয়েছিলাম দুশো-দুই'তে; তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি, বইয়ের তাকের সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব, দুহাতে ধরে পাতা ওলটাচ্ছেন বৃহদাকার মনিয়র উলিয়াম্‌স-এর। আমাকে দেখে বললেন, 'এই যে, সমীর— 'ধোয়া'র ভালো বাংলা কী, বলতে পারো?' চট করে মাথায় এসে গেল, বললাম, 'কেন, ধাবন?' অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'ধ্যাৎ, তুমি একেবারে বাংলা জানো না— ধাবন মানে দৌড়োনো।' 'কেন, দন্তধাবন?'

যেন একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় চমকে উঠলেন বুদ্ধদেব, বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন কিন্তু আমাকে দেখছেন না, আমাকে ভেদ করে বহুদূরে কোথাও নিবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর দৃষ্টি; আর সেই চোখ দেখে আমি সহসা বুঝতে পেরেছিলাম যোগীর চোখ বলতে রামকৃষ্ণদেব কী বোঝাতে চেয়েছিলেন : যে, পাখি যখন ডিমের উপর বসে তা দেয় তখন তার চোখে যেমন ফ্যালফেলে দৃষ্টি দেখা যায়—অর্থাৎ সে চেয়ে আছে কিন্তু কিছুই দেখছে না, তার সমস্ত মন নিবদ্ধ হয়ে আছে তার ডিমের উপর, সেই রকম শূন্যদৃষ্টি। আমার সঙ্গে আর একটিও কথা না বলে অভিধান নামিয়ে রেখে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর লেখার

টেবিলে; আমি আস্তে আস্তে বারান্দায় বেরিয়ে এসে পাপ্পার সঙ্গে দাবার ছক পেতে বসলাম।

এক সময় তাঁদের বাড়িতে রাত্রে প্রায় রোজই গোমাংস রান্না হত। এবং যা হয়, রাত্তির বেশি হয়ে গেলে প্রতিভা বসু অনেক সময়েই দূরাগত অতিথিদের খেয়ে যেতে বলতেন। একবার আমাদের এক সহপাঠী কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল, 'মাংসটা নাহয় না খেলাম—'

সেই একবার যথার্থভাবে রাগতে দেখেছিলাম বুদ্ধদেবকে। 'কী? লেখাপড়া শিখে— বীফ খাবে না?' আমি চেয়ে দেখছিলাম তাঁর ফর্শা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, বৈপরীত্যে ঝকঝক করছে দক্ষিণ কপালের কালো জন্মদাগ, অসংলগ্ন আঙুলে কপাল থেকে চুল সরাচ্ছেন। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমি মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম, কী বলতে চেয়েছিলেন সেই দ্রষ্টা কবি যিনি উচ্চারণ করেছিলেন, 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'— তাই বিদ্যা, যা মুক্তি দেয়— মুক্তি দেয় চিন্তার জাড্য থেকে, জন্মসূত্রে পাওয়া সংস্কারসমূহের দাসত্ব থেকে, বুঝতে পেরেছিলাম যে বিশ্বজনীনতাকে আত্মস্থ করবার মানসিক ঐশ্বর্যকে আয়ত্ত করার নামই বিদ্যা।

আমি চেষ্টা করেছি, বছর ধরে ধরে এই আশ্চর্য মানুষটির ক্রমশ উন্মীলিত হয়ে ওঠার ইতিহাস অনুসরণ করতে। ঘটনার বহিরঙ্গের গুরুত্বে সবগুলি বছরের প্রতিটি ঘটনার তাৎপর্য অবশ্যই সমান নয়। কিন্তু আমি যে-সূত্র থেকে আরম্ভ করেছি তা এই : নিরন্তরভাবে সৃষ্টিশীল একজন মানুষ, তাঁর জীবনে এমন কিছুই নেই যা তাৎপর্যহীন; যখন তিনি আপাতভাবে কিছু করছেন না তখনও তিনি কিছু করছেন, তখনও তাঁর সময় অপচিত হচ্ছে না; তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিকে ঈষৎ বক্রভাবে তাঁরই উদ্দেশে নিবেদন করে বলা যায়, তিনিই জানেন সেই সূক্ষ্ম, বাঁকা, চেষ্টাহীন গতি, যেহেতু তিনি ছিলেন প্রত্যেক মুহূর্তে সচেতন ও সৃষ্টিশীল। যে বছর জীবনের বাইরের দিকে কিছু ঘটছে না সে বছর হয়তো অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পাস্টেরনাক নিয়ে চিঠিতে বাদানুবাদ হচ্ছে— সে বছরে সেটাই প্রধান ঘটনা, যা তাঁর চরিত্রের উপর আলো ফ্যালে, তাঁকে বুদ্ধদেব বসু বলে চিনিয়ে দেয়। চরিতকারের আসল কাজ এই চরিত্র ফুটিয়ে তোলা— যেমন প্রতিকৃতিশিল্পীর আসল কাজ বহিরঙ্গের রূপায়ণ নয় : চিত্রিতের ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত করে তোলা।

আমি চেষ্টা করেছি নিজের ভাষা যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার করার। সমস্ত বইটিকেই বলা যায় বুদ্ধদেব-বিষয়ক উদ্ধৃতির একটি সংগ্রহ; তাঁর নিজের রচনা থেকে স্বভাবতই সর্বাধিক— তা ছাড়া প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথা থেকে, তাঁর সহজীবী ও অনুজদের স্মৃতিকথা ও আলোচনা থেকে। নিজস্ব আলোচনার ক্ষেত্র

যথাসম্ভব সংকীর্ণ রেখেছি; আমি শুধু সময়ের হিশেবে যথাস্থানে স্থাপন করেছি উদ্ধৃতিগুলিকে, কোথাও কোথাও দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে একটি মন্তব্য দিয়ে যোগসাধন করে দিয়েছি, বা নির্দিষ্ট করেছি শিরোনামে। আমার মনে হয়েছে, বুদ্ধদেব বসুর জীবনীরচনায় এই পদ্ধতির একটি বিশেষ প্রামাণ্যতা আছে। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল নয়, মোটা তথ্যগুলিকে হয়তো দশ-বিশ-তিরিশ পৃষ্ঠার মধ্যে বিশ্বাস্যভাবে ধরিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু তাঁর মতো একজন অন্তর্মগ্ন মানুষের ভিতরকার অহংটির বিকাশের ইতিহাসই তাঁর আসল জীবনচরিত, এবং সেখানে তাঁর নিজের চেয়ে বিশদ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষী আর কেউ নেই। ধরা যাক, শিশুবয়সে গীতার শ্লোক শ্রবণ করে তাঁর মনে কী রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, অথবা কোন পবিবেশে তিনি প্রথমবার 'ছিন্নপত্র' পড়েছিলেন— এগুলো তাঁর অন্তর্জীবনের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং এগুলো জানতে হলে তাঁর কাছেই আমাদের পৌঁছতে হবে। তাই যদি হয়, তবে তার দুটি উপায় আছে; হয় বুদ্ধদেবের বর্ণনাকে নিজের ভাষায় বদলে নিয়ে বিবৃত করতে হবে, অথবা তাঁর নিজের ভাষাই তুলে দিতে হবে। দ্বিতীয় পন্থাটিই আমার কাছে সুবুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে। তা ছাড়া বুদ্ধদেবের আত্মজৈবনিক রচনাগুলি বহুকাল ধরে ছাপা নেই— একটি তো গ্রন্থাকারে প্রকাশিতই হয়নি, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় লীন হয়ে আছে; এই উপলক্ষে পাঠক সেই ললিতগম্ভীর, বান্ধবসম্মিত গদ্যশিল্পের কথঞ্চিৎ স্বাদ পাবেন, সেটাও বড়ো কম কথা নয়।

এই পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও সংশয় থেকে গেছে। বুদ্ধদেব বা প্রতিভা বসু তাঁদের স্মৃতিকথায় প্রায় কোথাওই তারিখ ব্যবহার করেননি। ঘটনার পারম্পর্য সব সময় যথাযথ নেই, আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে চলে এসেছে, বহুকাল-ব্যবহিত দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি সংস্থাপন করা হয়েছে— এই সব সমস্যা তো আছেই। স্মৃতিকথা রচনা করতে গিয়ে ইতিহাসের এই রকম ব্যৎক্রম ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তার চেয়ে জরুরি কথা, বুদ্ধদেবের স্মৃতিকথাগুলিতে তিনি তাঁর জীবনেতিহাস রচনা করেননি; যা করেছেন তা হল, জীবনেতিহাসকে উপজীব্য করে অন্তর্জীবনের বর্ণনা। কালানুক্রম তিনি হয়তো ইচ্ছে করেই অনেক জায়গায় রক্ষা করেননি। ঘটনাবলির গুরুত্বের একটা ক্রমপর্যায় তাঁর মানসে ছিল, সেভাবেই তিনি ঘটনা সাজিয়েছেন। মোটামুটি একটা কালক্রম বজায় আছে, কিন্তু উপঘটনাগুলির সংস্থাপনে অনেক সময়ই পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয়নি।

চেষ্টা করেছি সেই ঘটনাগুলিকে কালানুক্রমে সাজিয়ে দেয়ার। বছরের হিশেবে বিবিধ ঘটনাকে সাজাতে গিয়ে অনেক জায়গায় সাহায্য নিতে হয়েছে দ্বৈতীয়িক তথ্যের, কোথাও বা অন্তর্নিহিত প্রমাণের। দ্বৈতীয়িক তথ্য প্রায় সর্বত্র

উল্লেখ করে দিয়েছি, তবু কোথাও কোথাও সংশয় দূর হয়নি। অনুমানের উপর নির্ভর করে কালানুক্রম রচনা করা যে সর্বাংশে নির্ভুল হয়েছে এমন দাবি করতে পারি না; তবে মনে হয় না জৈবনিক তথ্যের ধারাবাহিকতা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোথাও। তথাপি যদি কোনো পাঠক কোথাও অসংগতি লক্ষ করেন, দয়া করে জানালে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হব।

এই মানুষটির জীবনী রচনা করবার উপযুক্ত ব্যক্তি আমি নই। আমি তাঁর একজন অযোগ্য ছাত্র; তাঁর প্রদীপ্ত মনীষা, বিস্তীর্ণ সাহিত্যপ্রজ্ঞা, জটিল জীবনবোধ ও উদার মানবিকতাকে ধারণায় আনতে পারি এমন কোনো যোগ্যতাই আমি নিজের জীবনে অর্জন করিনি। দু-বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ক্লাশ করতে পেরেছিলাম, সেই সূত্রে অধিকার পেয়েছিলাম কবিতাভবনে যাওয়া-আসার। শিখতে পারিনি বিশেষ কিছুই, তবু তাঁর কিছুদিনের সাহচর্য আশিরমূল বদলে দিয়েছিল জীবনের প্রতি তাকাবার ভঙ্গিটাকে। আবছাভাবে বুঝতে পেরেছিলাম কাকে বলে কবিতা, কাকে বলে গদ্য; কাকে বলে সাহিত্যের জন্য ভালোবাসা, ভালোবাসার জন্য পরিশ্রম, কাকে বলে মানুষের প্রতি সম্মান। তাই, অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁর একটি জীবনীরচনার দায়িত্ব যখন ঘটনাচক্রে আমার উপর এসে পড়ল, তখন যথাসাধ্য বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেকে সেই দায়িত্বের সম্মুখীন করে তোলবার চেষ্টা করেছি। জানি না সেই বিরাট বিষয়কে কোথাও স্পর্শ করতে পেরেছি কিনা।

স. সে

রবীন্দ্রনাথ

ছিলে না বনের মৃগ, গাছ, ফুল, মেঘের গহ্বরে
অন্ধ আলোর খেলা। এমনকি, বালক ছিলে না।
তীক্ষ্ণ চোখ ঘিরে ছিলো সারাদিন। হাতের খেলনা
ভারি হ'য়ে প'ড়ে গেছে হাত থেকে। তবু ছিলে একাধারে ভ'রে।

তুমিও পাওনি দেখা লাবণ্যের গীতময়ার।
সিঁড়ির উপর নেই। সেই ছিলো, আমাদেরই মতো।
হয়তো খানিক, ঘষা। প্রতিকূল প্রবাসে প্রহত
ছন্নছাড়া খুড়ির আঁধার এলো। তবু ছিলে প্রতিযোগিতার

পঞ্চাশে, বিশ্বাসে ভঙ্গুরতায়, যেন তুমি কখনো করোনি
চেষ্টা, কিন্তু যেন কলম গিয়েছে জেনে, তুমি শুধু মন।
যা পেয়েছি দু-চোখ তোমার কাছে, নিঃশ্বাসে, কেবল
সন্ধ্যায় নিরিবিলি ~~[illegible]~~ চাঁদে ব'সে থেকে, আর তারে ~~[illegible]~~ নিখুঁত যামিনী
ফেলে দেয় দুই হাতে, তোমার আতুর অনলে,
তাই, এই, ~~তুমি এই সহজে~~ সাধনার নিমুক পথা শেষ হ'লে।

২১ এপ্রিল
১৯৬৬

বুদ্ধদেব বসুর জীবন

বুদ্ধদেব বসুর জন্মের ও তাঁর মাতার মৃত্যুর পর পিতা ভূদেবচন্দ্র বসুর পত্র, গিরীন্দ্রনাথ বসুকে। ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

বুদ্ধদেব বিষযে যা-কিছু বলা যাক তাই হযে উঠবে কবিতা বিষযে বলা। আক্ষবিক অর্থে তিনি কবিতাতে সমর্পণ কবেছিলেন নিজেকে, যে-কবিতাব মাযাবী টেবিল থেকে...উঠে গিযে, নিঃশব্দে শেষবাবেব মতো তিনি নিদ্রিত হলেন। কাব্যভাবনাই তাঁব একমাত্র জীবনী।

'কবিব মৃত্যু' . নবেশ গুহ
কলকাতা পত্রিকা, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা ১৯৭৪

১৯০৮-১৯২১ ।। শৈশব, প্রথম কৈশোর

১৯০৮ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ, বা তেরো বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধদেবের জীবন কেটেছিল প্রধানত নোয়াখালি শহরে। এই সময়কার তথ্যের উৎস বলতে আমবা পাই শুধুমাত্র তাঁর নিজের স্মৃতিকথা। কিন্তু এই সময়ের ঘটনাবলি, তাঁর পরবর্তী জীবনেব ঘটনার মতো, সময়ক্রম অনুযায়ী সাজানো অসম্ভব। সুতরাং এই প্রথম তেরোটি বছরকে বর্ষক্রম অনুযায়ী সাজাবার চেষ্টা না করে আমি একটিই পর্যায়ভুক্ত কবলাম— 'শৈশব, প্রথম কৈশোর'। অবশ্য তার মধ্যেও বুদ্ধদেবের স্মৃতিগুলিকে, আমার বোধ ও বিবেচনা অনুযায়ী, একটি শিশুর বড়ো হয়ে ওঠার ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দিয়েছি।

জন্ম : পিতামাতা ও দেশপরিচয়

জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৯০৮ (১৫ অগ্রহায়ণ ১৩১৫)। কুমিল্লা। পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু, মাতা বিনয়কুমারী।

> "আমি বিনয়কুমাবীর প্রথম ও শেষ সন্তান— আমার জন্মের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রসবোত্তর ধনুষ্টঙ্কার বোগে তাঁব মৃত্যু হয়। এর মৃত্যুই আমার নামকবণের কারণ।
>
> আমার জন্মের ও তাঁর মৃত্যুব সময় বিনয়কুমারীর বয়স ছিলো ষোলো— আমাদের এ-কালেব হিশেবে তিনি তখনো বালিকা। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং ভূদেবচন্দ্র পত্নীকে হারিয়ে বছরখানেকের জন্য পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এই দুই কারণে আমি আমার মাতামহ-মাতামহীর ঘরেই মানুষ হয়েছিলাম—কার্যত তাঁরাই ছিলেন আমার পিতামাতা।
>
> ...আমি... দেশের টান কখনো অনুভব করিনি, যে-গ্রাম বা পরগনা বা জেলায় আমার পূর্বপুরুষ অনেককাল আগে ভিটে তুলেছিলেন, সেটাকেই বিশেষভাবে আমার 'দেশ' বলে ভাবতে ছেলেবয়সেও পারিনি আমি। তবু তথ্যের দিক থেকে হয়তো বলা দরকার যে আমার মাতৃকুল পিতৃকুল দুয়েরই আদিনিবাস ছিলো বিক্রমপুরে— গ্রামের নাম যথাক্রমে বহর ও মালখানগর। পরবর্তী কালে যে-কন্যাকে বিবাহ করলাম তাঁর পিতৃভূমিও বিক্রমপুরেরই অন্তর্ভূত।"

আমার ছেলেবেলা, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১০

স্মৃতির আরম্ভ : কুমিল্লা থেকে নোয়াখালিতে আসা

"কুমিল্লা আমার জন্মস্থান, কিন্তু আমার স্মৃতির শুরু নোয়াখালিতে। মনে পড়ে ফেরুল সাহেবের বাগান নামে একটি বাড়ি— উঠোন ঘিরে খানচারেক ঘর, দর্মার বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে সোনালি রোদ ঝিলমিল করে ভোরবেলা, খড়ের চালে মাটির মেঝেতে দুপুরবেলাগুলো ঠাণ্ডা। লাগোয়া এক মস্ত বড়ো বাগিচা— রোদের দিনে নীল সবুজ ঝাপসা এক আভার মতো। ফল এত প্রচুর যে মহিলারা ডাবের জলে পা ধোন, পাখিরা ঠুকরে-ঠুকরে জামরুল-কালোজাম শেষ করতে পারে না।...

কিন্তু আমার প্রথমতম স্মৃতি আরো আগেকার। পঞ্চাশ বছর আগে দেখা কোনো স্বপ্নের মতো, ধূসর অতীতে ট্রেনের কামরায় হঠাৎ-চোখে-পড়া কোনো মুখের মতো, কয়েকটা ছবি আটকে আছে আমার মনে— সুদূর কিন্তু স্পষ্ট, যেন স্টিরিওস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখা। আমি দুলে-দুলে পড়ছি— 'আমি কেমন নাইতে পারি। মণি পারে না, টুনিও পারে না। তারা বলে, "আমরা গায়ে দল দেবো না।" তারা জলকে বলে দল্। ছেলেমানুষ কিনা, তাই।" কথাগুলোকে নিয়ে আমার জিভ যেন খেলা করছে, 'ছেলেমানুষ কিনা, তাই' বলতে গিয়ে আমি হেসে উঠছি খলখল ক'রে, বেগনি কালিতে ছাপা বড়ো-বড়ো অক্ষরগুলিতে কত যে খুশি পোরা আছে আমি যেন তার তল পাচ্ছি না।"

—তদেব, পৃ. ২২

দাদামশাই ও দিদিমার সঙ্গে সম্পর্ক

"...আমি আমার দাদামশাইকে ডাকতাম 'দা', দিদিমাকে 'মা' বলতাম। শুধু যে মুখে মা বলতাম তা নয়; তাঁকে মা ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবিনি কখনো, ভাবতে পারিনি। অথচ আমি খুব অল্প বয়সেই জেনেছিলাম আমার 'আসল' মা ম্'রে গিয়েছেন, আমার বাবার সঙ্গেও আমার দেখাসাক্ষাৎ হ'য়ে গিয়েছে। মা নেই, মা আছেন; আমার মা'র সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক শাশুড়ি-জামাইয়ের, আমার 'মার' স্বামীকে আমি 'বাবা' ব'লে ডাকি না— এ-সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার নিয়ে আমি কখনো বিব্রত বোধ করিনি, আমার কাছে এই অবস্থাই ছিলো সংগত এবং স্বাভাবিক। মা নেই— এটা হ'লো অস্পষ্ট এক প্রবচন, যাকে 'কথার কথা' বলে ঠিক তা-ই; আর মা আছেন— এটা অতি নিবিড় এক সত্য, যা আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি স্নেহে যত্নে আদরে আবদারে, অসুখের সময় পরিচর্যায়। মাতৃহীন শিশুর মনোকষ্ট আমার জীবনের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারেনি।..."

—তদেব, পৃ. ১৭

"...আমার দাদামশায়ের সঙ্গে আমি এমন এক ধরনের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, যার বুনোনটা খুব ঘন, প্রায় কোথাও ফাঁক নেই— পিতাপুত্রের সম্বন্ধের চেয়ে অনেকটাই বড়ো তার আয়তন। কেননা তিনি ছিলেন আমার জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম বন্ধু, ও প্রথম ক্রীড়াসঙ্গী— চাকুরির সময়টুকু বাদ দিয়ে তিনি

আমাকেই তাঁর জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অল্পবয়সে স্কুলে ভর্তি করেননি— সেজন্য আমি অন্তহীনভাবে কৃতজ্ঞ; যেরকম যত্নে আমাকে তিনি ইংরেজি শিখিয়েছিলেন তার কোনো তুলনা হয় না। শীতের ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছি তাঁর সঙ্গে— আমার পবনে কান-ঢাকা টুপি আব আলস্টার— তিনি চলতে-চলতে জিগেস করছেন : 'Do you see what I see?' আর আমি তাঁর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ব'লে উঠছি, 'A tree!' 'A dog!' 'A bullock cart!' — এমনি সারাটা সময়। রবিবার বিকেলে তাঁর সঙ্গে আমার খেলা জমে শব্দরচনা ও শব্দহরণের চৌকো এ-বি-সি-ডি-গুলো নিয়ে— সেটাও ইংরেজিচর্চারই একটা উপায়।..."

—তদেব, পৃ. ২২

বুদ্ধদেবের মাতার মৃত্যুর পর তাঁর পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন, প্রথম পক্ষের পুত্রকে নিজের কাছেও রাখেননি; কিন্তু বুদ্ধদেব ঢাকায় আসার পর পিতাপুত্রে আদৌ যোগাযোগ ছিলো না এমন নয়। *'আমার যৌবন'* গ্রন্থে, ঢাকা শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন :

"...বায় কোম্পানির মুখোমুখি একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যা খোলা থাকে নিশুতি রাত পর্যন্ত, পাছে ছদ্মবেশে পরিরা খেতে এসে ফিরে যায়— আমি তার পাশ দিয়ে কখনো ঢুকি মালীটোলায়, যদি আমার গন্তব্য হয় আমার পিতার বা কোনো বন্ধুর বাড়ি..." এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, পিতার বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল।

গীতার শ্লোকে কবিতার ধ্বনিকল্লোল

"অন্য একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমার দাদামশায়ের এক তরুণবয়সী ভ্রাতৃবধূ তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত বৈধব্য ও বালক-পুত্রকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য এক পূজারি ব্রাহ্মণকে ডাকা হ'লো; তিনি গীতা থেকে প'ড়ে শোনালেন —প্রথমে সংস্কৃতে, তারপর বাংলায় ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে। 'লোকেরা যেমন পুরোনো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে, তেমনি...' এ-সব কথা ঐ শোকার্তাকে শোনানো সেই বালকবয়সেই আমার প্রহসন ব'লে মনে হয়েছিলো, কিন্তু 'বাসাংসি জীর্ণানি'র শব্দসমাবেশ কেমন যেন কাঁপিয়ে দিয়েছিলো আমাকে— উপমা কাকে বলে তা না-জেনেও উপমাটিকে আমি ভালোবেসেছিলাম। সংস্কৃত কবিতার ধ্বনিকল্লোলের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়— এমন একটা সময়ে, যখন সংস্কৃত ব'লে যে আলাদা একটা ভাষা আছে তাও হয়তো আমি জানি না।"

—*আমার ছেলেবেলা,* বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ২৮

নোয়াখালির মেঘনা : ভাঙনের স্মৃতি

"...নোয়াখালির মেঘনার মতো এমন হৃতশ্রী নদী পৃথিবীর অন্য কোথাও আমি দেখিনি। রুক্ষ পাড়ি, ঘাট নেই কোথাও, কেউ নামে না স্নান করতে, কোনো মেয়ে জল নিতে আসে না। তরণীহীন, রঙিন পালে চিহ্নিত নয়, জেলে-ডিঙির সঞ্চরণ নেই— একটিমাত্র খেয়া-নৌকো দেহাতি ব্যাপারিদের নিয়ে সকালে-সন্ধ্যায় পারাপার করে। শহরের এলাকাটুকু পেরোলেই নদীর ধারে-ধারে ঘন বনজঙ্গল, নয়তো শুধু বালুডাঙা, মাঝে-মাঝে চোরাবালিও লুকিয়ে আছে—শীতে-গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ চরের ফাঁকে-ফাঁকে শীর্ণ জলধারা ব'য়ে যায়। বর্ষায় স্ফীত হ'যে ওঠে নদী— বিশাল — অন্য তীর অদৃশ্য; কিন্তু তখনও চোখ খুশি হ'তে পারে না, বরং আমার ভয় করে সেই কালচে-ব্রাউন বিক্ষুব্ধ জলরাশির দিকে তাকাতে— যার উপর দিয়ে, বর্ষার ক-মাস, একটি নিঃসঙ্গ স্টিমার যাতায়াত করে হাতিয়া-সন্দ্বীপে— পৃথিবী-ত্যক্ত দুই দ্বীপ, যেখান থেকে প্রায়ই ভেসে আসে সর্পদংশনের ভীষণ সব কাহিনী। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ঝড়ের সংকেত আসে মাঝে-মাঝে, ঘূর্ণি-হাওয়ায় এঁকেবেঁকে পাৎলা বৃষ্টি পড়ে সারাদিন— বারো-শো ছিয়াত্তর বা অন্য কোনো দূর-বছরের বন্যার স্মৃতি লোকেদের বুকের মধ্যে দুরুদুরু কবে। আর এই সব-কিছুব উপরে আছে — ভাঙন, অনিবার্য, অপ্রতিবোধ্য ভাঙন। প্রতি বর্ষায় নদী এগিয়ে আসে শহরের মধ্যে — প্রায় লাফিয়ে-লাফিয়ে— বিরাট বুড়ো বটগাছ আর অগুনতি পাখির বাসা নিয়ে মস্ত বড়ো মাটির চাঁই ধ্বসে পড়ে হঠাৎ, ধোঁয়া ওঠে জলের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই নদী আবার নির্বিকার। আমি একাধিকবার এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলাম— একবার কিছুটা বিপজ্জনকভাবে। শোনা গেলো অমুক সাহেবের বাংলোকে নদী ধ'রে ফেলেছে, তিনি সব জিনিশপত্র শস্তায় বেচে দিয়ে চ'লে যাচ্ছেন— রোববার সকালে দাদামশাই আমাকে নিয়ে হাজির হলেন সেখানে, আমার পড়ার মতো কোনো বই যদি বা পাওয়া যায়। আমরা যখন একমনে বই দেখছি, ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দে পাশের ঘরটি ধ্বসে পড়লো— একটি ফিরিঙ্গি যুবক জানলা দিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণ বাঁচালো, বরাতজোরে সে-ঘরে তখন আর কেউ ছিলো না। মুহূর্তের মধ্যে সব লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়, দাদামশাই কাঁপতে-কাঁপতে আমার হাত ধ'রে বাড়ির পথ ধরলেন, কিন্তু তার আগেই তিনি জুটিয়ে ফেলেছিলেন আমার জন্য এক বাণ্ডিল বাছা-বাছা বই।"

—তদেব, পৃ. ৩২

'আমার ছেলেবেলা'র আরম্ভে বুদ্ধদেব লিখেছেন :

"আমার ছেলেবেলার কথা আগে অনেকবার লিখেছি। 'সাড়া' উপন্যাসের প্রথম অংশে, 'আমার বন্ধু' ও 'অন্য কোনখানে' উপন্যাসে, 'পুরানা পল্টন', 'নোয়াখালি', 'চার্লস চ্যাপলিন', ও 'রামায়ণ' প্রবন্ধে, কোনো-কোনো ছোটো গল্পে ও কবিতায়, তাছাড়া কয়েকটা উপকথামূলক ক্ষুদ্র রচনাতেও সেই ইতিবৃত্ত টুকরো-টুকরো হ'য়ে

ছড়িয়ে আছে। কল্পনায় বা অন্য বিষয়ে আশ্রিত হ'লেও সেই ভগ্নাংশগুলিতে আত্মজৈবনিক যাথার্থ্য নেই বলা যায় না।"

জীবনের স্মৃতি কীভাবে তাঁর নির্মিত কাহিনিতে উঠে এসেছে তা বোঝাবার জন্য এখানে পাশাপাশি রাখা যাক 'অন্য কোনখানে' উপন্যাস থেকে এই ঘটনার সমান্তরাল বর্ণনাটি; গল্পের প্রয়োজনে দাদামশাই 'বাবা'তে রূপান্তরিত হয়েছেন, এইটুকু তফাৎ।

"সাহেব বললেন, 'এই জুল ভার্ণের বই ক-টা নিয়ে যান, ভালো লাগবে আপনার ছেলের।'

নিবারণবাবু আর দেরি করলেন না; তক্ষুনি সাহেবের অনুমোদিত ছ-খানা বই চার টাকা দিয়ে আর এক টাকা দিয়ে ছেলের মনোনীত বইখানা কিনে ফেললেন। বইগুলি তন্ময়ের হাতে দিয়েই কী-রকম একটা ভঙ্গি করলেন শরীরের— ভাবটা এই : আয় পালাই।

কিন্তু অত সহজে তিনি রেহাই পেলেন না। সাহেবের মুখ থেকে কথা লুফে নিলেন মেমসাহেব। থলথলে মুখে হাসি ফুটিয়ে তন্ময়কে বললেন, 'তোমার খুব রীডিং হ্যাবিট বুঝি? তা হেলথ-এর কেয়ার কেন নাও না সে-রকম? হেলথ ইজ ওএল্‌থ!'

তন্ময়ের মনে হ'লো তার দিদিমা হঠাৎ কয়েকটা ইংরিজি কথা শিখেছেন। বেজায় হাসি পেলো তার, ভয় হ'লো পাছে সত্যিই হেসে ফেলে।...

'এসো না একদিন আমাদের ওখানে,' মেমসাহেব আবার বললেন, 'কিছু খাবে-টাবে। আসবে?...মুখে যে কথা নেই? শাই বয়!'

সব-ইনসপেক্টরের পুত্রকে এতখানি আপ্যায়ন ক'রে মেমসাহেব নিজের ভালোমানুষিতে ভারি খুশি হলেন, আর সাহেব ছোট্ট অস্ফুট একটুখানি 'Well' ব'লে যেই পা বাড়িয়েছেন, অমনি যেন তাঁরই পদপাতেব প্রতাপে বাড়িটা যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো, বাজ-পড়ার মতো প্রচণ্ড শব্দে একটুক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে থাকলো সবাই। হঠাৎ মস্ত খোলা জানলাটা দিয়ে যেন আকাশ থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়লো ফার্ডিনান্ড সাহেবের ছোটো ছেলে, সুরকি আর জলের ধোঁয়ায় ঘর ভ'রে দিয়ে একটা বিরাট ঢেউ লাফিয়ে উঠে মিলিয়ে গেলো।

... মেমসাহেবের হাত ধ'রে পুলিশ-সাহেবও দিব্যি দৌড় দিলেন। মুখের লোনা জলের ছিটে হাত দিয়ে মুছে ফেলে তন্ময় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলো আশ্চর্য দৃশ্য। এই একটু আগে যেখানে সুন্দর বারান্দাটি ছিলো, সেখানে এখন থৈ-থৈ করছে জল, থৈ-থৈ, হৈ-হৈ, হৈ-চৈ, কী ফুর্তি জলের!— এই ঘর, যার একদিকে এখন দেয়ালের বদলে আকাশ, আর দূরের ঐ লম্বা বাঁকা ঝাপসা নীল— এ-দুয়ের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে পড়ন্ত রোদে সোনার মত জল, অস্থির, নিশ্চিন্ত, অফুরন্ত জল।"

—*অন্য কোনখানে*, বুদ্ধদেব বসু। ২য় সং, পৃ. ৩১

নোয়াখালির আরো স্মৃতি : পারিবারিক চিঠিপত্র লিখতে শেখা— ডায়েরি রাখা— ভাষাশিক্ষার আরম্ভ

"... পারিবারিক ছোটো-ছোটো চিঠিপত্র তিনি [দাদামশাই] আমাকে দিয়েই লেখান। আমার সাত বছরের জন্মদিন থেকে আমাকে একটি রোজনামচা লেখার কাছে লাগিয়ে দিলেন—সবই ইংরেজিতে। শুরুতে তিনি বাক্যগুলো ব'লে দিতেন আমাকে, বা সাহায্য করতেন : অল্পদিনের মধ্যে আমার কলম স্বাধীনভাবে সচল হ'য়ে উঠলো।

... তবু বলবো যে এখনকার স্বাধীন ভারতের বিত্তশালী সমাজে যে-ইঙ্গোম্মাদনার জোয়ার ডেকেছে (*যেন* ছেলেমেয়েরা ফিরিঙ্গি টানে এক ধরনের খিচুড়ি-ইংরেজি বলতে পারলেই শিক্ষার চূড়ান্ত হ'লো।) সে-রকম কিছুই আমার পরিবেশের মধ্যে ছিলো না তখন। ইংরেজি ছিলো আমাদের কাছে বইয়ের ও স্কুল-কলেজের ভাষা— জীবনের ভাষা বাংলা। আমার বাংলার জন্য চিন্তাহরণকে কোনো শ্রম করতে হয়নি, আমার শিক্ষক ছিলেন শুধু লেখকরা— যোগীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোর থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জাদুকরগণ।

দাদামশাই আমাকে সংস্কৃতটাও ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহে আমি 'নরঃ নরৌ নরাঃ' ও 'তি তস্ অন্তি'র প্রথম সিঁড়িগুলো ভেঙেছিলাম, মুখস্থ করেছিলাম কিছু চাণক্যশ্লোক, কয়েক পৃষ্ঠা 'হিতোপদেশ' চর্বণ করেছিলাম।... পরে স্কুল-কলেজে— ব্যাকরণের প্রতি বিতৃষ্ণা নিয়েও— আমি আরো কয়েকটি পদক্ষেপ এগোতে পেরেছিলাম। একে বুড়ি-ছোঁয়ার বেশি কিছু বলা যায় না, কিন্তু এখন বুঝতে পারি ঐ স্বল্প তহবিলও আমার সাহিত্যিক জীবনে কাজে লেগেছিলো— এখনো লাগছে।"

—*আমার ছেলেবেলা*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৪২

দাদামশাইয়ের কাছে ব্যাকরণ-বর্জিত ইংরেজি শিক্ষা

"... আমার ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে আর-একটা কথা বলতে চাই। দাদামশাই আমাকে ব্যাকরণের বালুডাঙায় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট করেননি; কোনো নেসফীল্ড ছুঁয়েও দেখতে হয়নি আমাকে; কাকে বলে জেরান্ড বা ইনফিনিটিভ, ক্রিয়াপদের মধ্যে কোনগুলো ট্রানজিটিভ আর কোনগুলো নয়— এ-সব তত্ত্ব অনেক বয়স পর্যন্ত আমি জানতাম না। আর তাই ঐ বিদেশী ভাষা অতি সহজে তার আনন্দের উৎসটি আমার জন্য খুলে দিয়েছিলো। আমার বয়স যখন ছয় থেকে আটের মধ্যে সেই সময়েই আমি ইংরেজি কবিতায় স্পৃষ্ট ও দষ্ট হয়েছি: 'Break, break, break / On thy cold gray stones, O sea!'—এই লাইনটার অফুরন্ত অনুরণন আমি শুনতে পাই মনে-মনে, তুষার-ঝড়ে হারিয়ে-যাওয়া লুসি গ্রে-র কথা ভেবে আমার রৌদ্রতপ্ত দুপুরগুলি উদাস হ'য়ে ওঠে।"

—তদেব, পৃ. ১৫

'ডেলনি হাউসে'র স্মৃতি : প্রথম কবিতা রচনা— ইংরেজিতে। তারপর থেকে বাংলায়

"জীবনে আমি প্রথম যে-কবিতাটি লিখেছিলাম, সেটি এই নদীর সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

একবার আমরা ছিলাম এমন একটি বাড়িতে, যা নোয়াখালির সবচেয়ে ভালোর মধ্যে একটি।... নোয়াখালিতে এটা আমাদের চতুর্থ বাসা, পাকা বাড়ি এটাই প্রথম ও একমাত্র।... যাকে বলা হয় 'কলোনিয়েল স্টাইল', যার দুটি-চারটি জীর্ণ নমুনা কলকাতার চৌরঙ্গিপাড়ায় বা মফস্বলের পুরোনো কোনো ডাকবাংলোতে এখনো দেখা যায়, সেই ছাঁদের বাড়ি— লোকেরা বলে 'ডেলনি হাউস'— আদি যুগে খুব সম্ভব কোনো হার্মাদ— মানে, পর্তুগিজের কুঠি ছিলো। মস্ত উঁচু প্লিন্‌থের একতলা, দশ-বারো ধাপ দীর্ঘাকার সিঁড়ি উঠে চওড়া একটি বারান্দা পাওয়া যায়, সামনে দুটো প্রকাণ্ড হল-ঘর পাশাপাশি, দু-পাশে আরো দুটো ঘর যেগুলিকে সংসর্গের জন্য ছোটো দেখালেও আসলে বেশ হাত-পা ছড়ানো, প্রায় সেই মাপেরই হাত-কমোড-বসানো বাথরুম, খাবার ঘরটির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাউকে ডাকলে অন্য প্রান্ত থেকে সে শুনতে পায় না। এ ছাড়া আর-একটি বারান্দা আছে পিছন দিকে; টালিব ছাদের আলাদা রান্নাবাড়ি, গোসলখানা— আর পশ্চিমে আরো দুটো ঘব যেগুলো আমাদের অধিকারভুক্ত নয়, সেখানে এক জমিদারের শেরেস্তা বসে। শোনা যায় এব প্রথম মালিক লবণের ব্যাবসায় পয়সা করেন, বাড়ির তলায় মস্ত বড়ো আস্তাবল ছিলো তাঁর— প্লিন্‌থ-এর গায়ে সারি-সারি তোরণাকৃতি ফোকরগুলো ছিলো ঘোড়াদের যাওয়া-আসার দরজা।

আমরা যখন প্রথম এলাম, তখন দক্ষিণের বারান্দা থেকে নদী দেখা যায়, কিন্তু প্রথম বর্ষা কেটে যাবার পরেই নদী অনেক এগিয়ে এলো, দ্বিতীয় বর্ষায় বড়োদের মুখে বলাবলি শুনলাম এ-বাড়িতে আর বেশিদিন থাকা যাবে না। একদিন সন্ধেবেলা দক্ষিণের ছোটো ঘরে ব'সে হঠাৎ একটা কবিতা লিখে ফেললাম— ইংরেজিতে। ছ-সাত স্ট্যান্‌জার কবিতা— প্রথমটা আমার মনে আছে এখনো।

Adieu, adieu, Delony House dear,
We leave you because the sea is near,
And the sea will swallow you, we fear.
Adieu, adieu.

ইংরেজিতে কেন? আমি জানি না— ইংরেজিতে এসেছিলো, এ ছাড়া আমার কোনো উত্তর নেই। কিন্তু ইংরেজিতে কেন 'এসেছিলো', তারও কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই? আমার বয়স তখন নয় হবে বা কিছু বেশি, হেম নবীন মধুসূদনের সঙ্গে চেনাশোনা আছে, আমি জানি এবং মানি এঁরা বড়ো কবি, 'মহাকবি'— কিন্তু আসলে হয়তো অনেক বেশি ভালো লাগছে 'ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান জেম্‌স্ অব ইংলিশ পোইট্রি' নামের লাল মলাটের মোটা বইটা— আমার পুরোনো এক সঙ্গী যার ছোটো-ছোটো অক্ষরে আমি প্রথম পড়েছিলাম ওঅর্ডস্বার্থ, কূপার, টমাস

গ্রে-র এলিজি, এরিয়েল-এর গান। আসলে আমার জীবনে তখনো রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়নি, শৈশবোত্তর বাংলা কবিতার অমৃতস্বাদ আমি পাইনি তখনও। হয়তো সেইজন্যেই এই বিদেশী ভাষায় ডেলনি হাউসকে বিদায় জানিয়েছিলাম।

... প্রথম পাপটি ক'রে ফেলার পর, আমি কবিতাকে আর ছাড়তে পারলাম না, অথবা কবিতাই আর নিস্তার দিলো না আমাকে— কিন্তু এর পর থেকে যা-কিছু লিখি, সবই বাংলায়। কেন ইংরেজি ছেড়ে বাংলা ধরলাম সেটাও আমি বলতে পারবো না — কেউ আমাকে পরামর্শ দেননি, ব'লে দেননি বাংলায় লিখতে, আর ভেবে-চিন্তে বেছে নেবার মতো বুদ্ধি যে আমার তখনও হয়নি, তা অবশ্য না বললেও চলে।

প্রায় রোজই লিখি একটি-দুটি পদ্য... লিখি নিয়ম ক'রে, মাষ্টারমশাই যেমন স্কুলের ছেলেকে হোম-ওঅর্ক দেন, তেমনি আমি নিজেই নিজেকে টাস্ক দিয়েছি। বিষয়গুলি খুব গতানুগতিক— 'নদী', 'সন্ধ্যা', 'প্রভাত', 'সূর্যাস্ত', এই ধরনের, আমার চলন টলোমলো, ছন্দ ভাঙাচোরা, আমার মডেল বোধহয় 'সদ্ভাবশতক' বা মানকুমারী বসুর কবিতা। কিন্তু ক্রমশ এই ছেলেমানুষি চেষ্টা আমাকে সুখ দিতে লাগলো, আমার কলম হ'য়ে উঠলো দ্রুত সচল, ডেলনি-হাউস ছেড়ে যাবার আগেই আমি পয়াবে-ত্রিপদীতে একটা সপ্তকাণ্ড রামায়ণও লিখে ফেলেছিলাম, মনে পড়ে— খুব খুশি হয়েছিলাম লিখে উঠে— কিন্তু সম্ভবত সেটা 'ছোট্ট রামায়ণে'রই চর্বিতচর্বণ।"

—তদেব, পৃ. ৩৬

প্রথম মহাযুদ্ধের স্মৃতি

'আমার ছেলেবেলা'য় বুদ্ধদেব লিখেছেন, "প্রথম মহাযুদ্ধ আমার স্পষ্ট মনে আছে।" মনে হয় তাঁর স্মৃতিতে জাগরূক হ'য়ে ছিল মহাযুদ্ধের অন্তিম অংশের ঘটনাবলি— কারণ মহাযুদ্ধ আরম্ভের সময় (২৮ জুলাই ১৯১৪) তাঁর বয়স ছিল ৫ বছর ৮ মাস। "যুদ্ধ-ঘটনার বিশ্লেষক ও ব্যাখ্যাতা" যাঁরা তাঁদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করেন, "কাগজ পড়েন খুঁটে-খুঁটে, ম্যাপ দ্যাখেন, হিশেব রাখেন কোন পক্ষ কতদূর এগোলো বা পেছোলো," তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষ করার পক্ষে আরেকটু বেশি বয়সই উপযুক্ত বলে মনে হয়। তাছাড়াও, "ভারতসমুদ্রে 'এমডেন' যখন হুলস্থুল টর্পেডো চালাচ্ছে" তখন সময় ১৯১৭-এর শেষার্ধ; উল্লেখ রয়েছে ফরাশি সেনাপতি মার্শাল ফশ (Foch)-এর— ইনি মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৯১৮-এর মার্চে। সুতরাং, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দেড়-দু-বছরের স্মৃতির কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন, এমন মনে করা অসংগত হবে না।

"কিন্তু এই সুদূর যুদ্ধ আমাদের জীবনে কোনো রেখাপাত করেনি। মাঝে কিছুদিন

আমাকে কাঠপেন্সিলের বদলে কাগজের পেনসিল ব্যবহার করতে হয়েছিলো, আর শাদার বদলে বালি-কাগজ, আর দিদিমা মাঝে-মাঝে উদ্বিগ্ন হতেন পাছে এবার বালামের বদলে রেঙ্গুনি চাল খেতে হয়— এটুকু ছাড়া আর কোনো ফলাফল আমার মনে পড়ে না।"

—তদেব, পৃ. ৭২

ডাকঘর-প্রীতির আরম্ভ : পত্রিকায় লেখা পাঠানো শুরু হল

"সেই অল্প বয়সেই ডাকবিভাগের সঙ্গে আমার নিবিড় লেনদেন শুরু হয়েছিলো। যেহেতু পারিবাবিক চিঠিপত্র আমাকে দিয়েই লেখানো হয, তাই আত্মীয়রাও বেশির ভাগ চিঠি আমারই নামে পাঠান; মাসে-মাসে আসে অনেকগুলো ছোটো-বড়ো পত্রিকা, দাদামশাই আমাকে কলকাতা থেকে ভি. পি. ডাকে বই আনিয়ে দেন মাঝে-মাঝে, আমি তাঁব সঙ্গে পার্সেল ছাড়াতে গিয়ে ডাকঘরের অন্দরমহলে প্রবেশ করি। সেই থেকে আমি এমন ধারণাও পোষণ করেছিলাম যে সেখানে সব ভালো-ভালো বই কিনতে পাওয়া যায়, আর এই ভুল ভেঙে যাবার পরেও আমার পোস্টাপিশ-প্রীতি ক্ষুণ্ন হয়নি, বরং আরো বেড়েই গিয়েছিলো, কেননা ততদিনে আমি দিগ্বিদিকে লেখা পাঠাতে শুরু করেছি—অনববত ফেরৎ আসছে সেগুলো, আর বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো এক-আধটা কখনো ছাপা হচ্ছে না তাও নয়।..."

—তদেব, পৃ. ৪২

কোনো-কোনো জীবনীকার লিখেছেন, তাঁর প্রথম রচনা বেরিয়েছিল ১৯২৩-এ, ঢাকার 'তোষিণী' পত্রিকায়; কিন্তু এর অন্তত দু-তিন বছর আগে থেকেই তাঁর রচনা নানা পত্রিকায় বেরোতে আরম্ভ করেছে। চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত সম্ভ্রান্ত 'নারায়ণ' পত্রিকাতে তাঁর লেখা বেরিয়েছিল ফাল্গুন ১৩২৮-এ— সুতরাং অন্য ছোটখাট পত্রিকায় আরো আগেই বেরিয়ে থাকবে। তা ছাড়া তাঁর নিজের সাক্ষ্যেই দেখা যাচ্ছে যে 'তোষিণী'তে তাঁর প্রথম লেখা যখন বেরিয়েছিল তখনও তিনি নোয়াখালিতে— অর্থাৎ ১৯২১ বা তৎপূর্বের ঘটনা এটি। এই রকম একটি আদিরচনা উদ্ধৃত হয়েছে ১৯২২ সালের বিবরণে।

রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়

"... 'চয়নিকা' চোখে দেখার আগেই রবীন্দ্রনাথে আমার প্রবেশিকা ঘটে আর, খুব সম্ভব, প্রথম অভিঘাত বই পড়ারও নয়, কানে শোনার। একবার গিয়েছিলাম নোয়াখালির মেয়েদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানে, দাদামশায়ের সঙ্গে। একটি বেশ বড়োশড়ো মেয়ে (অন্তত আমার চোখে তা-ই) সাধারণ শাড়ি-জামা প'রে এসে দাঁড়ালো; দর্শকদের নমস্কার ক'রে যে-কবিতাটা বললো তার প্রথম

লাইন 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে/জাগো রে ধীরে'। তারপর চার-পাঁচটি মেয়ে সেজে-গুজে এসে অভিনয় করলো মিনিটদশেকের একটা নাটক। শ্রাবস্তীপুরে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, ধনীর গৃহেও অন্ন নেই, কেউ কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না— শুধু একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো সে সকলকে অন্নদান করবে। আমার কানে লেগে রইলো সেই আবৃত্তি, সেই রচনা, 'জয়সেন' ও 'করিছেন' শব্দের অসাধারণ মিল, 'চিত্ত', 'তীর্থ', 'নিত্য' প্রভৃতি সমস্বর শব্দের অনুরণন— মেয়েদের বলা ছন্দ, ভাষা, অনুপ্রাস আমার মনে এক নতুন ও অদ্ভুত স্বাদ ছড়িয়ে দিলো। আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম যে 'কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!/ মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে' ইত্যাদি লাইনগুলো প'ড়ে, শুনে বা নিজে আবৃত্তি ক'রে, ঠিক এ-রকম সুখ আমি কখনো পাইনি।

এই মেয়েদের স্কুলের ঘটনাটুকু কোন সময়কার, তখন আমরা কোন বাড়িতে আছি, সে-সব কিছুই আমার মনে নেই। এমনও হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও আমি পড়িনি তখনও, অথবা লেখকের নাম লক্ষ ক'রে পড়িনি, কিন্তু কোনো-এক সময়ে — বেশিদিন পরেও হয়তো নয়— আমার বয়স বোধহয় তখন এগারো চলছে— 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামটি আমার কাছে স্পষ্ট এবং প্রিয় হয়ে উঠলো।"

—তদেব, পৃ. ৫৫

প্রথম 'চয়নিকা' পড়ার স্মৃতি

"এক শীতের সকালে— আমরা তখন ঢাকায় বেড়াতে গিয়েছি— আমার এক আত্মীয় ঘরে ঢুকে আমাকে বললেন, 'এই যে, তোমার বই।' গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে বের ক'রে দিলেন এক কপি 'চয়নিকা'। ডবল-ক্রাউন ষোলো-পেজি আকার, ইন্ডিয়ান প্রেসে পাইকা অক্ষরে ছাপা; লেখক— 'শ্রী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদকের নাম 'শ্রী' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বই হাতে পাবার পর আমি হারিয়ে ফেললাম হেম নবীন মধুসূদনকে, এর আগে যত বয়স্কপাঠ্য বাংলা কবিতা আমি পড়েছিলাম, তার অধিকাংশ আমার মন থেকে ঝ'রে প'ড়ে গেলো। এখনো অর্ধশতাব্দী পরেও, আমি যখনই ভাবি রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো লাইন— 'ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী / চরণপদ্মে নমস্কার,' বা 'হাজার-হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহেনি কথা,' বা 'আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,' বা 'ঐ শোনো গো অতিথ বুঝি আজ / এলো আজ—' তখনই আমার চোখে ভেসে ওঠে সেই ডবল-ক্রাউন ষোলো-পেজি সাইজের পৃষ্ঠা, সেই পাইকা অক্ষর— নিখুঁত একটি ফোটোস্টাট কপি যেন— অথবা, আরো অবিকল— পৃষ্ঠাটি ডাইনের না বাঁয়ের তা পর্যন্ত আমি ভুলিনি। পরবর্তী ভোট-কুড়োনো পরিস্ফীত 'চয়নিকা' বা এখনকার চলতি বই 'সঞ্চয়িতা', এগুলোকে আমি কখনোই ভালোবাসতে পারিনি — এদের আকার, মুদ্রণ, পঙ্‌ক্তিসজ্জা, স্তবকবিন্যাস, কিছুই আমার পছন্দ হয়

না— এই একটি বিষয়ে বর্তমানের উপর আমার অতীতকাল জয়ী হ'য়ে আছে।"

—তদেব, পৃ. ৫৪

এর সমান্তরাল অংশ, '*অন্য কোনখানে*' উপন্যাস থেকে

"সতুদা ফিরে গেলেন কলকাতায়, যাবার আগে তাকে উপহার দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চয়নিকা। সে-বই খুলে তন্ময়ের মনে হ'লো স্বর্গ।

স্বর্গ, স্বপ্ন। প্রথমঘুমভাঙা ভোরবেলার না-জাগা না-ঘুমের স্বপ্ন, স্বপ্ন দিন ভ'রে, রাত্রে, স্বপ্ন ভেঙে স্বপ্ন। আজি এ-প্রভাতে রবির কর— রবি মানে সূর্য? না; রবীন্দ্রনাথ। আর কর? নিশ্চয়ই হাত। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আঁকড়ে ধরেছেন মুঠোর মধ্যে, উড়ে চলেছেন আকাশে তাকে নিয়ে, ঝাঁপ দিয়েছেন পাথারে, আঁধার পাথারতলে পাতালে; আবার চলেছেন পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে সপ্তস্বর্গপুরে,... যেখানে নদীর নিকষে অরুণ রক্ত আলোর মদে মাতাল; হাতে হাত ধ'রে নাচছেন ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে — আনন্দ, কী আনন্দ, ছোটে আনন্দ, ফোটে আনন্দ, রাশি-রাশি আনন্দের অট্টহাসি, অন্ত নেই। আরো, চলো, শুধু চলো, শুধু ধাও শুধু ধাও উদ্দাম উধাও — আর কত? আর কত দূরে নিয়ে যাবে বলো, কোথায়, কোনখানে, অন্য কোনখানে?

তন্ময়ের দিনরাত্রির চেহারা বদলে গেলো।"

—২য় সং, পৃ. ১০৩

১

প্রথমবার 'ছিন্নপত্র' পড়ার স্মৃতি

"রবীন্দ্রনাথের গদ্যবই আমি প্রথম পড়ি 'ডাকঘর' আর 'ছিন্নপত্র'— দুটোই টাউনহল লাইব্রেরি থেকে ধার ক'রে। 'ডাকঘরে'র দৃশ্যপট আমাকে বেশ ভাবিয়েছিলো, মনে পড়ে: নীল পাহাড়, লাল রঙের রাস্তা, ঝর্নার জল— এসব আমার কল্পনায় থাকলেও চোখের পক্ষে অচেনা ছিলো...। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র ভূগোল শনাক্ত করতে আমার একটা দিনও দেরি হয়নি— তার সঙ্গে দৈবের একটি যোগাযোগ ঘ'টে গিয়েছিলো।

কুমিল্লা জেলার এক গ্রামে যাচ্ছি দাদামশায়ের সঙ্গে— উপলক্ষ: এক মাসির বিয়ে। যাচ্ছি নৌকোতে, সারাটা পথ নৌকোতে, পুরো একটা দিন কেটে গেলো জলের উপর। আমি সঙ্গে নিয়েছি 'ছিন্নপত্র'— মোটা অ্যান্টিকে ছাপা কালো চামড়ায় বাঁধানো বই—বইটার মধ্যেই ডুবে আছি। হাউসবোট নয়— গোল ছইওলা অতি সাধারণ দিশি নৌকোয় চলেছি আমরা, পদ্মা আত্রাই ইছামতীর বদলে সরু-সরু খালের মধ্য দিয়ে— আমাদের দুপাশে বনজঙ্গল ঘন, কোথাও-কোথাও দিনের আলোতেও প্রায় অন্ধকার, কোথাও-কোথাও বৈঠা রেখে দিয়ে লগি ঠেলতে হচ্ছে

মাল্লাকে, জল থেকে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ উঠছে, দৃশ্য বলতে উলঙ্গ শিশু আর বাসন-ধুতে-আসা বৌ-ঝিরা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু আমি যেন সেই সব দৃশ্য দেখতে-দেখতেই চলেছি, 'ছিন্নপত্রে' যেগুলোর কথা আছে— সেই জ্যোছনা, রোদ্দুরে ঝলকে ওঠা নদীর স্রোত, সেই শান্ত বালুচর, অবাধ নির্জনতা। বিয়ে-বাড়িতে দিন দুয়েক মাত্র কাটিয়ে আমরা সেই নৌকোতেই ফিরে এলাম, বাড়ি এসে আমার কেবলই মনে হ'তে লাগলো আমার সারা শরীর টলছে—বুঝতে পারলাম না সে কি নৌকোর দুলুনির জন্য, না কি বইটা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না।... সেই নৌকোতে পড়া বইটি আমার কাছে এখনো প্রথম দিনের মতোই তরতাজা। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-বইয়ের মধ্যে আমি জীবন ভ'রে সবচেয়ে বেশি বার পড়েছি 'ছিন্নপত্র', আমার প্রথম বিদেশভ্রমণের সময় আমি ওটি অতি যত্নে সর্বদা সঙ্গে রেখেছিলাম— বারো হাজার মাইল দূরে ব'সে মাঝে-মাঝে বাংলাদেশের হৃদয়ের স্পর্শ পাবার জন্য।"

—*আমার ছেলেবেলা*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৫৭

অপ্রিয় কাজে পরিশ্রমী হবার শিক্ষা

"নোয়াখালি-বাসের শেষের দিকে, যখন আমার কলম থেকে ফিনকি দিয়ে গদ্য-পদ্যের ধারা ছুটছে, সেই একই সময়ে আমি তোড়ে ক'ষে যাচ্ছি পর-পর অনেকগুলো পাটিগণিত আর বীজগণিত বইয়ের প্রশ্নমালা, বীজগণিতটা উপাদেয় লাগছে রীতিমতো। সংখ্যা, অক্ষর ও নানান ধরনের চিহ্নযুক্ত এক-একটা বিরাট ও বিদঘুটে চেহারার ব্যূহ যখন আমার পেন্সিলের খোঁচায় কুঁকড়ে যেতে যেতে অবশেষে একটি একাক্ষরে এসে ঠেকে, আমার মনে হয় আমি যুদ্ধে নেমে দুষমনগুলোকে কচু-কাটা ক'রে দিলাম। এতে অবশ্য আমার অঙ্কের মাথা খুলে যায়নি... তবু মনে হয়, এই চর্চায় আমি অন্য ভাবে উপকৃত হয়েছিলাম— তা আমাকে সাহায্য করেছিলো মানসিক আলস্য কাটিয়ে উঠতে, অপ্রিয় কাজে পরিশ্রমী হ'তে শিখিয়েছিলো। যে-সব মানুষের কল্পনার দিকে টান বেশি তাদের জীবনে এই শিক্ষাটি মূল্যবান।"

—তদেব, পৃ. ৮৫

বুদ্ধদেবের বালকবয়সের রচনার নিদর্শন

'ডাক'

—বুদ্ধদেব বসু

ঐ শোনো ডাক
ওরে মূঢ়, বঞ্চিত, নির্বাক্।
ওরে মূক, ওরে বদ্ধ, ওরে সন্দ [?], মলিন, বধির,

একবাব জেগে ওঠ চঞ্চল অধীব।
সুপ্তিব জডতা ভেদি ঐ শোনো উদাত্ত সে ধ্বনি,
মাযেব শৃঙ্খল খসি বাজিতেছে ওই বণবণি।
একবাব জেগে উঠে শোনো সেই ডাক,
হে চিব নির্বাক।
ঐ শোনো মাতৃ বন্দনাব,
তরুণ কণ্ঠেব বাণী মাতৃমন্ত্র কবিছে প্রচাব,
জীবন কবিযা পণ ঐ দেখ কত মুক্তি-সেনা,
কাবাগাবে হাসিমুখে সহিতেছে অসীম লাঞ্ছনা।
শুনিযা তাদেব ডাক বক্ত কি নাচে না?
সকল হীনতা ছাডি মাতিবি না— ওবে শান্তিসেনা।
বহে নাকি উষ্ণ হ্যে বক্ষ মাঝে চঞ্চল রুধিব?
হে চিব সুধীব।
একবাব হবি না পাগল?

"দ্বাদশবর্ষীয় বালকেব বচিত"
'শঙ্খ' ১২ আষাঢ ১৩২৯
উৎস *'বুদ্ধদেব বসু'*, ভূঁইয়া ইকবাল
বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১ম সং, পৃ ১২১

লেখাব চর্চা; অভিনযেব চর্চা; হাতে-লেখা পত্রিকা। মানসিক অতৃপ্তি

"আমাদেব নোযাখালিবাসেব শেষ পর্যাযে আমাব সমযটা তেমন ভালো কাটেনি। আমি আত্মসচেতন হ'যে উঠছি, নিজেব অনেক প্রকৃতিদত্ত ত্রুটি আবিষ্কাব ক'বে ক্ষুণ্ণ হ'যে আছি মনে-মনে। সমবযসী অন্য ছেলেদেব তুলনায আমি বেঁটে, আমি বোগা এবং দুর্বল — ফুটবল দূবে থাক, ব্যাডমিন্টনে আমাব অল্পেই দম ফুবিযে যায। আমাব স্বাস্থ্য ভালো নয তাব উপব আমি তোৎলা; হঠাৎ কোনো অচেনা লোকেব সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমাব যন্ত্রণা দুঃসহ হ'যে ওঠে, কোনো তর্ক উঠলে আমাব চোখা-চোখা যুক্তিগুলোকে কণ্ঠনালী থেকে টেনে বেব কবাব ব্যর্থ চেষ্টায আমি হাঁপাতে থাকি। কিন্তু প্রায় একই সময়ে, আমি এও বুঝেছি যে আমাব হাতে এ-সব বঞ্চনাব একটি উত্তব এসে গিয়েছে — একটি ক্ষতিপূবণেব উপায, হয়তো বা এমন কোনো ক্ষমতা যা সকলেব থাকে না। তত দিনে আমি এক-ঝুড়ি-ভর্তি কবিতা আব গল্প-প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি; বিকাশ অথবা পতাকা নামে একটি হাতে-লেখা মাসিকপত্রের আমি সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকাব; ঢাকাব শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'তোষিণী'তে আমাব লেখা বেবিয়েছে, আব বর্জইস অক্ষবে কলকাতাব 'অর্চনা'য় এমনকি শ্বেতপীত মলাটধাবী সম্ভ্রান্ত চেহাবাব 'নারায়ণে'ও। আমাব কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা নোয়াখালি শহরে, এবং অন্য

একটি কারণেও বয়স্করা আমাকে সমাদর করছেন। আমি হঠাৎ একজন অভিনেতা হ'য়ে উঠেছি, এমনকি গড়ে তুলেছি আমার সমবয়সী বা আমার চাইতে অল্প-বড়ো কয়েকটি ছেলেকে জুটিয়ে একটি নিজস্ব নাটুকে দল; আশ্চর্যের বিষয়, মঞ্চে নামলে আমার তোৎলামির চিহ্ন মাত্র থাকে না— আমাকে সাহায্য করে আমার উৎসাহ, শ্রোতাদের প্রীতি, আর সবচেয়ে বেশি কবিতার ছন্দ।... 'মেঘনাদবধ কাব্য' আর নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' থেকে সংকলিত কোনো-কোনো দৃশ্য আমাদের বিশেষ প্রিয়— স্থানীয় এলিটবৃন্দও সেগুলির তারিফ ক'রে থাকেন। ... সকলেই একটু বিশেষ চোখে দ্যাখেন আমাকে, যে-সব বই উপহার দেন তার মধ্যে থাকে এক ভল্যুমে সমগ্র শেক্‌সপীয়ার, এমন-কি বাল্মীকি-রামায়ণ পর্যন্ত।

... কিন্তু আমার এই ছোটো-ছোটো সাফল্যগুলোয় আমার ঠিক মন উঠছে না। আমি যা, আমি তার চেয়ে বড়ো, ভালো, যোগ্য হ'তে চাই— কবে, কতদিনে, কেমন ক'রে তা হ'তে পারবো আমি ভেবে পাই না।... আমি পড়ছি জুল ভের্ন, 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন', ভিক্তর উগোর উপন্যাস— আমার মন ঘুরে বেড়ায় দূর দেশে, নীলতর অন্য সব আকাশের তলায়— পর্বতে, অরণ্যে, সমুদ্রে— ভাসে গণ্ডোলায় চাঁদের আলোয় সন্ধেবেলা, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামে কোনো নতুন শহরে ক্যাথিড্রেল পাড়ার সরাইখানায়। কিন্তু স্বপ্ন— শুধু স্বপ্ন এগুলো— যেখানে আছি সেখানে বাঁশবনে সন্ধ্যা নামে ঝামরে, মশাদের কোরাস বাজে উঁচু পর্দায়, সবুজ পুকুরে কচুরিপানা আরো এগিয়ে আসে, আর পাশের বাড়িতে এক পুলিশ-ইনসপেক্টর তাঁর ভাইপোকে হান্টার দিয়ে পেটাতে থাকেন— প্রায় নিয়ম ক'রে। ছেলেটা ষণ্ডাগোছের, আমি তাকে একটুও ভালোবাসি না, কিন্তু তার আর্তনাদ যেন গাঢ়তর এক কালিমা ছড়িয়ে দেয় হাওয়ায়, আমি উঠে গিয়ে লণ্ঠনের আলোয় আবার কোনো বই খুলে বসি— হয়তো সেই বইটার নাম 'চয়নিকা'।"

—*আমার ছেলেবেলা*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৫৩

তোৎলামির সঙ্গে লড়াই

এই অংশে তোৎলামির যে-উল্লেখ আছে, সেই মানসিক অসুখের বিরুদ্ধে কেমনভাবে লড়াই করে জিতেছিলেন তিনি তারও অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে তাঁর 'অন্য কোনখানে' উপন্যাসে— যেটিকে তাঁর বয়ঃসন্ধিকালের স্মৃতিকথাই বলা যায়।

" 'এসো না একদিন আমাদের ওখানে।'

'কী ক'রে যাবো? কুকুর যে!' এই উত্তর তন্ময়ের মনে এলো, কিন্তু ওটা বললো না, অতগুলো 'ক'র সঙ্গে কুস্তি ক'রে সে কি পারবে? মনে-মনে কথাটা বদলে নিয়ে আস্তে বললো, 'আপনাদের স্‌স্‌স্‌—' না, হ'লো না, সিঁড়িটাও বাদ — হঠাৎ তার মনে এলো, মুখে এলো, 'আপনাদের দরজায় যে-রকম একটা জন্তু বাঁধা থাকে—'

'জন্তু বাঁধা থাকে! বলো কী হে!' তন্ময়ের পিঠে চাপড় দিয়ে হা-হা হেসে

উঠলো সতীশ। 'বেশ কথা বলো তো তুমি।'

শব্দের তির্যক ও সাহিত্যিক প্রয়োগ কীভাবে করতে হয়, তার একটি পাঠ বুদ্ধদেব এইভাবেই পেয়েছিলেন— ঐ প্রতিবন্ধকের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েই।

হাতে-লেখা যে-পত্রিকাটির উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব সেটির নাম মনে হয় 'পতাকা'ই ছিল। নানা স্থানে 'পতাকা' নামটির আরো উল্লেখ পাওয়া যায়— কিন্তু 'বিকাশ' কোথাও চোখে পড়েনি।

বুদ্ধদেব লিখছেন, এই সময় 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরিয়েছিল। পত্রিকাটি চালাতেন চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর পবিচয হয়েছিল ১৯১৯ সালে, যখন চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেবার উপলক্ষে স্বগ্রামে এসেছিলেন (দ্র : 'মানুষ চিত্তরঞ্জন', অপর্ণা দেবী, ১ম সং, পৃ. ১৯৩)। বুদ্ধদেবও লিখেছেন :

> "আমি জানি না কেমন ক'বে সেটি ঘটানো হয়েছিলো, কিন্তু একদিন আমি তাঁব গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রিত হলাম।... শুভ্র চাদরে জড়ানো দীর্ঘকায় চিত্তরঞ্জন কযেক মুহূর্তেব জন্য সেখানে এসে দাঁড়ালেন, উল্টে-পাল্টে দেখলেন আমার কবিতাব খাতা..."
>
> —তদেব, পৃ. ৫৯

অসহযোগ আন্দোলন

> "... আর্মিস্টিসেব অল্প দিন পরেই অন্য এক যুদ্ধ শুরু হ'লো— একেবাবে নতুন ধবনের – আব তা আমাদেবই দেশে, আমাদেবই চোখেব সামনে, আমাদেবই জীবনের মধ্যে তোলপাড় তুলে।
>
> নন্-কো-অপারেশন। অসহযোগ। সত্যাগ্রহ। এই নোয়াখালি শহর— দৈবাৎ যেখানে ছিটকে পড়েছি আমি, আর সে-সময়ে আমার যেটাকে মনে হচ্ছিলো দরিদ্র এবং মলিন এবং দম আটকানো— সেখানেও তরঙ্গ এসে পৌঁছলো।..."
>
> —তদেব, পৃ. ৭৩

যদিও বুদ্ধদেব লিখছেন "আর্মিস্টিসের অল্পদিন পরেই", আর যুদ্ধ বর্ণনার অব্যবহিত পরেই এটি যোগ করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়, কিন্তু জার্মানির সঙ্গে মিত্রশক্তির যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছিল ১৯১৮-র ১১ নভেম্বর, আর গান্ধিজি-উপস্থাপিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেসের কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয় ১৯১৯-র সেপ্টেম্বরে, পুনঃসমর্থিত হয় নাগপুরের বার্ষিক অধিবেশনে, ডিসেম্বরে। প্রায় দু'বছরের ব্যবধান। তবে সেটা এখানে আসল কথা নয়। যেটা লক্ষ্যণীয় তা হল, সাহিত্যের প্রতি যে অবিচল নিষ্ঠা ও ভালোবাসা

প্রায় অজ্ঞান বয়স থেকে তাঁর মানসতার মূল ধর্ম, তাতে প্রথম বড়ো ধরনের ধাক্কা দিয়েছিল এই ঐতিহাসিক ঘটনা, যার নাম অসহযোগ আন্দোলন।

"... প্রায় অজ্ঞান বয়স থেকেই আমি চা-খোর, ততদিনে এমন বয়সে পৌঁচেছি যখন সকালবেলার আধো-ঘুমের মধ্যে লোহার কেটলির ঘণ্টাধ্বনি শুনেও আনন্দ পাই, পিঙ্গলবর্ণ চায়ের রসে ধবল দুধ যখন ঘন মেঘের মধ্যে হালকা মেঘের মতো মিশে যায়, আমার মনে হয় একটি সচল রঙিন ছবি দেখছি। আর তার স্বাদ — গোলাপফুল-আঁকা ধোঁয়া-ওঠা পেয়ালায় প্রথম চুমুক— তুলনা হয় না! সেই চা, যার নতুন নাম হয়েছে কুলির রক্ত, আমি এক দমকে ছেড়ে দিয়েছি। ঘামছি সারা দুপুর চটের মতো মোটা খদ্দরে : নিয়মিত পড়ছি 'ইয়ং ইন্ডিয়া', 'বাংলার বাণী'; লিখছি নবযুগের বন্দনা, দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস, একটা গল্পের আকারে লিখে ফেলেছি পল্লীজীবনের প্রশস্তি— যে-জীবন আমি আসলে কখনো ভালোবাসতে পারিনি— নজরুল ইসলাম নামে এক সৈনিক-কবির বীররসাত্মক কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ। একটি চরকাও আছে আমার, চালাই মাঝে-মাঝে— কিন্তু আমার হাতে যে-সুতো উৎপন্ন হয় তা দড়ির মতো মোটা আর সন্নেসির জটার মতো গুলতি-পাকানো। কোনো অনুষ্ঠান বাদ দিইনি আমি— অনেকগুলো স্বরাজ-টিকিট কিনে ফেলেছি; ঘরে ঝুলছে ভারতমাতা ক্যালেন্ডার, যাতে ভারতের ভাগ্যতরীর হাল ধ'রে ব'সে আছেন মহাত্মা গান্ধী, আর দাঁড় টানছেন চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, লজপৎ রায়, পণ্ডিত মালব্য আর দুই ভাই মহম্মদ আলি শৌকত আলি— আর উপর থেকে স্মিত হাস্যে তাকিয়ে দেখছেন পদ্মধারিণী লক্ষ্মীরূপিণী ভারত-মাতা। একবার, এমনকি, স্বরাজের তারিখ এগিয়ে আনার জন্য, বাড়ির মহিলাদের কিছু শাড়ি-জামা নিয়ে বহ্ন্যুৎসবও করলাম। আমার দুঃখ শুধু এই যে এত ক'রেও গ্রেপ্তার হবার এবং জেলে যাবার যোগ্য হ'তে পারছি না।... শুধু কয়েকটা বছর দেরিতে জন্মেছিলাম ব'লে, নেহাৎই একজন দর্শক হ'য়ে বাইরে প'ড়ে রইলাম। আমি যে বেঁটে, আমি যে তোৎলা, আমার লেখাগুলো যে সম্পাদকেরা অনবরত ফেরৎ পাঠাচ্ছেন— এই সব দোষের যেন রাতারাতি খণ্ডন হ'য়ে যেতো, শুধু একবার ইংরেজের কয়েদখানার ভিতরটা যদি দেখে আসতে পারতাম!

এক বছর কেটে গেলো, দু-বছর কেটে গেলো, স্বরাজ এলো না। জেল-ফেরতা ছেলেরা গুটি-গুটি পায়ে স্কুলে ঢুকছে আবার, কোনো-কোনো উকিল-মোক্তার নতুন ক'রে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, ঘরে-ঘরে চলছে আগের মতোই টাট্টু-মার্কা ল্যাঙ্কাশিয়র-বস্ত্র। কিন্তু আমার পরনে এখনো খদ্দর, চা আমার অস্পৃশ্য।

—তদেব, পৃ. ৭৪

১৯২২ ।। বয়স চোদ্দো

অবশেষে, ঢাকায়

"নোয়াখালিতে আমাদের সর্বশেষ দিনগুলি আমার স্মৃতিতে বড়ো অস্পষ্ট, প্রায় অন্ধকার। এমনকি আমার আশৈশব চেনা শহর ছেড়ে চ'লে আসার দিনটিও আমার মনে পড়ে না। এর পরে পর্দা উঠলো ঢাকায়, দাদামশাই লম্বা ছুটি নিয়ে চ'লে এলেন। আমার বয়স তখন তেরো পার।"

—তদেব, পৃ. ৭৫

প্রভু গুহঠাকুরতা ও অজিত দত্তের সঙ্গে পরিচয়

"আমি ধারাবাহিকভাবে ঢাকায় ছিলাম মাত্র সাড়ে-নয় বছর, কিন্তু ছিলাম ঠিক সেই বয়সটায় যেটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে সগর্ভ ও প্রভাবশালী। ভাবলে মনে হয়— আমার মধ্য-তিরিশ থেকেই তাই মনে হচ্ছে— যেন কতকাল ছিলাম আমি সেখানে, ঢাকার বছরগুলি ভ'রে যেন অনেক-কিছু ঘটেছিলো... আসল কথা, আমি তখন হ'য়ে উঠছি, আবিষ্কার করছি নিজেকে। আস্তে-আস্তে বা দ্রুতবেগে, আমার শরীর-মনের এনভেলাপে পোরা অস্তিত্বটাকে বদলে দিচ্ছিলেন প্রকৃতি দেবী; তাঁর নেপথ্যকর্মের সহযোগী ছিলেন আমার সৌভাগ্যলব্ধ বন্ধুরা। তাঁদের মধ্যে সকলের আগে আমার মনে পড়ে বুদ্ধু-দা-কে— পোশাকি নাম প্রভুচরণ, পদবি গুহঠাকুরতা।

আমরা ঢাকায় আসার পরে একমাসও কাটেনি। আছি ওয়াড়িতে তেইশ নম্বর র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে— পাঁচিল-ঘেরা কম্পাউন্ডওলা পরিচ্ছন্ন একটি একতলায়। একদিন বেলা দশটা নাগাদ বাইরে কড়া ন'ড়ে উঠলো। আমি দরজা খুলে দেখি, একটি অচেনা যুবক সাইকেলের হাতল ধ'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে ধবধবে খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া আর চাদর, শেল-ফ্রেমের চশমার পিছনে চোখদুটি ব্রাউন এবং উজ্জ্বল, গালের হাড় উঁচু, গায়ের রঙ লাল-মেশানো ফর্শা, ঠোঁটের হাসি মনোমুগ্ধকর। আমার মনে হ'লো এমন একটি সুন্দর মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি, মনে হ'লো এক দেবদূত আমার সামনে দাঁড়িয়ে। দু-একটা কথার পরে বোঝা গেলো তিনি আমারই কাছে এসেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই নিবিড় হ'য়ে উঠলো যোগাযোগ। প্রায়ই যাই লক্ষ্মীবাজারে তাঁদের বাড়িতে— আমার জীবনে আড্ডার স্বাদ সেখানেই প্রথম। ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে এম. এ পড়ছেন তিনি, কিন্তু কলেজি গণ্ডির

সীমা ছাড়িয়ে তাঁর আগ্রহ নানান দিকে বিস্তীর্ণ। দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে তিনি কথা বলেন আমার সঙ্গে; আমাকে পড়তে দেন হুইটম্যান, আর এমন অনেক লেখকের উপন্যাস ও গল্পের বই যাঁদের নামগুলো অদ্ভুত এবং অনিংরেজ।"

—তদেব, পৃ. ৭৮

অজিত দত্তের স্মৃতিচারণ

"আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়স, ক্লাস এইট-এ পড়ি, তখন বুদ্ধদেবের সঙ্গে পরিচয় হল। পরিচয় করিয়ে দিলেন বুদ্ধুদা, অর্থাৎ প্রভু গুহঠাকুরতা। প্রভু গুহঠাকুরতার সাহিত্যানুরাগের কথা সুবিদিত। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন, তখন নন-কোঅপারেশনে পড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধুদা আমার মামাতো ভাই, বুদ্ধদেবেরও মামাতো পিসতুতো কোনো এক সম্পর্কের ভাই। বুদ্ধদেব ও ওর দিদিমা তখন গুরুতর অসুস্থ দাদামশাইকে সঙ্গে নিয়ে নোয়াখালি ছেড়ে ঢাকা চলে এসেছেন। বুদ্ধদেবের বয়স তখন তেরো। তখনও ইস্কুলে ভর্তি না হলেও ওর দাদামশাই ওকে ইংরেজি ও বাংলায় প্রচুর পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব ইতিমধ্যেই ইংরেজি-বাংলায়, বিশেষ করে ইংরেজিতে অনেক পড়াশুনো করেছে।...

সে-সময়ে অর্থাৎ ইস্কুল-জীবনে বুদ্ধদেব ও আমি ছিলাম নিত্যসঙ্গী। পরের বছর আমি যখন ক্লাস নাইনে উঠলাম, বুদ্ধদেব প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হল ক্লাস এইট-এ।... যেখানেই থাকুক, আমি রোজই ওর বাড়ি যেতাম অথবা বুদ্ধদেব আসতো। এর আগে কবিতা নিজের মনেই লিখতাম। এতদিনে তা দেখাবার বা কবিতা সম্বন্ধে কথা বলবার মতো বন্ধু পেয়ে কবিতার চর্চা এ-সময় থেকেই উল্লেখযোগ্য ভাবে শুরু করি বলে মনে পড়ছে।... অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সকলেরই উৎসাহ তখন ছিল ব্রহ্মচর্য পালন, গীতা পাঠ এবং দেশোদ্ধারের জন্য কোনো দলের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দিকে। আমি নিজেও বেশ কিছুদিন রাজনৈতিক দলে জড়িত ছিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আড্ডা ছিল বুদ্ধদেব-প্রমুখ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক বন্ধুদের সঙ্গেই।... বুদ্ধুদা ইতিমধ্যে নন-কোঅপারেশন আন্দোলনে কলেজ ছাড়েন এবং পরে বিদেশে চলে যান।"

—'কবিতা লেখার কথা', অজিত দত্ত। 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯

বুদ্ধদেব লিখেছেন, "প্রাক্-ম্যাট্রিক শেষ ক্লাশ দুটো আমি স্কুলে পড়েছিলাম" —যার মানে দাঁড়ায় ক্লাশ নাইন ও টেন; কিন্তু অজিত দত্ত এখানে লিখছেন, তিনি যখন ক্লাস নাইনে পড়েন বুদ্ধদেব তখন ক্লাশ এইটে স্কুলে ভর্তি হন। দুটো তথ্য মিলছে না; ক্লাশ এইটে ভর্তি হলে শেষ দুটো নয়, তিনটে ক্লাশ তাঁকে ইশকুলে পড়তে হয়েছিল।

অজিত দত্ত বুদ্ধদেবের চেয়ে এক বছরের বড়ো— তিনি এক ক্লাশ ওপরে

পড়বেন এটা স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব অন্যত্র লিখেওছেন (আমার ছেলেবেলা, পৃ. ১০০) যে তিনি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন অজিত দত্ত তাঁর জগন্নাথ কলেজ লাইব্রেরি থেকে বই এনে দিচ্ছেন তাঁকে। কিন্তু ওই পুস্তকেরই ৮৪ পৃষ্ঠায় আবার দেখতে পাচ্ছি, লিখছেন, "প্রভুচরণকে বিদায় দেবার সময় আমি নতুন ভর্তি হয়েছি কলেজিয়েট স্কুলে নয়ের ক্লাশে...।"

আমি বুদ্ধদেবের দেয়া তথ্যের ওপরেই নির্ভর করেছি— অর্থাৎ ধরে নিয়েছি তিনি ১৯২৩ সালে নয়ের ক্লাশে ইশকুলে ভর্তি হয়েছিলেন।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছাত্র, পরবর্তীকালের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত লিখেছেন :

"সময়টা ১৯২২-২৩ হবে। আমার জ্যাঠামশায় একদিন এসে বললেন, আমাদের পাড়ায় একটি ছেলে এসেছে— রীতিমতো 'প্রডিজি'। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে চিন্তাহরণ সিংহ এসেছেন র‍্যানকিন স্ট্রিটের উত্তরপ্রান্তের একটি বাড়িতে, সঙ্গে এসেছে তাঁর দৌহিত্র বুদ্ধদেব বসু। অল্পবয়সে মাতৃহীন, দাদুব কাছেই থাকে। আমার সমান বয়সীই হবে কিংবা দু'এক বছরের বড়। তার পড়াশোনা আশ্চর্য রকমের ব্যাপক, ইংরেজি-বাংলা দুইই লেখে চমৎকার, কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নাটক সব কিছুতেই পাকা হাত।

... একদিন নিযে গেলেন চিন্তাহরণবাবুর বাড়িতে। দেখলাম একটি লাজুক-লাজুক চেহারার আমার চেয়েও খর্বকায় একটি ছেলেকে। চেহারায় একটি লালিত্য ছিল, দীপ্তি ছিল। কিছু কথাবার্তা হল। তার বইয়ের সংগ্রহ দেখলাম। আমার নিজের সংগ্রহ নিয়ে গর্ব ছিল...বুদ্ধদেবেব সংগ্রহ দেখলাম আমার চেয়ে অনেক ভালো, বিশেষত ইংরেজি বইযের বেলায়। আমার ছিল অনেক বইযের— যেমন 'অলিভাব টুইস্ট' বা 'ডেভিড কপারফীল্ডে'ব— সংক্ষিপ্ত শিশুপাঠ্য সংস্করণ। বুদ্ধদেবেব বইয়ের তাকে দেখলাম পুরো বইগুলি। আর দেখলাম একটি হাতে-লেখা পত্রিকা — নামটা যতদূর মনে পড়ছে 'পতাকা'।... খেলাধুলাতে রুচি ছিল না, বাড়ির বাইরে রাস্তায কখনো দেখিনি। একদিন আমাদের বাড়িতে নিযে এসেছিলাম। আমার মা, জেঠিমারা ওকে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন, কথা বলাবার চেষ্টা কবলেন, কিন্তু একটা মিষ্টির আধখানা ভেঙে খাওয়া আর দু'এক কথায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া আর কিছু করাতে পারলেন না।

... আগে শুনেছিলাম স্কুলে ভর্তি হবে না, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হয়ে ম্যাট্রিক দিয়ে সোজা কলেজে যাবে। হঠাৎ একদিন দেখলাম মত পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের স্কুলে আমার এক ক্লাস উপরে এসে ভর্তি হয়েছে। প্রথম দিকটায় সারা স্কুলে আমি ছিলাম পূর্বপরিচিত। সহপাঠীরা দেখল একটি নতুন ছেলে এসেছে — বেশি কথা বলে না, টিফিনের সময় নানা ধরনের বই পড়ে। মাষ্টারমশায়রা প্রথম দিকে কিছু বুঝতে পারেননি। কিন্তু প্রথম পরীক্ষা দেবার পরেই সবার টনক নড়ল। ইংরেজি আর বাংলার খাতা দেখে মাষ্টারমশাইরা অভিভূত। হেডমাষ্টার খাঁ

বাহাদুর তসদ্দক আহ্‌মদ ছিলেন প্রকৃত গুণগ্রাহী। আর বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসামান্য প্রীতি ছিল। স্কুলে যে একটি প্রতিভাধর ছেলে এসেছে সেটা প্রায় সবাই স্বীকার করে নিলেন।

... বুদ্ধদেব ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকার সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছে আর আমি এবং আরো কয়েকজন স্কুলে ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক ও কর্মকর্তা। আগের বছর বুদ্ধদেবের লেখা একটি ইংরেজি গল্পের প্রথম অংশ ছাপা হয়েছিল। গল্পটির নাম ছিল Joie de Vivre (বাঁচার আনন্দ)। আমরা বুদ্ধদেবের কাছ থেকে দ্বিতীয় কিস্তিটা নিয়ে এলাম, কিন্তু পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বললেন, এ রচনা ছাপা যাবে না, এটা রীতিমতো অশ্লীল। আমাদের তখনকার বুদ্ধিতে কোনো অশ্লীলতা খুঁজে পাইনি— গল্পটিতে ছিল কয়েকটি প্রাণোচ্ছল তরুণীর কথাবার্তা। আমরা মুশকিলে পড়লাম— বুদ্ধদেবকে গিয়ে একথা বললে তো আর নতুন করে লিখে দেবে না, বলবে ছেপো না। মুশকিল আসান করলেন হেডমাস্টার। তাঁর কাছে গিয়ে বলতেই তিনি গল্পটা পড়লেন আর বললেন, ঠিক আছে, ছেপে দাও।"

—'বুদ্ধদেব বসু : স্কুলে আর কলেজে', ভবতোষ দত্ত। ৩০শে নভেম্বর
কবিতাভবন বার্ষিকী, ১৯৮৭, পৃ. ৩১

দেখা যাচ্ছে, লেখকরূপে প্রকাশিত হবার একেবারে প্রথম যুগ থেকেই তাঁকে নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

১৯২৩ ।। বয়স পনেরো

জীবনে প্রথম ইশকুলে ভর্তি হলেন

"প্রাক-ম্যাট্রিক শেষ ক্লাশদুটো আমি স্কুলে পড়েছিলাম— ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। আগে কখনো ক্লাশঘরে আটক থাকিনি, কিন্তু সেখানকার শৃঙ্খলা মেনে নিতে আমার অসুবিধে হ'লো না, কেননা আমি বাড়ির মধ্যেও এক ধরনের নিয়মে-বাঁধা দিন কাটিয়েছি— সেটাই আমার ভালো লাগতো ব'লে। তাছাড়া, আমার দাদামশাই আমাকে অনেক আগে থেকেই স্কুলের জন্য তৈরি ক'রে তুলেছিলেন; আমার সাহিত্যিক ঝোঁকটাকে ষোলো আনা প্রশ্রয় দিয়েও অন্য কোনো জরুরি বিষয়ে আমাকে পেছিয়ে থাকতে দেননি।"

—*আমাব ছেলেবেলা*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৮৪

স্কুলবাড়িটির চেহারা— "গোল মোটা রোমক-থামওয়ালা উন্নতশির অট্টালিকা" — তাঁর উপর যতটা ছাপ ফেলেছিল, পাঠক্রম বা পড়াবার ধরন ততটা করেনি :

[ভূগোলের ক্লাশে] "মাষ্টারমশাই নিজে বিশেষ কিছু যোগ করেন না। তিনি আদেশ দেন : 'পরেব দিন সমস্ত সাউথ আমেরিকা প'ড়ে আসবে!' আদেশ দিয়ে বাড়ি চ'লে যান, কিন্তু আমরা ভেবে পাই না ঐ বিপুল মহাদেশটাকে কেমন ক'রে এক গণ্ডূষে পান করা যায়।... তেমনি, অঙ্কের ক্লাশেও মাষ্টারমশাই চেয়ারে ব'সেই পড়িয়ে যান, আঙুল নেড়ে-নেড়ে শূন্যে আঁকেন জ্যামিতির চিত্র— ফিটফাট মানুষ, চকখড়ির গুঁড়োয় হাত ময়লা করবার ইচ্ছে নেই।... সপ্তাহেব মধ্যে ইংরেজি ক্লাশ সবচেয়ে বেশি, সেগুলির জন্য প্রথম ঘণ্টাটি বরাদ্দ— আর বাংলা আসে বিকেলের দিকে গড়িমসি ক'রে, আর দিনের শেষ ক্লান্ত ক্লাশটিতে সংস্কৃত।... ইংরেজি ভাষাটাই আসল এবং মুখ্য এবং প্রধান — মাষ্টারমশাইরা তা জানেন আর ছাত্ররাও তা মেনে নিয়েছে।... তবু এও সত্য যে... সংস্কৃত ব্যাকরণে যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমার আজ পর্যন্ত সম্বল তা সেখানকার হেডপণ্ডিতের কাছেই কুড়িয়ে পাওয়া, তাঁরই সাহায্যে সমাস জিনিশটার বিপুল ক্ষমতা আবিষ্কার ক'রে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম, এও বুঝেছিলাম কেমন অল্প হেরফেরেই বাংলা বিশেষ্য থেকে নিটোল এক-একটি বিশেষণ বেরিয়ে আসে।"

—তদেব, পৃ. ৮৮

প্রভুচরণ গুহঠাকুরতার বিদেশযাত্রা

প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা বিদেশে গেলেন। কিন্তু বিদেশ থেকেও বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রইল চিঠিপত্রে। শুধু তাই নয়, উন্মীলমান এই কিশোর তাঁর কাছ থেকেই প্রথম স্বাদ পেলেন, ইংরেজি ছাড়াও, জীবন্ত বিশ্বসাহিত্যের :

> "প্রভুচরণের প্রবাসকালে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলো নিরবচ্ছিন্ন। অবিরাম আমি লিখে যাচ্ছি, অবিরাম তাঁর চিঠি পাচ্ছি।... বস্টন থেকে, লস এঞ্জেলিস থেকে, সান্টা ফে থেকে— পুলম্যান ট্রেনের কামরা থেকে কখনো— তারপর লন্ডন রোম প্যারিস বার্লিন স্টকহল্‌ম থেকে আসছে তাঁর চিঠির পর চিঠি— আর সেই সঙ্গে নানা দেশের বই, আর মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা— রাশি-রাশি— বিচিত্র!... বই আসে ইবসেন, ম্যাটারলিঙ্ক, গোর্কী, আন্দ্রিয়েহ্‌ব, অস্কার ওয়াইল্ড, শ্যন ও'কেইসি, সমকালীন মার্কিন কবিতার সংকলন, আসে ন্যুয়র্কে মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয়-ঋতুর চিত্রময় অনুষ্ঠানলিপি, চিঠির মধ্যে সংবাদপত্রের কর্তিকা— পাভলোভার নৃত্য, ডুজের অভিনয়, শোপ্যাঁর সংগীত বিষয়ে আলোচনা। এর মধ্যে যা-কিছু আমি ঠিকমতো বুঝি না সেগুলিরও কিছু দেবার থাকে আমাকে— বইগুলোর গায়ে উন্মাদক এক গন্ধ, মুদ্রণের প্রসাধন, ছবি, আর অনেক দূর দেশের বাতাসের ছোঁওয়া। পুরো পাশ্চাত্ত্য জগৎ, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, সেখানকার শিল্প সাহিত্য জীবনযাত্রা, প্রাণবন্ত ভূগোল, আমার চোখে-না-দেখা কিন্তু মনের মধ্যে বাস্তব-হ'য়ে-ওঠা কত নদী নগর নর-নারী— এ-ই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন প্রভুচরণ, আমার চোদ্দো থেকে ষোলো বছরের মধ্যে, আমি যখন একটি চারাগাছের মতো মাটির তলা থেকে উদগত হচ্ছি, চাচ্ছি আমার সরু-সরু ডালগুলোকে জগৎ-জোড়া আকাশের দিকে তুলে ধরতে।
>
> বিদেশে যাবার আগে বুদ্ধু-দা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ব্যবহৃত একখানা পলগ্রেভ— তাঁর হাতে মার্জিনে লেখা নোটগুলোর জন্য আমার কাছে দ্বিগুণ মূল্যবান। সেই বইটি থেকে শেলি, কীটস, বায়রন, ব্রাউনিঙের অনেক কবিতা আমি ব্লটিং-কাগজের মতো শুষে নিয়েছিলাম; এঁদের যে-কটি লাইন এখনো আমার ক্ষীয়মাণ স্মরণশক্তিতে আটকে আছে, তার অধিকাংশই তখনকার সঞ্চয়। এমনও বলা যায় আমার বয়ঃসন্ধির জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে এঁরাই আমাকে উদ্ধার করেছিলেন— পলগ্রেভের এই রোমান্টিক কবিরা— আর অবশ্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ।"

—তদেব, পৃ. ১০১

১৯২৪ ।। বয়স ষোলো

ইশকুলে যাওয়া-আসা করছেন— দূর থেকে দেখছেন কলেজের ছাত্রদের, তাদের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

"কলেজিয়েট স্কুলের ঠিক পিছনেই ধবলবর্ণ জগন্নাথ কলেজ।... তখন থাকি অনেক দূবে লালবাগে [বন্ধুরা প্রায় সবাই সাইকেল চালাতেন কিন্তু বুদ্ধদেব কখনো ওই যন্ত্রটিতে চাপতে শেখেননি]... যেতে-আসতে মাঝে-মাঝে দেখি একদল ছেলেকে— যুবক তারা, কলেজে পড়ে, চলাফেরার ধরন বেপরোয়া ফুর্তিবাজ — ওদেব মধ্যে একমাথা কোঁকড়া চুলের শ্যামলবর্ণ একটি ছেলেকে বিশেষভাবে চোখে পড়ে আমার।... বছর দেড়েকের মধ্যে, আমি এই পুরো দলটিকে যেন অনিবার্যভাবেই ধ'রে ফেললাম, তারা কেউ-কেউ আমার নিবিড় বন্ধু হ'য়ে উঠলো — কিন্তু ততদিনে সেই কোঁকড়া চুলেব ছেলেটি আর ঢাকায ছিলো না। থাকলে আরো সুখের হ'তো— কেননা তাবই নাম প্রেমেন— প্রেমেন্দ্র মিত্র— যার গল্পে কবিতায় 'কল্লোল' তখন বোলবোলাও।"

—তদেব, পৃ. ৯০

মোটামুটিভাবে এই সময় থেকেই 'কল্লোলে' প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা বেরোতে থাকে। প্রথম লেখা বেরোয় শ্রাবণ ১৩৩১ সংখ্যায়, 'সংক্রান্তি' নামে একটি ছোটো গল্প। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই তাঁর লেখা থেকেছে। ঢাকার বন্ধু গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন :

"আমাদের এই দলটির মধ্যে পাঁচজন আমরা ছিলাম প্রায় অবিচ্ছেদ্য নিত্যসঙ্গী। আমি বাদে আব চারজন ছিল— অনিল ভট্টাচার্য, সুধীব [সুধীশ] ঘটক, ক্ষিতীন্দ্র সাহা আর ভৃগু গুহঠাকুরতা। ওরকম নিত্যসঙ্গী না হলেও দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল আরো কয়েকজনের। তাদের মধ্যে হিমাংশু সোম, প্রতাপ রায় আর সোমেন ঘোষের কথাই বেশি করে মনে পড়ছে।"

—*নানারঙে বোনা*, প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১ম সং, পৃ. ১৪৭

এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'নিত্যসঙ্গী' বলে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা অচিরে প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবেরও নিত্যসঙ্গী হ'য়ে উঠবেন— তাঁদের নাম বুদ্ধদেবের স্মৃতিকথায় নানা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হবে। প্রসঙ্গত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্মসাল হল ১৯০৪। বুদ্ধদেবের চেয়ে তিনি চার বছরের বড়ো।

হাতে লেখা পত্রিকার কাল

বুদ্ধদেবের জীবনে এই সময়টা হাতে লেখা পত্রিকার কাল। দুটি হাতে লেখা পত্রিকা এ-সময় পরপর বার করেছিলেন বুদ্ধদেব। সে-সময়ে সাহিত্যযশোলিপ্সু কিশোরদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের এই মাধ্যমটির খুব চলন ছিল। অজিত দত্ত লিখেছেন :

"বুদ্ধদেবের একটা হাতেলেখা পত্রিকা ছিল। বুদ্ধদেবই সম্পাদক লেখক প্রকাশক এবং মুদ্রাকর। যতদূর মনে পড়ে ইস্কুলজীবনেই এ পত্রিকা ছিল। পত্রিকাটির আযতন যে একেবাবে ছোট ছিল তাও নয়। কিন্তু লেখায় বুদ্ধদেবের আলস্য ছিল না। আমি অবশ্য এ পত্রিকায় লিখতাম, কিন্তু আমার লেখা থাকত অপেক্ষাকৃত সামান্যই। লেখা— এবং পড়াতেও— বুদ্ধদেবের ক্লান্তি কখনো দেখিনি। সাহিত্যকর্মে এরকম নিরলস নিষ্ঠাব তুলনা আমাদের কালে বিরল। সাহিত্যিক রুচি ও পছন্দ এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত নানা ব্যাপারে বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার অনেক মিল ছিল। আমরা একসঙ্গে অনেক কবিতা পড়েছি, বিদেশী গল্প-উপন্যাসও অনেক পড়েছি। বস্তুত মতের মিল এবং মনের মিল তখন অনেকখানি ছিল বলেই একসঙ্গে দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চা করা সম্ভব হয়েছিল।... এ-সময়ে লেখার জায়গা ছিল প্রধানত হাতে-লেখা পত্রিকা। বুদ্ধদেব ও আমার যে পত্রিকাটি ছিল তার নাম মনে নেই [নাম ছিল 'পতাকা']। কিছুদিন পবে সুধীশরাও একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বার করলো— তার নাম 'ভগ্নরথ'।... পরে 'ভগ্নরথ' ও আমাদের পত্রিকা এক হয়ে হাতে-লেখা 'প্রগতি' বেরোয়। এই কাগজের সূত্রেই 'কল্লোলে' লিখতে আরম্ভ কবি।"

—'কবিতা লেখাব কথা', অজিত দত্ত। 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৯

প্রথম বই বেরোল

"ঢাকার স্থানীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন পরিমলকুমার ঘোষ। ইংরেজির অধ্যাপক তিনি, কবিখ্যাতিও আছে কিছুটা।... তিনি যখন আমাকে প্রকাশ্যে সাহিত্যিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তখনও আমি স্কুল থেকে বেরোইনি।... খুব সম্ভব তাঁরই প্ররোচনায় বা পরামর্শে, বাংলাবাজারের এক পাঠ্য পুস্তক-বিক্রেতা আমায় এমনকি গ্রন্থকারের মর্যাদা দিলেন— গাঁটের কড়ি খসিয়ে, একটি কপিও বিক্রির আশা না-রেখে। চটি কবিতার বই— আমি নাম দিয়েছিলাম 'মর্মবাণী', তখন পর্যন্ত জীবিত দাদামশায়ের নামে একটি বাগ্‌বহুল উৎসর্গলিপি লিখেছিলাম। বালি কাগজে ছাপা, আমার পক্ষে খেদজনকভাবে হাতছানি কথাটা ছাপা হয়েছে 'হাতসানি'— তবু যা-ই হোক একটা বই তো। মুন্সিগঞ্জে যেবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'লো— আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরে লম্বা ছুটি চলছে তখন— আমি অনেকগুলো কপি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলাম।"

—*আমার ছেলেবেলা*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১০৩

দাদামশাইয়ের মৃত্যু

"আমার দাদামশায়ের রোগদুঃখভোগ ও মৃত্যুর বর্ণনা আমি দু-বার লিখেছি— 'অন্য কোনখানে' উপন্যাসে, সম্প্রতি 'পাতাল থেকে আলাপ'এ। ঢাকায় আসার স্বল্পকাল পরেই তাঁর কণ্ঠনালীতে ক্যানসার ধরা পড়লো।... অকথ্য সেই যন্ত্রণা, যা দু-বছর ধ'রে তিনি ভোগ করেছিলেন— দিনের পর দিন— যতদিন-না তাঁর চর্মাবৃত কঙ্কাল থেকে অবশেষে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হয়েছিলো।

মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণীর সেই ভয়াবহ সংগ্রাম আমি চোখে দেখেছিলাম, সব অনুপুঙ্খসমেত আমার আজকাল মনে পড়ে মাঝে-মাঝে— এবং এও মনে পড়ে যে সেই সময়ে আমি ঘটনাটিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করিনি, অনুভব করিনি। রোগ, অবক্ষয়, মৃত্যু— যা-কিছু নিরানন্দ, অসুন্দর, জীবন-বিরোধী, সে-দিক-থেকে আমি যেন নিজের অজান্তেই চোখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম, বা চোখে দেখেও মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার দাদামশাই, সেই 'দা'— মাত্র কয়েকবছর আগেও আমি যাঁকে চোখ হারিয়েছি, কোনো রবিবার সকালে বাজার থেকে যাঁর ফিরতে দেরি হ'লে আমাব কান্না পেয়ে গেছে, যাঁর গায়ের জামায় বর্মি চুরুটের গন্ধটাও খুব ভালো লাগতো আমার— সেই তাঁর মৃত্যুতে আমি যেটুকু কষ্ট পেয়েছিলাম, তাব চেয়ে অনেক বেশি কেঁদেছিলাম লিটল নেল-এর মৃত্যুর বিবরণ প'ড়ে— কেননা কল্পনায় কান্নাও সুখের। প্রকৃতি, আমাদের আদিমাতা, যাঁকে সাধারণত স্নেহময়ী ব'লে ভেবে থাকি আমরা, অথচ যাঁর নিষ্ঠুরতারও অন্ত নেই, তাঁরই খেলার পুতুল আমি তখনও;... আমাকে হাজার হাতে টেনে নিচ্ছে জীবন... সেই গতিবেগ ব্যাহত করার মতো শক্তি আমার নেই।

দাদামশাইযের মৃত্যু হয়েছিলো আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা মাসছয়েক আগে; অবিলম্বে আমাদের আশ্রয় দিলেন দিদিমার মেজো ভাই নগেন্দ্রনাথ;... তাঁকে, তাঁর স্ত্রী উষাবালাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি— দু'জনেই আমার প্রতি খুব স্নেহশীল। দোতলার দক্ষিণ-খোলা সেরা ঘরটি তাঁরা ছেড়ে দিলেন আমাকে, আমি সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশনের পাট চুকোলাম।"

—তদেব, পৃ. ৯৬

মুন্সিগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

"আমার সাহিত্য-সম্মেলনে যাওয়াটাও পরিমল ঘোষেরই জন্য ঘটেছিলো। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে, তাঁর পক্ষপুটের তলায় আশ্রয় দিয়ে, তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে রাখলেন আমাকে, আর তারপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন স্বরচিত কবিতাপাঠের জন্য— সেই মঞ্চে, যেখানে ব'সে আছেন শরৎচন্দ্র আর নাটোরের জগদিন্দ্রনাথ, আর কলকাতার ও পূর্ববঙ্গের অনেক সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জন— হল-ভর্তি বহু ভদ্রমহোদয় আর সামনের সারিতে কতিপয় ভদ্রমহিলারও দৃষ্টির সামনে।

আমি চোখে ঝাপসা দেখলাম, আমার পা কাঁপতে লাগলো— কবিতাটা পড়তে শুরু ক'রে মধ্যপথে হঠাৎ আক্রান্ত হলাম আমার পুরাতন বাক্‌বিলোপকারী রসনাবৈকল্যে— আমার হাত থেকে পাণ্ডুলিপি টেনে নিয়ে উদাত্তকণ্ঠে কবিতাটা প'ড়ে দিলেন খুব সম্ভব মৈমনসিংহের কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য।"

—তদেব, পৃ. ১০৪

১৯২৫ ।। বয়স সতেরো

ম্যাট্রিক পরীক্ষা

ঢাকা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করলেন। ভর্তি হলেন ঢাকা ইন্টারমীডিয়েট কলেজে।

> "ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা আমি দিয়েছিলাম খুব আটঘাট বেঁধে, প্রয়োজনের চেয়েও অধিকমাত্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমার পড়া চলতো তপ্ত কোকো নিয়ে শীতের রাতে দেড়টা-দুটো পর্যন্ত— তার মধ্যে সব-কিছু ম্যাট্রিক-যোগ্য না-হ'লেও বেশির ভাগই পরিকীর্ণভাবে তা-ই; প্রথম পরীক্ষার আগের রাতটা বিছানায় শুয়েও ঘুম এলো না। তবু পরদিন সকালে খাতা লিখতে বসলাম টাটকা দেহ-মন নিয়ে, অষ্টপত্র নির্বিঘ্নে সমাধা হ'লো। আমি ধ'রে নিয়েছিলাম আমি পয়লা অথবা নিদেনপক্ষে দুই নম্বর দাঁড়াবো, কিন্তু আখেরে আমি পঙক্তি পেলাম পঞ্চম— একটা যেমন-তেমন বৃত্তিও আমার জুটলো না। এতে বড্ড দাগা লেগেছিলো আমার মনে, দ্বিগুণ দাগা এইজন্যে যে অবিশ্বাসী গণিত আমাকে বঞ্চনা করেনি [প্রতিভা বসু জানিয়েছেন, অঙ্কে তিনি ৯৯ পেয়েছিলেন], যেখানে আমার সব চেয়ে বেশি জোর সেই ইংরেজিতেই শোচনীযভাবে ভ্রষ্ট হয়েছিলাম। এক পাঠ্য-পুঁথি-লেখক হেডমাষ্টার ইংরেজ ছিলেন পরীক্ষক; তিনি আমার খাতা প'ড়ে আমাকে 'পাগল অথবা প্রতিভাবান' ঠাউরেছিলেন, এ-রকম একটি রটনা একদিন কানে এলো আমার। কথাটা এমনিতে মন্দ নয়, বরং বলা যায় সম্মানজনক— কিন্তু ঐ 'অথবা'র অংশটুকুও আমাকে কিঞ্চিৎমাত্র সান্ত্বনা দিতে পারলো না; আমি শুধু ভাবছি কোন ছিদ্রপথে আমার অতগুলো নিশ্চিত নম্বর তলিয়ে গেলো— আমি তো সব প্রশ্নেরই সঠিক এবং সবিস্তার উত্তর লিখেছিলাম। অবশষে বুঝলাম ঐ বিস্তারটাই বড্ড বেশি হয়েছিলো; আমি ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম পাঠ্যকেতাবের বাঁধা গণ্ডি, ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী বঙ্গদেশীয় বালকের পক্ষে শেলি-কীটসের আস্ত-আস্ত স্তবক তুলে দেয়াটা ধৃষ্টতা ব'লে গণ্য হ'তে পারে তা বোঝাব মতো বুদ্ধি আমার ছিলো না।"
>
> —*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১

জীবনের প্রতি বুদ্ধদেবের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তা এই সময় থেকেই তৈরি হচ্ছে : সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখা। শেষ দিন পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অপরিবর্তিত ছিল— বলা যায়, এটাই তাঁর 'বুদ্ধদেব-বসুত্ব' :

"আমার ঢাকা-বাসের প্রথম তিন-চার বছরের মধ্যে আমার জীবন বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হ'লো— তার কারণ সেই নানান ধরনেব নতুন মানুষেরা, যাদের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ চেনাশোনা হচ্ছে, এবং সেই আবো বিচিত্র কল্পনার মানুষেরাও, যাদের কথা রুদ্ধশ্বাসে পড়ছি বইয়ের পাতায়। এক-একটা বছর, এক-একটা বাড়ি — তা আমার মনে জড়িত হ'য়ে আছে কোনো-না-কোনো বইয়ের সঙ্গে, লেখকের সঙ্গে; সেগুলোই আমার নিশানা, আমার পথের চিহ্ন। চোদ্দ নম্বর যুগীনগর : ডিকেন্স, বর্ণার্ড শ, আমার চোদ্দ বছরের জন্মদিনে উপহার-পাওয়া একটি লাল মলাটের অক্সফোর্ড সংস্করণ শেলি; 'লিপিকা', 'ঘরে বাইরে', 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক 'রমলা'। ওয়াড়িতে অন্য একটি বাড়ি, দাদামশাই মৃত্যুশয্যায় : আমাকে সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরেছে 'কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো' উপন্যাসটা। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কাবার : দল বেঁধে সদরঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমাদেব গলা থেকে অনর্গল বেরোচ্ছে 'ক্ষণিকা', 'অভ্র-আবীর', 'বিদায়-আরতি'— আর সদ্য-বেরোনো 'আবোলতাবোল' যার কবিতাগুলো 'সন্দেশ' থেকেই আমার কণ্ঠস্থ। পুরানা পল্টন : রাতের অন্ধকারে মশারির তলায় শুয়ে-শুয়ে আমি পাগলের মতো আউড়ে যাচ্ছি 'পূরবী' থেকে কবিতার পর কবিতা। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ : তুর্কি ধরনের জাফরি চুড়ো খিলান-ওলা লাল-রঙের দোতলা বাড়ি— দুটো ক্লাশের ফাঁকে ঝুলন্ত একটি ব্যাল্কনিতে ব'সে আমি নিবিষ্ট হ'য়ে আছি চেখহেবর ছোটোগল্পে — মাঝে-মাঝে সংস্কৃত ক্লাশে পিছনের বেঞ্চিতেও সেটাই পড়ে যাই— শুধু দৃশ্যত 'রঘুবংশ' খোলা থাকে, একদিন পণ্ডিতমশাই তা নিয়ে মন্তব্য ক'রে আমাকে লজ্জা দিয়েছিলেন। লালবাগ, শীতঋতু চলছে, আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। আমার নড়বড়ে গণিত-বিদ্যাকে মজবুত ক'রে তোলার জন্য সকালে আসেন একচক্ষু, শ্মশ্রুধারী, কঠোরদর্শন, শিক্ষাপটু এক প্রৌঢ়; দুপুর ভ'বে কুস্তি চালাই জ্যামিতির জটিলতর হেঁয়ালিগুলোর সঙ্গে, যা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকতে চায় না; খুলে বসি লংম্যান্স-গ্রীনের ভূগোল-বৃত্তান্ত, যার রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যের গুণে পৃথিবীর নদীগুলোও মরুভূমির মতো নীরস ব'লে মনে হয় আমার;— কিন্তু বিকেলবেলা টুনু নিয়ে আসে তার জগন্নাথ কলেজ লাইব্রেরি থেকে টুর্গেনিহ্ব, কখনো হয়তো ক্নুট হামসুন, য়োহান বোইয়ার— আমার বুকের মধ্যে আনন্দে দুলে ওঠে।..."

—*আমার ছেলেবেলা,* বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৯৯

প্রথম গ্রন্থ 'মর্মবাণী' সম্পর্কে কিশোর কবির উৎসাহ চলে গিয়েছিল— বই বেরোবার প্রাথমিক খুশি কেটে যাবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। আর, কেবল বইটি সম্পর্কেই নয় : প্রচুর লিখছেন কিন্তু কোনো লেখাই খুব সন্তুষ্ট করতে পারছে না তাঁকে :

"যতক্ষণ লিখি, মৌজে থাকি; লেখার পরেও মনটা বেশ খুশি লাগে— কিন্তু কয়েকটা দিন বা দুয়েকটা মাস যেতে-না-যেতে সেই রং-বেরঙের বেলুনগুলো

আমাবই চোখেব সামনে চুপসে যায়। আর আমার সেই 'মর্মবাণী' বলে বইটা — এই সেদিনমাত্র যেটা উপহার দিযেছিলাম জনে-জনে মুন্সিগঞ্জের সাহিত্যসভায় — সেটা কবে যে শব্দহীন ও নিঃশোকভাবে কবরস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো আমি তা টেবও পাইনি— সেটাকে আমি এখন বলি ছেলেমানুষি, কিন্তু আমার টাটকা-গজানো লেখাগুলিও দু-একবার হাত-পা ছুঁড়েই শিঁটিয়ে যাচ্ছে।"

—তদেব, পৃ. ১১৩

'কল্লোলে' প্রথম লেখা

'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম লেখা বেরোল। অবশ্য লেখা ছাপা হবার আগেই 'কল্লোলে'ব পাঠকবা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। 'কল্লোলে'র আষাঢ় ১৩৩২ সংখ্যায় 'ডাকঘব' স্তম্ভে তাঁর পরিচিতি বেরোয় : "শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কিছু-কিছু লেখা বোধহয় আজকাল পত্রিকায় পড়ছ। 'মর্মবাণী'র কবিতাসংগ্রহে এই কিশোর-কবির শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বয়সের তারুণ্য মনে না-রেখে বইখানা পড়ে দেখো।"

এই পরিচিতি বেরোবার ছ'-মাস পরে গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যু উপলক্ষে বচিত তাঁর কবিতা 'যৌবন-পথিক' প্রকাশিত হল 'কল্লোলে'র অগ্রহায়ণ ১৩৩২ (তৃতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা)-য়। কবিতাটি আরম্ভ হয়েছিল এইভাবে :

"তুমি নব-বসন্তেব সুরভিত দক্ষিণ বাতাস
ক্ষণতরে বিকম্পিত করি গেলে বাণীর কানন,
অসীমের বক্ষ 'পরে ফেলি গেলে একটি নিশ্বাস,
কুসুমেব সুষমার স্নিগ্ধ সুধা করি নিবেদন;
চিরন্তন যৌবনের অন্তরঙ্গ আনন্দপ্রতিমা,
প্রথম ফাল্গুনে তুমি জাগাইলে সুখ শিহরন,
হাসির তরঙ্গ দিয়ে ধৌত করি, ব্যথার নীলিমা
উৎসবান্তে জীবনের শূন্যপাত্র করিলে বর্জন..."

দ্র. "বুদ্ধদেব বসু : 'প্রগতি' থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘ'।"
সুবীর রায়চৌধুরী : কলকাতা ২০০০ পত্রিকা, নববর্ষ ১৩৯১

হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা

এই সময়েই বার করলেন হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা। আরো অন্তত দুটি হাতে-লেখা পত্রিকা এই সময়ের আগে-পরে চালিয়েছেন তিনি— 'পতাকা' আর 'ক্ষণিকা'— কিন্তু এর মধ্যে 'প্রগতি' পত্রিকাই পরে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

এখানে একটি কথার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী 'তরী হতে তীর' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন (২য় সং, পৃ. ২৪৭): " 'প্রগতি' কথাটির সঙ্গে বুদ্ধদেববাবুর প্রাণের টান কৈশোর থেকে; সম্ভবত তাই, মার্ক্সবাদী আওতায় 'প্রগতি'র মর্ম সম্পর্কে সংশয় পোষণ সত্ত্বেও তাঁর আনুকূল্য পাওয়া কঠিন হয়নি।" হীরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পরিহাস করতেই চেয়েছেন, কিন্তু ভুল অর্থ করারও সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। বুদ্ধদেবের এই 'প্রগতি' পত্রিকার সঙ্গে ১৯৩৮ সালের 'প্রগতি লেখক সংঘ' অথবা তার ক্ষণস্থায়ী মুখপত্র 'প্রগতি' পত্রিকার কোনো সুদূরতম সম্পর্কও নেই, এবং থাকতেও পারে না; কারণ এই সময়ে PWA বা 'প্রগতি লেখক সংঘ' এক দশকেরও বেশি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকার চরিত্র ও তারিখ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় অজিত দত্তের স্মৃতিচারণ থেকে:

> "১৯২৫ সালে, আমি যখন আই. এ পড়ি, হাতে লেখা 'প্রগতি'তে একটি গল্প লিখেছিলাম— বোধহয় বুদ্ধদেবের অনুরোধে। যথারীতি 'প্রগতি'র এই সংখ্যাটি বাড়িতে-বাড়িতে পড়া চলছিল। এই সময় একদিন সকালে অতিশয় লম্বা ও রোগা এক যুবক সাইকেল চালিয়ে এসে বাড়ির দরজার কাছেই আমাকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই অজিত?' আমি মাথা নাড়তেই বললেন, ' 'প্রগতি'তে আপনার গল্পটি বেশ হয়েছে। আপনি আমাদের কাগজে লিখুন।' 'আপনাদের কাগজ?' 'আমাদের 'কল্লোল'।' যুবকটি বললেন। আমি বললাম, 'গল্প তো আমি বিশেষ লিখি না, কবিতা লিখি।' যুবকটি বললেন, 'বেশ, কবিতাই পাঠাবেন।' বলে কালবিলম্ব না করে সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন। পরে যখন জানতে পাবলাম যে ইনিই 'যুবনাশ্ব' তখন খুবই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।
>
> বলা বাহুল্য কালবিলম্ব না করে 'কল্লোলে' কবিতা পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গে ছাপা তো হলই, সেই সঙ্গে এল আরও কবিতা পাঠাবার তাগিদ।"
>
> —'কবিতা লেখার কথা', অজিত দত্ত। 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় অজিত দত্তর কবিতা 'কল্লোলে' প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সংখ্যায়, নাম ছিল 'নিকষ কালো আকাশতলে'। সুতরাং হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা যে এর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে। সম্ভবত ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বুদ্ধদেব পত্রিকাটি প্রকাশ করে থাকবেন।

১৯২৬ ।। বয়স আঠারো

পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে

কযেকবাব বাডি বদল কববার পর, স্থায়ীভাবে উঠে এলেন নির্মীয়মাণ পাডা পুবানা পল্টনে।

"... আমি যখন আই. এ. ক্লাশে ভর্তি হযেছি বা হবো-হবো, তখন আমবা চ'লে এলাম পুবানা পল্টনে— যাকে তখন পর্যন্ত অনেকেই বলে সেগুনবাগান।... এ-কথা ঝাপসাভাবে শুনেছিলাম আমাব দাদামশাই সেখানে একটি প্লটেব জন্য বাযনা দিযে বেখেছেন।... ততদিনে তাঁদেব বহুবেব বাডি পদ্মাব জলে তলিযে গেছে— তাব ধ্বংসাবশিষ্ট কিছু কবগেট-করা টিন ছিলো দিদিমাব প্রাপ্য; তা-ই দিযে স্বামীব স্মৃতিবঞ্জিত জমিব উপব একটি বাডি তুললেন তিনি— সেই আমাদেব সাতচল্লিশ নম্বব পুবানা পল্টন, ক্ষণজীবী 'প্রগতি' মাসিকপত্রেব কার্যালয।"

—*আমাব ছেলেবেলা,* বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ ৯৮

এই সময়ের সঙ্গীরা

নোয়াখালিতে থাকতে বালক বুদ্ধদেব ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ— সঙ্গী বলতে দাদামশাই শুধু, আর ছিল বই। কিন্তু ঢাকায় আসার পর ধীবে ধীরে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটছে। আই. এ. ক্লাশে ভর্তি হযেছেন ঢাকা কলেজে; এখন আর নিঃসঙ্গ বলা যায় না তাঁকে, তাঁর বন্ধুবান্ধব এখন অজস্র। পুরানা পল্টনের এই টিনের বাড়ির আড্ডার প্রসিদ্ধি সমস্ত ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল, প্রতিভা বসু তাঁব কৈশোরস্মৃতিতে সে কথার উল্লেখ করেছেন।

তাঁর বন্ধুদের সামান্যলক্ষণ হচ্ছে সাহিত্যে উৎসাহ। আছেন কবি অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯)— 'টুনু' নামে তাঁর অজস্র উল্লেখ আছে বুদ্ধদেবের নানা স্মৃতিকথায়। মৃত্যু পর্যন্তই তাঁরা একত্র ছিলেন— কলকাতায় বাসকালে 'কবিতাভবন' নামে খ্যাত ২০২ রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর দোতলায় থাকতেন বুদ্ধদেব, তেতলায় অজিত দত্ত। ছিলেন পরিমল রায় (১৯০৯-১৯৫১), পরবর্তীকালের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, 'ইদানীং' নামক তাঁর ছোটো কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন (১৯৫৬) বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ করা। পুরানা পল্টনে ঢুকতে সেসময় তাঁদেরই ছিল প্রথম বাড়ি, নাম ছিল 'পরমভবন'। ছিলেন

অমলেন্দু বসু (১৯০৭?-১৯৯১), পরবর্তীকালের স্বনামধন্য ইংরেজির অধ্যাপক, বুদ্ধদেবের আগের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। এ ছাড়াও ছিলেন ভৃগু গুহঠাকুরতা, মনীশ ঘটকের ভাই সুধীশ ঘটক, চিত্রকর অনিল ভট্টাচার্য, পঙ্কজকুমার দাশগুপ্ত, সুধাংশু দাশগুপ্ত প্রমুখ আরো অনেকে— বুদ্ধদেব ছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসু ইত্যাদি সহজীবীদের স্মৃতিকথায় নানাস্থানে এইসব যুবকদের উল্লেখ আছে।

> "... সতেরো বছর বয়সে আমি পুরানা পল্টনের বাড়িতে আসি। পাড়াটা তখন সবে গ'ড়ে উঠছে; শহরের এক প্রান্তে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দু-একখানা বাড়ি; পাকা রাস্তা নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই; সেই বড়ো রাস্তার মোড়ে একমাত্র জলের কল। ডাকবাংলোর পর থেকে রাস্তায়ও আলো ছিলো না। অসুবিধে যতদূর হ'তে হয়। প্রথম কয়েকদিন খুব বিশ্রী লাগলো; মনে হ'লো সভ্যতার এলাকার বাইরে নির্বাসিত হয়েছি। আমাদের বাড়ি ছাড়া আর বোধহয় খানদুই বাড়ি উঠেছে তখন —তারই এক বাড়ির ছেলের সঙ্গে প্রতিবেশিতার সূত্রে আমার পরিচয় একই কলেজে পড়ার উপলক্ষে বন্ধুতায় পরিণত হ'লো [পরিমল রায়]। শেষ পর্যন্ত আমরা যে-কয়টি বন্ধু একত্র হ'য়ে 'প্রগতি দল' ব'লে পরিচিত হলাম, তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই সেই রকম সময়েই আলাপের সূত্রপাত।...
>
> পুরানা পল্টনে প্রথম যখন গেলুম, বয়ঃসন্ধির প্রভাবে নিজেকে আমি ভীষণ দুঃখী কল্পনা করছি, এবং রোজ দুটো-তিনটে ক'রে ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখছি। সংসার-সমাজের প্রতি সমস্ত মন তখন বিমুখ; বোহেমিয়ানিজ্‌মকে সার করেছি জীবনের। তার ফলে তিন মাসে একবার চুল ছাঁটছি; নাওয়া-খাওয়া সম্বন্ধে অনিয়মকেই ক'রে তুলেছি নিয়ম; দিন-কি-রাত্রির যে-কোনো সময়ে চায়ের দোকানে সবন্ধু আড্ডাই ছিলো আমার স্বর্গ। সে-সব দোকানের কথা মনে পড়লে এখন ন্যক্কারের উদ্রেক হয়। কিন্তু নিয়ম-করা উচ্ছৃঙ্খলতা বেশিদিন ভালো লাগে না; সে-ঢেউ কেটে গেলো শিগগিরই।"
>
> —*হঠাৎ আলোর ঝলকানি*, বুদ্ধদেব বসু। 'পুরানা পল্টন' প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথকে প্রথমবার দেখলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন ৭ ফেব্রুয়ারি, এক সপ্তাহের জন্য। এর আগে একবারই তিনি ঢাকায় এসেছিলেন, বহু বছর আগে, প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে। এবারে তাঁর সঙ্গে আছেন রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, কালীমোহন ঘোষ, হিরজিভাই মরিস, ফর্মিকি ও তুচ্চি। শেষোক্ত দুজনও বক্তৃতা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত।

বিপুল জাঁকজমকের সঙ্গে ঢাকাবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। নারায়ণগঞ্জের স্টিমারঘাটে তাঁকে স্বাগত জানাল বিপুল জনতা, অভ্যর্থনা সমিতির

সদস্যগণ তাঁকে সেখান থেকে মোটরে ঢাকায় নিয়ে এলেন। শহরে ঢোকার মুখে আরেকবার অভিনন্দন জানাল ঢাকার স্কাউট ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। বিরাট শোভাযাত্রা রাজসম্মানে তাঁকে নিয়ে এল বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে— কবি থাকবেন নদীবক্ষে, নবাববাহাদুরের নিজস্ব হাউসবোটে, নাম তার 'তুরাগ'। সেদিন সন্ধ্যায় নর্থব্রুক হল-এ মিউনিসিপ্যালিটি ও পীপল্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের কবি-সংবর্ধনা, তারপর করোনেশন পার্কে সাধারণের অভিনন্দন সভা। পরদিন সন্ধ্যায় মহিলা সমিতি 'দীপালি সংঘে'র সংবর্ধনা। সংবর্ধনার উত্তরে ভাষণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এত মহিলা এমন শান্তভাবে আমাকে কোথাও অভ্যর্থনা করেনি।" তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ঢাকা ইন্টারমীডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গণে জনসভায় বক্তৃতা, বিষয়: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা। পরদিন (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে বিচিত্র কর্মসূচি— সকালে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বক্তৃতা, দুপুরে কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অভিনন্দন গ্রহণ। বিকেলে মুসলিম হল-এ সংবর্ধনা। সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল-এ বক্তৃতা, বিষয়— দি ফিলজফি অব আর্ট, সভাপতি ভাইস চ্যান্সেলর মিঃ ল্যাংলি।

অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়াতে দুদিন বিশ্রাম; তারপর ১৩ তারিখ বিকেলে ভাইস চ্যান্সেলরের পার্টি, সন্ধ্যায় আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। ১৪ ফেব্রুয়ারিও দুয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাতের গাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

[দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪]

বিশ্ববরেণ্য মানুষটির এই অসম্ভব রকমের ঠাশবুনোন কর্মসূচির মধ্যেও হাউসবোটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁর পরিচিতরা, তাঁকে চোখের দেখা দেখতে আসতেন অপরিচিতরা। এই শেষোক্ত দলে ছিলেন বুদ্ধদেবও। উদীয়মান স্থানীয় কবি হিশেবে কোনো একটি সভার প্রশস্তি-পদ্য তিনি রচনা করেছিলেন, কিন্তু নিজে পাঠ করতে ভরসা পাননি, পাছে তাঁর "পুরাতন বাক্‌বিলোপকারী রসনাবৈকল্য" মঞ্চের উপর তাঁকে আক্রমণ করে—

> "রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমন উপলক্ষে যে-ছন্দোবদ্ধ প্রশস্তিটি আমি রচনা করলাম, সেটি সভায় দাঁড়িয়ে পড়বার ভার দিলাম সুধীশ ঘটককে— মনীশ ঘটকের ছোটো ভাই সে, আমার নবলব্ধ বন্ধু।"
>
> —*আমার ছেলেবেলা*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১০৪

প্রথমবার রবীন্দ্রনাথকে দেখার স্মৃতি

"রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম চোখে দেখেছিলাম বুড়িগঙ্গার উপর নোঙর-ফেলা

একটি স্টিম-লঞ্চে, যেখানে, নিমন্ত্রণকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রেষারেষি ক'রে, ঢাকার নাগরিকেরা তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। উপরের ডেক-এ ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন তিনি, ঠিক তাঁর ফোটোগ্রাফগুলোর মতোই জোব্বা-পাজামা পরনে, আরো কেউ-কেউ উপস্থিত ও সঞ্চরমাণ, রেলিঙে হেলান দিয়ে আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মুখ-চেনা একটি ব্রাহ্ম যুবক আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনাকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেবো?' আমি ত্রস্তে ব'লে উঠলাম, 'না, না— সে কী কথা!' একজন সাহিত্যঘেঁষা উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে এসে বললেন, 'আমি ব্যস্ত ছিলাম— আগে আসতে পারিনি—' আমি ভাবলাম : এঁর আসা না-আসায় রবীন্দ্রনাথের কি সত্যি কিছু এসে যায়?"

—*আমার ছেলেবেলা*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১০৫

অনেকদিন বাদে, 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৫২ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছিল :

"... ছেলেবেলায় আমারও একটি অটোগ্রাফ খাতা ছিলো, এবং রবীন্দ্রনাথ যেবার ঢাকা গিয়েছিলেন, আরো অনেকের সঙ্গে তাঁর প্রসাদ-কণিকা আমিও পেয়েছিলাম। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি যে খাতাটি আমি বহুদিন হ'লো হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু কবিতাটি আমার মনে আছে, সেটি এখানে উদ্ধৃত করি :

বাজে নিশীথের নীরব ছন্দে
বিশ্বকবির দান
আঁধার-বাঁশির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
তারার বহ্নি গান।"

প্রথমবার কলকাতায়

কলেজে প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পরীক্ষা দিয়ে জীবনে প্রথমবার কলকাতায় এলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার দপ্তরে গেলেন— দীনেশরঞ্জন দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ইত্যাদি কল্লোলগোষ্ঠীর অন্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় হল। একটা গল্প দিয়ে এলেন 'কল্লোলে'— সেই গল্পটি, যা তাঁকে রাতারাতি বাংলা সাহিত্যের বিতর্কবাত্যার কেন্দ্রস্থলে নিক্ষিপ্ত করবে।

"আমার ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা হ'য়ে গেলো, এখন গ্রীষ্মের ছুটি। ছুটির শুরুতে ঘুরে এসেছি কলকাতায়— এই প্রথম দূর-পথে এস্কর্টহীন, বাংলাদেশের রাজধানীতে এই প্রথম স্বাধীনভাবে পর্যটক। সেখানে আমাকে চুম্বকের মতো টানছিলো দশের-দুই পটুয়াটোলা লেন; সেই অভিযান ব্যর্থ হয়নি, আমি জেনে এসেছি আমি 'কল্লোলে'রই একজন, 'রজনী হ'লো উতলা' নামে আমার একটা গল্প দীনেশরঞ্জন গ্রহণ করেছেন। সেটা অচিন্ত্যকুমারের হাতে দিয়ে আমি বলেছিলাম, 'গল্পটা একটু মর্বিড।' অচিন্ত্য হেসে বলেছিলেন, 'আমরা মর্বিড লেখাই

পছন্দ করি।' বাজারে তখন মর্বিড কথাটা নতুন উঠেছে।"

—*আমার ছেলেবেলা,* বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১১৪

এই ঘটনা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর স্মৃতিচারণ :

"বুদ্ধদেবকে প্রথম দেখি কল্লোল-আপিসে। ছোটখাট মানুষটি, খুব সিগারেট খায় আর মুক্তমনে হাসে। হাসে সংসারের বাইরে দাঁড়িয়ে, কোনো ছলা-কলা কোনো বিধি-বাধা নেই। তাই এক নিশ্বাসেই মিশে যেতে পারল কল্লোলের সঙ্গে— এক কালস্রোতে। চোখে মুখে তার যে একটি সলজ্জতার ভাব সেটি তার অন্তরের পবিত্রতার ছায়া, অকপট স্ফটিকস্বচ্ছতা। বড় ভাল লাগল বুদ্ধদেবকে। তার অনতিবর্ধ শরীরে কোথায় যেন একটা বজ্রকঠোর দার্ঢ্য লেখা রয়েছে, অনমনীয় প্রতিজ্ঞা, অপ্রমেয় অধ্যবসায়। যখন শুনলাম ভবানীপুরেই উঠেছে, এক সঙ্গে এক বাসে ফিরব, তখনই মনে-মনে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম।

বললাম, 'গল্প লেখা আছে আপনার কাছে?'

এর আগে বত্রিশের ফাল্গুনের 'কল্লোলে' সুকুমার রায়ের উপরে সে একটা প্রবন্ধ লিখেছে। বাংলাদেশে সেটাই হয়তো প্রথম প্রবন্ধ যেটাতে সুকুমার রায়কে সত্যিকার মূল্য দেবার সৎচেষ্টা হয়েছে। 'আবোলতাবোলে'র মধ্যে শ্লেষ যে কতটা গভীর ও দূরাগত তারই মৌলিক বিশ্লেষণে সমস্তটা প্রবন্ধ উজ্জ্বল। প্রবন্ধের গদ্য যার এত সাবলীল তার গল্পও নিশ্চয়ই বিস্ময়কর।

'আছে।' একটু যেন কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর।

'দিন না কল্লোলে।'

তবুও যেন প্রথমটা বিস্ফারিত হল না বুদ্ধদেব। বাংলা সাহিত্যে তখন একটা কথা নতুন চালু হতে শুরু করেছে। সেই কথাটারই সে উল্লেখ করলে : 'গল্পটা হয়তো মর্বিড।'

'হোক গে মর্বিড। কোনটা রুগ্ন কোনটা স্বাস্থ্যসূচক কোন বিশারদ তা নির্ণয় করবে। আপনি দিন। নীতিধ্বজদের কথা ভাববেন না।'

উৎসাহের আভা এল বুদ্ধদেবের মুখে।

বললাম, 'নাম কী গল্পের?'

'নামটি সুন্দর।'

'কী?'

'রজনী হল উতলা।' "

—*কল্লোলযুগ,* ৪র্থ মু. পৃ. ১১৮

দশের-দুই পটুয়াটোলা লেন, কল্লোল পত্রিকার আপিশ, আসলে ছিল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের বাসাবাড়ি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে এই আপিশের একটি জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় :

"চেহারা দেখে প্রথমে কি দমে গিয়েছিলাম সেদিন? ছোট্ট দোতলা বাড়ি

—একতলায় রাস্তার দিকে ছোট্ট বৈঠকখানায় কল্লোল অফিস। বাঁয়ে বেঁকে দুটো সিঁড়ি ভেঙে উঠে হাত-দুই চওড়া ছোট একটু রোয়াক ডিঙিয়ে ঘর। ঘরের মধ্যে উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে নিচু একজনের শোয়ার মতো ছোট একফালি তক্তপোষ, শতরঞ্চির উপর চাদর দিয়ে ঢাকা। পশ্চিমদিকের দেয়ালের আধখানা জুড়ে একটি আলমারি, বাকি আধখানায় আধা-সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পিছন দিকে ভিতরে যাবার দরজা, পর্দা ঝুলছে কি ঝুলছে না, জানতে চাওয়া অনাবশ্যক। ফাঁকা জায়গাটুকুতে খানদুই চেয়ার, আর একটি ক্যানভাসের ডেক চেয়ার। ঐ ডেক চেয়ারটিই সমস্ত কল্লোল আফিসের আভিজাত্য। প্রধান বিলাসিতা।... কিন্তু প্রথম দিন সব চেয়ে যা মন ভোলাল তা হচ্ছে ঠিক সাড়ে চারটের সময় বাড়ির ভিতর হতে আসা প্লেট ভরা এক গোছা রুটি আর বাটিতে করে তরকারি। আর মাথা-গুনতি চায়ের কাপ।"

কল্লোলের আপিশ নিয়ে বুদ্ধদেবের যে স্মৃতিচারণ, তার সঙ্গে এর চরিত্র একই ধরনের :

"বাইরে কোনে ফলক নেই, ভিতরটাও চাকচিক্যহীন— রাস্তা থেকে দু-তিন ধাপ কোণ-ক্ষয়ে-যাওয়া সিঁড়ি উঠে ঘর, দেয়াল ঘেঁষে দুটো তিনটে আলমারি, মধ্যিখানে ব্যবহারমলিন সেক্রেটারিয়েট টেবিল : সেখানে বিরাজ করেন দীনেশরঞ্জন, তাঁর স্বাক্ষর-অনুসারে 'ডি. আর'— মধ্যবয়স্ক সুশ্রী সুবেশ পুষ্টবপু মানুষ, মাথার চুল পাতলা, গোল মুখখানায় সরু গোঁফজোড়া চমৎকার মানিয়েছে। দীনেশ-দার গুণপনা অনেক : তিনি শাদায়-কালোয় আভরণচিত্র আঁকেন 'কল্লোলে'র জন্য, গেয়ে ওঠেন গুণগুণ ক'রে 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' বা 'সোনাব হরিণ', শৌখিন পালায় অভিনয়েও তিনি দক্ষ ব'লে শোনা যায়। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ এই যে তিনি খুব সহজে কাছে টানতে পারেন মানুষকে, ধ'রে রাখতেও পারেন —আমি যেদিন প্রথম এসেছিলাম তাঁর কাছে, আই. এ.- পড়ুয়া অজাতশ্মশ্রু আমি তখনও, তিনি যে-রকম সাবলীলভাবে শুধু প্রথম বাক্যটি 'আপনি'তে ব'লে, আমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে 'তুমি' পেরিয়ে 'তুই'য়ের স্তরে অবনত বা উন্নত করেছিলেন, আমি তাতে চমৎকৃত হয়েছিলাম। এবং এটাই কারণ, যেজন্যে কল্লোল-দলটি অমন আঁটোসাঁটো ও মজবুত হ'তে পেরেছিলো, এবং সেই একতলার ঘরে জড়ো হতেন নানা ধরনের নানা বয়সের সাহিত্যিক ও আড্ডা-প্রেমিকেরা।... চেয়ার বেশি নেই, আমরা বসি চাদরে ঢাকা তক্তাপোশে ঘেঁষাঘেঁষি; সাহিত্যের নানান পাড়ার খুচরো খবর উড়ে বেড়ায় মুখ থেকে মুখে, কেউ কবিতা আওড়ায়, কেউ বলে কড়াপাকের রতিরসাক্ত ছড়া যা ছাপার অক্ষরে লেখা যায় না, এবং যা থেকে ভদ্রসমাজে অব্যবহৃত দু-অক্ষরের বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদগুলি আমি শিখে নিয়েছিলাম— তার মধ্যে কয়েকটা যে খাঁটি সংস্কৃত তা আবিষ্কার করতে অনেক দেরি হয়েছিলো আমার।... ঢাকা থেকে দু-দিনের জন্য এসে আমি নিবিড় একটি গোষ্ঠীসুখ অনুভব করি— যেন এখানকার প্রতিটি মানুষই আমরা, ঘনিষ্ঠতায়

তারতম্য থাকলেও সকলেই সকলের সঙ্গে সংযুক্ত।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৩৫

'রজনী হ'লো উতলা' 'কল্লোলে' বুদ্ধদেব বসুর প্রথম গল্প, চতুর্থ রচনা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

'রজনী হ'লো উতলা'

[অংশ]

মনে হলো প্রকৃতি চলতে-চলতে যেন হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে —যেন উৎসুক আগ্রহে কার প্রতীক্ষা করছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠবার আগ্-মুহূর্তে দর্শকেরা কেমন হঠাৎ স্থির, নিঃশব্দ হ'য়ে যায়, সমস্ত প্রকৃতিও যেন এক নিমেষে সেইরূপ নিঃসাড় হ'য়ে গেছে। তারাগুলো আর ঝিকিমিকি খেলছে না, গাছের পাতা আর কাঁপছে না, রাতে যে-সমস্ত অদ্ভুত, অকারণ শব্দ চারদিক থেকে আসতে থাকে, তা যেন কার ইঙ্গিতে মৌন হ'য়ে গেছে, নীল আকাশের বুকে জ্যোছনা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে— এমনকি বাতাসও যেন আর চলতে না-পেরে ক্লান্ত পশুর মতো নিঃশব্দ হ'য়ে গেছে— অমন সুন্দর, অমন মধুর, অমন ভীষণ নীরবতা, অমন উৎকট শান্তি আর আমি দেখিনি। আমি নিজের অজান্তে অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠলুম— কেউ আসবে বুঝি?

অমনি আমার ঘরের পর্দা স'রে গেলো। আমার শিয়রের উপর যে একটু চাঁদের আলো পড়েছিলো তা যেন একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে সহসা নিবে গেলো— আমি যেন কিছু দেখছি না শুনছি না ভাবছি না— এক তীব্র মাদকতার ঢেউ এসে আমাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। তারপর...

তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কী কতগুলো খসখসে জিনিশ এসে পড়লো— তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম ক'রে উঠলো। প্রজাপতির ডানার মতো কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মতো দুটি ঠোঁট, চিবুকটি কী রমণীয় হ'য়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কী মনোরম, অশোকগুচ্ছের মতো নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দুটি বক্ষ— কী সে উত্তেজনা, কী সর্বনাশা সেই সুখ— তা তুমি বুঝবে না, নীলিমা!

তারপর ধীরে-ধীরে দুখানি বাহু লতার মতো আমাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে যেন নিজেকে পিষে চূর্ণ ক'রে ফেলতে লাগলো— আমার সারা দেহ থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো— মনে হলো আমার দেহের প্রতি শিরা বিদীর্ণ ক'রে রক্তের স্রোত বুঝি এখুনি ছুটতে থাকবে।

আমার মনের মধ্যে তখনো কৌতূহল প্রবল হ'য়ে উঠলো— এ কে? কোনটি? এ, ও, না সে? তখন সব নামগুলো জপমালার মতো মনে-মনে আউড়ে গেছলুম, কিন্তু আজ একটিও নাম মনে নেই। সুইচ টিপবার জন্যে হাত বাড়াতেই আরেকটি হাতের নিষেধ তার উপর এসে পড়লো।

তোমার মুখ কি দেখাবে না?

চাপা গলায় উত্তর এলো— তার দরকার নেই।

কিন্তু ইচ্ছে করছে যে!

তোমার ইচ্ছে মেটাবার জন্যেই তো আমার সৃষ্টি! কিন্তু ঐটি বাদে।

কেন? লজ্জা?

লজ্জা কীসের? আমি তো তোমার কাছে আমার সব লজ্জা খুইয়ে দিয়েছি।

পরিচয় দিতে চাও না?

না। অপরিচয়ের আড়ালে এ রহস্যটুকু ঘন হ'য়ে উঠুক।

আমার বিছানায় তো চাঁদের আলো এসে পড়েছিলো—

আমি জানালা বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

ও! কিন্তু আবার তা খুলে দেয়া যায়!

তার আগে আমি ছুটে পালাবো।

যদি ধ'রে রাখি?

পারবে না।

জোর?

জোর খাটবে না।

একটু হাসির আওয়াজ এলো। শীর্ণ নদীর জল যেন একটুখানি কূলের মাটি ছুঁয়ে গেলো।

তুমি যেটুকু পেয়েছো, তা নিয়ে কি তুমি তৃপ্ত নও?

যা চেয়ে নিইনি, অর্জন করিনি, দৈবাৎ আশাতীতরূপে পেয়ে গেছি, তা নিয়ে তো তৃপ্তি-অতৃপ্তির কথা ওঠে না।

তবু?

তোমার মুখ দেখতে পাওয়ার আশা কি একেবারেই বৃথা?

নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্যেই?

না, তা হবে কেন? তা যে অফুরন্ত সুধার আধার।

তবে?

আমি হার মানলুম।...

নীলিমা বললে, এইখানেই কি তোমার গল্প শেষ হ'লো?

মাষ্টারের কাছে ছাত্রের পড়া বলার মতো ক'রে জবাব দিলুম— না, এইখানে সবে শুরু হ'লো। কিন্তু এর শেষেও কিছু নেই— এই শেষ ধরতে পারো।...

পরের দিন সকালে আমার কী লাঞ্ছনাটাই না হ'লো! রোজকার মতো ওরা চারদিক থেকে আমায় ঘিরে বসলো— রোজকার মতো ওদের কথার স্রোত বইতে লাগলো জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি সুরে, তাদের হাসির রোল ঘরের শান্ত হাওয়াকে আকুল ক'রে ছুটতে লাগলো, হাত নাড়বার সময় ওদের বালা-চুড়ির মিঠে আওয়াজ রোজকার মতোই বেজে উঠলো— সবাকার মুখই ফুলের মতো রূপময়, মধুর মতো লোভনীয়! কিন্তু আমার কণ্ঠ মৌন, হাসির উৎস অবরুদ্ধ। গত রাত্রির

চিহ্ন আমার মুখে আমার চোখের কোণে লেগে রয়েছে মনে ক'রে আমি চোখ তুলে কারো পানে তাকাতে পারছিলুম না। তবু লুকিয়ে-লুকিয়ে প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলুম— যদি বা ধরা যায়! যখন যাকে দেখি, তখনই মনে হয় এই বুঝি সেই! যখনি যার গলার স্বর শুনি, তখনই মনে হয়, কাল রাত্রিতে এই কণ্ঠই না ফিশফিশ ক'রে আমায় কত কী বলেছিলো? অথচ কারো মধ্যেই এমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখলুম না, যা দেখে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায়! সবাই হাসছে, গল্প করছে! কে? কে তাহ'লে?...

ভেবেছিলুম সমস্ত বাত জেগে থাকতে হবে। মনের সে অবস্থায় সচরাচর ঘুম আসে না। কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজনার ফলেই হোক বা পায়ে হেঁটে সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর দরুণ শারীরিক ক্লান্তিবশতই হোক, সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুমে আমার সারা দেহ ভেঙে গেলো— একেবারে নবজাত শিশুর মতোই ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর আবার আস্তে-আস্তে ঘুম ভেঙে গেলো— আবার প্রকৃতির সেই স্থির প্রতীক্ষমাণ, নিষ্কম্প অবস্থা দেখতে পেলুম— আবার আমার ঘরের পর্দা স'রে গেলো— বাতাস সৌরভে মূর্ছিত হ'য়ে পড়লো— জোছনা নিভে গেলো— আবার দেহের অণুতে-অণুতে সেই স্পর্শসুখের উম্মাদনা— সেই মধুময় আবেশ— সেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট ক্ষইয়ে ফেলা— সেই বুকের উপর বুক ভেঙে দেয়া— তারপর সেই স্নিগ্ধ অবসাদ— সেই গোপন প্রেমগুঞ্জন— তারপর ভোরবেলায় শূন্য বিছানায জেগে উঠে প্রভাতের আলোর সাথে দৃষ্টি বিনিময়—"

আজকের দিনে ভেবে ভেবে আমাদের কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়, কিন্তু এই গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে ঝড়ের মতো অভিযোগ উঠল— অশ্লীলতার অভিযোগ। বুদ্ধদেবের জীবনে বারবার তাঁকে এই রহস্যময় অভিযোগের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, এই তার মধ্যে প্রথমবার। প্রথম অভিযোগ করলেন বীণাপাণি দেবী (মিসেস এন. সি. রায়) 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়। তিনি লিখলেন, এমন লেখককে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল। আরেকজন মহিলা লিখলেন, "লেখক যদি বিয়ে না করে থাকে তবে যেন অবিলম্বে বিয়ে করে, আর বউ যদি সম্প্রতি বাপের বাড়িতে থাকে তবে যেন আনিয়ে নেয় চটপট!" (দ্র. 'কল্লোলযুগ', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ৪র্থ সং, পৃ. ১২২)। কুম্ভিলবৃত্তির অভিযোগও এসেছিল। 'নবশক্তি' পত্রিকায় (৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) জনৈক নির্মলকান্তি ধর চিঠি লিখে অভিযোগ করেছিলেন, স্টেফান জোয়াইগ-এর Erstes Erlebnis গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পটির সঙ্গে বুদ্ধদেবের গল্পের কাহিনি-অংশ অবিকল মিলে যাচ্ছে। উত্তরে বুদ্ধদেব ওই পত্রিকায় চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 'রজনী হল উতলা'র প্রকাশকাল ১৯২৬, আর জোয়াইগ-এর গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৩১!

[দ্র. "বুদ্ধদেব বসু : 'প্রগতি' থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘ'।" সুবীর রায়চৌধুরী। কলকাতা ২০০০, নববর্ষ ১৩৯১]

কিন্তু এসব আরো পরের কথা। গল্পটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও স্থূল আক্রমণ করলেন সজনীকান্ত দাস— তাঁর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায়। এই পত্রিকার 'বিরহ' সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩৩) অতি-আধুনিক সাহিত্যকে ব্যঙ্গ ক'রে বেরোল সজনীকান্তের একটি নাটিকা, 'কেবলরাম গাজনদার' ছদ্মনামে রচিত, 'Orion বা কালপুরুষ'— তার আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই 'রজনী হলো উতলা' গল্পটি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখে (২৩ ফাল্গুন ১৩৩৩) তিনি এই ধরনের রচনার বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করলেন :

"... লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল।... পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে-সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান ক'রে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার-শ্রেণীভুক্ত ব'লে প্রচার করবার একটা চেষ্টা দেখি।... দৃষ্টান্তস্বরূপ... 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'লো উতলা' নামক একটি গল্প... এই মাসের [ফাল্গুন ১৩৩৩] 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটির ['বন্দীর বন্দনা']... ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে।... কোনো প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাংলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট ক'রে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি..."।

কল্লোলযুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪র্থ সং, পৃ. ১২৬

রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

কল্যাণীয়েষু,

কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল কোরো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না-ও হতে পারে। আলোচনা করতে হলে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্রদৃষ্টির প্রভাব— তাই এখন বাগ্‌বাত্যার ধুলো দিগ্‌দিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলার বলব। ইতি ২৫শে ফাল্গুন ১৩৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্লোলযুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ৪র্থ সং, পৃ. ১২৭

'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত এই চিঠির উত্তরে মন্তব্য লিখলেন বুদ্ধদেব, 'প্রগতি'র 'মাসিকী' নামক সাময়িক সাহিত্য আলোচনার স্তম্ভে (কার্তিক ১৩৩৪) :

"... যদিও 'আধুনিক সাহিত্য' তাঁর 'চোখে পড়ে না', তবুও তাতে 'হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে' ব'লে মত দিয়েছেন। আব্রু ঘুচে যাওয়ার বিরুদ্ধে কী সাহিত্যিক কারণ আছে তা রবীন্দ্রনাথ জানালেও পারতেন। সে কি এই যে, ভদ্র শ্রেণী— উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হওয়া এতকাল যাঁদের একচেটে সৌভাগ্য ছিলো —ও নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে সাহিত্যের দিক দিয়ে যে-ব্যবধান এতকাল ছিলো, তা হঠাৎ খ'সে গেছে; না এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যেসব জিনিশ ইঙ্গিতমাত্র করেছেন, আধুনিকেরা সেইটেই একটু স্পষ্ট ক'রে বলছেন? গোগোলের আমলে রুশীয় নাটক-নভেলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি ভিন্ন কোনো লোক স্থান পেতো না; সেই ব্যবধান লঙ্ঘন ক'রে চেহ্‌হব গর্কী নিশ্চয়ই মহাপাতক করেছেন। যুবনাশ্বের গল্প যে ভালো নয়, তার একমাত্র কারণ কি এই যে, তাঁর চরিত্রগুলি পুরানো আমলের জমিদার বা বালীগঞ্জ-নিবাসী ব্যারিস্টার নয়?"

এই ১৯২৬ সালে, নোবেল প্রাইজ পাবার তেরো বছর পর, রবীন্দ্রনাথ যখন বাঙালির চোখে প্রায় দেবতার আসনে আসীন, সেই সময়ে তাঁকে এই শালীন কিন্তু কঠিন ভাষায় আক্রমণ করছেন যিনি, তাঁর তখনো আঠারো বছর বয়স পুরেছে কি পোরেনি। এবং যে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে পত্রিকায় এইরকম তীব্র মন্তব্য লেখেন, তিনিই রাতের অন্ধকারে মশারির তলায় শুয়ে শুয়ে পাগলের মতো আউড়ে চলেন 'পূরবী' থেকে কবিতার পর কবিতা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের প্রথম জীবনের এই স্বতোবিরোধটিকে মাথায় রাখলে তবেই আমরা তাঁর জীবনব্যাপী রবিভক্তির সংরক্ত কিন্তু নির্মোহ চরিত্রটি ঠিকমতো ধরতে পারব।

ভবিষ্যতের নিজেকে কীভাবে দেখছেন

বুদ্ধদেবের ছেলেবেলার দিনগুলি ফুরিয়ে এল। এই সময়ে নিজের প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন ছিল তার পরিচয় পাই তাঁর স্মৃতিকথার একটি অনুচ্ছেদে। একদিকে শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দিচ্ছেন বৈষয়িক হতে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে সেইভাবে জীবন গড়ে তুলতে; অন্য দিকে, ভবিষ্যতের নিজেকে তিনি যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন, তাতে একটিমাত্র কাজ ছাড়া নিজেকে তিনি অন্য কিছুরই যোগ্য বলে মনে করতে পারছেন না— সেটি হল সাহিত্যকর্ম।

"কী ছিলাম আমি সেই সময়ে? একটা আবেগের পিণ্ড, বাস্তবে-কল্পনায় জট-পাকানো একটা বাণ্ডিল— অগোছালো, অস্থির, দোলায়মান— মনের এক অংশে নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর অন্য অংশে অনেক বয়স্কের চেয়েও অধিক বয়স্ক। কাঁপছি আমি সারাক্ষণ, যে-কোনো হাওয়ায়, যে-কোনো ইঙ্গিতে, যেন আমি বড্ড বেশি খুলে যাচ্ছি, যেন আমার ভিতর-মহলে অনেকের জন্য জায়গা থাকলেও আমার নিজেরই কোনো আশ্রয় নেই।... আমার আবেগ আমি ফুরোতে পারি না;

তা উপচে পড়ে আমার লেখার খাতায়, 'প্রগতি'র পাণ্ডুলিপি সংখ্যাগুলিতে— পদ্যে-গদ্যে অদম্য ও ফেনিল।... এই লেখালেখি ব্যাপারটাই কেমন আটকে রেখেছে আমাকে— বাইরের সব টানা-হেঁচড়ার মধ্যেও আমাকে বারবার সেখানেই ফিরতে হয়। আমি তাই মানতে পারি না যে আমার এখন থেকেই আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়া উচিত (যে পরামর্শ আমার গুরুজনদের মধ্যে কেউ-কেউ আমাকে দিয়ে থাকেন মাঝে-মাঝে);— আমার কেবলই মনে হয় আমি একটি ছাড়া অন্য কোনো কাজের যোগ্য নই, এবং সেই একটিকে নিয়েই সারা জীবন আমাকে কাটাতে হবে। আমার সব অস্থিরতার তলায় এই একটি বিশ্বাস নিষ্কম্প্র।"

—*আমার ছেলেবেলা,* বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১১৩

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি রচিত হতে আরম্ভ হল এই সময় থেকে।

"কোনো-কোনো মুহূর্তে আমার মনে হয় এই জীবন বড়ো সুন্দর, বড়ো আশ্চর্য, যেন ভেবে পাই না মানুষের মনে কেন থাকে মালিন্য, ঈর্ষা, বিদ্বেষ— যাব প্রমাণ পেয়েছিলাম একবার যখন সন্ধ্যার আবছায়ায় দুটি মুখে-রুমাল-বাঁধা যুবক প্রহার করেছিলো আমাকে আর পরিমলকে— ভেবে পাই না কেন কুৎসিত বাসনা-কামনা আমাকেও দংশন করে মাঝে-মাঝে— যে আমি কবিতায় এত ভাবের কথা লিখছি। আমার এই সব ভাবনা অবশ্য খুবই অস্পষ্ট— অথবা সেগুলি ভাবনাই নয়, অনুভব মাত্র— যার মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য নেই— কিন্তু এরই তলা থেকে হঠাৎ একদিন দুটো লাইন ভেসে উঠলো :

"যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
ব'সে আছি আমি।"

ধীরে-ধীরে, অসমমাত্রিক লাইনের-পর-লাইনে, মিলছুট, চলন একটু ভাবি, বেরিয়ে এলো এক যুবকের জবানবন্দি, এক শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর আত্মঘোষণা। 'অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।' এই শেষ উক্তিটি কাগজে লিখেই আমার অনুভূতি হ'লো— এটা ঠিক, এটা হয়েছে, এটা সত্যি। মানে, এটা বানানো নয়, আওয়াজের কুচকাওয়াজ নয়, নয় *রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন দত্তে বদহজমজনিত* উদগার— এখানে আমার কিছু বলার ছিলো, এই প্রথম আমি নিজের গলায় কথা বলতে পারলাম।"

—তদেব, পৃ. ১১৫

'রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন দত্তে বদহজম-জনিত উদ্‌গার' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তার উদাহরণ রয়েছে তাঁর ছোটোবেলার জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস 'অন্য কোনখানে'তে— যার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "বইটি ছোটোদের উপন্যাস, কিন্তু লেখকের ইচ্ছা বড়োরাও পড়েন।" সেখানে উপন্যাসের নায়ক

তন্ময় যে আসলে তিনি নিজে সেকথা কাউকে বলে দিতে হয় না। তন্ময় বেঁটে, তন্ময় তোৎলা, তন্ময় লাজুক, তন্ময় কবিতা লেখে। তারও আছেন বিপুলদেহিনী প্রখরভাষিণী প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী দিদিমা, আর মৃদু, ভিতু, পুলিশে কাজ করেন কিন্তু সে চাকরির তিনি একেবারেই যোগ্য নন এমন বাবা; বাস্তব জীবনের দাদু গল্পের দাবি মেটাতে পরিণত হয়েছেন বাবাতে। মিল আছে ছোটোখাটো কিন্তু জীবন্ত আরো অনেক অনুপুঙ্খে, 'আমার ছেলেবেলা'র সঙ্গে পাশাপাশি রেখে পড়লেই বোঝা যায়। সেখানে আছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তন্ময়ের কবিতা লেখার বর্ণনা।

অনুকরণ করার নানারকম উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বইটিতে, নজরুল থেকে উদাহরণ, অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুকুন্দদাস থেকে অনুকরণ, কিন্তু এখানে আমরা বেছে নিচ্ছি শুধু রবীন্দ্রনাথ— তার প্রধান কারণ এইটে দেখানো, কিশোর এই কবিকে কেমন করে পাকে পাকে জড়িয়েছিলেন তিনি, আর সেই পাক সবলে ছাড়িয়ে, 'বন্দীর বন্দনা'র প্রথম পঙ্‌ক্তিতে পৌঁছনোর জন্য তাঁকে কী অমানুষিক চেষ্টা করতে হয়েছিল।

প্রথম দিকে কবিতা লেখার সময়ে তন্ময়ের আদর্শ ছিল মাইকেল বা হেম-নবীনের কবিতা, তখনো রবীন্দ্রনাথ অচেনা ছিলেন। লিখছে, কিন্তু অতৃপ্তি নিজের কাছে গোপন থাকছে না :

"সেই অমিত্রাক্ষরের মহাকাব্যটা— তৃতীয় সর্গের আরম্ভটা এই রকম ভাবছে—

যখন ভীষণ দ্বন্দ্ব কৌরবে পাণ্ডবে
আরম্ভিল, দম্ভনাদে দুর্যোধন কহে,
অর্জুন দুর্জয়, তার প্রচণ্ড গাণ্ডীব—

কাল মনে-মনে আউড়িয়ে ভালো লেগেছিলো, আজ তো লাগছে না।

তারপর শিবেনবাবু মাষ্টারমশাইয়ের মুখে বলাকার একটুখানি ছোঁয়া পেয়েই তার কবিতার জগতে কীভাবে ধাক্কা লাগল তা আমরা দেখলাম। তারপর চয়নিকা হাতে এল একদিন, তার জগৎসংসারের চেহারা একেবারে বদলে গেল।

"তন্ময়ের দিনরাত্রির চেহারা বদলে গেলো। এ যেন সে-পৃথিবী নয়, এতকাল যাকে জেনেছে, আর এই কি সে, যাকে 'আমি' ব'লে-ব'লে সে এত বড়ো হ'লো —আর তার জন্যই এত বড়ো আশ্চর্য পৃথিবী ছড়িয়ে আছে নানারঙিন আকাশতলায়, সোনাজ্বলায়, তারাজ্বলায়, তারই জন্য?

তারই জন্য।

হাওয়ায় কী মনে পড়ে, বিকেলে মেঘ দেখলে কাঁপে, বৃষ্টি তাকে আনন্দে ভাসায়, ডোবায় তাকে আশ্চর্য দুঃখে একলা ছাতে আকাশভরা সন্ধ্যাচোখ।... কী-সব লিখেছে এর আগে— ছি!— তুলে রাখলো সে-সব— নতুন ক'রে লিখতে লাগলো নতুন-কেনা চার টাকা দামের ফাউন্টেন পেনে।... লম্বা কবিতা এলো

তন্ময়ের মনে সকালবেলায়, ভালো, খুব ভালো, যেমন আগে সে আর লেখেনি।...খাতা খুলেই লিখতে আরম্ভ করলো :

সকালবেলা ঘুম ভেঙে যেই জাগা
কী যে ভালো—কী যে ভালো লাগা।
কী যে ভালো বৃষ্টি ঝমঝম
কী যে ভালো মেঘের কালো রং।
কী যে ভালো ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া,
কী যে ভালো ঘরের মধ্যে ছায়া।
কী যে ভালো একলা ঘরের কোণে
ইচ্ছে মতো লিখছি আপন মনে।"

—*অন্য কোনখানে*, ২য় সং। পৃ. ৪৯

এই উপন্যাস লেখার পঁচিশ বছর পরে 'আমার ছেলেবেলা'য় বুদ্ধদেব 'বন্দীর বন্দনা' সম্পর্কে লেখেন, "এই প্রথম আমার নিজের গলায় কথা বলতে পারলাম।" আর তারপর :

"তথ্যের খাতিরে বলতেই হয় যে এর পরেও আমি অনেক ঠুনকো দ্রব্য বানিয়েছিলাম, সেগুলো নিয়ে বেসাতি করিনি তাও নয়; কিন্তু কয়েক মাস পরেই 'বন্দীর বন্দনা' কবিতাটা লেখা হ'য়ে গেলো [প্রথম প্রকাশ : 'কল্লোল', ফাল্গুন ১৩৩৩]। এতদিন শূন্যে ঝুলে থাকার পর আমি পায়ের তলায় মাটি পেলাম এবার — অন্তত একটু দাঁড়াবার মতো জায়গা। আমার বয়স তখন সতেরো পেরিয়ে আঠারো চলছে; আমার ছেলেবেলার এখানেই সমাপ্তি।"

—*আমার ছেলেবেলা*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১১৫

১৯২৭ ।। বয়স উনিশ

ইন্টারমীডিযেট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পেলেন।

"সেই আশাভঙ্গেব [ম্যাট্রিক পবীক্ষাব ফল আশানুৰূপ না হবাব] তিতকুট সোযাদ আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলতে পাবিনি।. তাই আই. এ. পবীক্ষা যখন কাছে এলো, আমি বইলাম সুচিন্তিতভাবে চিন্তাহীন, বদ্ধপবিকবভাবে অনিবদ্ধ। হাতে মাত্র পনেবো কুড়ি দিন সময নিযে দৃষ্টিপাত কবলাম ইতিহাস এবং ইকনমিক্সেব দিকে, ছেড়ে দিলাম আস্ত একখানা ভট্টিকাব্য বা অন্য কোনো অরুচিকব সংস্কৃত পুঁথি— ভাবতে ভালো লাগলো যে আমাব ম্যাট্রিকেব বোকা খাটুনিব উপব এবাবে বেশ প্রতিশোধ নেযা যাচ্ছে। কৌতুক এই, সেই তাচ্ছিল্যসাধিত আই এ পবীক্ষাতেই আমি পেলাম দ্বিতীয স্থান— পবন্তু একটি স্কলার্শিপ। মানতেই হবে, এব পিছনে অনেকটা ছিলো দৈবেব হাত, কেননা প্রথম দাঁড়ানো ছাত্রীটিব চেযে আমাব মোট নম্বব ছিলো অনেক নিচুতে, আব দ্বিতীয় বৃত্তিটি ঢাকা বোর্ড মাত্র সে-বছব থেকেই মঞ্জুব কবেছিলেন। তা দৈব হোক আব যাই হোক, মাসিক কুড়ি টাকা মানে মাসিক কুড়ি টাকাই; বন্ধুবা মিলে স্থিব কবা গেলো হস্তলিপি-পত্রিকা আব নয, এবাবে একটি মুদ্রাযন্ত্র-নিঃসৃত দস্তুবমাফিক মাসিকপত্র চাই।"

—*আমাব যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ২

"হিশেব ক'বে দেখা গেলো, মাসে একশো টাকা হ'লে টায়ে-টুযে একটি কাগজ চলে। একবকম নিজেদেব ভিতর থেকে সহজেই দশজন লোক পাওযা গেলো, যাবা প্রতি মাসে দশ টাকা ক'রে চাঁদা দেবে। আমি দিতে পাববো কিনা, সেটাই ছিলো সন্দেহ; আমাব বৃত্তি পাবার খববে সে-দুর্ভাবনা ঘুচলো।"

—*হঠাৎ আলোব ঝলকানি : পুবানা পল্টন*। বুদ্ধদেব বসু

'প্রগতি' পত্রিকা

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই ১৯২৭) 'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল, বুদ্ধদেব ইংরেজি অনার্স বিভাগে প্রবিষ্ট হবার মাসখানেক আগে।

"... আষাঢ় মাসের কোন-এক দিনে আমার এবং টুনুর [কবি অজিত দত্ত] যৌথ



সম্পাদক

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

প্রথম বর্ষ, ১৩৩৪-৩৫

প্রগতি-কার্য্যালয়

৪৭ নং পুরানা পল্টন

রমনা, ঢাকা

প্রথম বর্ষের আখ্যাপত্র

[উৎস : বুদ্ধদেব বসু, ভুঁইয়া ইকবাল। বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

সম্পাদনায়— এবং প্রধানত এই দুজনেরই আর্থিক দায়িত্বে— 'প্রগতি'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো। আকারে ফুলস্ক্যাপ অষ্টমাংশ, হলদে মলাটে ঊর্ধমুখ একটি নারীমুণ্ড আঁকা— প্রথম রচনা অচিন্ত্যর একটি অষ্টাদশপদী কবিতা : 'আমার পরান মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে।' তখনকার মাসিকপত্রের পক্ষে অপরিহার্য ধারাবাহিক উপন্যাসটি আমিই কপাল ঠুকে শুরু ক'রে দিয়েছিলাম[১]। প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিলো, মনে পড়ে, বেশ একটু চাঞ্চল্যও তুলেছিলো।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৩

"প্রগতির নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার— যাঁর 'বেদে', 'টুটাফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে —তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনো ভেঙে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে— সম্পাদক দু-জনকে বাদ দিয়ে— যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।...

'প্রগতি'তে শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিলো আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যেই তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ-বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লন্ডনে-পাশ-করা প্রোফেসর, আর কেউ-বা ফরাশি-জর্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পঙ্‌ক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই আমরা হেরে যাইনি, ভেঙে যাইনি, ম'রে যাইনি, দাঁড়িয়েছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-ক'দিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাবও দিতে চেয়েছিলাম— সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, আর ইতর

১. উপন্যাসটির নাম 'চৌরঙ্গী'। প্রথম কিস্তি লেখেন বুদ্ধদেব, দ্বিতীয় কিস্তির লেখক প্রভু গুহঠাকুরতা; তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তি লেখেন শচীন্দ্রনাথ কর, এবং শেষ করেন 'বিপ্রদাস মিত্র' ছদ্মনামে পুনশ্চ বুদ্ধদেব বসু। উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে 'বুদ্ধদেব বসু রচনাসংগ্রহে'র চতুর্থ খণ্ডে।

রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘূর্ণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হ'তো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তেমন হ'তো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিবাদ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয়; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে।... কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হ'লো, তা নাহ'লে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না।"

—*কালের পুতুল* : 'জীবনানন্দ দাশের স্মরণে'। বুদ্ধদেব বসু

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দের কবিতা 'প্রগতি'তে প্রথম বেরোয় তার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৪) : কবিতার নাম 'খুশ-রোজী', কবির নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হবার আগে অবধি তিনি 'দাশগুপ্ত' লিখতেন। এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে উদ্দিষ্ট পত্রে (২.৭.৪৬) জীবনানন্দ লিখেছেন :

"বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়; স্পষ্টতাসম্ভবা তারা; অতএব সাহস ও সততা দেখাবার সুযোগ লাভ করে চরিতার্থ হলাম— বুদ্ধদেব বসুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে।"

—'জীবনানন্দ দাশ : জীবনীপঞ্জি', প্রভাতকুমার দাস
'অনুষ্টুপ' জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৮

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

"কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিয়েছিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি

পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম— এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ— যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।"

—*কালের পুতুল* : 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে'। বুদ্ধদেব বসু

জীবনানন্দের জীবিতকালে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর কবিতার সংখ্যা ১৬২ ; আর বুদ্ধদেব প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ১১৪টি কবিতা— 'প্রগতি'তে ১৪টি, 'কবিতা'য় ৯৭টি, এবং কবিতাভবন বার্ষিকী 'বৈশাখী'তে ৩টি। এর পরে জীবনানন্দ দাশের প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধদেব বসুর অবদান কতটা তা মন্তব্যের প্রয়োজন রাখে না।

'প্রগতি'তে সাহিত্যিক বাদানুবাদ

" 'প্রগতি'র প্রতি সংখ্যায় কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে সমকালীন সাহিত্যিক বাদানুবাদ— 'কল্লোলে' যে-জিনিশটি কখনো স্থান পায়নি, বা উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পায়নি। এই বিভাগের জন্য অন্যদের লেখা দুষ্প্রাপ্য, আমিই লিখি মাসে-মাসে প্রায় পুরোটা— অনিচ্ছায় নয়, বরং সাগ্রহে ও উত্তেজিতভাবে। সাহিত্য বিষয়ে আমার একটা অনুভূতি আছে, সেটা তীব্র এবং প্রকাশের জন্য উৎসুক, এদিকে সেই সময়টাও ছিলো বিশেষভাবে তর্কমুখর। অলিতে-গলিতে রব তুলছে আমাদের নিন্দুকেরা, দু-একটা সুশ্রাব্য কথাও আমাদের কানে আসছে মাঝে-মাঝে। ব্যাপারটা আমার মন্দ লাগছে না, আমার ছেলেমানুষি অহমিকায় ঈষৎ শুড়শুড়ি দিচ্ছে এই ভাবনাটা যে আমরা এতদূর মনোযোগের যোগ্য। আমি দুই হাতে ছড়িয়ে যাচ্ছি পালটা জবাব— শুধু শত্রুপক্ষের প্রতিবাদ হিশেবেই নয়, আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে ব'লেও। আমার প্রিয় লেখকদের প্রশংসায় আমি নিষ্কুণ্ঠ; এক পা এগিয়ে দু-পা পেছিয়ে ইতি-উতি তাকিয়ে পথ চলাও আমার স্বভাবে নেই। আমার সে-সব লেখায় দাপাদাপি একটু বেশি ছিলো, গদ্য ছিলো ইংরেজি বুকনি-মেশানো, নড়বড়ে;— কিন্তু কাঁচা লেখাও কখনো কোনো কাজে লাগে না তা নয়, কোনো বিশেষ মুহূর্তে মুহূর্তের কথাও সবীজ হ'তে পারে, খুব উঁচু ক'রে নতুনের নিশেন উড়িয়ে দেবারও প্রয়োজন ঘটে কখনো। 'প্রগতি'র জন্য এটুকু অন্তত দাবি করা যায় যে সেই দূর সময়ে, যখন 'গণ্ডার-কবি'কে নিয়ে রোল উঠেছিলো অট্টহাসির, অন্য কোথাও সমর্থনসূচক প্রয়াস ছিলো না, তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত হন জীবনানন্দ— প্রকাশ্যে, একক কণ্ঠে, সোচ্চার ঘোষণায়। এবং — এটাও উল্লেখ্য— রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি একটি অতি-আবশ্যক বোঝাপড়ার চেষ্টাও সেখানেই আমরা প্রথম করেছিলাম। বোঝাপড়া— মানে, এমন কোনো ব্যবস্থা, কিংবা বলা যাক আমাদের দিক থেকে প্রস্তুতি, যাতে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে আমরা আটকে না থাকি চিরকাল, তাঁকে আমাদের পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য ক'রে তুলতে পারি। লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো রবীন্দ্র-বিদ্রোহ, কিন্তু

'শেষের কবিতা'র প্রথম দু-তিনটি পরিচ্ছেদ প'ড়ে আমার মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনের কথাটা আঁচ করেছিলেন।

শুরুতে বেশ জমেছিলো এই তর্কের খেলা, কিন্তু কিছুদিন যেতেই আমোদের অংশ উবে গেলো; যা ছিলো স্রোতের জল তা হ'য়ে উঠলো পাঁকালো, রঙ্গরস গাঁজিয়ে উঠলো তিক্ততায়। মাঝে-মাঝে আমার অনুভূতি হয় এ সব বাকবিতণ্ডা নিষ্ফল, নিজের ধরনে নিজের কাজ ক'রে যাওযার মতো ভালো আর কিছু নেই। 'প্রগতি' যখন উঠে গেলো, আমি এ-কথা ভেবে স্বস্তি পেলাম যে কোনো জুগুপ্সাপরায়ণ পত্রিকা আমাকে আর খুলে দেখতে হবে না।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ২৪

পারিবারিক সূত্রে জেনেছি, পরের দিকে 'শনিবারের চিঠি'র মোড়ক পর্যন্ত খুলতেন না বুদ্ধদেব। পত্রিকাটি চিরকাল পাঠানো হয়েছে তাঁকে; কিন্তু গৃহে তাঁর নির্দেশ দেয়া ছিল, তাঁর অনুপস্থিতির কালেও এই পত্রিকা এলে যেন মোড়ক না খুলে, প্রেরকের ঠিকানায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়।

'প্রগতি'র লেখকবর্গ

'প্রগতি'তে কারা লিখতেন, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে একটি বিজ্ঞাপন থেকে। ধূপছায়া মাসিকপত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রগতি

সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকের মাসিকপত্র

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত

আগামী আষাঢ়ে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে

এ-বৎসর প্রগতিতে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের

মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম :

সুশীলকুমার দে	প্রভু গুহঠাকুরতা	নজরুল ইসলাম
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	মোহিতলাল মজুমদার	প্রিয়ম্বদা দেবী
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	জগদীশ গুপ্ত	হেমচন্দ্র বাগচী
জসীমউদ্দীন	যুবনাশ্ব	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বুদ্ধদেব বসু	জীবনানন্দ দাশগুপ্ত	অজিতকুমার দত্ত

বৈশাখ সংখ্যা হইতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

"প্রবাসী"

ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে—

'প্রগতি'তে কখনো কোনো অনুৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয় নাই

নব-বর্ষের বার্ষিক মূল্য (তিনটাকা ছয় আনা)

২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে প্রেরিতব্য।

উৎস : *কল্লোলের কাল*, জীবেন্দ্র সিংহরায়, দে'জ সং, পৃ. ২৩২

বিশ্ববিদ্যালযেব জীবন

'প্রগতি' প্রকাশেব মাসখানেক পবে বুদ্ধদেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব ইংবেজি অনার্স বিভাগে প্রবিষ্ট হলেন। "একদিকে এই পত্রিকা চালাবাব উত্তেজনা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালযেব নতুন জীবন— আমাব দিনগুলি দুই ধাবায উচ্ছল ব'যে যাচ্ছে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয আক্ষবিক অর্থে আবাসিক ছিল না— "কিন্তু গডন কিছুটা সেই ধবনেব; যে-সব ছাত্র স্বগৃহবাসী তাদেবও সংলগ্ন থাকতে হয কোনো-না-কোনো হল বা হস্টেলে— তাদেব প্রাচীবাতিবিক্ত ক্রিযাকর্মেব সেটাই হ'লো ঘটনাস্থল।" বুদ্ধদেব ছিলেন 'জগন্নাথ হল'-এব সঙ্গে সংযুক্ত। এই সময নির্বাচনে জিতে তিনি তাঁব হল-এব বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'ব সম্পাদনা কবেন এক বছবেব জন্য। এই উপলক্ষে প্রত্যক্ষ পবিচয হ'লো 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা'ব সঙ্গে।

> "আমি ভর্তি হবাব মাস দুযেক পবে ছাত্র-নির্বাচনেব সময এলো। সুধাংশুবিকাশ বাযচৌধুবী নামে একটি বক্তৃতাপটু কর্মিষ্ঠ ও সহৃদয যুবক আমাকে ধ'বে-প'ডে তাঁব 'পার্টি' থেকে দাড কবিযে দিলেন— সাহিত্য-সম্পাদকেব পদপ্রার্থী হিশেবে। তাঁব পাল্লায প'ডে এবং তাঁবই নেতৃত্বে আমাকে ক্লাশে-ক্লাশে ঘুবে দাডাতে হ'লো আমাব 'ইলেক্টবেটে'ব সামনে, দেখতে হ'লো নিজেব নামে লজ্জাকব দেযাল-বিজ্ঞাপন- আব শেষ পর্যন্ত, সুধাংশুবিকাশেব বুদ্ধি ও বাগ্মিতাব জোবে আমি যখন এই ভোটাভুটি-খেলায জিতেও গেলাম তখন ব্যাপাবটা হ'যে উঠলো আমাব পক্ষে বিশুদ্ধ এক বিডম্বনা। কমিটি, সাব-কমিটি, কনস্টিট্যুশন, আইনেব তর্ক— এ-সব বিতিকিচ্ছিবি ঝামেলা আমি যতদূব সম্ভব এডিযে চলি, মীটিং ডাকতে উৎসাহ পাই না, অন্য সদস্যেবা যা নিযে উত্তেজিত হয আমাকে তা নিবতিশয ক্লান্ত কবে। সংক্ষেপে বলা যায, 'সাহিত্যবিভাগেব সম্পাদক' হিশেবে আমি মন দিযে একটিমাত্র কাজ কবেছিলাম— আমাব চেষ্টায জগন্নাথ হল-এব বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'ব কিছুটা হযতো শ্রীবৃদ্ধি হযেছিলো সে-বছব।"
>
> —*আমাব যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু ১ম সং, পৃ ৬

এই 'বাসন্তিকা'তেই মুদ্রিত হয বুদ্ধদেব বসুব বিখ্যাত কবিতা 'কঙ্কাবতী'।

পত্রিকাব সম্পাদক হিশেবে বুদ্ধদেবেব নাম ছিলো না। নাম থাকত অধ্যক্ষেব —তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ঐতিহাসিক বমেশচন্দ্র মজুমদাব। দাযিত্ব অবশ্যি ন্যস্ত থাকত সাহিত্য বিভাগেব সম্পাদকেব উপবই। এই তথ্য উদ্ধাব কবেছেন সুবীব বাযচৌধুবী।

দ্র "বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি' থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘ' "।
কলকাতা ২০০০, নববর্ষ ১৩৯১।

'কাব্য-দীপালি'

"বাংলা সাহিত্যে প্রথম কাব্য সংকলন 'কাব্য-দীপালি' যখন ছাপা হয়, তখন নরেন্দ্র দেব ছিলেন তার সম্পাদক (সাল মনে নেই। তবে, আমি তখনো রাধারানী দত্ত)। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী এই তিনজন কবির কবিতা ছাপানো নিয়ে সম্পাদক-প্রকাশক মতভেদ সুতীব্র হয়ে ওঠে। সম্পাদকের দাবি, সংকলনে এদের স্থান দেওয়া হোক, কারণ এঁরা রবীন্দ্র-প্রভাবের বাইরে। এঁরাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকারের দাবি, একেবারেই না! দুই বন্ধুর মন-কষাকষি এত প্রবল হয়ে ওঠে যে নরেন্দ্র দেব শেষ অবধি এই সম্পাদনার ভার থেকে মুক্ত হতে চান।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত সম্পাদকেরই জয় হল। বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র শিবরাম এঁদের কবিতা নিয়ে কাব্য-দীপালি বার হল। পববর্তীকালে সুধীরবাবু অবশ্য নিজের আগ্রহেই ওই তিন লেখকের লেখা প্রকাশ করেছিলেন। আস্তে আস্তে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রকাশক ও প্রচারক। নরেন্দ্র দেবের এতে আনন্দের অবধি ছিল না।"

—'স্মৃতি', বাধারানী দেবী। ৩০শে নভেম্বব : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৭। পৃ. ৩২৬

১৯২৮ ।। বয়স কুড়ি

'সাড়া' : জীবনের প্রথম উপন্যাস

সম্ভবত 'প্রগতি' পত্রিকার চাহিদা মেটাবার জন্যই, জীবনে প্রথমবার উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন : 'সাড়া'। সাধুভাষায় রচিত এই একটিই উপন্যাস তাঁর। 'প্রগতি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৩৬) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'সাড়া' বেরিয়েছিল— "সোনার শিকল" অধ্যায় অবধি। কার্তিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন আছে— "বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' প্রকাশিত হইয়াছে। দাম দুই টাকা।" সুবীর রায়চৌধুরী মনে করেন, সংখ্যাটি বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এটিই সম্ভবত 'প্রগতি'র শেষ সংখ্যা।

শ্লীল-অশ্লীলের দ্বন্দ্ব : বিচিত্রাভবনের সভা

শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসব সেরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। এই সময় তরুণ সাহিত্যিকরা অপূর্ব চন্দ ও প্রশান্ত মহলানবিশকে (এঁরা দুজনেই তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) অনুরোধ করলেন, 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা' নামক বিভাগে তাঁদের রচনার টুকরো-টুকরো অংশ অশ্লীল বলে ছাপা হচ্ছে —রবীন্দ্রনাথকে বলে এর একটা বিহিত করতে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে রাজি করিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রাভবনে নবীন ও প্রবীণ দলের এক সভার আয়োজন করেন। কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মেলনের উদ্যোগে এই সভা আহূত হয়। দুদিন এই সভার অধিবেশন চলে— ৪ ও ৭ চৈত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রধান বক্তা। তিনি বললেন : "সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিকভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে।... যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।"

(দ্র. *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃ. ২৩৩)

বুদ্ধদেব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন (দ্র. *'কল্লোলের কাল'*, জীবেন্দ্র সিংহরায়, দে'জ সং,পৃ. ৪১)। এই সভার বিবরণী হিশেবে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়— বৈশাখ ১৩৩৫-এ 'সাহিত্যরূপ' এবং 'সাহিত্যসমালোচনা'— প্রবন্ধ দুটি বুদ্ধদেবদের খুশি করতে পারেনি। পরের সংখ্যা

'প্রগতি'তে তিনি এই প্রবন্ধদুটির সমালোচনা করলেন।

"রবীন্দ্রনাথের গৃহে... প্রথম দিনের সভায় শ্রীযুক্তা রাধারানী দত্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শনিবারের চিঠির জঘন্যতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেন, তা উল্লেখ করা কি [রবীন্দ্রনাথের পক্ষে] উচিত ছিলো না? প্রবাসীতে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে তিনি এমন কিছু-কিছু কথা বলেছেন, যা সভায় তিনি বলেননি। দ্বিতীয়, প্রমথ চৌধুরী, অপূর্ব চন্দ, প্রশান্ত [মহলানবিশ] যে সব কথা বলেন, তাও উদ্ধৃত করা হ'লো না— অথচ কোথাকার কে সজনী দাস— তিনি কী বলেছিলেন তা সযত্নে প্রকাশ করাতে কোনো কুণ্ঠা বোধ হ'লো না। মোট কথা রবীন্দ্রনাথেব ঐ দুটি প্রবন্ধ দুই সভার যথাযথ বিবরণ নয়।... সেই সভায় আধুনিক সাহিত্যের পক্ষ থেকে যা যা বলা হয়েছিলো তা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সযত্নে বর্জন করা হবে— এরূপ পক্ষপাতিত্ব আমরা কবিগুরুর কাছে প্রত্যাশা করি না।...

অধুনা বাংলা সাহিত্যে একটি পরম বিস্ময়কর ও অভিনব movement শুরু হয়েছে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি, এবং সেই নব-রসের আস্বাদ বাংলাব প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানকে গ্রহণ করাবার ভার প্রগতি নিয়েছে।..."

—'মাসিকী', 'প্রগতি'। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

উৎস : *কল্লোলের কাল,* জীবেন্দ্র সিংহবায। দে'জ সং, পৃ. ২৩৯

নজরুলের সঙ্গে পরিচয়

এবছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষে নজরুল ঢাকায় এসেছিলেন। জগন্নাথ হল-এর সাহিত্য-সম্পাদক হিশেবে বুদ্ধদেব তাঁর সম্মানে জগন্নাথ হল-এ একটি সভার আয়োজন করলেন। সবান্ধবে তাঁকে নিয়েও গেলেন নিজের পুরানা পল্টনের বাড়িতে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে চিঠিতে লিখছেন (২৭.২.১৯২৮):

"... নজরুল ইসলাম এখানে দিনকতক কাটিয়ে গেলেন। এবার তাঁর সঙ্গে ভালোমতো আলাপ হ'লো। একদিন আমাদের এখানে এসেছিলেন;— গানে, গল্পে, হাসিতে একেবারে জমাট ক'রে রেখেছিলেন। এত ভালো লাগলো! আর ওঁর গান সত্যি অদ্ভুত! একবার শুনলে সহজে ভোলা যায় না। আমাদের দুটো নতুন গজল দিয়ে গেছেন;— স্বরলিপি শুদ্ধ ছাপবো ভাবছি।"

—বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ : ৪। অচিন্ত্যকুমারকে লেখা ৮নং চিঠি।

এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন স্মৃতিকথাতেও—

"আমার আয়োজিত অন্য একটি ঘটনাও মনে পড়ছে, যার সঙ্গে আমার হৃদয়ের সংযোগ ছিল। সেই ঘটনার নাম নজরুল ইসলাম।

সেই আমি প্রথম দেখলাম নজরুলকে, অন্য অনেক অসংখ্যের মতোই দেখামাত্র প্রেমে প'ড়ে গেলাম। চওড়া কাঁধে বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, মাঝখান দিয়ে সোজা-

সিঁথি-করা কোঁকড়া চুল গ্রীবা ছাপিয়ে প্লাবিত, মুখখানা বড়ো ও গোলছাঁদের, নেত্র আয়ত ও কোণরক্তিম[১]। গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দর পাঞ্জাবি, কাঁধে সূর্যমুখী-হলদে চাদব। কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর গান, প্রাণে তাঁর অফুরান আনন্দ— সব মিলিয়ে মনোলুণ্ঠনকারী একটি মানুষ। তাঁর জন্য আমি জগন্নাথ হল্-এ যে সভাটি আহ্বান করেছিলাম তাতে ভিড় জমেছিলো প্রচুর, দূর শহর থেকে ইডেন কলেজের অধ্যাপিকাবাও এসেছিলেন, তাঁর গান ও কবিতা-আবৃত্তি শুনে সকলেই মুগ্ধ : মৃত অথবা বৃদ্ধ অথবা প্রতিষ্ঠানীভূত না হওযা পর্যন্ত কবিদের বিষয়ে যাঁরা স্বাস্থ্যকরভাবে সন্দিগ্ধ, সেই সব প্রাজ্ঞদেরও মানতে হয়েছিলো যে 'লোকটার মধ্যে কিছু আছে'।

সে-যাত্রায় আমার নজরুল-সংসর্গ সেখানেই অবশ্য শেষ হয়নি। তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম সবান্ধবে আমার পুরানা পল্টনের বাড়িতে; বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক অধ্যাপক-ভবনে তাঁকে গান রচনা করতে দেখেছিলাম। তাঁর স্বকণ্ঠে তাঁর গান যাঁবা শুনেছেন, তাঁর বচনা-প্রক্রিয়ার দর্শক ছিলেন যাঁরা, শুধু তাঁরাই জানেন নজরুলের পক্ষে গান জিনিশটা কত সত্য ছিলো, কত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। একটি হার্মোনিয়াম, প্রচুর পরিমাণে পান এবং ঘণ্টায়-ঘণ্টায় চা : এই উপকরণ নিয়ে তিনি সারাদিন ধ'রে গেয়ে যেতে পারেন— অনুরোধের অপেক্ষা না-বেখে, প্রাণের আবেগে, অক্লান্তভাবে, মাঝে-মাঝে শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টিবাণ হেনে, কোনো বিশেষ পঙ্ক্তি বা শব্দবন্ধে এসে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠে। গাইয়ের সাধা গলা নয় তাঁর, বরং একটু ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু সেই ত্রুটি বিপুলভাবে পুষিয়ে দেয় তাঁর অপর্যাপ্ত বাধাবন্ধহীন উৎসাহ। আর গীতরত নজরুলকে শ্রবণ এবং দর্শন ক'রে আমরা আরো বেশি আনন্দ পাই এই কারণে যে সেই নবোদ্ভূত নবরসান্বিত গজলগুচ্ছের প্রতিটি পঙ্ক্তি 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠা থেকেই আমাদের মুখস্থ, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর মুখে-মুখে সেগুলি সুরে-বেসুরে আবর্তিত হ'য়ে থাকে। যেমন তাঁর গান গাওয়া নিঃসংকোচ, তেমনি তাঁর রচনাও এক প্রকাশ্য ঘটনা : সৃষ্টিকর্মটি যে-নির্জনতা দাবি করে ব'লে আমরা চিরকাল শুনে এসেছি তার তোয়াক্কা রাখেন না নজরুল, ঘর-ভর্তি লোকের উপস্থিতি তাঁকে বিব্রত করে না মুহূর্তের জন্য— বরং অন্যদের চোখে-চোখে তাকিয়ে, হাসির উত্তরে হাসি ফুটিয়ে, তিনি যেন নতুন প্রেরণা সংগ্রহ করেন। সামনে হার্মোনিয়াম, পাশে পানের কৌটা, হার্মোনিয়ামের ঢাকনার উপরে খোলা থাকে তাঁর খাতা আর ফাউন্টেন পেন— তিনি বাজাতে-বাজাতে গেয়ে উঠলেন একটি লাইন, তাঁর বড়ো-বড়ো সুগোল অক্ষরে লিখে রাখলেন খাতায়, আবার কিছুক্ষণ বাজনা শুধু— দ্বিতীয় লাইন—তৃতীয়—চতুর্থ—দর্শকদের নীরব অথবা সরব প্রশংসায় চর্চিত হ'য়ে ফিরে-ফিরে গাইলেন সেই সদ্যরচিত স্তবকটি : এমনি ক'রে, হয়তো আধঘণ্টার মধ্যে, 'নিশি ভোর হল জাগিয়া পরানপিয়া' গানটি রচনা করতে আমি তাঁকে দেখেছিলাম— দৃশ্যটি আমার দেবভোগ্য ব'লে মনে

১. বুদ্ধদেব এখানে সম্ভবত য়োরোপের রেনেসাঁ-যুগের একটি বিশ্বাসের কথা ইঙ্গিত করেছেন : প্রতিভাবানদের নাকি চোখের কোণ লালচে হয়। মিকেলাঞ্জেলোর তাই ছিল।

হয়েছিলো। 'প্রগতি'তে প্রকাশিত নজরুলের লেখা সেই গানটাই বোধহয় প্রথম।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৭

পুরানা পল্টনের টিনের বাড়ির আড্ডা

৪৭ নং পুরানা পল্টন— বুদ্ধদেব বসুর দিদিমার তৈরি টিনের বাড়ি, যে বাড়ি থেকে 'প্রগতি' পত্রিকা বেরোত— সেখানকার আড্ডা সমস্ত ঢাকা শহরে বিখ্যাত ছিল। নোয়াখালিতে যে-লাজুক, তোতলা ছেলেটি একা-একা দিন কাটাত, বই আর দাদামশাই ছাড়া যার আর কোনো সঙ্গী ছিল না, সে ঢাকায় এসে এই পাঁচ-ছয় বছরে অর্জন করেছে অজস্র বন্ধু, এবং আড্ডা দেবার জন্য খ্যাতি-কুখ্যাতি দুইই। এই আড্ডার স্মৃতিচারণ করেছেন আড্ডার অন্যতম আদি সদস্য, কবি অজিত দত্ত :

"... কল্লোল আপিশের আড্ডায় আমরা আসতাম ছোট বড় ছুটিছাটায়। আমাদের নিজস্ব আসল আড্ডাটি ছিল ঢাকায়। যতদূর মনে পড়ে বুদ্ধদেব পুরানা পল্টনের টিনের বাড়ির বাসিন্দা হয় ১৯২৪ সালে। কিন্তু তখনও আড্ডাটা ওর বাড়িতে জমাট বাঁধেনি। প্রথম কারণ, আমি পড়তাম জগন্নাথ কলেজে, বুদ্ধদেব পড়ত ঢাকা কলেজে। দ্বিতীয়ত তখনো আমার সাইকেল ছিল না। আমি মাঝে মাঝে যেতাম, পরিমলও আসত কিন্তু অধিকাংশ দিন বুদ্ধদেবই শহরে আসত। অমলেন্দু ও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরই টিনের ঘরের আড্ডাটি খুব জমজমাট হয়ে ওঠে। আমার ও অমলেন্দুর সাইকেল থাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রোজই সোজা বুদ্ধদেবের বাড়ির আড্ডা সেরে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া ততদিনে বন্ধুগোষ্ঠীও বেশ বড় হয়েছে। সুধীশ [ঘটক], অনিল [ভট্টাচার্য] ও ভৃগু [গুহঠাকরতা] প্রায়ই আসত। চা-সিগারেটের সঙ্গে তুমুল সাহিত্যচর্চাও হত। কেউ নতুন কিছু লিখলে তা নিয়েও কথাবার্তা হত। পরিমল [রায়] ছিল অপেক্ষাকৃত মৃদুভাষী ও মিতভাষী। তুমুল চেঁচামেচিতে যোগ না দিলেও অনেক সময়ে সে দু-একটি বুদ্ধিদীপ্ত টিপ্পনি কাটত বা মুখে-মুখে ছড়া বানাত। পরিমলের মতো এরূপ সুরসিক, পরিচ্ছন্ন-রুচি, স্বল্পভাষী কিন্তু বাক্‌চতুর, প্রকৃত সাহিত্যসমঝদার বন্ধু পাওয়া একটি দুর্লভ সৌভাগ্য। সে অর্থনীতির ছাত্র ছিল, কিন্তু তাঁর 'ইদানীং' বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই ওর রচনাশক্তি ও রসবোধের পরিচয় জানেন। পরিমল অনেক ছড়াও লিখে রেখে গেছে।... মোটের উপর এ আড্ডায় সাহিত্যচর্চাটাই প্রধান ছিল।"

—'কবিতা লেখার কথা', অজিত দত্ত। 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯

এই আড্ডা, ও বুদ্ধদেব বসুকে প্রথমবার দেখা বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন ঢাকার মেয়ে রানু সোম (প্রতিভা বসু) :

"এরকমই একদিন গিয়েছি [বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসুর বাড়িতে : তিনি তখন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন]; বোধহয় কোনো ছুটির দিন ছিল, প্রাতর্ভ্রমণ নয়, একটু বেলাতেই গিয়েছি। বেলা মানে আটটা। আমি আর বাবাও গেট দিয়ে ঢুকছি, দেখলাম দিলীপদাও [দিলীপকুমার রায় : ডি. এল. রায়ের পুত্র] একটি সদ্যযুবকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে গেটের কাছে এসেছেন। যুবকটিকে বিদায় দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কী রকম কবি-কবি চেহারা করে ফেলেছে দেখেছ?'

আমি বললাম, 'কে?'

দিলীপদা বললেন, দেখলে না? তোমার পাশ দিয়েই তো বেরুল। চেন না?'

'না তো।'

'বলছ কী! ঢাকার মেয়ে আর ঢাকার সবচেয়ে সেরা ছেলেটিকেই চেন না? বুদ্ধদেব বসুর নাম শুনেছ তো? না কি তাও জান না?'

'ওমা, এই নাকি বুদ্ধদেব বসু?' আমি একেবারে সচকিত।

'এর আগে দ্যাখোনি কোনোদিন? আলাপ নেই?'

'না।'

'ঠিক আছে, আমি একদিন আলাপ করিয়ে দেব। দুর্দান্ত ছেলে।'

উৎফুল্ল হলাম। আমি জানতাম পুরানা পল্টনে একটা টিনের ঘরে বুদ্ধদেব বসু থাকেন। প্রচণ্ড আড্ডা হয় সেখানে। আড্ডার সদস্য পরিমল রায়, অমলেন্দু বসু, মন্মথ ঘোষ, অনিল ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, সুকুমার বসু ইত্যাদি, এঁরা সকলেই বিশেষ, তখনো বিশেষ ছিলেন পরবর্তী জীবনেও বিশেষ। এই বিশেষ দলটি ঢাকার যুবক-যুবতীদের কাছে আলোচনার বিষয়। 'একখানা হাত' কবিতাটি লিখে বুদ্ধদেব আমাদের মনে অনেক রোমাঞ্চ জুগিয়েছেন, 'রমাকে আমন্ত্রণ' পড়ে সকলেরই 'রমা' হবার সাধ হয়েছে। অজিত দত্ত আর বুদ্ধদেবের সম্পাদনায় 'প্রগতি' বেরোচ্ছে তখন। বুদ্ধদেবের দেব আর অজিত দত্তের দত্ত মিলিয়ে দেবদত্তের নামে অনেক লেখা বেরোচ্ছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা পুরানা পল্টনের মাঠে বেড়াতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর আড্ডাখানা এবং বাসস্থান টিনের ঘরটাও দেখে এসেছি, উঁকিঝুঁকিও মেরেছি। সেই বুদ্ধদেব বসুকে দেখেও দেখলাম না সেটা যত দুঃখ তার চেয়ে অনেক বেশি সুখ হল দিলীপদা তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন জেনে।"

—*জীবনের জলছবি*, প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ. ৪২

১৯২৯ ।। বয়স একুশ

'প্রগতি' পত্রিকার জন্য সংগ্রাম

'প্রগতি'র শেষ সংখ্যা বেরোল, আশ্বিন ১৩৩৬। দু-বছরের কিছু বেশিদিন ধরে এই পত্রিকা চালিয়েছিলেন বুদ্ধদেব, আর্থিক সমস্যার সঙ্গে অমানুষিক লড়াই করে করে। পত্রিকা চালাবার জন্য বুদ্ধদেবকে কী-পরিমাণ বিব্রত থাকতে হয়েছিল অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়, তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর সে সময়কার স্মৃতিকথায়, আরো স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় অচিন্ত্যকুমারকে সে সময় লেখা তাঁর চিঠিপত্রে। স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"প্রথম সংখ্যা কাগজ বেরোবার কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের দশজনের মধ্যে বেশির ভাগ ঘটনা-চক্রান্তে কে কোথায় ছিটকে পড়লো— পরে আর তাদের পাত্তা পাওয়া গেলো না। কেবল দু-জনের কাছ থেকে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত সাহায্য পেয়েছিলুম। কিন্তু মোটা খরচের ভারটা যে-দুজনের উপরে পড়লো, তাদের যৎসামান্য বিত্ত মাসিকপত্রের অগ্নিসংযোগে আশ্চর্য দ্রুতবেগে পুড়ে যেতে লাগলো। ('প্রগতি'র যা বার্ষিক আয়, তাতে ঠিক এক সংখ্যা কাগজ ছাপা হ'তে পারতো।) এমন অবস্থায় মাসিকপত্রের মতো প্রচণ্ড শখ মিটতেও বেশিদিন লাগে না, অকস্মাৎ মধ্যপথে 'প্রগতি'র গতি গেলো বন্ধ হ'য়ে।"

—*হঠাৎ আলোর ঝলকানি : পুরানা পল্টন* । বুদ্ধদেব বসু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা কয়েকটি চিঠি :

১. "... 'প্রগতি' আগামী বছর চলবে কিনা, এখনো ঠিক করিনি। সাধ তো আকাশের মতো প্রকাণ্ড; কিন্তু পুঁজিতে যে কুলোয় না। এ-পর্যন্ত এর পিছনে নিজেদের যত টাকা ঢালতে হয়েছে, তার হিশেব করলে মন খারাপ হ'য়ে যায়। এরূপ পুরোপুরি লোকশান দিয়ে আর এক বছর চালানো সম্ভব নয়।

এখনো অবশ্যি একেবারে হাল ছেড়ে দিইনি; গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ামাত্র একবার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের চেষ্টায় কলকাতায় যাবো; যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহ'লে 'প্রগতি' চলবে। যথাসাধ্য চেষ্টার ফলেও যদি কিছু না হয়, তাহ'লে আর কী করা?

—তারিখ নেই। অচিন্ত্যকুমারকে 'আপনি' সম্বোধনে মনে হয় ১৯২৮-এর গোড়ার দিকে লেখা। *বুদ্ধদেব বসু রচনাসংগ্রহ-৪*। অচিন্ত্যকুমারকে লেখা পত্র নং ৫।

২. "... 'বিচিত্রা'কে যদি convert করতে পারো তো বেশ হয়— টাকার দিক থেকে

অন্তত। আমি যে কী অভাবে পড়েছি, বলা যায় না। 'প্রগতি'র জন্য তো বটেই —নিজের খরচও চালানো দায়। কোনো রোজগারের পথ না দেখলে চলে না। তুমি কি 'বিচিত্রা'র থেকে আমার জন্য কোনো লেখার order supply করতে পারো? যদি কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে দরকার হয় সব কিছু।..."

—তারিখ নেই, তবে অচিন্ত্যকুমার ১৯২৮ নাগাদ 'বিচিত্রা'য় চাকরি করতেন।

"... কল্লোল বার হবার বছর পাঁচেক পরে 'বিচিত্রা'য় যখন সাব-এডিটরি করি..."

'কল্লোলযুগ', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ৪র্থ মু, পৃ. ১৭৭

উৎস : 'বুদ্ধদেব বসু', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯/৩/১৯৭৪, পৃ. ৪

৩. "... 'প্রগতি' সত্যি সত্যি আর চললো না। কোনোমতে জ্যৈষ্ঠটা বের ক'রে দিতে পারলেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তবু, যদি কখনো অর্থাগম হয়, আবার কি না বার করবো?... ২৭/২/২৮"

—*বুদ্ধদেব বসু রচনাসংগ্রহ : ৪*। অচিন্ত্যকুমারকে লেখা চিঠি, ৮ নং

৪. অচিন্ত্য,

শেষ পর্যন্ত 'প্রগতি' বোধহয় উঠে গেলো না। তুমি বলবে, অমন প্রাণান্ত ক'রে চালিয়ে লাভ কী? লাভ আছে।

"পরিমলবাবুর সঙ্গে আজ কথা ক'য়ে এলাম। তিনি পঁচিশ টাকার মতো মাসিক সাহায্য জুটিয়ে দিতে পারবেন, আশ্বাস দিলেন। আমি কলকাতায় দশের ব্যবস্থা করেছি। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার মতো দেখা যাচ্ছে। আরো কিছু পাবো আশা করা যাচ্ছে। তার ওপব বিজ্ঞাপনে দুটো-পাঁচটা টাকা কি আর না উঠবে? উপস্থিত ঋণ শোধ করাব মতো উপায়ও পরিমলবাবু বাৎলে দিলেন। এবং কাগজ যদি চলেই, কিছু ঋণ থাকলে যায় আসে না।

তোমার কাছে কিছু সাহায্য চাই। পাঁচটা টাকা তুমি সহজেই spare করতে পারো। সম্পূর্ণ নিজেদের একটা কাগজ থাকা— সেটা কি কম সুখের?..."

—*কল্লোলযুগ*, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ৪র্থ মু, পৃ. ১৩৯। তারিখ নেই।

'প্রগতির খরচ চালাবার অর্থ কোন কোন উৎস থেকে, কী মূল্যে আসত তা নিজের যৌবনের স্মৃতিকথায় স্মরণ করেছেন বুদ্ধদেব :

"... আমার নিজের সম্বলও ফুরিয়ে এলো। এতদিন চলছিলো আমার দাদামশায়ের জীবনবীমার সঞ্চয়ে, কিন্তু পত্রিকা চালিয়ে খামখেয়াল মিটিয়ে দিদিমার সেই তল্পি আমি ফুটো ক'রে দিয়েছি, তাঁর সর্বশেষ দু-একটি স্বর্ণালংকারও আমার অপব্যয়ের খাতে তলিয়ে গেছে। আমি ধারাবাহিকভাবে বৃত্তি পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ে, একবার পেয়েছিলাম প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় থোকে আড়াইশো টাকা পুরস্কার— তখনকার পক্ষে সংখ্যাটা বেশ ভারবান— আনুষঙ্গিক স্বর্ণপদকাদিও তৎক্ষণাৎ নগদ মূল্যে তর্জমা ক'রে নিয়েছিলাম। এ ছাড়া অবশ্য অল্পস্বল্প লেখার উপার্জনও ছিলো। সেই সবই, আমার আত্মবিশ্বাসী যৌবনের জোরে, আমি সাবলীলভাবে দগ্ধ করেছি।

আখেবে এমন অবস্থা দাঁড়ালো আমাব এম. এ. পবীক্ষাব ফী প্রায জোটানো যাচ্ছে না— আমাব দিদিমাব ডাক্তাবভাই তা দান কবেছিলেন।"

—*আমাব যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৫১

বিষ্ণু দে-কে লেখা কয়েকটি পত্রাংশ :

১. (১৬/১/১৯২৯)

"'প্রগতি'ব জন্য কত টাকা দবকাব, জিজ্ঞেস কবেছেন। দবকাব মাসে সত্তব-আশি টাকা— খুব কম ক'বে ধবলে। আশি টাকা মানে ছ' ফর্মা কাগজ। আপাতত তাই হোক না। আপনি যদি পনেবো টাকাব আশ্বাস দিতে পাবেন— সে অনেকখানি।..."

২. (২৮/৩/১৯২৯)

"... টাকাব আশায থাকবো। সব দিক থেকে ছেঁকে ধবেছে। Apl এব first week-এব মধ্যে আবাব ২০ টাকা যেমন কবেই হোক পাঠাবেন। একটু যদি অসুবিধে সইতেও হয় তো উপায নেই। তাব চেযে অনেকগুণ বেশি কৃচ্ছ্রসাধন আমাকে কবতে হয।..."

৩. (১লা এপ্রিল বাত্রি)

"... আপনাব টাকা পেযেছি। ধন্যবাদ। চাঁদা-দাতাদেব অবস্থা শুনে ভাবি dısconcerted হ'য়ে পড়েছি। অথচ আমাদেব অবস্থা তো জানেনই। দুর্ভাবনাব বোঝাটা আমাকে একাই বহন কবতে হয। ভাবি বিশ্রী লাগে এক-এক সময। ঘবেব খেযে বনেব মোষ তাড়ানো শখেব কথা বটে, কিন্তু you've to pay dearly for ıt..."

৪. ৪৭ পুবানা পল্টন, বমনা, ঢাকা— ৫ই মে বাত্রি।

"... কাবণ এ-কথা ঠিক যে আমাব বিলেত যাওযা হোক আব না-ই হোক 'প্রগতি', আব চলবে না। 'প্রগতি' চলা অসম্ভব হ'যে দাঁড়িযেছে। অজস্র অপবাদ ও নিন্দা নিযে 'প্রগতি' পত্রিকা বাংলা সাহিত্য থেকে অপসৃত হ'লো; তবে তাব নাম এত সহজে লুপ্ত হবে ব'লে মনে হয় না।..."

চাবটি চিঠিবই উৎস—'ভাষানগব' পত্রিকা, সেপ্টেম্বব ১৯৮৯

'প্রগতি'র সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু

তিন বছরেরও কম আয়ু নিয়ে 'প্রগতি' প্রত্রিকা সে-সময়কার বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জীবনানন্দের তেরো বা চোদ্দটি কবিতা বেরিয়েছিল 'প্রগতি'তে, তার মধ্যে আছে '১৩৩৩', 'পিপাসার গান', 'অনেক আকাশ', 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত', (পরে এর

নাম বদলে হয় 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'—অর্থাৎ, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ১৭টি কবিতার ১১টি ; বিষ্ণু দে'র বিখ্যাত কবিতা 'ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে', অজিত দত্তের 'মালতী' এবং 'কুসুমের মাস' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা। লেখকসূচিতে আর ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনীশ ঘটক, হেমচন্দ্র বাগচী, পরিমল রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। আরো ছিলেন গুরু-শিষ্য মোহিতলাল মজুমদার এবং নজরুল ইসলাম, এবং জসীমউদ্দিনও।

বুদ্ধদেব বসুর নিজের কোনো বিখ্যাত রচনা 'প্রগতি'তে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এই ক্ষীণজীবী পত্রিকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তরুণ সম্পাদকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। লেখক নির্বাচনে, রচনানির্বাচনে। অনেক লেখককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না, অন্য পত্রিকায় তাঁদের রচনাশক্তির পরিচয় পেয়ে, ঠিকানা সংগ্রহ করে ডাকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের লেখা আনিয়েছেন। এইরকম ভাবে নতুন লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের কৌতুককর ইতিহাস পাই বিষ্ণু দে-কে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে :

১. (২৬/১২/২৮)

"... আপনার প্রেরিত 'পুরাণের পুনর্জন্ম' শীর্ষক রচনাটি পাইলাম। গল্পটি আমাদের বিশেষ ভালো লাগিয়াছে। আপনার তীক্ষ্ণ লিখনভঙ্গী যথার্থই প্রশংসনীয়।... কিন্তু আমরা আপনাকে ছদ্মনামধারী বলিয়া সন্দেহ করি। যদি তা-ই হয়, তবে আপনার আসল নামটি দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। ইহাই সম্পাদকীয় প্রথা।..."

—'দেশ', ২৫/৭/৮৯

২. (তারিখ : "৪ঠা মার্চ")

আপনার চিঠি পেয়ে সুখী ও নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার হাতের লেখা, লিখনভঙ্গী ও সবুজ কালি আমাদের পূর্বপরিচিত কোনো সাহিত্যিক বন্ধুর অনেকটা অনুরূপ ব'লেই আমরা আপনার বিরুদ্ধে নাম-ভাঁড়ানোর অন্যায় অভিযোগ এনেছিলুম। যা হোক, সেজন্য আমরা এখন আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী এবং আপনার নামের যাথার্থ্য সম্বন্ধে এতটা নিঃসন্দেহ হয়েছি যে আপনার বাবাকে দিয়ে আর না-লেখালেও চলবে।..."

—'দেশ', ২৫/৭/৮৯

বিশেষ করে 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় মন্তব্য ও 'মাসিকী' ফীচারে সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ সংখ্যা 'প্রগতি'র 'মাসিকী'তে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন :

"... অধুনা বাংলা সাহিত্যে একটি পরম বিস্ময়কর ও অভিনব movement শুরু হয়েছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি, এবং সেই নব-রসের আস্বাদ বাংলার প্রত্যেক

শিক্ষিত সন্তানকে গ্রহণ করাবার ভার 'প্রগতি' নিয়েছে।..."

এত কষ্ট ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও 'প্রগতি' পত্রিকা চালিয়ে যাবার পিছনে এ-ই ছিল বুদ্ধদেবের দর্শন। এই কথা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন বলেই, যতদিনে অসম্ভব হয়ে না উঠল, তিনি যে-কোনো মূল্যে 'প্রগতি' প্রকাশের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

'কল্লোল' পত্রিকাও উঠে গেল

'প্রগতি' উঠে যাবার মাসতিনেক বাদে 'কল্লোল'ও বন্ধ হয়ে গেল। শেষ সংখ্যা বেরোয় পৌষ ১৩৩৬— সপ্তম বর্ষের নবম সংখ্যা এটি। আর্থিক দুরবস্থা, এবং 'কল্লোলে'র প্রাণপুরুষ, সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের চলচ্চিত্র ব্যাবসার দিকে ঝুঁকে পড়াই 'কল্লোলে'র বন্ধ হয়ে যাবার কারণ।

এর বারো বছর পর, 'কল্লোলে'র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন :

"... 'কল্লোলে'র স্রোত যে তার পূর্ণতার সময়েই সহসা থেমে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি।... সেদিন মনে-মনে বলেছিলাম দীনেশ-দা মস্ত ভুল কবলেন, আজও সেকথা অভিমানে আর্দ্র হ'য়ে মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। যদি 'কল্লোল' আজ পর্যন্ত চ'লে আসতো এবং এ-ক'বছরে সমাগত নবীন লেখকদেরও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতো তাহ'লে সেটি হ'তো বাংলাদেশের একটি প্রধান— এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রধানতম— মাসিকপত্র... একথা মনে না ক'রে পারিনে যে এ গৌরব দীনেশরঞ্জন ইচ্ছে ক'রেই হারালেন, বাংলা সিনেমা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ক্ষতি করলো 'কল্লোলে'র অপমৃত্যুর জন্য অন্তত আংশিকরূপে দায়ী হ'য়ে। সত্যি বলতে আজ পর্যন্তও আমি 'কল্লোলে'র অভাব অনুভব করি, কারণ ঠিক ঐ ধরনের আরেকটি সাহিত্যিক মাসিকপত্র এখনও আমাদের দেশে হ'লো না।... আমাদের মতো লেখকরা, যারা দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখে না, যারা নেহাৎই গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখে, অথচ যথেষ্ট রকম গতানুগতিক ভাবে লেখে না, আমরা আমাদের আপন মনে করতে পারি এমন একটি পত্রিকাও আজ বাংলাদেশে নেই।"

—'কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ' : 'কবিতা', কার্তিক ১৩৪৮

'কল্লোলে' বুদ্ধদেব বসুর রচনার তালিকা

কল্লোলে চার বছরে বুদ্ধদেবের চব্বিশটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল :

১. অগ্রহায়ণ ১৩৩২ : **কবিতা, 'ঝরবে না আঁখিজল'**
(গোকুল নাগ স্মরণে)

২.	ফাল্গুন	১৩৩২	: অনুবাদ কবিতা, 'অন্ধ কবি' (খলিল জিব্রান থেকে)
৩.	চৈত্র	১৩৩২	: প্রবন্ধ, 'কবি সুকুমার রায়'
৪.	জ্যৈষ্ঠ	১৩৩৩	: গল্প, 'রজনী হ'লো উতলা'
৫.	কার্তিক	১৩৩৩	: কবিতা, 'শাপভ্রষ্ট'
৬.	ফাল্গুন	১৩৩৩	: কবিতা, 'বন্দীর বন্দনা'
৭.	জ্যৈষ্ঠ	১৩৩৪	: অনুবাদ কবিতা, 'বৃদ্ধ পরীক্ষক' (জাপানি কবি আজুমি রিয়োসাই)
৮.	আষাঢ়	১৩৩৪	: কবিতা, 'ওগো বিদ্যুল্লতা'
৯.	ভাদ্র	১৩৩৪	: প্রবন্ধ, 'ছোটোগল্পের কথা'
১০.	আশ্বিন	১৩৩৪	: কবিতা, 'ব্যথিত'
১১.	পৌষ	১৩৩৪	: কবিতা, 'আর কিছু নাহি সাধ'
১২.	চৈত্র	১৩৩৪	: প্রবন্ধ, 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' ('প্রগতি' থেকে পুনর্মুদ্রিত)
১৩.	বৈশাখ	১৩৩৫	: কবিতা, 'ছায়া'
১৪.	জ্যৈষ্ঠ	১৩৩৫	: কবিতা, 'তোমারে বেসেছি ভালো'
১৫.	আষাঢ়	১৩৩৫	: কবিতা, 'বৈশাখী পূর্ণিমা'
১৬.	শ্রাবণ	১৩৩৫	: কবিতা, 'উৎসর্গ'
১৭.	আশ্বিন	১৩৩৫	: প্রবন্ধ, 'জেরোম কে জেরোম ও তাঁহার সাহিত্য'
১৮.	পৌষ	১৩৩৫	: গল্প, 'ছেলেমানুষি'
১৯.	মাঘ	১৩৩৫	: প্রবন্ধ, 'চতুর্দশপদী কবিতা'
২০.	ঐ		: সমালোচনা, 'দীপান্বিতা'
২১.	ফাল্গুন	১৩৩৫	: প্রবন্ধ, 'চতুর্দশপদী কবিতা'
২২.	বৈশাখ	১৩৩৬	: গল্প, 'অভিনয়'
২৩.	আষাঢ়	১৩৩৬	: কবিতা, 'কাল'
২৪.	কার্তিক	১৩৩৬	: গল্প, 'অভিনয় নয়'

উৎস : *কল্লোলের কাল*, জীবেন্দ্র সিংহরায়

ছোটোদের জন্য লেখার আরম্ভ

প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই (১৯২০) 'মৌচাক' পত্রিকার মুগ্ধ গ্রাহক ছিলেন বুদ্ধদেব— নানা স্থানে সেকথা তিনি লিখেছেন। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখবার বাসনা এত প্রবল ছিল যে মৌচাকের ধাঁধার উত্তরদাতাদের তালিকায় নিজের নাম দেখতে পেলেও ভালো লাগত তাও লিখেছেন, একবার লেখাও পাঠিয়েছিলেন। সম্পাদক সেটি ফেরৎ পাঠানোয় মর্মাহত হয়ে একটি অনুচিত কর্ম করেছিলেন, তার উল্লেখ নিজেই করেছেন জয়ন্তী সংখ্যা মৌচাকে।

সুধীরচন্দ্র সরকারও তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার কাল আমার দেশ'-এ ঘটনাটির সকৌতুক উল্লেখ করেছেন। এই সুধীরচন্দ্রের নির্বন্ধেই তিনি ছোটোদের জন্য লিখতে আরম্ভ করেন :

"একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। বন্ধু অচিন্ত্যকুমার বললেন, 'সুধীরবাবু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, চলো তোমাকে নিয়ে যাই।' একদিন দুপুরবেলা ১৫নং কলেজ স্কোয়ারের খশখশ-এর পর্দাঢাকা ঘরে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে প্রবেশ করলুম। সুধীরবাবু আমার কাছে মৌচাকের জন্য লেখা চাইলেন। আমি বললুম, 'ছোটোদেব জন্য তো কখনো লিখিনি।' সুধীরবাবু বললেন, 'লিখুন না।' মনে-মনে ভাবলুম, দেখি-না চেষ্টা ক'রে, হয়তো পারবো। ঢাকা ফিরে গিয়েই একটি কবিতা লিখে পাঠালুম, পরের সংখ্যায় প্রথমেই সেটি ছাপা হ'লো।[১] মৌচাকে সেই আমার প্রথম লেখা, তারপর গদ্য-পদ্য অজস্র লেখা মৌচাকে লিখেছি তা সকলেই জানেন।

মৌচাক-সম্পাদক উশকিয়ে না-দিলে ছোটোদের লেখায় আমি কখনোই হয়তো হাত দিতুম না। আমার সমসাময়িক অনেক লেখকের সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায়। সন্দেশ ছিলো একটি প্রতিভাবান পরিবারের মুখপত্র, আর 'মৌচাকে' বাংলাব সমগ্র সাহিত্যজগৎ প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যিনিই কিছু-না-কিছু কৃতী হয়েছেন, তাঁকেই, সুধীরবাবু মৌচাকের লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিযেছেন— এটি তাঁর সম্পাদনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যিনিই বড়োদের জন্য ভালো লিখেছেন, তাঁকে দিয়েই তিনি ছোটোদের জন্য লিখিয়ে নিয়েছেন— ফল প্রতি ক্ষেত্রেই ভালো হয়েছে। মৌচাকের লেখক-তালিকার মধ্যে ভারতী-যুগ থেকে কল্লোল-যুগ পর্যন্ত সকল নামজাদাকে পাওয়া যাবে।

এক সময়ে আমাকে ছোটোদের লেখার একটা নেশায় পেয়েছিলো, বললেই লিখতে পারতুম। তার পিছনে ছিলো মৌচাক সম্পাদকেরই দরাজ দাক্ষিণ্য। মনে আছে একবার বাত জেগে মৌচাকের জন্য লিখছিলুম, একটি গল্প শেষ ক'রে মনে হ'লো আরেকটি লিখি, তক্ষুনি আরম্ভ করলুম এবং শেষ ক'রে শুতে গেলুম। আজ আর ছোটোদের জন্য লিখতে মনের মধ্যে সেরকম উৎসাহ পাই না।"

—জয়ন্তী-সংখ্যা 'মৌচাক', বৈশাখ ১৩৫১

"মনে করা যাক কোনো গ্রীষ্মের দিনে বেলা তিনটে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বাস থেকে নামলাম। রাস্তা পেরিয়ে প্রথম দোকান এম. সি. সরকার[২]— খশখশের পর্দায় ঢাকা দরজা, একটি লোক ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লম্বা নলে জল ছিটোচ্ছে। ভিতরে খশখশ-নিঃসৃত চন্দন আর পুঞ্জ পুঞ্জ বইয়ের একটা মিশোল গন্ধ, আধো-অন্ধকার। আমি কাউন্টারের দরজা ঠেলে এগিয়ে যাই; দেখি

১. কবিতাটির নাম ছিল 'নদীস্বপ্ন', বেরিয়েছিল ভাদ্র ১৩৩৬ এর 'মৌচাকে'। ছোটোদের জন্য তাঁর প্রথম গল্প 'প্রাইজ' প্রকাশিত হয় 'মৌচাকে'র পৌষ ১৩৩৬ সংখ্যায়।

২. সেই সময় দোকানটি তার বর্তমান ঠিকানায় ছিল না— ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনাসামনি, অ্যালবার্ট হল-এর একতলায়। দ্র. *'আমার কাল আমার দেশ'*, সুধীরচন্দ্র সরকার। ১ম সং, পৃ. ২৮

দু-চারজন সাহিত্যিক ব'সে আছেন— কোঁকড়া চুলে সিঁথি-করা ছিপছিপে হেমেন রায় হয়তো, বা মাথা-ভর্তি-টাক স্থূলকায় গিরিজাকুমার বসু, এক কোণে গম্ভীরদর্শন কেদার চাটুজ্যে হয়তো— আর দেখি, ঈষৎ অস্পষ্টভাবে, অধিকর্তা সুধীর সরকারকে। অস্পষ্ট, কেননা তাঁর মুখে কথা খুব কম, ভাবরেখাও বিরল, যখন তিনি মাথা নিচু করে প্রুফ দেখছেন না, বা চিঠি লিখছেন না, তখন— তাঁর কানের কাছে অভ্যাগতের কথাবার্তা চললেও— নিঃশব্দে ব'সে থাকার আশ্চর্য একটি ক্ষমতা আছে তাঁর। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে নিচুগলায় সেই কথাটা বলি যা আগেও অনেকবার বলেছি, আর ব'লে কখনো ব্যর্থ হইনি : 'সুধীরবাবু, দশটা টাকা দেবেন— 'মৌচাকে' গল্প দিয়ে শোধ করবো?' তিনি তক্ষুনি টান দেন তাঁর দেরাজে। এমনি আরো অনেকের জন্য, বারবার। সুধীর সরকার শুধু প্রকাশক নন, সাহিত্যের পাঠক ও গুণগ্রাহী, এবং তাঁর স্বল্পভাষিত নম্র ধরনে সাহিত্যিকদের প্রতি সস্নেহ।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৬১

'কঙ্কাবতী'র কবিতা রচনা করছেন। আর একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন— 'অকর্মণ্য'।

১৯৩০ ।। বয়স বাইশ

'একটি মেয়ের জন্য'

এই নামে এ সময় একটি নাটক লেখেন বুদ্ধদেব; জগন্নাথ হল-এ সেটি মঞ্চস্থ হয়, প্রকাশিত হয় 'নবশক্তি' পত্রিকায় (বর্ষ ১ সংখ্যা ৪১, ২ ফাল্গুন ১৩৩৬)।

"পুরানা পল্টনে আমার একটি সদ্যযৌবনা প্রতিবেশিনীকে আমি মনে-মনে ভালোবেসেছিলাম— বিনা বাক্যালাপে, শুধু রাস্তার এপারে-ওপারে চোখের দেখা দেখে। সেই মাত্রাস্পর্শহীন প্রণয়ের বেদনা প্রকাশ করেছিলাম 'কঙ্কাবতী'র দু-একটি কবিতায়— এবং একটি ইচ্ছাপূরণকারী একাঙ্ক নাটকে, যার শিরোনাম ছিলো 'একটি মেয়ের জন্য', আর বিষয় সেই 'একটি মেয়ে'র সপ্রেমিক গৃহত্যাগ— ঠিক সেই দিনেই, যেদিন তাকে মামুলি প্রথায় 'কনে দেখাবার' আয়োজন চলছে বাড়িতে। কন্যাবক্ষক পিতাটির উদ্দেশ্যে স্বভাবতই কিছু বিদ্রূপ ছিলো, নায়ক-নায়িকার নিভৃত সাক্ষাতে চুম্বনযোগও ঘটিয়েছিলাম— গুরুজনবর্গের পক্ষে ঠিক মনোরঞ্জনী ঘটনা বলা যায় না; কিন্তু তবু— আমাকে বিস্মিত ও পুলকিত ক'রে —অধ্যাপক রমেশ মজুমদার আমার লেখাটাকে অনুমোদন করলেন জগন্নাথ হল-এ অভিনয়ের জন্য, শুধুমাত্র চুম্বনের দৃশ্য বর্জন ক'রে।... উপস্থাপনা বোধহয় ভালোই হয়েছিলো, লোকেরা নিন্দে করেনি, মাঝে-মাঝে প্রেক্ষাগৃহ থেকে হাসির শব্দও শোনা গিয়েছিলো।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৭৯

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সেসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন এবং জগন্নাথ হল-এর প্রভোস্ট ছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"জগন্নাথ হল-এর সাহিত্য বিভাগের খুব নাম ছিল। জগন্নাথ হল থেকে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তার নাম ছিল 'বাসন্তিকা'। হলের ছাত্র এবং সংযুক্ত শিক্ষকেরা এই পত্রিকায় লিখতেন। সে সময়ে কয়েকজন ছাত্রের রচনা পড়ে আমি খুব মুগ্ধ হই। আমার এই বিচারশক্তি যে খুব ভ্রান্ত ছিল না, তার প্রমাণ এদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।... আর একজন বুদ্ধদেব বসু— সাহিত্যজগতে আজ বিশেষভাবে পরিচিত। বুদ্ধদেবের কয়েকখানি ছোট নাটক হলে অভিনীত হয়েছে।"

—*জীবনের স্মৃতিদীপে*, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১ম সং, পৃ. ৫৮

বি. এ. পরীক্ষা এসে পড়েছে— কিন্তু বুদ্ধদেব লেখাপড়ার চেয়ে নিজের

লেখা নিয়েই ব্যস্ত বেশি। বিষ্ণু দে-কে চিঠিতে লিখছেন (২৯/২/১৯৩০) :

"পরীক্ষা এসে পড়েছে; আমার দিবারাত্র Grimm's Law, Beowulf আর তিরিশ প্রকার ism সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত, কিন্তু there are six hundred thousand characters in search of an author, who am I...."

—'ভাষানগর' পত্রিকা। সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

বি. এ পাশ করলেন

"এপ্রিল মাস, আমার অনার্স পবীক্ষা চলছে। আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত পরীক্ষার সময়; বাড়ি থেকে বেরোই অতপ্ত রোদে, প্রান্তর-পেবোনো ঝিরিঝিরি হাওয়ায়। কার্জন হল-এর সবুজ লন-এ আমি পাইচারি করি খানিকক্ষণ : মনে-মনে আওড়াই 'বেওউল্‌ফ'-এর লাইন, বা আলেকজান্ডার পোপের ব্যঙ্গকবিতা, বা সুইনবার্নের কোনো অশ্বখুবতাল স্তবক— অথবা ভাবি ফলস্টাফকে কাপুরুষ বলার সার্থকতা কী। পরীক্ষা-দেয়া ব্যাপারটা আমার বরাবরই বেশ ভালো লেগেছে; সে-যাত্রায় বিশেষ সুখদায়ক ব'লে মনে হয়েছিলো। আমার অনুরোধে মাষ্টারমশাইরা আমাকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেন রোজ বেলা দশটা নাগাদ; আমি বাড়ির অভ্যেসমতো চুমুক দিতে-দিতে লিখে চলি, কিন্তু পরবর্তী সিগারেটটির জন্য বারান্দায় বেরিয়ে আসতে হয়। আমার কলম প্রায় সারাক্ষণ চলে, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি মনে পড়ে যায় : পরীক্ষামণ্ডপের স্তব্ধ গম্ভীর আবহাওয়ায় আমি যেন এক ধরনের উদ্দীপনা অনুভব কবি। শেষ দিনে এলো প্রবন্ধ-পত্র : আমি বিষয়নির্বাচনে ইতস্তত করছিলাম, পাশ দিযে যেতে-যেতে সংস্কৃতের এক অধ্যাপক অস্ফুটে বললেন, 'চার্লস ল্যামটাই লেখো—' আমি তক্ষুনি শুরু ক'রে দিলাম।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৪৬

জীবনানন্দ দাশের বিবাহ

জীবনানন্দের সঙ্গে লাবণ্য দেবীর বিবাহ হল ৯ মে। ঢাকার রামমোহন লাইব্রেরিতে বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত প্রভৃতি কবিবন্ধুবা (দ্র. 'জীবনানন্দ দাশ : জীবনীপঞ্জি', প্রভাতকুমাব দাস। 'অনুষ্টুপ' জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৮)। বিষ্ণু দে-কে একটি চিঠিতে লিখছেন ("ঢাকা : ৫ই মে রাত্রি")

"... আমরা ইতিমধ্যে কলকাতা গিয়ে উপস্থিত হতাম, যদি না সামনের শুক্রবার জীবনানন্দর বিয়ে হত। ওর বিয়েতে উপস্থিত না থাকা অসম্ভব; এবং কেবলমাত্র সেইজন্য আমরা এ-week-টা detained হলাম। সামনের সপ্তাহে ঠিক গিয়ে পৌছাবো।... শ্রীবুদ্ধদেব বসু"

—'ভাষানগর পত্রিকা', সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

সে আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম ছিল, বি. এ. পাস্ শিক্ষাক্রম দু-

বছরের, অনার্স শিক্ষাক্রম তিন বছরের; এম. এ. শিক্ষাক্রম এক বছরের। আধুনিক আটটির পরিবর্তে এম. এ.-তে পত্রের সংখ্যা পাঁচ।

বুদ্ধদেব বসুর বি. এ. পরীক্ষার মার্কশিট

Buddhadeb Basu
Hons in English 1930
[Roll No.] 247 Jagannath Hall
Subsidiary— History, Sanskrit

Year of admission in the Faculty of Arts 1927
Month and year of passing the English Test April 1928
Marks in Hons

1st	2nd	3nd	4th	5th	6th	7th	8th	Total
55	56	68	54	73	73	72	73	524

Subsidiary
Sanskrit— 136 History—99

Result— First Class

লক্ষণীয়, তাঁর নিজের ইংরেজি রচনায় তাঁর নামের যে-বানানটির সঙ্গে আমরা পরিচিত (Buddhadeva Bose) এখানে সে বানান নেই।

বুদ্ধদেব বসুর এম. এ. পরীক্ষার মার্কশিট

M. A. Final in English July 1931
Roll-3 Jagannath Hall
Marks

Paper I	Paper II	Paper III	Paper IV	Paper V	Total
55	55	65	63	66	304

Result : First Class

ইকবালের 'বুদ্ধদেব বসু' গ্রন্থ থেকে (১ম সং, পৃ. ১১)। পাদটীকায় ভুঁইয়া ইকবাল জানিয়েছেন :

"ডক্টর সাঈদ-উর রহমান নথিপত্র দেখে জানিয়েছেন, উভয় পরীক্ষায় বু. ব. একাই প্রথম শ্রেণী অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার সৌজন্যে নম্বরপত্রী সংগৃহীত।"

এখনকার দিনে এই মার্কশিট দেখে একটু অবাক লাগবে আমাদের— কারণ বুদ্ধদেব বসুর প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে বহু গল্প চলিত আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে

হবে যে সেকালে, বিশেষত সাহিত্যে, নম্বর বেশি দেয়ার প্রথা ছিল না— ৬০ দেয়া মানেই প্রায় যেন ১০০ দেয়া, পরীক্ষকদের মনোভঙ্গি ছিল এরকমই। শোনা যায়, বহুকাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মার্কশিট দুটি রেকর্ড নম্বর হিশেবে পরিচিত ছিল।

গ্রন্থপ্রকাশ

এ বছর পরপর তিনটি বই বেরোল তাঁর : প্রথম উপন্যাস, 'সাড়া'; প্রথম গল্পসংগ্রহ, 'অভিনয়, অভিনয় নয়'; এবং কাব্যগ্রন্থ, 'বন্দীর বন্দনা'।

'সাড়া উপন্যাসের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় (ডিসেম্বর ১৯৫৯) বুদ্ধদেব লিখেছিলেন :

"কাহিনী-রচনায় আমার এই প্রথম প্রচেষ্টাকে সেকালের পাঠক ও সমালোচকবর্গ উপেক্ষা করেননি; প্রভূত ও সুতীব্র নিন্দার দ্বারা তাঁরা একে সম্মানিত করেছিলেন। ... প্রথম প্রকাশকালে 'সাড়া' চিহ্নিত হয়েছিলো অশ্লীলতার দুঃসহ নিদর্শনরূপে। কেউ এতে ঈডিপাস-এষণা আবিষ্কার করেছিলেন, কেউ বা অজাচার।

... সাগরেব ভাবুকস্বভাব আমার উপন্যাসের নায়কদের কুললক্ষণ; তার শৈশবজীবন ও নগরপ্রীতি আমার পরবর্তী রচনায় বারবার হানা দিয়েছে; প্রেমের চরম সার্থকতা যে দুঃখেই এই ধারণা আমি এখনো কাটাতে পারিনি।... 'সাড়া' ভরপুর হয়ে আছে সেই কালের স্বাদে ও গন্ধে, যাকে সম্প্রতি 'কল্লোল-যুগ' বলা হচ্ছে—... যেমন অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসে তেমনি এই পুস্তকে কল্লোলযুগের চরিত্রলক্ষণ আমি দেখতে পাই।...

'সাড়া' এবং একই সময় রচিত 'রেখাচিত্রে'র গল্পগুলি [রচনাকাল : ১৯২৮-২৯] কেন 'সাধু'ভাষায় লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম বলতে পারি না। তখন হয়তো মনে হয়েছিলো যে উভয় ভঙ্গিতেই রচনা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই যে আমার মতের বদল হ'লো তা কোনো-কোনো পাঠকের অজানা নাও থাকতে পারে।"

বাস্তবিক, এই দুটি গ্রন্থের পর বুদ্ধদেব 'সাধু' ভাষাকে চিরকালের মতো ত্যাগ করেছিলেন।

ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে দুজন তরুণ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থ একই সঙ্গে প্রকাশিত হল : অজিত দত্তর 'কুসুমের মাস', এবং বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'। বুদ্ধদেবের বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে অজিত দত্তকে। এই বইদুটির প্রকাশ সম্পর্কে অজিত দত্ত লিখেছেন :

"১৯৩০ সালে আমার প্রথম কবিতার বই 'কুসুমের মাস' আর বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা' একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিল ডি. এম. লাইব্রেরি। আমাদের মতো তরুণ কবির প্রথম কবিতার বই গোপালবাবু ছাপতে রাজি হয়েছিলেন, যতদূর

মনে পড়ে, কাজি নজরুলের অনুরোধে। তখন নতুন প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি কাজি নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' প্রভৃতি ছেপে কম লাভবান হচ্ছিল না। তা ছাড়া নজরুল ইসলাম ও গোপালবাবুর মধ্যে বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিল। মানিকতলার মোড়ে ডি. এম.-এর ছোট্ট ঘরটিতে কাউন্টারের পিছনে মাদুর বিছিয়ে ওঁরা দুজনে দাবা খেলতেন। গোপালবাবুব একটি গড়গড়াও থাকত। আমি সুযোগ পেলে কখনো দর্শকরূপে সে খেলায় যোগ দিযেছি।

আমাদের কবিতার বই দুখানি যখন ছাপা হয়, তখন আমি ঢাকাতে। সেটা আমার এম. এ.-র বছর। বুদ্ধদেবই কলকাতা এসে ছাপার সব ব্যবস্থা কবেছিল এবং দুটি বইয়েরই প্রুফ দেখে দিয়েছিল।"

—'কবিতা লেখার কথা', অজিত দত্ত। 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯

১৯৩১ ।। বয়স তেইশ

অক্‌সফর্ডে যাবার সম্ভাবনা হয়েছিল

এই সময় কোনো-না-কোনো সূত্রে একবার তাঁর বিলেত যাবার কথা হয়েছিল। বিষ্ণু দে-কে লেখা একটি পত্রাংশ (২৮।২।৩১ তারিখে) :

"আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। আমার অক্‌সফর্ড-যাত্রা সম্বন্ধে দয়া ক'রে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না; এ প্রসঙ্গ আমার পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে উঠছে; কারণ তার একেবারেই কিছু ঠিক নেই; tantalizing দুরাশা আছে মাত্র।..."

—'ভাষানগর' পত্রিকা। সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

ঢাকা ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায়

"ঢাকায় আমার শেষ বছরটা ভালো কাটেনি। 'প্রগতি' উঠে গেছে, কলকাতায় 'কল্লোল' ও ম্রিয়মাণ— দীনেশরঞ্জন সাহিত্য ছেড়ে সিনেমা রচনায় লিপ্ত হয়েছেন, অচিন্ত্য 'ল'য়ের সঙ্গে লভ করছে'— তার নিজেরই ভাষা উদ্ধৃত করছি— যার 'অর্থ হ'লো সে আইন-অধ্যয়নে রত। স্থানীয় বন্ধুরাও বিচ্ছিন্ন— অনেকেই ঢাকায় নেই, কেউ-কেউ কলেজ থেকে বেরিয়ে অর্থার্জনে সচেষ্ট, আমার নিজেরও সম্বল ফুরিয়ে এলো।...

এদিকে তখন বহির্জগৎও অশান্ত। পশ্চিম উপকূলে গান্ধীজীর দণ্ডী-যাত্রা, ঘরের কাছে গুমরোনো চাপা সন্ত্রাসবাদের প্রচণ্ড আগ্নেয় বিস্ফোরণ— যুগপৎ এই দুই ঘটনায় সারা দেশ উন্মথিত। ঢাকায় ঘটছে পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অথবা সেগুলিকে ঘটিয়ে তোলা হচ্ছে 'বিভক্তিশাসন নীতি' অনুসারে। অনেক চাঞ্চল্যকর বার্তা, আরো বেশি লোমহর্ষক সব জনরব— সর্বজনের সমস্যা ও বিক্ষোভ ও উত্তেজনা : এ-সবের পাশে ম্লান হ'য়ে যায় আমার সাহিত্যচর্চা, আমার ব্যক্তিগত সংকল্প ও প্রয়াস। বন্ধুরা তর্ক চালায় রাজনীতি নিয়ে, আমি নিঃশব্দে শুনি অথবা শুনি না; অবন্ধু কেউ গায়ে প'ড়ে মন্তব্য করে 'কবিতা লেখার চেয়ে লণ্ঠন বানানো ভালো'— যে-কথার সত্যি কোনো উত্তর নেই— মাঝে-মাঝে রাস্তায় কোনো সাইকেল-আরোহী বালক আমাকে 'কবি! কবি!' ব'লে টিটকিরি ছুঁড়ে চ'লে যায়। যেমন দশ বছর আগে নোয়াখালিতে, তেমনি এখন ঢাকা শহরটাকেও আমার মনে হচ্ছে বড়ো সংকীর্ণ— যেন পুরানা পল্টনের উন্মুক্ত মাঠেও যথেষ্ট আলো-হাওয়া আর খেলছে না। ততদিনে আমার 'সাড়া', 'বন্দীর বন্দনা' বেরিয়ে গেছে, 'অভিনয়, অভিনয় নয়' যন্ত্রস্থ, প্রবোধ সান্যাল-সম্পাদিত 'স্বদেশে' বেরোচ্ছে 'এরা

আর ওরা'র গল্পগুলো, 'মৌচাকে' নিয়মিত লিখছি। আমি দিন গুণি কবে আমার এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরোবে, কবে চ'লে যেতে পারবো আমার স্বাদিত ও কাঙ্ক্ষিত মহানগরে,[১] 'কল্লোলে'র তিরোধান ও দীনেশরঞ্জনের অন্তর্ধান সত্ত্বেও আমার পক্ষে যা সর্বতোভাবে অনুকূল— যেখানে বহু ভিন্ন-ভিন্ন স্রোতে বিকীর্ণ হচ্ছে মানুষের উদ্যম, রাস্তার ভিড়ে অনামীভাবে মিশে যাওয়া যায়, জীবনের স্রোত প্রখর, এবং যেখানে সাহিত্যিকও তার মনোমতো সংস্রব বেছে নিতে পারে। ১৯৩১ সালের এক ভাদ্রের দিনে আমি শেষবারের মতো ঢাকা ছাড়লাম।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৫১

'বন্দীর বন্দনা'র অভ্যর্থনা

"দিলীপকুমার পণ্ডিচেরিবাসী সন্ন্যাসী, কিন্তু পত্রযোগে বিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত; তাঁর গুণগ্রাহিতার ব্যাপ্তি অতি বিশাল। বাংলার ও সর্বভারতের গুণীজ্ঞানী মনীষীর মধ্যে প্রায় কেউ নেই তাঁর অচেনা— সকলেই তাঁর প্রিয় এবং তিনিও সকলের। তাঁর উদারচরিতের আব একটি লক্ষণ এই যে একের সঙ্গে অন্যের যোগসাধনে তিনি তৎপর;... 'বন্দীর বন্দনা' বইটাকে তিনি যে-ভাবে অভ্যর্থনা জানালেন তা ছিলো আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আশাতীত; তিনি পড়ালেন সেটা শ্রীঅরবিন্দকে,[২] একটি কাঁচি-ছাঁটা কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিলেন, অনুমোদন করলেন বন্ধুদের কাছে জনে-জনে।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৮৬

রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাগুলির আলোচনা করলেন 'বিচিত্রা'য় (কার্তিক ১৩৩৮), 'নবীন কবি' নাম দিয়ে।

"কিছুকাল পূর্বে একবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়েছিলুম তখন বুদ্ধদেব বসুর একখানি কবিতা আমার হাতে পড়ে। সেই সময়ে তাঁর কিশোর বয়স। মনে আছে লেখাটি প'ড়ে আমার কোনো-একজন সঙ্গীকে বলেছিলুম, এই কবিতায় ছন্দ ভাষা এবং ভাব গ্রন্থনের যে-পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আমার

---

১. বিষ্ণু দে-কে চিঠিতে লিখছেন (৩১।৫।৩১)

"... এম. এ. পরীক্ষার পর কলকাতায় বসবাস স্থির করেছি— অন্য কোথাও থেকে সাহিত্যের ব্যাবসা চলে না। আশা করি তখন আপনার সঙ্গে more than usual দেখাশোনা হবে।..."

'ভাষানগর' পত্রিকা। সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

২. অরবিন্দ ঘোষের এই মন্তব্য বুদ্ধদেবের 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থের ফ্ল্যাপে ছাপা হয়েছিল (১৯৩৩):

"বন্দীর বন্দনা is certainly remarkable for so young a poet. There is an extraordinary power of language and a great force in the writing and a strong flow in the verse... the gifts he begins with are considerable, and if he develops and achieves depth and subtlety as well as power— for power is not enough— may lead to something very great."

নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে কেবল কবিত্বশক্তিমাত্র নয় এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েচে, একদিন প্রকাশ পাবে।

...বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলবার অধিকার আমার নেই।... দৈবক্রমে বুদ্ধদেব বসুর লেখার প্রথম যে-পরিচয় পেয়েছিলুম তার থেকে আমার মনের মধ্যে এ-বিশ্বাস ছিল যে, বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহ তিনি সম্মান লাভ করবেন। আগামীকালের সাহিত্যদৌবারিক যাঁরা, যথাযোগ্য আসনে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার তাঁদেরই পরে। টিকিট তাঁরাই দেখে নেবেন, আমরা বাইরে থেকে নমস্কার করে বিদায় নেব।

সম্প্রতি দিলীপকুমার কাঁচি-ছাঁটা পাতায় তাঁর আপন মন্তব্যের দ্বারা পরিকীর্ণ করে বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা আমাকে পড়তে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সবটা দেননি। যে-কয়টি ও যতটুকু কবিতা পাওয়া গেল পড়ে খুসি হলুম। খুসি হলুম বললে মনে হবে মুরুব্বিয়ানা করছি। কেননা যখন-তখন ব্যবহারের ঘর্ষণে ঐ কথাটার ধার ক্ষয়ে গেছে। তবু বলতে হবে খুশি হওয়ার চেয়ে বড়ো দাম কবিতার পক্ষে আর কিছু নেই। এই রচনাগুলি জলভরা ঘন মেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের গলদঘর্ম প্রয়াস দেখা যায়। সে দুর্লক্ষণ না দেখে আরাম পেয়েচি। কবিতাগুলিতে সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্যশালী।

যে কয়টি কবিতা আমার সামনে এসে পড়েচে তার বাইরে নিশ্চয় আরো অনেক লেখা আছে। হয়তো কেবলমাত্র এই লেখাগুলি নিয়ে সমগ্রভাবে কবির বিচার করা সংগত হবে না। তাঁর হাতে যে যন্ত্রটি আছে তার কতকগুলি তন্তু, তার কোন কোন পর্দায় কত রকমেব সুরেব মীড় লেগেছে, তা বলতে পারলুম না। যে লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হোলো এ যেন একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া, ফল ফুল, ধ্বনি ও বর্ণ। এর সরস উর্বরতার বিশেষ একটি সীমার মধ্যে এক জাতীয় বেদনার উপনিবেশ। দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু নিভৃত। হয়তো ক্রমে দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ, হয়তো প্রকাশ পাবে উদার বিচিত্র মহাদ্বীপে 'তমালতালীবনরাজিনীলা' তটরেখা। কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে ফরমাস চলে না। যা পাওয়া গেল সে যদি গজমুক্তার কৌটো হয় তবে আবদার করলে চলবে না কণ্ঠী কোথায়।"

কলকাতায় আসার পর

বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ থেকে :

"কলকাতায় আমার জন্য দুটি ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো— এক হ'লো আলাদা বাসস্থান, আর একটি ট্যুশনি।

ট্যুশনিটা অচিন্ত্যর উপহার। সে চ'লে যাচ্ছে মুন্সেফি নিয়ে মফস্বলে, তার

পরিত্যক্ত কর্মে বহাল ক'রে গেছে আমাকে। আর আমার এক চিত্রকর বন্ধু— 'প্রগতি' ও প্রথম পর্যায়ের 'কবিতা'র এবং 'সাড়া' থেকে 'কালো হাওয়া' পর্যন্ত আমার অনেকগুলো বইয়ের প্রচ্ছদশিল্পী অনিল ভট্টাচার্য[১]— সে তখন আর্ট স্কুল সাঙ্গ ক'রে ঢাকায় তার পিতৃগৃহে আছে : তার চক্রবেড়ে রোডের ঘরটিতে আমি প্রথম তাঁবু ফেললাম।... আমি খুশি। চিরকাল দিদিমার যত্নে লালিত আমি, নিজের হাতে বিছানাটাও পাতিনি কখনো— তবু আমার খারাপ লাগছে না আমার পরিচর্যাহীন নতুন জীবন, বরং তাতে স্বাবলম্বিতার সুখজনক একটি স্বাদ পাচ্ছি। সকালে চায়ের জন্য যাই পদ্মপুকুর ওয়াই. এম. সি. এ.'র রেস্তোরাঁয়— জায়গাটা খুব নিরিবিলি থাকে তখন— এক পট চা, দু-টুকরো মাখন-ছোঁওয়ানো টোস্ট, আস্তে পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে কোনো বইয়ের পাতা ওলটাই, বাড়ি ফিরি ট্যুশনি সেরে ঘণ্টা দুই পরে।... কাছেই থাকেন আমার সেই আত্মীয়া যাঁর বাড়িতে আগে এসে আশ্রয় নিয়েছি মাঝে-মাঝে— আমার দিদিমার দেবর-কন্যা, আমার ছেলেবেলাব প্রিয় ছোটো-মাসিমা— তাঁব কাছে দুপুরে রাত্রে আমার আহার বরাদ্দ। আমার অপরাহ্ন কাটে বইয়ের পাড়ায় ঘুরে-ঘুরে— কোথাও প্রুফ দেখা, কোথাও টাকা জোগাড়, কোথাও কোনো নতুন বই প্রকাশের প্রস্তাব : লুপ্ত 'কল্লোলে'র কোনো স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে দেখা হ'যে যায় কখনো, সুধীর সরকারের দোকানে নতুন চেনা হয় 'ভারতী' গোষ্ঠীব কোনো লেখকের সঙ্গে।..."

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৫৪

বেশিদিন এ বাড়িতে ছিলেন না। ঢাকার সুধীশ ঘটক থাকতে এলেন তাঁর সঙ্গে; কিন্তু "একটি প্রিমাস স্টোভ আর ন্যূনতম বাসনপত্র সম্বল ক'রে", একটি অলস ও নির্বোধ পরিচারক সমভিব্যাহারে দুই অনভ্যস্ত যুবকের সংসারযাত্রা প্রায় অচল হয়ে পড়ল।

"এভাবে অবশ্য বেশিদিন চলতে পারে না, দিদিমাও চ'লে আসার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন; আমি ফ্ল্যাটের খোঁজে বেরোলাম।

... আমার ট্যুশনি-বাড়ির সুপারিশে একটি ফ্ল্যাট জোটানো গেলো— শীতের শুরুতে দিদিমা এসে পৌছলেন...। বকুলবাগান-রমেশ মিত্র রোডের চৌবাস্তায় আড়াই কামরার একতলা [ঠিকানা ছিল ৪৬/১ রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর], আলাদা রান্নাঘর নেই, বাথরুমটা দম-আটকানো।... কৃষ্ণবর্ণ অদ্ভুতভাষী ফেরিওলা ডোমেদের কাছে কেনা হ'লো শস্তায় কিছু বেতের আশবাব, আমার মাসিমা দিলেন এক-দেরাজওলা ক্ষুদ্র একটি টাইপিস্ট টেবিল আমার লেখাপড়ার জন্য— সেটি এখনো আছে আমার। বেতের নড়বড়ে শেলফে আমি সাজিয়ে নিলাম আমার ছাত্রজীবনের রবীন্দ্রনাথ ও ইংরেজ কবিদের, আর এম. এ. পরীক্ষার প্রাইজের টাকায় সদ্য-কেনা ডি. এইচ. লরেন্স আর অলডাস হাক্সলির পুরো সেট— জানলায় পর্দা খাটিয়ে দিলেন দিদিমা।... গভীর রাত্রে লিখতে-লিখতে আমি চোখ তুলে দেখি

১. 'আলফা বিটা' এই ছদ্মনামে প্রচ্ছদ আভরণচিত্র ইত্যাদি আঁকতেন।

পুরানা পল্টনের রাঙাভাঙা চাঁদ উঠে এলো, ল্যান্সডাউন-বাজারের করোগেট-ছাদের উপর দিয়ে, ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ, সুন্দর।”

—তদেব, পৃ. ৫৭

পেশাদার লেখকজীবন আরম্ভ হল

“... আমি লিখছি শুধু নগদ মূল্যে উপন্যাস আর ছোটোগল্প আর ছোটোদের গল্প —আর ফাঁকে-ফাঁকে, বিনোদ-হিশেবে, খেয়ালি চালে মজুরিহীন প্রবন্ধ দু-একটা। মনে পড়ে প্রথমে আমি অবাক হয়েছিলাম যে আমার দৈনিক খাদ্য আপ্‌সে চ'লে আসবে না, আমাকেই চেষ্টা ক'রে তা জোটাতে হবে; তারপর মনে হ'লো এই অন্ন একটু অধিক স্বাদু, কেননা আমি নিজে তা অর্জন করেছি— দু-বেলা খেতে ব'সে প্রায় অভিনন্দন জানাই নিজেকে। কিন্তু, এই নূতন ব্যবস্থা অভ্যেস হ'য়ে যাবাব পর যা বাকি রইলো তা নিছক খাটুনি— শুধু লেখার নয় (তাতে আমি সর্বদাই রাজি।), উপরন্তু আবার নতুন এবং নতুনতর প্রকাশক-সন্ধান, আর কখনো বা পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ধন্না, এক-এক দফায় পাঁচ টাকা বা দু-টাকা পর্যন্ত হাত পেতে নেয়া— সবচেয়ে তেতো অংশ সেটাই।”

—তদেব, পৃ. ৮২

পাঁচ টাকা দুটাকার ব্যাপারটা গল্পকথা নয়, আক্ষরিক অর্থেই পাঁচ টাকা বা দুটাকা। আজকের দিনে অবিশ্বাস্য শোনায়, কিন্তু এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় অচিন্ত্যকুমারের ‘কল্লোলযুগ’ গ্রন্থে। সেখানে বর্ণিত ঘটনাটি হয়তো এর পাঁচ-ছ বছর আগেকার—

“এই সময় আমি এক টেক্‌স্ট-বুক প্রকাশকের নেকনজরে পড়ি। সেই আমার পুস্তক প্রকাশকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার। অনুরোধ হল, নিচু ক্লাশের স্কুলের ছাত্রদের জন্যে বাঙলায় একখানা রচনা-পুস্তক লিখে দিতে হবে— হাতি-ঘোড়া-উষ্ট্র-ব্যাঘ্র নিয়ে রচনা। তনখা পঞ্চাশ টাকা। সানন্দচিত্তে রাজি হয়ে গেলাম, প্রায় একটা দাঁও পাওয়ার মতো মনে হলো। লেখা শেষ করে দিলাম অল্প কয়েক দিনের মধ্যে— লেখার চেয়েও লেখা শেষ করতে পারাটাই বেশি পছন্দ হল প্রকাশকের। টাকার জন্য হাত বাড়ালে প্রকাশক মাত্র একটি টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন। বললাম— বাকিটা? আস্তে-আস্তে দেব, বললেন প্রকাশক, একসঙ্গে একমুস্তে সমস্ত টাকা দিয়ে দিতে হবে পষ্টাপষ্টি এমন কথা হয়নি। ভালোই তো, অনেকদিন ধরে পাবেন। কিন্তু একদিন এই অনেকদিনের সান্ত্বনাটা মন মেনে নিতে চাইল না। হন্তদন্ত হয়ে দোকানে ঢুকে বললাম, টাকা দিন। প্রকাশক মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, এত হন্তদন্ত হয়ে চলেছেন কোথায়? বললাম, খেলা দেখতে। খেলা দেখতে? যেন আশ্বস্ত হলেন প্রকাশক। সরবে হিসেব কয়লেন শুনিয়ে-শুনিয়ে: গ্যালারি চার আনা, আর ট্রাম ভাড়া দশ পয়সা। সাড়ে ছ'আনাতেই হবে, সাড়ে ছ'আনাই নিয়ে যান। বলে সত্যি-সত্যি সাড়ে ছ'আনা পয়সাই গুণে দিলেন।

বাংলাদেশের প্রকাশকের পক্ষে তখন এও সম্ভব ছিল!”

—*কল্লোলযুগ*, অধ্যায় আট

দিলীপকুমার গুপ্ত

“অচিন্ত্যর দেয়া ট্যুশনিটি বিষয়ে এখানে কিছু বলা দরকার।

কলকাতায় পৌঁছবার পরের দিন সকালেই আমি রামময় রোডে ট্যুশনি-বাড়ির খোঁজে বেরিয়েছিলাম— বেশি ঘুরতে হয়নি, চক্রবেড়ে থেকে পাঁচ মিনিট মাত্র পথ। আমাকে দরজা খুলে দিলো বলিষ্ঠ চেহারার লম্বা একটি যুবক— অন্তত আমার তাকে পুরোদস্তুর যুবক ব'লেই মনে হ'লো— কিন্তু পরে শুনলাম সে-ই আমার ছাত্র, সামনের বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। বাড়ির লোকেরা তাকে খোকন অথবা খোকা ব'লে ডাকে, তার পোশাকি নাম দিলীপকুমার গুপ্ত [ডি. কে. গুপ্ত —পরবর্তীকালের বিখ্যাত প্রচারবিদ; সিগনেট প্রেস স্থাপন ক'রে বাংলা প্রকাশনাব জগতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন]।

... খোকনকে আমি পড়িয়েছিলাম বোধহয় ছ'মাস; শেষেব দিকে, আমি যখন একটি ভাঙা হাত নিয়ে কষ্ট পাচ্ছি, সে রোজ আমার রমেশ মিত্র রোডের বাড়িতে এসে প'ড়ে যেতো। তখন ঘন শীত, খোকন আসে বেলা দেড়টা-দুটো নাগাদ, যখন যায় আমার একতলায় দিনের আলো মলিন। পড়ানো হ'য়ে গেলে সে আমার সঙ্গে গল্প করে কিছুক্ষণ— তার মুখে খইয়ের মতো কথা ফোটে, মাথার মধ্যে বুড়বুড়ি তোলে এন্তার প্ল্যান;— ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে আমার ঝিমুনি আসে মাঝে-মাঝে, আমার তন্দ্রার উপর ঝ'রে পড়ে তার কৈশোরকথন; তার সরলতা আমার দৈহিক বেদনাকে প্রশমিত করে। তার পরীক্ষা চুকে যাবাব পর আমি কিছুদিন তাকে দেখতে পাইনি; কিন্তু কয়েকটা বছরের ব্যবধানে তার পথ আবাব মিলে গিয়েছিলো আমার সঙ্গে— যখন সে এক বিজ্ঞাপন-আপিশের অধিকর্তা, আর যখন সিগনেট প্রেস স্থাপিত হ'লো।”

—তদেব, পৃ. ৬৫

‘পরিচয়’ পত্রিকা

“১৯৩১ সালের শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যের একটি আনকোরা ঘটনা ছিলো ‘পরিচয়’ পত্রিকা,[১] কলকাতায় অনেকেই কথা বলছে তা নিয়ে। প্রথম সংখ্যাটি আমি ঢাকায় থাকতেই দেখেছিলাম— প্রথম দেখেছিলাম সুশোভন সরকারের হাতে— যখন আমার এম. এ. পরীক্ষার কোনো-এক দিনে, তিনি প্রহরীরূপে পাইচারি করছিলেন চোখের সামনে ‘পরিচয়’ খুলে, আর আমি খাতা লিখতে-

১. ‘পরিচয়’ পত্রিকা প্রথম বেরোয় শ্রাবণ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট ১৯৩১ খৃ.)। ১৯৪৪ খৃ. সুধীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার স্বত্ব দান করে দেন ‘ফাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'কে। তখন সম্পাদক হন গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল।

লিখতে ঈর্ষুক চোখে তাকাচ্ছিলাম। সেদিনই বিকেলের ডাকে আমার হাতে পৌঁছলো সেটি— দেখে মনে হ'লো নতুন ধরনে নতুন, আমার পূর্বপরিচিত অন্য কোনো বাংলা পত্রিকার সবর্ণ নয়। আরো একটু চমক লাগলো এই কারণে যে লেখকদের মধ্যে অনেকেরই নাম আমি এই প্রথম দেখলাম ছাপার অক্ষরে; সম্পাদক-মণ্ডলীর মধ্যে, ধূর্জটিপ্রসাদ ছাড়া, অন্যদের নামগুলো সুদ্ধ আমাব অচেনা। কলকাতায় এসে এই প্রথম-শ্রুত লেখকদের সঙ্গে দেখা হ'লো।

'পরিচয়ে'র শুক্রবাসরীয় সন্ধ্যায় আমি উপস্থিত ছিলাম কয়েকবার— বিভিন্ন গৃহে, কিন্তু কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে সুধীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবনেই প্রধানত। যা ছিলো শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির এবং তখনই একটি চলচ্চিত্র-গৃহে রূপান্তরিত হয়েছিলো [আজকের 'বাধা' সিনেমা]— প্রহরীপ্রতিম পুত্তলশোভিত ১৩৯ নম্বরটি তারই সংলগ্ন। বৈঠকখানাটি আয়তনে বড়ো নয়, কিন্তু দেখে মনে হয় সরস্বতী ও লক্ষ্মীঠাকরুনের ঝগড়া সেখানে মিটে গেছে। হলুদ অথবা সবুজ বঙের নির্মল মেঝে, গভীর গদির অতি নমনীয় আসন, চায়ের বাসন আলো-ঠিকরোনো, ভোজ্য তালিকা উচ্চাঙ্গের। কোনোদিন থাকে উত্তর কলকাতার গৌরববাহী বৃহদাকার শিঙাড়া সন্দেশ ইত্যাদি, কোনোদিন বা ফার্পো রেস্তোরাঁর অবদান— সবই সুপ্রচুর। আসেন একে-একে বিদগ্ধ জনেরা— জ্ঞানের বহু বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ, আধুনিকতম দর্শনে বিজ্ঞানে পবিব্রাজক— সব মিলিয়ে উজ্জ্বল এক অঁসব্‌ল, যার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হন— তাঁর কান্তি নিয়ে, চোখে-পড়ার-মতো সাজসজ্জা নিয়ে— কোনোদিন আধ-হাত-পরিমাণ ধাক্কা-বসানো সূক্ষ্মকুঞ্চিত তাঁতেব ধুতি আর কোনোদিন বা কালোর উপরে সোনালি-কাজ-করা জাপানি কিমোনোর বিলাস নিয়ে— তাঁর সুস্বন কণ্ঠ ও সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি নিয়ে, তাঁর আলাপদক্ষতা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে— গোষ্ঠীপতি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

'পরিচয়ে'র প্রথম সংখ্যায় আমার কবিতা ছিলো, দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিলো 'বন্দীর বন্দনা' ও 'অভিনয়, অভিনয় নয়' বইদুটোর সহৃদয় ও সাধু সমালোচনা,[১] আমি জেনেছি এঁরা আমার প্রতি অনুকূল; তবু এঁদের মজলিশে ঠিক মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য পাইনি সেকথা আমাকে মানতেই হবে। যেন একটু অধিকমাত্রায় সুচারু ও সমৃদ্ধ ও শোভমান, যেন আড্ডা নয়, আয়োজিত একটি অধিবেশন— এমনি মনে হয়েছিলো আমার। আরো অস্বস্তি এইজন্য যে সকলেই যেন বড়ো বেশি বিদ্বান ও পরিপক্ব, তত্ত্বালোচনায় এঁদের যতটা দক্ষতা সাহিত্যরচনায় ততটা নয়— এঁদের

১. দ্বিতীয় সংখ্যা নয়, প্রথম সংখ্যাতেই এ-দুটি গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, "... গিরিজাবাবু বুদ্ধদেব বসুর রিয়ালিজ্‌ম-এর দাবি অস্বীকার করলেও তাঁর উক্ত গল্পটিকে 'সর্বাঙ্গসুন্দর' বলতে দ্বিধা করেননি; 'বন্দীর বন্দনা'র কবি যে একদিন কবিমণ্ডলীর মধ্যে 'অতি সম্মানের আসন' পাবেন এই ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করেছিলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ গিরিজাবাবুকে বলেছিলেন বৌদ্ধ।"

—*পরিচয়ের কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র*, পৃ. ২৮

মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখক আছেন দুজন মাত্র : সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে। তখনও 'কল্লোল'-'প্রগতি' আমার মনে সন্নিকট; তাই সেই প্রথম ধাক্কায় আমি বুঝিনি যে তরুণ কণ্ঠের কলরোলমুখর উচ্ছ্বাসের পরে প্রয়োজন ছিলো আত্মপরীক্ষার ও নবমূল্যায়নের, আর সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর সমালোচনাপ্রধান বুদ্ধিজীবীনির্ভর 'পরিচয়' পত্রিকায় তা-ই সাধন করছিলেন। আমার স্বভাব এবং সেই মুহূর্তের প্রয়োজন আমাকে 'পরিচয়' থেকে দূরে সরিয়ে নিলো— সুধীন্দ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলাম শুধু সাহিত্যের সূত্রে, ব্যক্তিগতভাবে নয়। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মে অনেক পরে, প্রৌঢ় বয়সে, আর তা যখন ফুলে-ফলে পূর্ণবিকশিত, ঠিক তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটলো।"

—তদেব, পৃ. ৭০

'পরিচয়ে'র সঙ্গে বিচ্ছেদ

'পরিচয়' থেকে বুদ্ধদেব বসুর দূরে স'রে যাবার কারণ সম্পর্কে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন :

"বুদ্ধদেববাবু সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এই 'প্রথমা' [প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতার বই] কিংবা তাঁদের গোষ্ঠীর কোন লেখকের লেখা অপর কোনো একটি বইয়ের সমালোচনার ভার তাঁদেরই একজনের ওপর দিতে।... সম্পাদক স্বভাবতই তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, অন্য যোগ্য সমালোচক না থাকলে হয়তো এ-অনুরোধ তিনি রাখতে পারতেন, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে লোকাভাব ঘটেনি সে-ক্ষেত্রে দলের লোকের হাতে লেখা নিজেদের বইয়ের সমালোচনা নিরপেক্ষ হলেও সুশোভন হবে না। এ নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি। এর পর পরিচয়ের আড্ডা ও লেখকগোষ্ঠী এই উভয় আসর থেকে বুদ্ধদেববাবু সবান্ধবে প্রস্থান করলেন।"

—*পরিচয়ের কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র*, পৃ. ৪৭

এরপর 'প্রথমা'র সমালোচনা করেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, 'পরিচয়' শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যায়। সুতরাং এ-ঘটনা ঘটেছিল, মনে হয়, ১৯৩২-এর জুন-জুলাই নাগাদ।

তবে, 'পরিচয়ে'র সংস্রব ত্যাগ করলেও 'পরিচয়' তাঁর সাহিত্যরুচির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল— তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক বন্ধুরা সেকথা জানতেনও। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর ডায়েরিতে (যার কিছু অংশ পরে 'পরিচয়ের আড্ডা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়) এর কয়েক বছর পরেকার এক তারিখে লিখেছিলেন :

"... বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখ করে বিষ্ণু দে বললেন যে, পরিচয়ের বুর্জোয়া পিউরিটানিজ্‌মের প্রভাবে তিনি নাকি এতদূর আচ্ছন্ন হয়েছেন যে সমর সেনের একটি কবিতায় নারীদেহের বর্ণনা তাঁর কাছে অশ্লীল বলে মনে হওয়ায় তিনি সেটা

'কবিতা' কাগজে ছাপতে চাননি। বেচারি সমর সেন তাতে এমনি মুষড়ে পড়েছিল যে সটান সে বিষ্ণুবাবুর কাছে আসে সান্ত্বনার জন্য।"

'কবিতা' পত্রিকার স্বপ্ন

কিন্তু 'পরিচয়ে'র আড্ডা থেকে সবচেয়ে বড়ো যে-সম্পদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, যা পরবর্তী যুগের বাংলা কবিতাভাবনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে— তা হল, 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'পরিচয়ে'র কোনো বৈঠকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে ইংরেজি 'পোয়েট্রি' পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখে 'কবিতা' পত্রিকার কল্পনা তাঁর মনে আসে। এ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণার জন্য ১৯৩৫ সালে 'কবিতা' পত্রিকার জন্মের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

'রাবণ' নাটক

গত বছর খেলাচ্ছলে রচিত তাঁর দুটি নাটক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হওয়ায় নাটক মাধ্যমটির প্রতি কৌতূহল জাগ্রত হল বুদ্ধদেবের। স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"... কলকাতা-বাসের আরম্ভকালে নিজেকে আমি নাট্যকাররূপেও কল্পনা করেছিলাম। সেই কৌতুকজনক কাহিনী এখানে বিবৃত করি।...

... প্রভুচরণ [গুহঠাকুরতা] নানা দেশের নাটক দেখেছেন, গবেষণা করেছেন বাংলা নাটকের বিবর্তন নিয়ে— কলকাতার নাট্যজগতে তিনি সম্মানিত। তাঁর সাহায্যে থিয়েটারের অন্দরমহলে আমার প্রবেশ ঘটলো, পরিচয় হ'লো বিখ্যাত মঞ্চাধিকারী হারান ঠাকুরতা বা প্রবোধচন্দ্র গুহমহাশয়ের সঙ্গে... তিনি আমাকে তাঁর জন্য কিছু লিখতে বললেন।... তারই ধাক্কায় রচিত হ'লো আমার 'রাবণ' নাটক, আমার ঢাকা-জীবনের সর্বশেষ রচনা— যা নিয়ে ঢাকা ছেড়ে আসার সময়ে অনেক আশা ছিলো আমার, এমনও ভেবেছিলাম আমার কলকাতার জীবনে সেটাই আমার দারিদ্র্য ঘোচাবে।

আমি চেয়েছিলাম পুরোদস্তুর মঞ্চোপযোগী হ'তে, মেনে নিয়েছিলাম শ্যামবাজারিক সব বিধি-বিধান। পাঁচ অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, সখীবৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত নৃত্যগীত— কিছুই আমি উপেক্ষা করিনি। সরমা আছেন সীতা দেবীর সান্ত্বনাদাত্রী, রাবণের সমালোচক আছেন বিভীষণ, অশোকবনে ও রাবণের সভায় মঞ্চসজ্জার অবকাশ আছে। সবই বলা যায় গতানুগতিক— আমার নতুনত্ব শুধু এটুকুতে যে আমার রাবণ পুরোপুরি একটি দুরাত্মা নন, সীতাকে হরণ ক'রে এনে এখন চান হৃদয় দিয়ে তাঁকে জয় করতে— তাঁর মনের একটি অংশে তিনি ভাবপ্রবণ। এই প্রথাচ্যুত রোমান্টিক রাবণকে গ্রহণ করলেন হারান ঠাকুরতা— তিনি তখন স্টার ছেড়ে দিয়ে নতুন খুলেছেন নাট্যনিকেতন— মহড়া থেকে পোস্টার পর্যন্ত এগিয়ে

গেলো আমার নাটক, আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম একটি টাকার থলি শূন্যে ঝুলছে আমার জন্য। আর তারপর— মাসের পর মাস যদিও কেটে যায়, অন্য নতুন নাটকের উপর পর্দা ওঠে আর পর্দা পড়ে— 'রাবণে'র উদ্বোধন-রজনী আর আসে না। ঠাকুরতা মহাশয়কে জিগেস করলে তিনি 'হবে-হচ্ছে' করেন, আর বলেন, 'বুঝলে হে, আমরা হলাম জ্ঞানপাপী'— আমার নাটকের প্রসঙ্গে যার অর্থ আমি ভেবে পাই না। গুজব শুনি, আমার সংলাপে আপত্তি করেছেন প্রধান অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা...। অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যিনি বিভীষণের ভূমিকা নেবেন কথা ছিলো, আর আমার প্রতি স্পষ্টত যিনি সহৃদয়, তিনিও একদিন বললেন, আমার ভাষা আর একটু 'রীমোট' হ'লে ভালো হ'তো— আমি বুঝে নিলাম রাবণ-সীতার মুখে সমকালীন চলতি ভাষা বসানো আমার ভুল হয়েছিলো। অগত্যা আমি পাণ্ডুলিপিটির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলাম— তাতেও ব্যর্থ হ'তে হ'লো। আর তবু, এতেও সম্পূর্ণ হার না মেনে, আমি শিশির ভাদুড়ীর বীডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা করলাম কিছুদিন; তিনি অনেক মনোহর কথা শোনালেন আমাকে, এবং অতি ভদ্রভাবে আমার আসল প্রস্তাবটি এড়িয়ে গেলেন।"

—*আমার যৌবন*, ১ম সং, পৃ. ৮০

এই নাটকের পাণ্ডুলিপিটি শেষ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের গহ্বর থেকে আর উদ্ধার করা হয়নি; নাটকটিও মঞ্চস্থ বা মুদ্রিত হয়নি কোনোদিন।

১৯৩২ ।। বয়স চব্বিশ

'পূর্বাশা' পত্রিকা

" 'পরিচয়ে'র সঙ্গে একই সময়ে, বোধহয় পরের বছরই কুমিল্লা থেকে নতুন পত্রিকা 'পূর্বাশা' বেরোলো,[১] আর তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন নতুন একজন কবি-প্রাবন্ধিক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পত্রিকার সম্পাদকও তিনি। আরম্ভকালে সঞ্জয় চেয়েছিলেন 'কল্লোলে'র শূন্যস্থান পূরণ করতে, তাঁব আতিথ্যে পুনর্মিলিত হয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য আমি আর প্রেমেন আর অচিন্ত্য— লোকেরা যাদের তখনও বলছে "কল্লোলে'র ট্রায়ো"— তখন-পর্যন্ত অনতিখ্যাত জীবনানন্দকেও তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। অচিন্ত্য আর আমি তাঁকে বারবার লিখছিলাম তাঁর পত্রিকা নিয়ে কলকাতায় চ'লে আসতে ; এবং সেই বদলটি ঘটবার পর কিছুদিনের মধ্যেই 'পূর্বাশার'র আসর জ'মে উঠলো, আধুনিক সাহিত্যের পরিমণ্ডলে সঞ্জয় একটি নিজস্ব স্থান ক'রে নিলেন।"

'পূর্বাশা'য় দুটি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের এক আশ্চর্য সংযোগ ঘটেছিলো : একজন কবি ও ভাবুক, অন্যজন কর্মী ও ব্যবস্থাপক। সঞ্জয়ের জীবন সাহিত্যে ও সত্যপ্রসন্নর জীবন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে উৎসর্গিত— সঞ্জযের মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সম্বন্ধে ছেদ পড়েনি। পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সব উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে নিত্যসঙ্গী— অথচ এঁরা 'আপনি' বলেন পরস্পরকে, অন্যের কাছে উল্লেখের সময় 'বাবু'-উপাধিটুকুও বাদ দেন না— সেটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়। জীবৎকালব্যাপী বন্ধুতার এ-রকম একটি উদাহরণ আমি চোখে না-দেখলে সম্ভব ব'লেও ভাবতে পারতাম না।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং. পৃ. ৭১

কলকাতাকে কেমন লাগছে

"এক অতি বৃহৎ ও যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়—এমনি ছিলো কলকাতা আমার পক্ষে, আমি এখানে আসার পর প্রথম দু-তিন বছর। ভাষা, এই বাংলা ভাষা, সেটিও একটি বিশেষ অর্থে আমাকে শিখতে হচ্ছে, কেননা আমার আদি মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভাষা এক নয়। অনেক জিনিশের নাম আলাদা, অনেক অনেক বাগ্‌ধারা ভিন্ন—উদাহরণের

১. 'পূর্বাশা' কুমিল্লা থেকে প্রথম বেরোয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। কয়েক মাস পরেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য পত্রিকার দপ্তর তুলে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন।

কথা না-তোলাই ভালো। এই প্রভেদে কবিতা-রচনায় কোনো ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু গদ্যে অনেক সমস্যা দেখা দেয়—আমার প্রথম পর্যায়ের গল্পে উপন্যাসে, বিশেষত সংলাপের অংশে, আমি মাঝে-মাঝেই ঈষৎ বিপন্ন বোধ করেছি, যেন ঠিক জীবন্ত স্বরটি শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু—আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম—তথাকথিত কলকাতার ভাষাতেও আছে ভিন্ন ধরনের বিকৃতি, আর আমার পরিত্যক্ত বাঙাল ভাষাতেও এমন কোনো-কোনো প্রকাশভঙ্গি, যা আমাদের গদ্য রান্নায় নতুন একটি 'তার' আনতে পারে। কলকাতায় এসে নানা জেলার বুলি শুনছি আমি, কুড়িয়ে পাচ্ছি অনেক নতুন মৌখিক শব্দ—আর এমনি ক'রে, কানে শুনে-শুনে, নানান জাতের বাংলা বই প'ড়ে প'ড়ে, অনেক বর্জন ও স্বীকবণের মধ্য দিয়ে, আমি গ'ড়ে তুলছি সেই ভাষা—অন্তত তার কাঠামো—আজ দীর্ঘকাল ধ'রে আমি যাতে কথা বলছি, বই লিখছি।"

—তদেব, পৃ. ৬৪

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

উপন্যাস লিখছেন 'সানন্দা', 'আমার বন্ধু'। ছোটোগল্প লিখলেন 'নতুন নেশা', বই হয়ে বেরোবে ১৯৩৬-এ। ছোটোদের জন্য গল্প লিখছেন 'মৌচাকে'। এক মাসে লিখে উঠলেন 'মন দেয়া নেয়া' উপন্যাস, সঙ্গে সঙ্গে ছেপে বেরিয়ে গেল। 'রডোডেনড্রনগুচ্ছ' উপন্যাসটিও তাই। কবিতা লেখা চলছে পাশাপাশি।

বই বেরোল : 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে', ছোটগল্পসংগ্রহ। 'মন দেয়া নেয়া' উপন্যাস, জুলাই। 'যবনিকাপতন' এবং 'রডোডেনড্রনগুচ্ছ', দুটি উপন্যাস নভেম্বরে। ডিসেম্বরে বেরোল 'একটি কথা' কাব্যগ্রন্থ।

১৯৩৩ ।। বয়স পঁচিশ

অশ্লীলতার অভিযোগে পুলিশে

লেখকজীবনের প্রায় শুরু থেকেই— যৌবনে পৌঁছবারও আগে থেকে, অশ্লীলতার অভিযোগ বুদ্ধদেবের পিছনে তাড়া করে ফিরেছে। আজকের দিনে তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল কারণ যৌনতার প্রকাশ নয়, অবিবাহিত নরনারীর প্রণয়ের অলজ্জ স্বীকৃতি।

অশ্লীলতার প্রথমতম অভিযোগ আসে সম্ভবত ১৯২৫ সালে— যখন ভারপ্রাপ্ত মাস্টারমশাই তাঁর ইংরেজি গল্প Joie de Vivre-এর দ্বিতীয় অংশ ইশকুল ম্যাগাজিনে ছাপাতে আপত্তি করেন (দ্র ১৯২২)। তারপর 'রজনী হলো উতলা' নিয়ে তোলপাড় করা অভিযোগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে মধ্যস্থতা করতে হয়। তারপর 'সাড়া' উপন্যাস— যার নতুন সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, "আজকের দিনের পাঠকরা শুনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন যে প্রথম প্রকাশকালে 'সাড়া' চিহ্নিত হয়েছিল অশ্লীলতা'র দুঃসহ নিদর্শনরূপে। কেউ এতে ঈডিপাস-এষণা আবিষ্কার করেছিলেন, কেউ বা অজাচার।" কিন্তু এই প্রথম (যদিও এই শেষ নয়) সেই অশ্লীলতার অভিযোগ গড়াল আদালত হয়ে পুলিশ পর্যন্ত। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ :

> "১৯৩২-৩৩-এর শীতঋতুতে কলকাতার সাহিত্যমঞ্চে একটি প্রহসন অনুষ্ঠিত হ'লো। প্রবোধ সান্যালের 'দুয়ে আর দুয়ে চার', অচিন্ত্যর 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', আর 'প্রাচীর ও প্রান্তর', আমার 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে'— এই চারখানা সদ্য বেরোনো উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনলেন প্রতাপশালী পাব্লিক-প্রসিকিউটার স্বয়ং। আমার তলব পড়লো লালবাজারে, বাড়িতে এলো 'এরা আর ওরা'র কপি কিনতে দুটি অচেনা লোক যারা স্পষ্টত পুলিশের স্পাই— আমার মনের উপর ছায়া ফেললো কাঠগড়া, পাহারাওলার গুঁতো আর শেষ পর্যন্ত জেলখানার ঠাণ্ডা মেঝেতে কম্বলশয্যা। কিন্তু আদালতে পৌঁছবার মতো সামর্থ্য আমাদের কারোরই নেই, প্রকাশকেরা ভীরু ও পলায়নপন্থী— অগত্যা পুলিশের সঙ্গে রফা করতে হ'লো।
>
> শুরুতে একটা যুদ্ধ ঘোষণার ভাব ছিলো আমার— সাহস পেয়েছিলাম দিলীপকুমার রায়ের কাছে ; তাঁর লেখা পরিচয়পত্র নিয়ে তাঁর একটি আত্মীয়ের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। দুর্জয় ব্যারিস্টার সেই ভদ্রলোক, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে

হর্ম্যনিবাসী— চেহারা শিলাখণ্ডের মতো সুদৃঢ় ও কণ্ঠস্বর ব্যাঘ্রগম্ভীর— তাঁকে দর্শন এবং শ্রবণ ক'রে আমার ধারণা হ'লো তাঁর একটি হুংকারে হাইকোর্ট সুদ্ধ কেঁপে উঠবে। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁর তর্জন পড়লো শেষ পর্যন্ত আমারই উপর।

স্থান, বটতলা কোর্ট— সময়, এক জানুয়ারির [১৯৩৩] অপরাহ্ন : ব্যারিস্টার-সাহেব বেরিয়ে এলেন বারান্দা কাঁপিয়ে, সঙ্গে একটি কনিষ্ঠ উকিল। আমাকে প্রথম কথা বললেন— 'আপনার কাছে গাড়িভাড়া-টাড়া কিছু আছে?' তাঁর নিজের গাড়ির কী হ'লো, সেই প্রশ্নটি চেপে গিয়ে আমি ট্যাক্সি ডাকলাম। আমরা চলেছি লালবাজারে... আব তারপব, ট্যাক্সি যখন মোড় নিচ্ছে লালবাজারে, যেন হঠাৎ কাজের কথাটি মনে প'ড়ে গেছে এমন সুরে তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কী লিখেছিলেন বলুন তো?' প্রশ্নটা অদ্ভুত শোনালো আমার কানে, কেননা আমি তাঁকে এক কপি বই দিয়ে এসেছিলাম, ধ'রে নিয়েছিলাম ইতিমধ্যে তিনি খুঁটে-খুঁটে পড়েছেন সেটা, আমার সমর্থনকল্পে অনেক যুক্তিও সাজিয়েছেন মনে-মনে। তাঁকে আশ্বাস দেবার ধরনে আমি বললাম, 'কিছু না —এই তরুণ-তরুণীর প্রেমের কথা আর কী।' 'অ্যাঁ?' শুন্যে হাত তুলে আঁৎকে উঠলেন ব্যারিস্টার সাহেব, 'Love between unmarried men and women? আপনি করেছেন কী? এসব কথা কি শেক্সপীয়র লিখেছেন, না মিল্টন লিখেছেন? আমবাও তো বিলেতে শ্টুডন্ট ছিলুম— কই, এ-রকম তো দেখিনি!' আমার মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম ক'রে উঠলো, এই অকল্পনীয় উক্তি শুনে হাসতে পর্যন্ত পাবলাম না।

পরবর্তী দৃশ্য লালবাজারে : মামলার নিষ্পত্তি হ'তে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগলো না। এক ইংরেজ নগরপাল যিনি একবর্ণ বাংলা জানেন না, এক বঙ্গদেশীয় আইনজীবী যিনি আমার বইয়ের একটি অক্ষরও পড়েননি— হয়তো আইনগ্রন্থ ছাড়া কিছুই পড়েননি সাবা জীবনে : এঁদের সমক্ষে একটি মুচলেকায় আমাকে সই দিতে হ'লো — তার মর্মার্থ এই যে আগামী পাঁচ অথবা দশ বছরের মধ্যে এ-বই আর প্রকাশ করবো না, আর তার পরেও প্রকাশ করতে পারবো শুধু পুলিশের অগ্রিম অনুমতি নিয়ে, অখণ্ড অথবা 'পরিষ্কৃত' অবস্থায়। বেরিয়ে এসে ব্যারিস্টার সাহেব আদেশ দিলেন— 'আমার জুনিয়রকে আট টাকা দিয়ে দিন।' আমি ভেবে পেলাম না কেন দেবো, কেননা সেই কনিষ্ঠ উকিলটি কিছুই করেননি আমার জন্য, কেন তাঁকে লাঙ্গুল রূপে আনা হয়েছিলো তাও আমার ধারণাতীত ; কিন্তু তবু— যেহেতু প্রধান পুরুষটি আমাকে দান করেছেন তাঁর ধন-মূল্যবান সময় থেকে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট—শুধুমাত্র তাঁর স্নেহভাজন মণ্টুর মুখ চেয়ে— তাই আমি নিঃশব্দে বের ক'রে দিলাম আমার শ্রমার্জিত আটটি রুপোর চাকতি : এ-রকম সুখহীনভাবে অপব্যয় আর কখনো করিনি।

কৌতুকনাট্যে যবনিকা পড়লো লালবাজারের সামনে ফুটপাতে। আমার সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন কনিষ্ঠ উকিল— একটি পরিচ্ছন্ন নীল স্যুট তাঁর পরনে, মাথার চুল তৈলচিক্কণ, জুতোর পালিশ অনিন্দ্য। পুলিশ-কর্তার কামরায়

তিনি নির্বাক ছিলেন, যেন আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন— কিন্তু এখন দিব্যি খোশমেজাজ দেখছি তাঁর, এক-আধটু সদালাপও করছেন। 'আপনি জানেন কি —they have made a bonfire of your book at Lalbazar— a *bonfire*,' বলতে-বলতে তাঁর গলায় উল্লাস ফুটলো। আমার চোখে পড়লো তাঁর হাতে সেই দহনযোগ্য বইখানা— আমার সর্বশেষ কপি— যেটি আমি ব্যারিস্টার-সাহেবকে পড়তে দিয়েছিলাম। 'আমার বইটা তাহ'লে—' আমি কথা শেষ করার আগে উত্তর এলো : 'এটা আমারই কাছে থাক।' বইখানা পকেটে পুরে হাতের ইঙ্গিতে ট্যাকসি থামালেন ভদ্রলোক, অমায়িক একটু হাসি টেনে বললেন, 'আচ্ছা, নমস্কার।' আমি দু-নম্বর বাসের দোতলায় উঠে বসলাম।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৯১

•

এই ঘটনার প্রতিবাদে আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৩ তারিখে তিনি লিখলেন :

"... উপন্যাসেব নর-নারীরা কিভাবে প্রেম নিবেদন বা হৃদয় বিনিময় করিবে, তাহার 'হুদ্দা' যদি পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে বাঙালা সাহিত্যের অতি শোচনীয় দুর্দিন সমাগত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীমান বুদ্ধদেব বসু উচ্চশিক্ষিত; বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান তিনি পাইয়াছেন এবং অল্প বয়সেই বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার রচনাগুলি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি দরিদ্র বলিয়াই যে এইভাবে নির্যাতিত হইলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা।...

... সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ব্যবসায়িগণের এই অভিনব উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে গ্রন্থকারও সুপরামর্শ দ্বারা চালিত হন নাই। তাঁহার কর্তব্য ছিল, প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার গ্রন্থখানিকে এই অন্যায় অপবাদ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা। তাঁহার বিবেচনার ভুল— পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের অনধিকার সুযোগ হইল। ইহাতে অন্যান্য সাহিত্যিকগণের ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে।...

সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা
১৪ জানুয়ারি ১৯৩৩

প্রথম প্রকাশনা : 'গ্রন্থকারমণ্ডলী'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধদেবের মাথায় এল নিজের বই নিজে ছাপার কথা; তার ফলে জন্ম হল 'গ্রন্থকার মণ্ডলী'র—প্রকাশক হিশেবে তাঁর প্রথম প্রয়াস।

"লালবাজারের উঠোনে যখন বই পুড়ছে তখন আমার 'যবনিকাপতন' উপন্যাসটা ছিলো যন্ত্রস্থ। প্রকাশক মহাশয় ভয় পাচ্ছিলেন পাছে আবার ফ্যাসাদ

ঘটে, তাঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য অগত্যা আমাকে ছদ্ম-প্রকাশক সাজতে হ'লো। ছাপার অক্ষরে লেখক-প্রকাশক উভয় ভূমিকায় রইলো আমার নাম— অর্থাৎ আইনের চোখে সব দায়িত্ব আমারই, যিনি আমার বই নিয়ে ব্যাবসাদারি করছেন তাঁকে কেউ ছুঁতে পারবে না।... শুনলাম এর পরে আমার প্রকাশক পাওয়া শক্ত হবে। আমার মাথায় খেললো দু-একটা বই নিজেরা ছেপে দেখলে মন্দ হয় না —তাতে পারমার্থিক এবং আর্থিক লাভও বেশি হ'তে পারে।

কয়েকদিন চললো বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা, হিশেব-নিকেশ, প্রেসের সন্ধান, আর সেই সব সুখদায়ক জল্পনা-কল্পনা যা এ-সব উদ্যমের আসল মুনাফা।... বই বেরোবে লেখকদের নিজ-নিজ ব্যয়ে, বিক্রির চেষ্টা চলবে যৌথভাবে। আমাদের এই লেখক-প্রকাশক-সংস্থার নামকরণ হ'লো 'গ্রন্থকার-মণ্ডলী', ঠিকানা আমার রমেশ মিত্র রোডের ফ্ল্যাট, আমি ঘোষিত ভাবে প্রকাশক।

প্রথমে বেরোল নিরাভরণ হলদে মলাটের দুটি ষোলো পৃষ্ঠার কবিতার বই —অচিন্ত্যর 'আমরা' ও আমার 'একটি কথা'— চার আনা মূল্যে পাঁচশো কপি কেটে গেলো কলকাতার স্টলে। তারপর, উজ্জ্বলতরভাবে, বিষ্ণু দে প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' : সেটাই গ্রন্থকার-মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ এবং শেষ অবদান।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৯৪

বুদ্ধদেবের এই স্মৃতিচারণের সঙ্গে তথ্যের সর্বাংশে মিল হচ্ছে না। 'একটি কথা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ডিসেম্বর ১৯৩২, এবং এ-বইয়ের প্রকাশকও 'গ্রন্থকার-মণ্ডলী' নয়, 'গ্রন্থকার'— অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং। পরন্তু, 'গ্রন্থকার-মণ্ডলী' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থ— এটি বেরিয়েছিল জুলাই ১৯৩৩— তিন ফর্মার বই, দাম ছিল এক টাকা।

সাহিত্যকে জীবিকা করবার সংগ্রাম

"অনুকূল ছিলো না সময়টা— কারো পক্ষেই নয়, সদ্য যারা উপার্জনে সচেষ্ট তাদের পক্ষে রীতিমতো বৈরী। জগৎ জুড়ে ব্যাবসা-মন্দা চলছে, ভারতবর্ষে গান্ধীজীর উপবাস, ঢাকা-চাটগাঁর সন্ত্রাসবাদ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো।... আমি তাক্ ক'রে আছি কলকাতার কোনো কলেজের দিকে, কিন্তু মনে হচ্ছে সব দরজা বন্ধ [১] ; আমার কোনো-কোনো হিতৈষী বন্ধু বলছেন ও-পথে আমার কোনো আশা নেই, কেননা আমার ডিগ্রি ঢাকার, এবং আমার লেখা অশ্লীল, অন্তত লোকেরা

১. দিলীপকুমার রায় সুপারিশ করেছিলেন রিপন কলেজে ইংরেজি অধ্যাপনার চাকরির জন্য : কলেজের অধিকর্তা তাঁর নিকট-কুটুম্ব। অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষও বুদ্ধদেবের লেখা অপছন্দ করতেন না—তবু দু-দুবার আবেদন করা সত্ত্বেও তাঁর চাকরি হল না। সম্ভবত 'অশ্লীল সাহিত্য' রচনা করে পুলিশের খাতায় নাম ওঠাই তার গোপন কারণ ছিল।

তাই ব'লে থাকে। এই অবস্থায়— বাড়ি-ভাড়া দিয়ে, একটি ভৃত্য রেখে, আমার উপর নির্ভরশীল আরো দু-জনকে নিয়ে, রোজ তিন প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক আর সবান্ধবে বারো-চোদ্দ পেয়ালা চা উড়িয়ে— চালচুলোহীন আমার পক্ষে সংসারযাত্রা যে সহজ হয়নি তা হয়তো না-বললেও চলে — আশ্চর্য এই যে আমি চালাতে পেরেছিলাম, শুধুমাত্র লেখনী থেকে অক্ষররাশি নিঃসৃত ক'রে। সে-সবের মধ্যে অনেক ছিলো যা আমি তখনই জেনেছি মূল্যহীন, অনেক ছিলো যা আমি লিখতাম না, বা লিখলেও প্রকাশ করতাম না, যদি আমার বিকল্প কোনো উপায় থাকতো — কিন্তু স্থূল প্রয়োজন আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা লেখা শেষ হওয়ামাত্র অন্য একটায়, আর মাঝে-মাঝে সেই স্থূল প্রয়োজনই আমাকে দিয়ে এমন কিছুও লিখিয়ে নিচ্ছে, যা তখনকার আমার পক্ষে সম্ভবপর মতো ভালো। কখনো আশা, কখনো অবসাদ, কখনো এক দম-আটকানো অনুভূতি, কখনো আবার ক্ষণিকের জন্য স্বস্তিবোধ— এই সব নিয়ে আসে যায় আমার দিনগুলি সংগ্রামে ভরা, আমার সাহিত্যিক বৃত্তি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে অনিশ্চয়তায় ভরা— যে-সংগ্রাম ও অনিশ্চয়তা আমি সারা জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।"

—তদেব, পৃ. ৮২

"আমি চালাতে পেরেছিলাম শুধুমাত্র লেখনী থেকে অক্ষররাশি নিঃসৃত ক'রে"— বাক্যটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব যদি ভেবে দেখি যে, ১৯৩১ সালে, ঢাকা থেকে কলকাতায় চ'লে আমার সময় পর্যন্ত, বুদ্ধদেবের মোট গ্রন্থের সংখ্যা ছিল পাঁচ— কৈশোরক কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী'কে ধরে; তাঁর বিয়ের সময়, তিন বছরে, এই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পঁয়তিরিশে।

বুদ্ধদেব বসুর লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

কেমন লিখতেন এই সময়ে বুদ্ধদেব? রসজ্ঞ সমালোচকরা কেমনভাবে গ্রহণ করতেন তাঁকে?

অগস্টে বেরোল 'যেদিন ফুটলো কমল' উপন্যাস। পড়ে, রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন বুদ্ধদেবকে। তাঁর ঠিকানা জানতেন না, চিঠিটি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে উপরে লিখে দিলেন, "ধূর্জটি, বুদ্ধদেবের ঠিকানা জানিনে তাকে পাঠিয়ে দিয়ো— রবীন্দ্রনাথ।" দীর্ঘ চিঠি, তার প্রথমাংশে আছে সাহিত্যের মূল্য নিয়ে আলোচনা, আধুনিক সাহিত্য আলোচনা করবার তিনি অধিকারী কিনা সে সম্বন্ধে সংশয়। শেষ দিকে লিখছেন :

"... তোমার নতুন বই 'যেদিন ফুটলো কমল' সম্বন্ধে ধূর্জটি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। ঐ বইটি আমি পড়ি এবং আমার মত প্রকাশ করি, সেদিনকার কথায় এই তাঁর ইচ্ছাটি অব্যক্ত ছিল। সেই তাঁর অকথিত অনুরোধটি রক্ষা করতেম না

যদি তোমার এই বই আমার ভালো না লাগত।

পড়তে পড়তে খটকা লেগেচে পদে পদে তোমার ভাষায়। অনেক স্থানেই বাক্যের প্রণালী অত্যন্ত ইংরেজি। মনে মনে ভাবছিলেম, এখনকার যুবকযুবতীরা সত্যিই কি এমনতরো তর্জমা করা ভাষাতেই কথাবার্তা কয়ে থাকে? অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় তো আমি এতটা লক্ষ্য করিনি। কথাবার্তার এরকম কৃত্রিম ঢংটাতে রসভঙ্গ হয় কেননা তাতে সমস্ত জিনিষটার সত্যতাকে দাগী করে দেয়। এই ত্রুটি সত্ত্বেও তোমার সমস্ত বইটার গৌরব আমি স্বীকার করতে পেরেচি। এতে তোমার প্রতিভার একটি স্বকীয় বিশেষত্ব পাওয়া যায়। তোমার এই গল্পটি বাইরে থেকে নানা উপকরণে সাজানো জিনিষ নয়, এ ভিতর থেকে আপন ভাবপ্রাচুর্যে আপনি জেগে ওঠা। আয়োজনের বহুলতায় এর সম্পূর্ণতা বাধাগ্রস্ত হয়নি। এর মধ্যে অনেক মতামত আলাপ আলোচনা আছে কিন্তু চরিত্র পরিচয়ের সীমাকে অতিক্রম করে যায়নি। তত্ত্ববিশ্লেষণ করে দেখাবার সুযোগ সমালোচককে দাওনি, ভালো লেগেছে এই সহজ কথাটি ছাড়া আর কিছু বলবার নেই।

ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠি পেয়ে বুদ্ধদেব জবাব দিলেন ·

৩০/৯/৩৩

শ্রীচরণেষু

ধূর্জটিবাবুর কাছে আপনি যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা আমি পেয়েছি। আপনার চিঠি পেয়ে ও প'ড়ে, আমি খুশি হয়েছি, খুব বেশিরকম খুশি হয়েছি, এ ছাড়া আর কী বলবার আছে? আপনার শরীর ক্লান্ত, আপনার অবসর কম— তবু যে আপনি আমার বইখানা পড়েছেন ও তা উপলক্ষ ক'রে এত বড়ো চিঠি লিখেছেন, এতে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি।

আমার কাছে— প্রত্যেক আধুনিক বাঙালি লেখকের কাছে— কিন্তু বিশেষ ক'রে আমার কাছে আপনি দেবতার মতো। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি। সে-ভাষা আপনার পছন্দ হয় না। আমারই দুর্বলতা, অক্ষমতা। উৎস-স্রোত স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ — আমি কি তাকে ঘোলাটে ক'রে তুলি আমার বেসামাল ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে? কিন্তু তর্ক করবো না , শুধু এই সুযোগ গ্রহণ করছি আপনাকে আমার অন্তরের গভীরতম ধন্যবাদ জানাবার— আপনি আমাকে ভাষা দিয়েছেন ব'লে।

আপনি আমার শারদীয় অভিনন্দন ও প্রণাম জানবেন।

ইতি

বুদ্ধদেব

[দুটি চিঠিরই উৎস : চিঠিপত্র/১৬, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

‘যেদিন ফুটলো কমল’ নাট্যাভিনয

এই ‘যেদিন ফুটলো কমল’ উপন্যাসকে, প্রকাশিত হবাব প্রায সঙ্গে সঙ্গেই, নাট্যৰূপ দিযে পাবলিক স্টেজে অভিনয কবিযেছিলেন তখনকাব বিখ্যাত গাযিকা বানু সোম, পববর্তী কালেব প্রতিভা বসু। তাঁব বযস তখন ১৭ বছব। ঢাকা শহবে স্ত্রীপুরুষেব প্রথম মিলিত অভিনয এটি। প্রতিভা বসু বুদ্ধদেবেব লেখাব ভক্ত পাঠিকা ছিলেন, ছোটো মফস্বল শহবে যেমন সবাই সবাইকে চেনে তেমনি চিনতেনও— তবে ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

প্রতিভা বসু লিখেছেন :

“কৌতূহলে ফেটে পডল শহবেব লোক, আশাতিবিক্তভাবে সমস্ত টিকিট বিক্রি হ'যে গেল। তাবপব দুরু দুরু বক্ষে স্ত্রীপুরুষে মিলে নাটক কবাব প্রথম সোপানটি অতিক্রম কবলাম আমবা। নিন্দাব বান ডাকল বাণু সোমেব নামে। কলকাতায যেমন একটা কেচ্ছাব কাগজ বেরুত ‘শনিবাবেব চিঠি’, ঢাকাযও একটা কাগজ বেরুত যাব নাম ‘ববিবাবেব লাঠি’। সেই ‘ববিবাবেব লাঠি’ব পাতায পাতায বানু সোম কত দুশ্চবিত্র তাব বিববণ বেবিযে বাতাবাতি কাগজেব কাটতি বেডে গেল তিনগুণ।”

—*জীবনেব জলছবি*, ৩য মু। পৃ ৮৫

প্রতিভা বসুব সঙ্গে সাক্ষাৎ : পূর্বরাগ

“সে-বছব আমি লিখেছিলাম বিস্তব · এক দমকে তিনটে উপন্যাস, এক বাত জেগে ‘মৌচাকে’ব জন্য তিনটে গল্প—এমনি বেগে দৌড কবিযেছিলাম আমাব কলমটাকে। বিরুদ্ধতাব উপবে এই আমাব প্রতিশোধ, দুর্ভাগ্যেব উদ্দেশে এই আমাব উত্তব। পব-পব বেবোচ্ছে আমাব নতুন বই, অনববত আবো নতুন ভাবতে হচ্ছে—এদিকে ঋতু গডিযে গেলো গ্রীষ্ম থেকে শীত পর্যন্ত, আমি পঁচিশ পেবোলাম। আব তাবপব শীতেব শেষে, আমি যখন লিখে-লিখে ক্লান্ত হ'যে পডেছি, নিজেব মধ্যে যেন আব-কোনো স্বাদ পাচ্ছি না, তখন আমাব জীবনে একটি অন্য ধবনেব ঘটনা ঘটলো— সাহিত্যিক নয, জীবিকাসম্পৃক্ত নয, ব্যক্তিগত। আমাব দেখা হ'লো সেই মেযেব সঙ্গে, যাকে পুবোনো ভাষায বলা যায আমাব নির্বন্ধ।

ঢাকাব মেযে সে, সেখানকাব দুই বিখ্যাত গাযিকাব অন্যতবা, পোশাকি নাম প্রতিভা, লোকেবা বলে বানু সোম। আমি ঢাকায থাকতে অনেক শুনেছি তাব কথা, কিঞ্চিৎ দেখাশুনাও হযেছিলো। আমাব ওয়াড়িবাসী গীতবসিক বন্ধু পঙ্কু [১]

১ পঙ্কু · পঙ্কজকুমাব দাশগুপ্ত। সাহিত্যিক নন, কিন্তু বুদ্ধদেবেব কলকাতাব প্রথম জীবনেব অন্যতম ঘনিষ্ঠ। তাঁবা একসঙ্গেই ঢাকা থেকে কলকাতায় আসেন। দ্র. আমাব যৌবন, ১ম সং, পৃ. ৫৩।

তাকে বলে 'সোনালি-কণ্ঠী প্রতিবেশিনী', জানলায় কান পেতে থাকে সন্ধেবেলা তার রেওয়াজের সময় ; মুসলমান ওস্তাদের কাছে খেয়াল শেখে ব'লে তার বাড়ির ছাদে ঢিল পড়ে মাঝে-মাঝে, তারই বাড়ি থেকে ফেরার পথে সমাজহিতৈষী যুবদলের হাতে লজ্জাকরভাবে প্রহৃত হন নজরুল ইসলাম। সে প্রিয় ছাত্রী নজরুল ও দিলীপ রায়ের, অল্প বয়সেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানিতে, গানের জন্য অনেক জ্ঞানী-গুণীর যে স্নেহভাজন— রমনার যে-সব বড়ো-বড়ো বাড়িতে তার আনাগোনা সেগুলি আমার পক্ষে সন্নিকট হয়েও সুদূর। আমি তার গান শুনেছি পুরানা পল্টনে পরিমলের বাড়িতে, এবং তার নিজের বাড়িতেও আমন্ত্রিত হ'য়ে একবার : তার গদ্য-পদ্য লেখা দেখেছি 'উত্তরা'য়— হয়তো 'পূর্বাশা'য় বা 'ভারতবর্ষে'ও ; 'প্রগতি'র জন্যেও তার একটা কবিতা আমি পেয়েছিলাম ও নির্বাচন করেছিলাম, কিন্তু ছাপতে পারিনি— যেহেতু পরের মাস থেকেই পত্রিকা উঠে গেলো। সন্ধেবেলা তার ছাদে ব'সে একদিন দেখেছিলাম বালি-কাগজের খাতা-ভর্তি তার পাণ্ডুলিপি— সলজ্জ লেখিকার আপত্তি কাটিয়ে স্নেহমুগ্ধা মাতা আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। আর সম্প্রতি, এই কিছুদিন আগে, তার সঙ্গে আরো একটি সংযোগ আমার ঘটেছিলো : আমার 'যেদিন ফুটলো কমল' উপন্যাসটাকে নাট্যরূপ দিয়ে সে মঞ্চস্থ করেছিলো ঢাকার নর্থব্রুক হল্-এ, তার বন্ধু-বন্ধুনির দল থেকে কুশীলব জুটিয়ে— স্ত্রীপুরুষের মিশ্রিত শৌখিন অভিনয় ঢাকার ইতিহাসে সেই বোধহয় প্রথম। এই পর্যন্ত ছিলো পটভূমিকা— তারপর একদিন সকালবেলা আমার এক ঢাকার বন্ধু এসে আমাকে জানালো যে রানু সোম কলকাতায় এসেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি গেলাম সেদিন, গেলাম তার পরের দিন : হঠাৎ আমার দৈনিক রুটিন বদলে গেলো।

রানু এসেছে গান রেকর্ড করতে, বেশিদিন থাকবে না— আমি প্রতিটি দিনকে নিংড়ে নিতে চাই, ভব্যতার সীমা না-পেরিয়ে যতদূর সম্ভব। সে উঠেছে তার মাতুলের গৃহে, আশুতোষ মুখার্জি রোডের উপর একটি পাঁচ তলার ফ্ল্যাটে, আমার বাড়ি থেকে হাঁটা রাস্তায় মাত্র দশ-বারো মিনিট। আমি বেছে নিয়েছি দুপুরবেলার ঘণ্টাগুলো, কেননা সকালে আমার লেখা থাকে আর সন্ধেবেলায় আড্ডা—আর তার গৃহেও সেই সময়টা নিরিবিলি। বেরিয়ে পড়ি খাওয়ার পরে দুটো নাগাদ, ফিরে আসি সন্ধ্যার ঠিক পূর্বক্ষণে, ব্যস্ত পায়ে— পাছে কোনো বন্ধু এসে আমাকে বাড়ি না-পেয়ে ফিরে যায়, পাছে জিগ্যেস করে কোথায় গিয়েছিলাম। রানুর মা, তার মাসিমা, বিকেল পড়লে চা এবং আরো দু-চারজন অভ্যাগত— অনেক-কিছু জড়িয়ে-মিশিয়ে ধীরে গ'ড়ে ওঠে একটি পারস্পরিকতা, রাস্তায় ছায়া লম্বা হ'য়ে পড়ে। আলাপের অনেক বিষয় আমাদের— কেননা রানুর ও আমার বৃত্ত নানা দিক থেকে সংলগ্ন, তারও পত্রবিনিময় চলে দিলীপ রায়, আশালতার সঙ্গে, তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন হলেন জ্যোতির্মালা,[১] যিনি কোনো এক সময়ে

১. জ্যোতির্মালা দেবী (১৯০৩-১৯৮১) প্রকৃত নাম জ্যোতির্ময়ী, 'বিলেত দেশটা মাটির' এবং আরো অনেক উপন্যাসের লেখিকা। বিলেতে জর্নালিজ্‌ম পড়তে গিয়ে বিবাহ ও

ঢাকায় ছিলেন; কলকাতার সুধীমণ্ডলে নীরেন রায়[২] ও অন্য কেউ-কেউ তার বিশেষ পরিচিত, দিলীপ রায়ের একটি ভ্রাতৃব্য-পরিবারের সে ঘনিষ্ঠ, আমারও তাঁরা আংশিকভাবে চেনা। এবং একবার দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে, তার গানের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁর পরিবারবর্গেরও সান্নিধ্যও সে পেয়েছিলো। আরো একটি কথা: তার প্রকৃতি-দত্ত সুকণ্ঠ ও সুরজ্ঞান সত্ত্বেও তার আসল টান সাহিত্যের দিকে—'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অনেকেই তার প্রিয় লেখক, আমি আর অচিন্ত্য যে চার-আনা মূল্যের চটি পদ্য পুঁথি ছেপেছিলাম, তাও তার পড়তে বাকি নেই। কিন্তু এই সব তথ্যের ওপারে আমি অনুভব করি এক জায়মান অন্য কিছুকে, যেন আমার মনের মধ্যে এক হাওয়া উঠলো— সুখের, কিন্তু সম্পূর্ণ সুখেরও নয়— কত জোরালো সেই বাতাস তা কষ্টকর ভাবে ধরা পড়লো সেদিন, যেদিন সকালে উঠে আমি প্রথম কথা ভাবলাম, 'এতক্ষণে রানু স্টিমারে!' আলোর দিকে তাকিয়ে দিনটাকে শূন্য মনে হ'লো।

সেই আমাদের উপকারী বন্ধু— বিচ্ছেদ, অভাববোধ— তার তাড়নায় আমার নতুন ক'রে কবিতা লেখা শুরু হ'লো, অনেক দিন পরে আবার। 'বন্দীর বন্দনা' 'কঙ্কাবতী' থেকে দূরে, ভিন্ন সুরে— লিখি দু-তিনটি ক'রে গদ্যকবিতা প্রতিদিন, ক্ষুদ্রাকার ও সরল ও মন্ময়— যা নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলা যায় না তারই অনুলিখন যেন, প্রায় একটি দৈনিক ডায়েরির মতো। কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাই না— মনে হয় যেন বড়ো বেশি ব্যক্তিগত— আমি চাই না এ-মুহূর্তে সেগুলো অন্য কারো চোখে পড়ে। এক দিকে কবিতায় এই নিভৃতভাষণ,[৩] অন্য দিকে পত্রচালিত দ্বিরালাপ (আমার জীবনে আবহমান ভূমিকাসম্পন্ন সেই পোস্টাপিশ।)— এরই মধ্য দিয়ে অব্যক্ত হ'লো সুপরিস্ফুট— আমার নিজের কাছে এবং অন্যজনের কাছেও, তার মনও আর লুকানো রইলো না— আমরা পূর্বরাগের সবগুলো ধাপ পেরিয়ে এলাম।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ৯৬

বিচ্ছেদ। দেশে ফিরে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে অরবিন্দ-দর্শনে আকৃষ্ট হন। প্রসিদ্ধ বীণাবাদক বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় বৌদ্ধ মতে — এ-বিবাহও স্থায়ী হয়নি। পণ্ডিচেরিবাসী হন। শেষজীবনে মানসিক ভারসাম্য হারান।

দ্র. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।

২. নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬ : ১৯৬৬) প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন বঙ্গবাসী কলেজে, শেক্‌সপীয়ার পড়ানোর খ্যাতি ছিল। শেষ জীবনে মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে পার্টি ত্যাগ করেন কিন্তু মার্কসবাদে বিশ্বাস হারাননি। দু-বছর মস্কোতে থেকে রুশ সাহিত্য বঙ্গানুবাদের কাজ করেন। তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের নাম 'সাহিত্যবীক্ষা'। 'শেকসপীয়ার : হিজ অডিয়েন্স অ্যাণ্ড হিজ রীডার্স' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

দ্র. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

৩. এই কবিতাগুলি পরে সংকলিত হয় 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থে।

প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথা থেকে

"এর আগের বার যখন এসেছিলাম বুদ্ধদেব বসুকে কথা দিয়েছিলাম, পরের বার এসে নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ি যাবো। সেকথা আমি ভুলিনি।... একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি আর মাসীমা বুদ্ধদেবের রমেশ মিত্র রোডের বাড়িতে গেলাম। রমেশ মিত্র বোড আমার মামার বাড়ির প্রায় উল্টো দিকে।

এতদিন বাদে একটু যে সংকোচ হচ্ছিল না তা নয়। বলা যায় অতি ভীরুহস্তেই টোকা দিয়েছিলাম দরজায়। খুলে গেল তক্ষুনি। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুই খুলে দিলেন। বৈকালিক স্নানের পর তিনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, সে অবস্থাতেই খুলে দিয়ে বললেন, 'এসো'। তারপরেই আমাকে দেখে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ও আপনি! কী আশ্চর্য! আসুন আসুন। আমি ভাবছিলাম ভৃগু।'

... আমি মাসীমাব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। আমাদের কীভাবে আদরযত্ন করবেন তা নিয়ে উনি ছেলেমানুষের মতো বিব্রত হয়ে পড়লেন। যতক্ষণ ছিলাম ভালোই কাটলো। বিদায় দিতে রাস্তা পর্যন্ত এসে বললেন, 'আবার আসবেন।'

আমার মাসীমা বললেন, 'এবার তো আপনার যাবার পালা।'

বেশ সাগ্রহেই বললেন, 'বলুন কবে যাবো?'

'যে কোনোদিন। আমরা সব সময় বাড়ি থাকি।'

বুদ্ধদেব এসেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আসাটা তাঁর প্রাত্যহিকও হয়েছিল। দুপুরেব দিকে আসতেন, বিকেলে চা খেয়ে ফিরে যেতেন।

সাহিত্যরচনা ও গ্রন্থপ্রকাশ

ছোটোগল্প লিখছেন অনেক। উপন্যাস লিখছেন 'একদা তুমি প্রিয়ে'। 'যেদিন ফুটলো কমল' লিখলেন, অগস্টে বেরোল। 'হে বিজয়ী বীর' লিখলেন, বেরোল অক্টোবরে। 'ধূসর গোধূলি'ও বেরিয়ে গেল লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই। 'অসূর্যম্পশ্যা' লিখলেন, বেরোল ডিসেম্বরে। 'নতুন পাতা' গ্রন্থের কবিতাগুলি রচিত হচ্ছে।

জুলাইতে বেরোল কবিতার বই, 'পৃথিবীর পথে'। মে-তে 'সানন্দা' উপন্যাস, 'আমার বন্ধু'ও বেরোল অগস্টে। 'অনেক রকম' নামক নাট্যোপন্যাস। ছোটো গল্পের বই 'অদৃশ্য শত্রু'।

ছোটোদের বই বেরোল, গল্পগ্রন্থ 'ঘুমপাড়ানি'। উপন্যাস 'এলোমেলো'। নাট্যোপন্যাস, 'জলতরঙ্গ'। সব মিলিয়ে মোট বারোটি বই বেরোল এবছর।

১৯৩৪ ।। বয়স ছাব্বিশ

প্রাক্‌বিবাহ্ পারিবারিক সমস্যা

প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথা থেকে :

"...বুদ্ধদেবের আসা নিয়েও অনেক অশান্তি হতে লাগল। বুদ্ধদেব বসু যখন আসেন সাধাবণত মামা সেই সময বাড়ি থাকেন না। যদি দৈবাৎ দেখা হয়ে যায় এমন অমায়িক মিষ্ট ব্যবহার কবেন যে বুদ্ধদেব মুগ্ধ হয়ে যান। আমার অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত একটা নির্যাতনের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মা-বাবাকে যে-একটা চিঠি লিখবো এমন অবস্থাও ওঁরা রাখলেন না। নিয়মিতভাবে একদিন অন্তর একদিন অপর্ণাদিব কাছে যেতাম, সেটাও বন্ধ করে দিল। কী কারণে আমি জানি না আমাব দাদা আমাব মাকে কলকাতায় চলে আসবাব জন্য একটা টেলিগ্রাম করেছিল বোধহয় এসব আটকাবার জন্যই। এই টেলিগ্রামের খবরও আমি জানতাম না। টেলিগ্রাম পেয়ে দুজনেই ব্যাকুল হয়ে চলে এলেন। তাঁদের দেখে আমি অবাক। মা-বাবাকে ধরে আমি আব কান্না রাখতে বাখতে পারছিলাম না। দুপুবে খাওয়াদাওয়ার পবে আমাকে বাদ দিয়ে মা বাবা মামা মামী আর দাদার একটা গোপন বৈঠক বসল। তাঁরা কী বলেছিলেন, উত্তরে মা-বাবা কী বলেছিলেন জানি না তবে মা-বাবার কোনো ভাবান্তর না-দেখে আমি অনেকটা স্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু পরের দিনই একটা গুরুতর তর্ক বেধে গেল মামা মামী দাদার সঙ্গে আমার মায়ের। বুদ্ধদেব বসুর আসা নিয়ে আমার প্রতি এঁদের ব্যবহারকে মা কোনো রকমেই সমর্থন করতে পারছিলেন না। বলছিলেন, কেন একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে দাওনি ওকে, অপর্ণাব বাড়িতে কেন যেতে দেওয়া হয়নি।... তর্ক তুমুল পর্যায়ে উঠে প্রায় ঝগড়ার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে বাবা বললেন, আমার মত হচ্ছে পাত্র গরিব কি বড়লোক সেটা বিবেচ্য বা বড়ো প্রশ্ন নয়, আসল বিবেচনা হওয়া উচিত সে যোগ্য কি অযোগ্য। আর তাছাড়া এটা নিয়ে এখন এত উত্তেজিত হবার কোনো কারণ তো আমি দেখছি না। আগে সেই পর্যায়ে আসুক, ওরা নিজেরা কিছু বলুক, তখন না হয় ভাবা যাবে কী করা উচিত বা উচিত নয়। তাছাড়া আমি কিন্তু আমার মেয়ের অমতে কারো সঙ্গে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী নই; সে তোমরা যত বড়মানুষের কথাই বলো না কেন।'

সেই সময়টায় বেশ কদিন বুদ্ধদেব আসছিলেন না। আমার মনে হচ্ছিল এটা মামারই কোনো কারসাজি। ...মা-বাবা আসবার দুদিন বাদে কখন সকালের চায়ের আড্ডাটা গড়িয়ে গড়িয়ে প্রায় দশটায় গিয়ে পৌঁচেছে এই সময়ে দেখা গেল পাঁচতলা ভেঙে ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব বসু এসে শেষ সিঁড়ির মুখটিতে দাঁড়ালেন।

...মা-বাবার দিকে তাকিয়ে বুদ্ধদেব ভীষণ খুশি হয়ে বললেন, 'আপনারা এসে গেছেন খুব ভালো হয়েছে। আমি আপনাদের কথাই ভাবছিলাম।'

তাঁদের কথা কেন ভাবছিলেন তা অবশ্য তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না। মামীমা অনুযোগের সুরে বললেন, 'কী হয়েছিল? এতদিন আসনি কেন?'

জবাবে জানা গেল, তিনি 'রাবণ' নামক একটি নাটক লেখা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে আছেন। শ্রীরঙ্গমে যেটি মঞ্চস্থ হবে। সেটা শেষ করতে হাবুডুবু খাচ্ছেন। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে না-দিতে পারলে তাঁদের খুব বিপদে ফেলা হবে। সমস্তই তাঁবা ঠিক করে ফেলেছেন, এমনকি পোস্টাবও পড়ে গেছে সারা শহরে। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই নাটক মঞ্চস্থ হয়নি।

... চা খেতে খেতে আমার মা-বাবার দিকে তাকিয়ে বুদ্ধদেব বসু খুব সহজ গলায় বললেন, 'আপনারা অনুমতি করলে এ বাড়িতে একটা বিয়ে হতে পারে। অবশ্য রানুর যদি কোনো আপত্তি না থাকে।'

আচমকা এরকম একটা প্রস্তাবে মা-বাবা যতটা বিস্মিত এবং বিচলিত, আমি ততোধিক। কী উত্তর দেবেন সহসা ভেবে উঠতে পারছিলেন না তাঁবা। সামান্য ধাতস্থ হয়ে যা বললেন, 'যা বলছ তার গুরুত্ব কি তুমি ভেবে দেখেছ?'

একই রকম সহজভাবে বুদ্ধদেব জবাব দিলেন, 'দেখেছি। এক বছর ধরে দেখছি।'

...মা চুপ করে থেকে বললেন, 'এর দায়িত্ব কিন্তু অনেক।'

'সে তো বটেই। আপনার মেয়েব কোনো কষ্ট হবে না। আমি হতে দেব না।'

...নিজে থেকেই জমে উঠল কথাবার্তা। মা অবশ্য এর পরেও একবাব বললেন, 'তোমার তো চাকরি নেই, বিয়ে করলে খরচ বাড়বে, শুধু লেখার আয়ে চলবে কি?'

বললেন, 'সেটাই একটা ভাববার বিষয়, ঐজন্যই কথাটা তুলতে অপেক্ষা করছিলাম। এখন মনে হচ্ছে অপেক্ষা করা বোকামি। খুব একটা ব্যয়বহুল ভাবে থাকতে পারব না ঠিক, রমেশ মিত্র রোডের অতটুকু বাড়িতে থাকতে আপনার মেয়ের কষ্ট হবে সেটাও ঠিক—অবশ্য বাড়ি আমি বদলাব। বিয়ের আগেই বদলাব এবং আয় বাড়াবার জন্যে সচেষ্টও হব। ওটা কিছু নয়।'

...

বাবা বললেন, 'আমার কোনো অমত নেই। যার আত্মপ্রত্যয় আছে তার সব আছে।'

মামা তর্ক করলেন, 'আত্মপ্রত্যয় ধুয়ে জল খাক আর আপনারা দেখুন। কী করে এভাবে প্রস্তাবটা করতে পারল ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনারা কি জানেন, ওর মদের খরচ কত? সিগারেটের খরচ কত? (যদিও তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে আমি কখনো মদ্যপ বলে জানতে পারিনি।)

শুনেছি লক্ষ কথা পূরণ না হলে বিবাহ হয় না। এই বিবাহে মামার দয়ায় তাই হতে লাগল। আমি নিঃশব্দ। আত্মপ্রত্যয় আমার নিজেরও ছিল। আমি কী করব তা আমি জানতাম। মা বাবা যে বিরোধী নন সেটাই ছিল আমার পরম সৌভাগ্য। তাদের কষ্ট দিয়ে কিছু করা আমার পক্ষে কতটা সম্ভব হত জানি না। শুধু তারাই নন, আমি আমার কাকুর কথাও ভাবছিলাম। কাকুর মতামতের উপর আমার অনেক কিছুই নির্ভর করে। মা বাবাকে ব্যথা দিয়ে যদি বা কিছু করতে পারি কাকুর অমতে কিছু করা আরো কঠিন। দুরু দুরু বক্ষে আমি কাকুর আসার অপেক্ষাতেই দিন গুনছিলাম। সেটা ছিল ১৯৩৪ সাল।...

.. দার্জিলিং থেকে কাকু এসে গেলেন টেলিগ্রাম পেয়ে। ভেবেছিলেন কারো অসুখ, সকলকে বহাল তবিয়তে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। আর তারপরেই মামার শেডের তলার ডাইনিংরুমে চায়ের কাপ নিয়ে সবাই জড়ো হল। কেন টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে সেটাও জানানো হল। কাকু হাসিমুখে বললেন, 'এই কথা? এ তো খুব ভালো প্রস্তাব। এর চেয়ে যোগ্য ছেলে সারা বাংলায় আর ক'জন আছে?' সেটা ছিল আষাঢ় মাস। আষাঢ় মাসের পয়লা তারিখেই বুদ্ধদেব প্রস্তাবটা করেছিলেন। কাকুর মত পেয়ে মা আর বাবার আর কোনো দ্বিধা রইল না। মা বুদ্ধদেবকে বললেন, 'বিয়ে হবে ফাল্গুন মাসে। সব চেয়ে সুন্দর মাস।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তার তো অনেক দেরি।'

মা বললেন, 'আমাদের তো প্রস্তুত হতে হবে।'

'কীসের প্রস্তুতি?'

'বাহ্, বিয়ে বলে কথা, তার প্রস্তুতি কি কম?'

'বিয়েটা কি আপনারা হিন্দু মতে ভাবছেন?'

'তা ছাড়া কী মতে ভাববো?' মা অবাক।

বুদ্ধদেব বললেন, 'ওসব ঝামেলায় কেন যাবেন? যে কোনোদিন রেজেষ্ট্রি করে এলেই তো হয়ে যায়। হিন্দুমতে যেমন ঝামেলা তেমনি খরচ।'

মা হেসে বললেন, 'ঝামেলা নয়, আনন্দ। দুজন মানুষকে ঘিরে সকলের আনন্দ। তা থেকে কেন বঞ্চিত করবে তাদের? তা ছাড়া রানুর দাদু ঠাকুমা আছেন, হিন্দু বিবাহ ছাড়া অন্য বিবাহকে তাঁরা বিবাহ বলেই গণ্য করবেন না। আমার একটামাত্র মেয়ে তাকেও আমাদের কিছু দিতে ইচ্ছে করবে, সে সবের জোগাড়ও তো কম নয়। তোমারও নিশ্চয়ই কিছু চাহিদা আছে?'

'আমার চাহিদা? সে তো আমি আপনাদের অনুমতির সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ে গেছি।'

'তা ছাড়া?'

বুদ্ধদেব হেসে বললেন, 'ওটাই আমার একমাত্র আরজি আপনাদের কাছে। পার্থিব অপার্থিব কোনো অর্থেই তার চেয়ে মূল্যবান আর আমার কাছে কিছু নেই।'

খবর গেল দাদু দিদার কাছে। জবাবে দাদু লিখলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম্। এসব

ব্যাপার দীর্ঘদিনের জন্য ফেলে রাখা আমি সমীচীন বলে মনে করি না। তোমরা শ্রাবণেই দিন ঠিক করো।'

—*জীবনের জলছবি*, ৩য় মু, পৃ. ৯৭

বিবাহ

বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথা থেকে :

"কন্যার মাতা প্রথমে বলেছিলেন অঘ্রান মাস, কিন্তু— বোধহয় পাত্রপাত্রীর প্রণয়-পরিণতি লক্ষ ক'রে— দ্রুত এগিয়ে দিলেন লগ্নটা, আর ততদিনে, তৃতীয়বারের মরিয়া চেষ্টায়, আমিও একটি কনিষ্ঠ মাষ্টারি জুটিয়ে ফেললাম রিপন কলেজে। ["আমাকে যেদিন বুদ্ধদেব একটি এনগেজমেন্ট রিং পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনই খুব আশ্চর্যভাবে রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজের জন্য টেলিগ্রামে তাঁর চাকরি হয়েছিল।" *জীবনের জলছবি*, প্রতিভা বসু। পৃ. ১০৯] আমাদের বিয়ে হ'লো পুরো হিন্দু মতে, জুলাই মাসের উনিশ তারিখে— বছর চলছে উনিশশো চৌত্রিশ।

বিবাহের প্রস্তুতির জন্য না-হোক-ক'বেও কিছু অর্থের প্রয়োজন হয় ; কিন্তু সে-সময়ে আমার তহবিল ছিলো শূন্য, সম্প্রতি বিক্রয়যোগ্য কিছু লিখতে পারিনি, এবং আমার সম্ভবপর সাহায্যকারী আত্মীয়েরা ছিলেন সকলেই এই বিবাহের বিরোধী। অগত্যা, আড়াই-শো টাকা ঋণ প্রার্থনা ক'রে, একটি চিঠি লিখেছিলাম অধ্যাপক রমেশ মজুমদারকে ; তিনি যে পত্রপাঠ আমার অনুরোধকে সম্মানিত করেছিলেন সেকথা ভেবে আজও আমি আনন্দ পাই। কিন্তু তা থেকেও এতটা উদ্বৃত্ত রইলো না যাতে সম্পন্ন করা যায় বৌভাত নামক সমাজসম্মত অনুষ্ঠান —তার কোনো প্রয়োজনও আমি অনুভব করিনি। তবে অন্তত বাড়িটা বদলানো গিয়েছিলো— সেটা মস্ত বাঁচোয়া, কেননা রমেশ মিত্র রোডের ফ্ল্যাটটি ছিলো সস্ত্রীক বসবাসের পক্ষে অসম্ভব।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ১০০

বিয়ের ঠিক আগেই বাড়িবদল করে বুদ্ধদেব উঠে গিয়েছিলেন রা রসা রোডের মোড়ে গোলাম মহম্মদ ম্যানশনে (এ বাড়িটি এখন আর দাঁড়িয়ে নেই)। বিয়ের পরপরই মারা গেলেন, বহুকাল ধরে তাঁদের পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত, বুদ্ধদেবের দাদামশায়ের মাসিমা, বামাসুন্দরী।

"এই বাড়িবদল এক ব্যাপার, যা সে-সময়ে বড্ড ভুগিয়েছিলো আমাকে —বিয়ের পর তিন বছরের মধ্যে চারবার ঠাঁই নাড়তে হয়েছিলো। আমরা প্রথম উঠেছিলাম রসা রোডে গোলাম মহম্মদ ম্যানশন্স-এ, যার গা ঘেঁষে আজকাল থাকে সারি-সারি সিনেমার হোর্ডিং। দক্ষিণ-খোলা তেতলার ফ্ল্যাট, বাথরুম বিলেতি ছাঁদের, রান্নাঘরে গ্যাস, ঘরগুলো দরাজ মাপে তৈরি। বিবাহের যৌতুকরূপে প্রাপ্য

বিবিধ আশবাব দিয়ে রানু সাজিয়ে নিলো তার মনোমতো ক'রে, আমাদের বন্ধুসম্মেলনে এই প্রথম একটি মহিলা যুক্ত হলেন।"

—*আমার যৌবন,* বুদ্ধদেব বসু, ১ম সং, পৃ. ১০১

"... আমাদের সেই রসা রোডের বাড়িটার একটা মস্ত দোষ ছিল। ওই অঞ্চলের শববাহকেরা সব ওই বাড়ির তলা দিয়ে গিয়ে ডাইনে কেওড়াতলার দিকে মোড় নিত। প্রত্যেকটি হরিধ্বনির শব্দে রাত্রিবেলা আমার ঘুম ভেঙে যেত, বাকি রাত ভূতের ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে থাকতাম। এই মহিলার [বামাসুন্দরী] মৃত্যুতে ভয় শতগুণ হল। উপরন্তু দাহ করে এসেই যখন বুদ্ধদেব ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন তখন মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লাম। ভাগ্যদোষে বুদ্ধদেবের জ্বরের জন্য তাঁর দিদিমা এমন কতগুলো অদ্ভুত আচরণ শুরু করলেন যার জের সামলানো আমার পক্ষে খুব কঠিন হল।...

শিগগিরই পুজোর ছুটি এসে গেল, বাঁচা গেল। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় মা-বাবার কাছে গিয়ে থেকে আমরা পুরী বেড়াতে চলে গেলাম।"

—*জীবনের জলছবি,* প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ. ১১০

বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথের কাছে

বুদ্ধদেব বসুর বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি— স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারদের বাসন্তী কটন মিল্‌স-এর উদ্বোধন করতে (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯)। খবর পেয়ে বুদ্ধদেব একদিন সস্ত্রীক গেলেন দেখা করতে। সুন্দর বর্ণনা আছে প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথায় :

"আমার বিবাহের কিছুকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে এসেছেন শুনে বুদ্ধদেব আমাকে নিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন বুদ্ধদেব নববধূ নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়াতে। আমি প্রণাম করে মুখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। পা নড়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'মেয়েটিকে তো আমি চিনি গো। তা হলে এই গাইয়ে কন্যাটিকেই তুমি বিবাহ করেছো?' সামান্য একটু উত্তেজিত হলেই রবীন্দ্রনাথ হাঁটু নাড়াতেন, দাড়িতে হাত বুলোতেন।

বুদ্ধদেব বাড়ি ফিরে বললেন, 'তোমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আগেও দেখা হয়েছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমাকে বলোনি তো।'

'কী প্রসঙ্গে বলবো? তুমি তো জিজ্ঞাসা করোনি।'

'এর জন্য প্রসঙ্গ দরকার হয়? জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন ওঠে? রবীন্দ্রনাথকে

দেখা শোনা পরিচয় থাকা সবই তো একটা ঘটনা, একটা বলবার বিষয়।' "
—*জীবনের জলছবি*, প্রতিভা বসু। পৃ. ১১৫

'চিল্কায় সকাল'

পুজোর ছুটিতে প্রথমে গেলেন ঢাকা : ফিরে এসে পুরি, ভুবনেশ্বর, কোনারক, চিল্কা। সে সময় কোনারক যাবার পাকা রাস্তা ছিল না, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গোরুর গাড়িতে যেতে হত, নদী ফেঁপে উঠলে রাত্রিবাস করতে হত গোরুর গাড়িতেই— তাঁদের তাই করতে হয়েছিল। তার রোমাঞ্চকর বর্ণনা আছে 'জীবনের জলছবি'তে।

বিখ্যাত 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি লেখা হয়েছিল এই ভ্রমণে, সত্যি-সত্যি চিল্কার ধারে বসেই। বুদ্ধদেব বসুর লেখা থেকে :

"চলতি মুহূর্তের কবিতা বলতে কী বুঝি, তার একটা উদাহরণ দিই। 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি সত্যি চিল্কার ধারে ব'সেই লিখেছিলাম, সত্যি এক সকালবেলায় —আমাব জীবনের নিবিড় এক আনন্দেব মুহূর্তে। যেন মুহূর্তটিকে হাতে-হাতে গ্রেপ্তার ক'রে ফেলেছিলাম, তাব সমস্ত সবুজ গন্ধ আর সজলতা শুদ্ধু— তাকে শুকিয়ে যাবার সময় না দিয়ে, নিজেকে অন্য কোনো দিকে ফিরে তাকাবার সময় না দিয়ে। এর উল্টো উপায়ে লেখা হয়েছিলো কয়েক বছর পরে 'ব্যাং' আব 'ইলিশ'। ব্যাং দেখেছিলাম অনেক দিন আগে পুরানা পল্টনে— মাঠে-ভ'বে-থাকা জলের মধ্যে এক মস্ত দল, উল্লসিত ও নির্ঘোষিত এক অসাধারণ কোরাস ;— তখন বৃষ্টির পরে জ্ব'লে উঠেছে রোদ্দুর, আমি বোধহয় কলেজ থেকে ফিরছি। ইলিশ চোখে পড়েছিলো গোয়ালন্দের প্ল্যাটফর্মে— আমি রাত্তির দশটায় স্টিমার থেকে নেমে সবেগে ট্রেনের দিকে ছুটছি— আধো-অন্ধকারে স্তূপীকৃত ইলিশ চালান যাবার জন্য প'ড়ে আছে, কিন্তু সেদিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই আমার ; আমি থার্ড ক্লাশ কামরায় শোবার মতো একটু জায়গা ক'রে নিতে পারবো কিনা, আমার মনে সেই ভাবনাটাই প্রধান। 'চিল্কায় সকাল' এ যা কিছু আছে সবই সেই মুহূর্তে দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েছিলো ; আর পরের দুটো কবিতার মধ্যে এমন অনেক বিষয় প্রবেশ করেছে যা পুরানা পল্টনে বা গোয়ালন্দে আমি ভাবিনি।"
—'কবিতা ও আমার জীবন', *কবিতার শত্রু ও মিত্র*

সমর সেনের সঙ্গে পরিচয়

"এক গ্রীষ্মের সকালে আমার ঘরে এলো একটি ক্ষীণাঙ্গ ছেলে— প্রায় বালক, সবে পা দিয়েছে যৌবনে— গায়ের রং হলদে-ঘেঁষা ফর্শা, ঠোঁটে গোঁফের ছায়া, চোখে চশমা, গালে একটি ব্রণের উপর এক ফোঁটা চুন লাগানো। কিছুমাত্র ভূমিকা না-ক'রে বললো, 'আমি আপনার 'শাপভ্রষ্ট' কবিতার একটা ইংরেজি করেছি—

আপনি দেখবেন?' পাণ্ডুলিপিতে তাব নাম দেখলাম সমব সেন, ঠিকানা বেহালায দীনেশচন্দ্র সেনেব বাড়ি। স্কটিশ চার্চে আই. এ. পড়ছে, দীনেশ সেন তাব দাদু হন— আমাব প্রশ্নেব উত্তবে সংক্ষেপে এই দুটি তথ্য জানিযে সে মুহূর্তকাল পবে বিদায নিলো। তর্জমাটি প'ড়ে চমক লাগলো আমাব— এত অল্প বযস, অথচ ইংবেজি ভাষায তাব দখল অসামান্য, কবিতাব দিকে মনেব টান আছে বোঝা যায। লেখাটা আমি পাঠিযে দিলাম বম্বাইযেব নতুন-বেবোনো 'ওবিযেন্ট' পত্রিকায, সম্পাদক সেটি সমাদবপূর্বক গ্রহণ কবলেন।

সমব বোধহয আবো দু-একবাব বমেশ মিত্র বোডে এসেছিলো, কিন্তু তাব বিষযে আমাব পববর্তী স্মৃতি অন্য বাড়িতে, বছব দুযেকেব ব্যবধানে। সেদিন তাব মৌলিক কযেকটি বাংলা বচনা সে দেখিযেছিলো আমাকে ; আমি, তাব ছন্দেব হাত টলোমলো দেখে, তাকে গদ্যকবিতা লেখাব পবামর্শ দিলাম— 'পুনশ্চ'ব পবে বাংলা ভাষায গদ্যকবিতা জাতে উঠেছে ততদিনে। আব তাবপব, 'কবিতা' পত্রিকাব সূচনাব সময, সে নিযে এলো তাব প্রথম গদ্যকবিতাগুচ্ছ— বাবীন্দ্রিক বোমান্টিকতাব সেই শেষ মধুব সৌবভে-ভবা দীর্ঘশ্বাস, আজকেব দিনে অনেকেবই যা অন্তবঙ্গ। সমব সেনেব সঙ্গে আমাব বন্ধুতাব সেখানেই শুরু।"

—*আমাব যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ ৬৭

সমব সেন সম্পর্কে এই স্মৃতিচাবণে বুদ্ধদেব বসু কোনো সমযেব উল্লেখ কবেননি। তবে এই ঘটনাব বিষযে আবো দুটি স্মৃতিচাবণ পাচ্ছি— একটি সমব সেনেব, অপবটি প্রতিভা বসুব— তাতে দেখতে পাচ্ছি সমব সেনেব সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুব পবিচয হযেছিল ১৯৩৪ সালেব মাঝামাঝি সমযে।

সমব সেনের স্মৃতিচাবণ

"১৯৩৪-এ গ্রীষ্মকালে দাৰুণ মর্মবেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবাব জন্য একবাব সাহস কবে গেলাম বুদ্ধদেব বসুব বাড়িতে, ভবানীপুবে। 'বন্দীব বন্দনা'ব কযেকটি কবিতাব ইংবেজি অনুবাদ পড়ে খুশি হযে তিনি জিজ্ঞেস কবলেন আমি কবিতা লিখি কিনা। কযেকটা লেখা দিনকযেক পবে দেখাতে, বললেন নিযমিত ছন্দেব চেষ্টা ছেড়ে গদ্যছন্দে যেতে। 'বন্দীব বন্দনা'ব লেখক সম্বন্ধে ধাবণা ছিল বলিষ্ঠ, দীর্ঘ দৃপ্তকণ্ঠ মানুষ হবেন। বুদ্ধদেববাবুকে প্রথমবাব দেখে বিস্মিত হযেছিলাম।"

—*বাবুবৃত্তান্ত*, ১ম সং। পৃ. ২৬

এই বর্ণনাব সঙ্গে সন-তারিখে মিল রয়েছে প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণেব :

"সমবেব সঙ্গে আমাব প্রথম আলাপ ১৯৩৪ সালেব জুলাই মাসে [তাঁদেব বিযে হয় ১৯ জুলাই— অর্থাৎ বিয়ের পবপরই— অর্থাৎ বসা বোডে গোলাম মহম্মদ ম্যানশনেব ঘটনা এটি]। আমি আর সমর একেবাবেই সমানবযসী

[প্রতিভা বসুব জন্ম ১৯১৫, সমর সেনেব ১৯১৬]। বুদ্ধদেব আলাপ করিয়ে দিযেছিলেন। বোগা ফর্শা উজ্জ্বল চোখ তীক্ষ্ণ নাসিকা উনিশ বছবের তরুণ যুবকটিব পকেটে ইংবিজি কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিল। সেই সময়ে সমর সেন যত লাজুক ছিলেন বুদ্ধদেবও তাব চেযে কিছুমাত্র কম নন। মনে আছে বুদ্ধদেব বাবে বাবে রুমাল দিযে মুখ মুছে, কেশে, চুলে আঙুল চালিযে বাঙালি ছেলেব ইংবেজি কবিতা লেখাব বিরুদ্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিযেছিলেন। সেই ইংবিজি কবিতাব পাণ্ডুলিপিব মধ্যে বুদ্ধদেবেব 'বন্দীব বন্দনা' অথবা 'শাপভ্রষ্ট' কবিতাদুটিব একটিব অনুবাদ ছিল। বুদ্ধদেব পডতে পডতে বলেছিলেন, 'Wondertul, splendıd'!

...সমবেব সঙ্গে আমাব সেই দিনই একটা অলিখিত বন্ধুতা তৈবি হযেছিল।

কিছুকাল বাদে সমব আবাবও একদিন এসে সেই বকমই লজ্জা-লজ্জা মুখে আবাব কযেকটি কবিতাব পাণ্ডুলিপি বাব কবলেন। বাংলা। সাগ্রহে সেই পাণ্ডুলিপি পাঠ কবে চেয়াব থেকে লাফিযে উঠে দাঁডিযে বুদ্ধদেব আবাব সেই দুটি শব্দ উচ্চাবণ কবলেন, 'wonderful, splendıd'! সেই কবিতা 'কবিতা'তেই আত্মপ্রকাশ কবে।

—'নিবেদন', প্রতিভা বসু। '৩০শে নভেম্বব
কবিতা ভবন বার্ষিকী'। পৃ ৭

নিজেব চেযে আট বছবের বযোকনিষ্ঠ সমব সেনের কবিতাব গুণমুগ্ধ ছিলেন বুদ্ধদেব, প্রথম থেকেই। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় সমর সেনের চাবটি কবিতা ছিল ; তাব পরেও, যতদিন না সমর সেনেব কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে গেছে, বুদ্ধদেব নিয়মিত তাঁর গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। যখন কবিতাভবন প্রকাশনার সৃষ্টি হল, সেখান থেকে প্রথম কবিতাব বই বেবোল সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'।

সমর সেন লিখেছেন, "আমার কবিতা রচনাব আয়ু অবশ্য বারো বছর —১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত" : (বাবুবৃত্তান্ত, ১ম সং পৃ. ২৬)। এবং সমর সেন বোধহয় 'কবিতা' পত্রিকাব সমগ্র আয়ুষ্কালে একমাত্র কবি, যাঁর কবিতা 'কবিতা'য় ছাড়া আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

কবিতা পত্রিকার প্রথম আটটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক সমর সেন (আশ্বিন ১৩৪২—আষাঢ় ১৩৪৪)। তারপর, প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কবিতা' পত্রিকার সংস্রব বর্জন করলে, সমর সেনের নাম বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সম্পাদক হিশেবে মুদ্রিত হতে থাকে পৌষ ১৩৪৭ পর্যন্ত আরো তিন বছর ধরে। এমনকি সমর সেন কর্ম নিয়ে দিল্লি চলে যাবার পরও এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। শেষে সমর সেন দিল্লি থেকে চিঠি লিখলেন, ... 'কবিতা'র সম্পাদক হিসেবে আমার নাম আর কতদিন রাখবেন? ব্যাপারটা হাস্যকর দেখায়।" [বুদ্ধদেব বসুকে চিঠি নং ১৯। 'অনুষ্টুপ' সমর সেন বিশেষ সংখ্যা]

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

উপন্যাস লিখে উঠলেন এক বছরে পাঁচটি— 'বাড়িবদল', 'সূর্যমুখী', 'রূপালি পাখি', 'লাল মেঘ' ও 'পরস্পর'। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে আরো দুটি— 'বিসর্পিল' ও 'বনশ্রী'। তা ছাড়াও লিখছেন ছোটোগল্প, ছোটোদের জন্য গল্প, হানস আণ্ডেরসেন অনুবাদ করছেন, রচনা করছেন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র প্রবন্ধগুলি। কবিতা লেখাও চলছে সঙ্গে সঙ্গে।

গত বছরে লেখা 'একদা তুমি প্রিয়ে' বেরোল মে মাসে, 'রূপালি পাখি' উপন্যাসটিও। অক্টোবরে 'পরস্পর'। তা ছাড়াও বেরোল 'লাল মেঘ', এবং তিনজনে-মিলে লেখা উপন্যাস দুটি। ছোটো গল্পের সংকলন 'মিসেস গুপ্ত' বেরোল এপ্রিলে। এবং বেরোল ছোটো গল্পের আরো তিনটি সংকলন— 'প্রেমের বিচিত্র গতি', 'শ্বেতপত্র' ও 'অসামান্য মেয়ে'।

১৯৩৫ ।। বয়স সাতাশ

আবার বাড়িবদল

"[বসা বোডেব গোলাম মহম্মদ ম্যানশনেব] সবই ভালো— ভালো নয শুধু কেওড়াতলাব সান্নিধ্য। অবিবাম চলে শ্মশানযাত্রীদেব হবিধ্বনি, বানু বড্ড ভয পায বাত্রে, কোনো-কোনো বাত আলো জ্বেলে ব'সে কেটে যায আমাদেব। উপবন্তু উৎপাত জুটলো পাশেব ফ্ল্যাটে এক নৈশ-চীৎকৃত মাতাল— হঠাৎ-হঠাৎ ঢুকেও পড়ে আমাদেব ঘবেব মধ্যে : সেও এক অস্বস্তি কম নয। বাড়ি-বদলেব কথা ভাবতে হ'লো।

আমাদেব দ্বিতীয বাসা জুটলো প্রথমটিব উল্টো ছাঁদেব— ঘেঁষাঘেষি জগু-বাজাব পাড়ায, যেখানে আমি চাব বছব আগে প্রাতবাশেব জন্য যেতাম সেই ওযাই. এম. সি-এ-বই পিছনকাব অংশে একতলায। বাড়িব মালিক সুশীলকুমাব মিত্র বিপন কলেজে আমাব সহকর্মী, 'বিচিত্রা'ব পবিচালক হিশেবে সাহিত্যেব সঙ্গেও সম্পৃক্ত— আমাদেব ফ্ল্যাটটি তাঁব ঠাকুমাব 'বান্নাবাড়ি' ছিলো। মনোবম বলা যায না— ঠিকানা যোগেশ মিত্র বোড হ'লেও [১২ যোগেশ মিত্র বোড, ভবানীপুব] অবস্থান অতি সংকীর্ণ এক গলিতে, স্নানাগাব কুশ্রী, আব প্রতিবেশীবা সেই সমাজভুক্ত যাঁদেব মেযেদেব 'বেবোনো নেই'। তবে অন্তত মাতালেব হল্লা শোনা যায না কখনো, হবিধ্বনিও দূবে— এদিকে মযদান পাযে-হাঁটা পথ, বাজাব ফেবতা প্রেমেন প্রাযই কিছুক্ষণ কাটিযে যায সকালে। এই বাড়িতেই, আশ্বিন মাসেব একই তাবিখে, ভূমিষ্ঠ হ'লো আমাদেব প্রথম সন্তান ও 'কবিতা' পত্রিকা।"

—*আমাব যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ ১০২

'কবিতা' পত্রিকার জন্ম হল

তারিখটি হল ১ অক্টোবর ১৯৩৫ (১৪ আশ্বিন ১৩৪২)। তারিখটি নিয়ে সামান্য সন্দেহের অবকাশ আছে। যে চিঠির সঙ্গে বুদ্ধদেব এই পত্রিকার একটি কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠির তারিখ হল ৩০/৯/৩৫ (দ্র. রবীন্দ্রনাথকে লেখা বুদ্ধদেবের ২ সংখ্যক চিঠি : চিঠিপত্র ১৬)। এ থেকে মনে হয় পত্রিকাটি ১ অক্টোবরের আগেই ছাপাখানা থেকে মুক্তিলাভ করে থাকবে।

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক হিশেবে নাম ছিল বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র —সহকারী সম্পাদক সমর সেন। প্রকাশক ও মুদ্রক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত, পূর্বাশা প্রেস, ১৬২/১ ধর্মতলা স্ট্রিট। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্ত এই সংখ্যাটি

বিনামূল্যে ছাপিয়ে দেন। পরের মাসের (কার্তিক ১৩৪২) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি বেরোয়, স্পষ্টতই বুদ্ধদেবের লেখা :

"চলতি সাময়িকপত্রে নিজেদের কবিতা ছাপতে দিতে আজকালকার অনেক কবিই অনিচ্ছুক এবং এ-অনিচ্ছা অন্যায়ও নয়। কেননা অন্নিবাস মাসিকপত্রের পাঁচমিশেলি ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারের ভালো কবিতারও কেমন একটা বাজে ও তুচ্ছ চেহারা যেন হ'য়ে যায়। কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িকপত্র বর্তমানে দেশে বেশি নেই। অথচ আধুনিক কবিদের অনেকেই নতুন কবিতা লিখছেন— বাইরের পাঠকমণ্ডলী দূরে থাক, সব সময় নিজেদের মধ্যেও সেগুলো দেখাশোনার সুবিধে হয় না।

এই কারণে আমরা একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্র বার করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার নাম হবে 'কবিতা' এবং তাতে থাকবে শুধু— কবিতা। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিরা সকলেই এতে তাঁদের রচনা প্রকাশ করবেন। নবীন কবির ভালো কবিতাও যতটা পাওয়া যায় প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যা বেরুবে আগামী ১লা আশ্বিন। প্রতি সংখ্যা ছ' আনা ক'রে দোকানে ও স্টলে বিক্রি হবে, বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। এই পত্রিকাসংক্রান্ত সর্ববিধ চিঠিপত্র আমাদের ম্যানেজর শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্তের নামে ১৬২/১ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার ও ডি এম লাইব্রেরি, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট এই দুই ঠিকানা থেকে শহরের ও মফস্বলের পাঠকরা প্রতি সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারবেন। ইতি

বুদ্ধদেব বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র

'কবিতা' পত্রিকার জন্মকথা : বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ

" 'কবিতা' পত্রিকার জন্মকথা আগে একবার সংক্ষেপে লিখেছিলাম— তখনও তার মধ্যবয়স চলছে। কিন্তু যেহেতু এই পত্রিকা ছিলো দীর্ঘকাল আমার সহচরী এবং অন্য অনেক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর যেহেতু তার বিলুপ্তির পরেও দশ-বারো বছর অতীত হ'য়ে গেছে, তাই আজ আর-একবার আরো সম্পূর্ণভাবে সেই ইতিহাস বললে অশোভন হয় না।

আবাল্য দেখেছি, বাংলা মাসিকপত্রে কবিতার স্থান পাদপ্রান্তিক। অর্থাৎ যেখানে কোনো গদ্যরচনা শেষ হ'লো তারই ঠিক তলায় থাকে কবিতা—কোথাও কোথাও বর্জইস অক্ষরে কুণ্ঠিত হ'য়ে। 'প্রবাসী' বিষয়ে গল্প ছিলো সেখানে ইঞ্চি মেপে কবিতা ছাপা হয়। ব্যতিক্রম অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, আর তাঁর পরেই— যদিও অনেক ধাপ নিচের তলায়— সত্যেন্দ্র দত্ত। গদ্যে-পদ্যে এই ভেদনীতি নেই 'সবুজপত্রে', কিন্তু সেখানে আবার কবিতা থাকে খুবই অল্প, যা থাকে প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ— উঠতি কবিদের মধ্যে একবার স্থান পেয়েছিলো শুধু অচিন্ত্য তার

চমৎকার 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি নিয়ে। 'প্রবাসী' ইত্যাদির ইঞ্চি-কৃপণ পাদপূরণকারী অবজ্ঞা থেকে কবিতাকে প্রথম উদ্ধার করলো 'কল্লোল'— তার অনেক সংখ্যায় প্রথমেই থাকে কবিতা— বড়ো অক্ষরে প্রবহমান ও শোভমান— এবং তা শুধু, রবীন্দ্রনাথেরই নয়, অন্যদেরও ; সদ্যোজাত আমার লেখা 'শাপভ্রষ্ট' ও 'বন্দীর বন্দনা'কে ঐ একই সম্মান দিয়েছিলেন দীনেশরঞ্জন।[১] 'পরিচয়' এলো ভিন্ন এক চরিত্র নিয়ে— 'সবুজপত্রে'রই মতো প্রবন্ধপ্রধান কিন্তু একটু বেশি গুরুগম্ভীর ; সেখানে মার্কামারা আলাদা কামরায় স্থান পায় কয়েকটি মাত্র সুনির্বাচিত কাব্যরচনা —রবীন্দ্রনাথ strange bedfellows-এ আপত্তি করায়[২] শুধু তাঁর কবিতাকে পরে বিশ্লিষ্ট করা হয়েছিলো। ১৯৩১-৩২-এর কলকাতায় ভালো পত্রিকা অনেক ছিলো কিন্তু এমন কোনো পত্রিকা ছিলো না যার মধ্য দিয়ে কবিতা হ'তে পারে বিশেষভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত ও রসজ্ঞজনের দৃষ্টিগোচর।

'পরিচয়ে'র কোনো এক বৈঠকে দেখেছিলাম অন্নদাশঙ্করের হাতে ক্ষীণাঙ্গ একটি ইংরেজি পত্রিকা— চেহারা কিছুটা শেষ উনিশ-শতকী, ইট-রঙের মলাট থেকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন শেলি, লম্বা রোগা অক্ষরে আঁকা 'পোইট্রি' তার শিরোনামা। আমি জানি না সেটাই হ্যারিয়েট মনরো-স্থাপিত শিকাগোর 'পোইট্রি' কিনা— তখনও সেই বিখ্যাত পত্রিকাটির নাম শুনিনি ; কিন্তু সেটাতেও ছিলো শুধু কবিতা আর হয়তো কিঞ্চিৎ কবিতা-সংক্রান্ত গদ্য। নমুনাটি উল্টেপাল্টে দেখে আমার মনের মধ্যে একটা উশকোনি জাগলো : এ রকম একটি কবিতাসর্বস্ব পত্রিকা বাংলায় কি বের করা যায় না? তখন এ নিয়ে কথা বললাম না কারো সঙ্গে, হয়তো অসম্ভব ভেবে মনের তলায় চেপে দিয়েছিলাম—কিন্তু সেই অঙ্কুর থেকেই ফল ফললো প্রায় চার বছর পরে— আমার সে-সময়কার ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমেন আমার সঙ্গী, প্রধান উৎসাহদাতা বিষ্ণু দে ও সমর সেন।

পাঁচ টাকা ক'রে চাঁদা দিলেন কবিদের মধ্যে দু-তিনজন। আমার অসাহিত্যিক বন্ধু পঙ্কু পাঠালো দিল্লি থেকে দুই কিস্তিতে দশ টাকা ; রানুর প্রতি স্নেহশীলা এক ধনী মহিলা আমাদের ফাণ্ডে আরো দশ টাকা যোগ করলেন।[৩] ছাপানো হ'লো

১. কার্তিক ১৩৩৩ সংখ্যা 'কল্লোলে' যখন তাঁর 'শাপভ্রষ্ট' কবিতা এইভাবে, অর্থাৎ বড়ো হরফে পত্রিকার প্রথম রচনা হিশেবে প্রকাশিত হল, তখনো বুদ্ধদেব বসুর বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি।

২. যে-কোনো কবির কবিতার সঙ্গে একসঙ্গে কবিতা ছাপাতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। সুধীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "কেবল মনে একটু আপত্তি হয় যখন strange bedfellowsদের সঙ্গে আমার কবিতার মিলন ঘটাও। অনেক সময় অত্যন্ত অসবর্ণ ঠেকে। ভালমন্দর বিচারে নয় বর্ণভেদের বিচারে।" (২৫ মে ১৯৩৭)

—সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে চিঠি, ২৫ নং, চিঠিপত্র ১৬

৩. "চাঁদা তুলে টাকা জোগাড়ের বুদ্ধিটা কার সেটা মনে নেই, তবে প্রথম চাঁদাটা যে আমিই তুলেছিলাম সেটা ভুলিনি। সেই দার্জিলিঙের মায়ামাসিমাই [মায়া বসু : চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতুষ্পুত্রী] দিয়েছিলেন। চাঁদার হার পাঁচ টাকা। বুদ্ধদেব পাঁচ টাকা, প্রেমেন্দ্র মিত্র পাঁচ

চিঠি লেখার কাগজ-লেফাফা ইত্যাদি, ডিকিনসন কোম্পানির উৎকৃষ্ট বিলিতি অ্যান্টিক কেনা হ'লো। আমার অনুরোধের উত্তরে সকলেই লেখা পাঠালেন। অনিল এঁকে দিলো কিউবিস্ট ছাঁদে বিশাল অক্ষরে মলাট-চিত্র, একজন দেখে বললেন 'পেরেকের মতো'; ছেপে দিলেন পূর্বাশা প্রেসে সঞ্জয়-সত্যপ্রসন্ন বিনামূল্যে। এমনি ক'রে, অনেক ধাত্রীর পরিচর্যায়, হলুদ মলাটে চল্লিশ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনহীন, জন্ম নিয়েছিলো আমাদের ত্রৈমাসিক 'কবিতা'— এক আশ্বিনের দিনে ভবানীপুরের গলির মধ্যে সেই একতলায়...।

আমি ঝটপট একটা নামের লিস্টি লিখে ফেললাম। কলকাতার জন-কুড়ি নাগরিক—সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, অধ্যাপক— আমার চেনা, মুখ চেনা, নামে চেনা—এঁদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম একটি ছেলেকে, সঙ্গে একখানা ক'রে পত্রিকা আর অনুরোধপত্র। ছেলেটি ফিবে এলো বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিকেলবেলায়— তার চেহারা ক্লান্ত, রুমালে বাঁধা টাকা সিকি আধুলির স্তূপ। আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় সকলকেই বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিলো, প্রায় সকলেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হাতে-হাতে বার্ষিক চাঁদা দেড় টাকা— তখনকার মাপে সেটাকে খুব তুচ্ছ বলা যায় না।"

—'আমাদের কবিতাভবন', বুদ্ধদেব বসু। শারদীয় দেশ ১৩৮১

"এঁকে ওঁকে খোশামোদ করে দু'চারজনকে গ্রাহক কবা, এক একটি সংখ্যা পঞ্চাশ পয়সায় বিক্রি করা, এই সব দুঃখময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার আর বুদ্ধদেবের মতো একমাত্র সমবেরই একান্ত সংস্রব ছিল। মনে আছে মাত্র তিনজন ক্রেতার মধ্যে আমার বিবাহের পূর্বে পরিচিত একজন ধনী ক্রেতা সমরকে একটি অচল আধুলি দিয়েছিলেন। রাত বারোটা পর্যন্ত বসে তিনমাথা একত্র করে ভাবা হল আধুলিটা তাঁর কাছে গিয়ে বদলে আনা সংগত হবে কিনা। একটা আধুলির দাম তো আমাদের কাছে বড়ো সোজা নয়, অনেক। শেষ পর্যন্ত সমর রায় দিল, 'না, আর কোনোদিন এর কাছে যাবো না, একে আমরা মন থেকে ছেঁটে ফেললাম।' বুদ্ধদেব চেঁচিয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, 'চমৎকার decision, নাহ্, সমরের মতো হয় না। রানু আবার রাগ করলে না তো? তোমার বন্ধু।'

আট আনার ক্ষতি সেই সন্ধ্যায় আমাদের সুখের প্রতীক হয়ে রইল।"

—'সমর সেন', প্রতিভা বসু। অনুষ্টুপ সমর সেন সংখ্যা। ১৯৮৮

সামান্য একটু তথ্যের ভুল আছে লেখাটিতে— প্রথম সংখ্যা 'কবিতা'র দাম ছিল পঞ্চাশ পয়সা নয়, ছ' আনা।

পুনশ্চ বুদ্ধদেব থেকে :

"সমর যখন জমা দেবার জন্য এসপ্লানেড স্টলে দশটি কপি নিয়ে গেলো,

টাকা, মায়া মাসিমা পাঁচ টাকা, পনেরো টাকা তো উঠেই গেল। কী ফূর্তি সকলের। বাড়ি ভেসে গেল সুখের জোয়ারে। সান্ধ্য আড্ডাটা জোরালো হল। শেষ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ টাকা চাঁদা উঠতেই শুরু হয়ে গেল কাজ।

—*জীবনের জলছবি*, প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ. ১১৮

স্টলওয়ালা বললো ওটুকু পত্রিকা ছ-আনা দিয়ে কে কিনবে— কিন্তু দু-দিন পরেই শুনলাম তার আরো দশ কপি চাই। বন্ধু, যাঁরা কলকাতার বাইরে আছেন, বন্ধুর বন্ধুরা— এই পরিচয়ের মণ্ডল থেকে আরো কিছু নাম উঠলো আমার সম্পাদকীয় খাতায়, প্রথম বছরে গ্রাহকসংখ্যা সত্তরে ঠেকেছিলো, মনে পড়ে। আর এই সত্তরের মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ অযাচিত ও অজানিত তাঁরা প্রায় সকলেই হিজলি-বা দেউলি-নিবাসী রাজবন্দী— এই কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

—'আমাদের কবিতাভবন', বুদ্ধদেব বসু। শারদীয় দেশ ১৩৮১

'কবিতা'ই কি প্রথম?

"সে-সময়ে আমার ধারণা ছিলো নিখিলভারতে 'কবিতা'ই প্রথম কবিতা-পত্রিকা (আহ্‌মেদাবাদ থেকে একটি গুজরাতি 'কবিতা' বেরোয় খুব সম্ভব তার পরের বছর ও আমাদেরই দৃষ্টান্তে)— কিন্তু অনেককাল পরে, ব্রজেন বাড়ুয্যে বা অন্য কোনো গবেষকের লেখায় পড়েছিলাম ঢাকা থেকে এক মহিলা একটি কবিতা পত্রিকা বের করেন উনিশ-শতকের কোনো-এক সময়ে। একজন মহিলা, তার উপর অনগ্রসর ঢাকা শহরে অতকাল আগে— ঘটনাটা চমকপ্রদ সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-বিষয়ে অন্য কোনো তথ্য আমি কখনোই জানতে পারিনি।"

—আমাদের কবিতাভবন, বুদ্ধদেব বসু। শারদীয় দেশ ১৩৮১

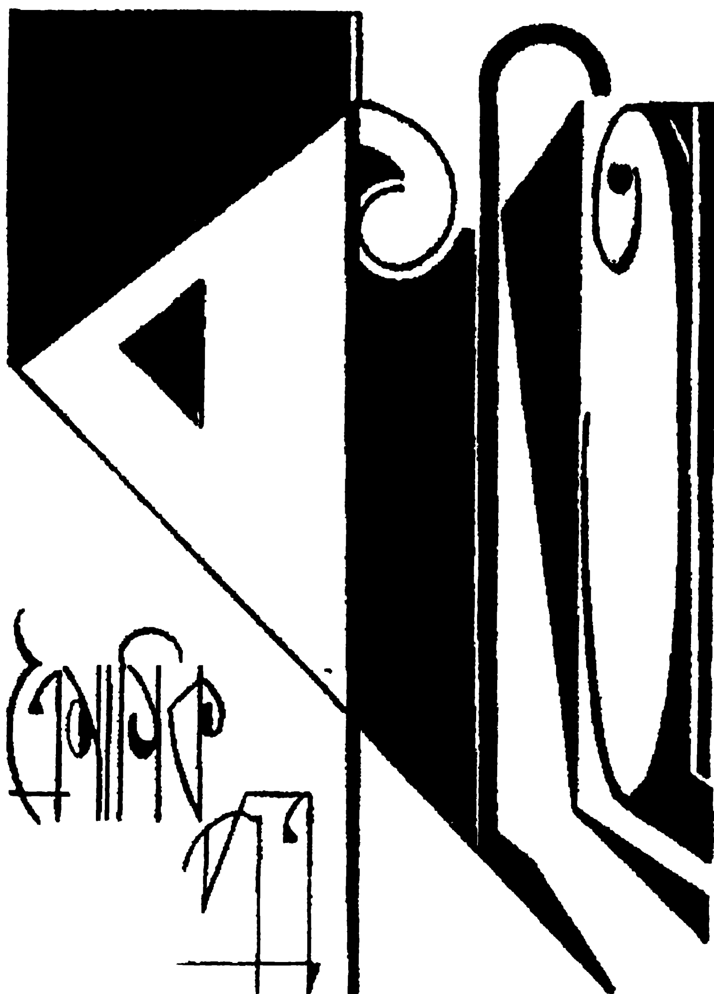
এই সম্পর্কে সুধীর রায়চৌধুরী লিখেছেন :

"বস্তুতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য' র (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩৩ ১৯৬৪) তালিকায় কোনো মহিলা সম্পাদিত কবিতা পত্রিকার উল্লেখ নাই। তবে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হরিশচন্দ্র মিত্র 'কবিতা-কুসুমাবলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার উদ্দেশ্য বিষয়ে বলা হয় "বঙ্গীয় উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকথা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণবর্দ্ধনই এতৎ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।" যাহা হউক 'কবিতা' পত্রিকার প্রভাব ও গুরুত্বের সঙ্গে এই স্বল্পস্থায়ী প্রাথমিক প্রচেষ্টার কোনো তুলনাই হয় না।"

—"বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি' থেকে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ"
কলকাতা ২০০০। নববর্ষ ১৩৯১

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

"ঈষৎ ভয়ে-ভয়ে এক কপি পত্রিকা পাঠালাম রবীন্দ্রনাথকে, প্রার্থনা করলাম তাঁর একটি কবিতা। ভয় এজন্যে নয় যে আমাদের ক্ষুদ্র উপচার তাঁর পছন্দ হবে না—সেটা প্রায় প্রত্যাশিত বলা যায়; পাছে, তাঁর অসামান্য সৌজন্য ও কর্তব্যবোধের তাগিদে, তিনি লিখে পাঠান কোনো দায়সারা গোছের সার্টিফিকেট, অথবা তাঁর ঝুলি হাৎড়ে বের ক'রে দেন দু-চার লাইনের কোনো পদ্য-বিন্যাস — যেমন দেখা যেতো সে-কালে অনেক মাসিকপত্রে ও কবিতার বইয়ের



প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন,
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ,
অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়
হেমচন্দ্র বাগচী

বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা | আশ্বিন ১৩৪২ | প্রতি সংখ্যা ছয় আনা

'কবিতা' পত্রিকাব প্রথম সংখ্যাব প্রচ্ছদ

বিজ্ঞাপনে— সেটাই ছিলো আশঙ্কা। কিন্তু আমাদের সব দ্বিধা উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত এলো [কলকাতা থেকে পাঠানো বুদ্ধদেবের পত্রের তারিখ ৩০/৯/৩৫— আর শান্তিনিকেতন থেকে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের জবাবের তারিখ ৩/১০/৩৫ !] তাঁর উত্তর — মস্ত একখানা তুলোট কাগজের এপিঠ-ওপিঠ ভর্তি সেই অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষর, যার তুলনা আমি দেখেছিলাম বহুকাল পরে অক্সফোর্ডে এক প্রদর্শনীতে টেনিসন ও রবার্ট ব্রিজেস্-এর পাণ্ডুলিপিতে ; উপরন্তু এলো তাঁর আনকোরা নতুন লম্বা-মাপের গদ্য-কবিতা 'ছুটি' (আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি)— তাঁর সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ একটি রচনা। চিঠিখানা প'ড়ে বুঝেছিলাম তিনি দৃষ্টিপাতমাত্র সরিয়ে রাখেননি এই নতুন পত্রিকাটিকে, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশের যোগ্য ব'লেও ভেবেছিলেন। আর সেই যে কিছুদিন আগে 'বন্দীর বন্দনা' বিষয়ে তাঁর ক্ষুদ্র নিবন্ধ পড়েছিলাম 'বিচিত্রা'য়— যা, আমার বিশ্বাস, দিলীপ রায়ের উপরোধ ছাড়া তিনি কখনোই লিখতেন না ['নবীন কবি' প্রবন্ধ 'বিচিত্রা', কার্তিক ১৩৩৮ : দ্র ১৯৩১]— তাব মতো উপমানির্ভর নির্বিশেষ ভাষা নয় এই চিঠির ; এখানে তাঁর ভিতরকার সমালোচকটিকেও দেখা যাচ্ছে। সত্যি বলতে, আমার সমকালীন কোনো-কোনো কবির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য গ্রথিত আছে শুধুমাত্র এই পত্রটিতেই, এবং এটি ছাপা হয়েছিলো শুধু 'কবিতায়' যা আজকেব দিনে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য ; তাই, যদি বা ভবিষ্যতে কোনো কাজে লেগে যায়, এখানে তার পুরো লেখন উদ্ধৃত করছি।

[চিঠিটি এখন পাওয়া যায় বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ১৬-তে : রবীন্দ্রনাথের চিঠি বুদ্ধদেব বসুকে, পত্র নং ৪]

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু—

তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেকটি রচনাব মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারি দল-বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে। অল্পদিন আগে পর্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। গদ্যছন্দের রাজত্বে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা আছে যথার্থভাবে তার মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন। বস্তুত সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দুরূহ। বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারে যে মোহ সৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত পদ্যে গদ্যছন্দের কারুশিল্প কৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্দ্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারে না। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ। কেবল দেখলুম স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতাটি পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে

পারেনি। পূর্ব অভ্যাসের বাঁধন তার পায়ে জড়িয়ে আছে, গদ্যের জুতোজোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুন্টিবিরল পদ্যনূপুরের উদ্বৃত্ত। অথচ অন্যত্র এই ছদ্মনামা কবির লেখায় অবাধ ছন্দের কলাদক্ষতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তা বলে তাঁর এ কবিতাটি বর্জনীয় নয়— আমি যা বলেছি সে আঙ্গিকের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে লেখাটির উপভোগ্যতা অস্বীকার করতে পাবিনে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তামাসা' কবিতাটিতে পাহাড়তলীর বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগলো ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে অথচ সহজে নয়। বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে, সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তাব বচনায় পবিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাট বাঁধানো দিঘির পাশাপাশি পাইন বনেব ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পাবে না। সাইকলজির আকাঁড়া ইংরেজি শব্দ বাংলা কাব্যের জঠরে চালান করতে পাবো, কিন্তু সেটা হজম না হয়ে আস্ত থেকেই যাবে। সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যেব রূঢ়তার ভিতর দিয়ে পদ্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'নীলিমাকে' কবিতাটি পূর্বেই দেখেছিলাম এবং প্রশংসাও করেছি। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে। তার একটি কারণ— তাঁর কাব্য অনেকখানি রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে —নিয়েছে নিঃসংকোচে— অথচ তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ তাঁর আপন। তাঁর স্বকীয়তা চেষ্টামাত্র করেনি অনন্যত্বের স্পর্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তিস্বীকার উপেক্ষা করতে। এ সাহস ক্ষমতারই সাহস। এবারে তাঁর জন্মান্তর কবিতাটি বিশেষ ভালো লাগল। সুধীন্দ্রর কাব্যকে গাল দিয়েও সমালোচকরা সম্মানিত করেনি এই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে— এ ছাড়া অজিত দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব।

আমার কাছ থেকে কবিতা চেয়েছ। জান না আমার কলমটাকে পিঁজরাপোলে পাঠাবার সময় এসেছে। অন্তর্যামী জানেন এখন না-লেখার চর্চা করাই আমার চরম সাধনা। অনেকদিন লেখা চালিয়েছি এখন যদি পরের দাবীতেও অভ্যাসের নেশায় লেখা না থামাতে পারি, তাহলে অপঘাত ধ্রুব। এই যে তোমাকে দীর্ঘ চিঠিখানা লিখলুম এটা উজান ঠেলে। শরীর আমার নিরতিশয় ক্লান্ত, মন তাই কর্মবিমুখ। তোমাদের তো সম্বল কম নেই দেখতে পাচ্ছি— আমার কাছে প্রার্থনা করে লজ্জায় ফেলো না। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"চিঠিখানায অনেকটাই আছে গদ্যছন্দেব কথা— তাই বলে কেউ যেন না ভাবেন 'কবিতা'ব প্রথম সংখ্যাটি বিশেষভাবে গদ্যকবিতাকে আশ্রয দিযেছিলো। কিন্তু আমবা অনেকেই গদ্যকবিতা লিখছি তখন, এই নতুন প্রকবণটি নিযে তর্ক চলছে অনবরত, ববীন্দ্রনাথকেও সমর্থনকল্পে বিস্তব লেখা লিখতে হচ্ছে— এই চিঠিকে তাব একটি টুকবো বলা যায। আমবা বুঝতে পাবছিলাম, সুধীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশঙ্কবেব অনমনীয বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, গদ্যকবিতাব প্রতিষ্ঠালাভেব আব দেবি নেই— যদিও কল্পনাও কবতে পাবিনি যে মাত্র তিন দশকেব ব্যবধানে, এক নতুন প্রবংশেব হাতে, কবিতাব অর্থই দাঁড়াবে গদ্যকবিতা— আদ্যাশক্তি অক্ষবছন্দেব পজাবি সাবা দেশে প্রায কেউ থাকবে না।"

—'আমাদেব কবিতাভবন', বুদ্ধদেব বসু। শাবদীয দেশ ১৩৮১

'টাইমস লিটেবাবি সাপ্লিমেন্টে' 'কবিতা'ব আলোচনা

"কী মনে ক'বে এডওযার্ড টমসনকেও একখানা 'কবিতা' পাঠিযেছিলাম— সে সমযকাব একমাত্র শ্বেতাঙ্গ, যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব চর্চা ক'বে থাকেন। আমাব সঙ্গে তাব কখনো দেখা হযনি, কিন্তু শুনেছিলাম সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যেও তিনি আগ্রহবান, সুধীন্দ্র দত্তব শুক্রবাব-সভায একবাব তাকে দেখাও গিযেছিলো। কযেকমাস পবে দৈবাৎ আমাব হাতে পডলো একখানা টাইমস লিট্রেবি সাপ্লিমেণ্ট, খুলেই শিবোনামা দেখলাম— 'BENGAL A LAND MADE FOR POETRY . ববীন্দ্রনাথেব শেষ কবিতাব বই 'বীথিকা' আব 'পবিচয', 'কবিতা' ও মাদ্রাজেব ইংবেজি পত্রিকা 'ত্রিবেণী'কে অবলম্বন ক'বে দীর্ঘ একটি সম্পাদকীয প্রবন্ধ— লেখক যে এডওযার্ড টমসন তা কাউকে ব'লে দিতে হয না। আমাদেব অভ্যর্থনা এতদূব গডাবে ভাবিনি, কিন্তু ঠিক তখনই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিবিব থেকে বেবিযে আসতে লাগলেন বাজবন্দীবা— এক ধাক্কায আমাদেব অর্ধেক গ্রাহকেব নাম উডে গেলো, আমাকে বেবোতে হ'লো বিজ্ঞাপনেব চেষ্টায।"

—তদেব।

[এডওযার্ড টমসনেব লেখাটিব প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত হযেছে ১৯৩৬ সালেব বিববণে— টমসনেব মৃত্যুতে কবিতা পত্রিকায বেবিযেছিল।]

প্রথম সংখ্যা 'কবিতা'র সূচি

প্রেমেন্দ্র মিত্র	:	তামাসা
বুদ্ধদেব বসু	:	চিল্কায় সকাল
		ঘুমের গান
		বিরহ
বিষ্ণু দে	:	পঞ্চ মুখ

সমর সেন	:	Amor stands upon you
		মুক্তি
		স্মৃতি
		প্রেম
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	:	জাগরণ
		জন্মান্তর
জীবনানন্দ দাশ	:	মৃত্যুর আগে
অজিতকুমার দত্ত	:	ন খলু ন বাণঃ
প্রণব বায	:	আলাপ
স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়	:	প্রচ্ছন্ন
হেমচন্দ্র বাগচী	:	সমাপ্তির সুর

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় : 'কবিতার দুর্বোধ্যতা'

শুধুমাত্র কবিতাব জন্য এই রকম একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন নিয়ে কোনো আলোচনা নেই— তার বদলে একটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ, 'কবিতার দুর্বোধ্যতা'। সেকালে আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন দত্তে অভ্যস্ত বাঙালি পাঠকের যেটি প্রধান আপত্তি ছিল তাকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে, আধুনিক কবিতার মূল দর্শনটির সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেয়া হল— সম্ভবত এই প্রথমবার। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করলে বোঝা যাবে যে এই পত্রিকা আধুনিক কবিতার সপক্ষে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আসরে নেমেছে। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান অভিযোগ যে দুর্বোধ্যতা, তার উত্তরে লেখা হল :

"... এখন বলতে গেলে, কবিতা সম্বন্ধে 'বোঝা' কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। কবিতা 'বুঝিনে' ; কবিতা আমবা অনুভব কবি। কবিতা আমাদের কিছু 'বোঝায়' না ; স্পর্শ করে, স্থাপন কবে একটা সংযোগ। ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণই এই যে তা 'বোঝা' যাবে না, 'বোঝানো' যাবে না। যে-কবিতা বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বোঝা যায় তার উচ্চতম রূপ আঠারো শতকের ইংরেজি কবিতা : তাতে আর সবই আছে, কবিতা নেই। যে-কবিতা পড়বাব সঙ্গে-সঙ্গে নিতান্তই বোঝা গেলো, সে-কবিতা লংফেলো মিসেস হেমান্সদের, ইস্কুলের পাঠ্যকেতাব তার পরম গৌরবময় কবর। যা 'বোঝবার' জিনিশ, বোঝাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা ফুরিয়ে যায়, কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি-অতীত বুদ্ধি-পলাতক যে-বিরাট উদ্বৃত্ত, যে-জ্বলন্ত ভাবমণ্ডল— যেখানে অপরূপ ধ্বনির আর অলৌকিক ইঙ্গিতের সীমাহীনতা— কবিতা তো তা-ই, তা ছাড়া আর কী? সেটা 'বোঝা' যায় না, 'বোঝানো' যায় না ; যে নিজে না দ্যাখে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না তাকে। রামকৃষ্ণ পরমহংস-বর্ণিত ঈশ্বর-

উপলব্ধির মতো এ-উপলব্ধিও অসংবেদনীয়।

... এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে কবিতা যত অল্প 'বোঝা' যাবে ততই তা উচ্চতর শ্রেণীর এবং বিশুদ্ধ কবিতায় বোঝাবুঝির কোনো বালাই-ই নেই। এমন যদি হয় যে কেউ জিজ্ঞেস করে 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কি 'Tiger! Tiger! Burning bright' কবিতার অর্থ কী, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ এ-কথাই ব'লে উঠতে হয় : 'অর্থ! অর্থ আবার কী!' সত্যি-সত্যি ও ছাড়া কোনো উত্তর নেই। অবিশ্যি অধ্যাপকদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করছি না : তাঁরা অধ্যাপক, তাঁরা সবই পারেন।

... এমন পাঠকের নিশ্চয়ই অভাব নেই যার কাছে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্য-রচনা 'অর্থহীন' ঠেকে, ঠিক যেন 'বোঝা যায় না, কেমন অস্পষ্ট ঠেকে, একটা হাতল পাওয়া যায় না যেটা আঁকড়ে কবিতাটাকে বাগানো যায়। বাংলাদেশে কবিতা যাঁরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে মনে-মনে— কি কখনো-কখনো প্রশংসনীয় প্রকাশ্যতায়— রবীন্দ্রনাথের চাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ কি নজরুল ইসলামকে অনেকে বেশি পছন্দ করেন। কেননা শেষোক্ত কবিদের রচনার একটা নির্দিষ্ট 'বিষয়' আছে, তা স্পষ্ট ও স্পর্শসহ, তার বোধগম্যতা বুদ্ধিসাপেক্ষ। আমার বক্তব্যের আর-একটা মস্ত প্রমাণ এই যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আমাদের দেশে 'কথা ও কাহিনী'র প্রচারই বহুলতম; কেননা সেখানে আছে সুনির্দিষ্ট বিষয়, আছে বোধগম্যতা।"

'কবিতা' পত্রিকায় অনুসৃত আরো একটি নান্দনিক নীতি— যে নীতি 'কবিতা'র সমগ্র আয়ুষ্কাল ধরে প্রতিফলিত হয়েছে— তা স্পষ্ট হয়েছে এই প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। তা হল, আধুনিক কবিতার কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্রে অবস্থান নির্ণয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথকে কম্পাস হিশেবে ব্যবহার করা। আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই যে শ্রেষ্ঠতম, এই দৃষ্টিভঙ্গি 'কবিতা'য় প্রাধান্য পেয়েছে —রবীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন। এবং তার পরেও— রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধার ভাব 'কবিতা' পত্রিকা থেকে কখনো বিদায় নেয়নি।

এবং এই শ্রদ্ধা শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্যই, অন্য কোনো কারণে নয়। অন্য যে সব অসাহিত্যিক কারণে বাঙালি ভদ্রলোকেরা রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি করেন —তাঁর পারিবারিক মর্যাদার জন্য (স্বয়ং প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ড পড়ে, রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, এটি রবীন্দ্রনাথের জীবনী হয়নি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের জীবনী হয়েছে), 'দার্শনিকতা'র জন্য, দেশকে আন্তর্জাতিক সম্মান এনে দেবার জন্য, স্বাধীনতা-আন্দোলনে উদ্দীপিত নেতৃত্ব দেবার জন্য— এই কারণগুলিকে স্বীকার করেও, 'কবিতা' তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রে গেছে তাঁর সাহিত্যকীর্তিরই জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়।

'বাসরঘর' উপন্যাস

সেপ্টেম্বর মাসে দুটি বই বেরোল বুদ্ধদেবের : উপন্যাস 'বাসরঘর', এবং হালকা প্রবন্ধের সংগ্রহ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। দুটি বই-ই রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়েছিল, পড়ে পরপর দুটি চিঠিতে মতামত জানালেন রবীন্দ্রনাথ : খানিকটা অযাচিত ভাবেই, কেননা বুদ্ধদেব শুধু বই পাঠিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, কোনো মতামত প্রার্থনা করেননি। 'বাসরঘর' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"... তোমার বইখানি নিঃসংশয়েই ভালো লাগল, তাই অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েচি। গল্প হিসাবে তোমার এ-লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীব স্রোত বেগে বয়ে চলেছে। একটি নারী এবং একটি পুরুষ এই দুই তটেব মাঝখানে এর আবেগেব ধারা। ধাবার মধ্যে থেকে থেকে আবর্ত পাক খেয়ে উঠছে, কিন্তু তাব কারণগত আঘাত বাইরের দিক থেকে নয়, গভীব তলাব দিক থেকে। কাবণ যদি থাকত বাইরে, তাহলে তার ইতিহাস নিয়ে আখ্যানের উপকবণ জমে উঠতে পাবত। তাহলে এর ভিতর থেকে দস্তুরমতো একটি গল্প দেখা দিত। তুমি যেন স্পর্ধা কবেই সেটা ঘটতে দাওনি। আশপাশের দুটি একটি পাত্রকে এনেছ তোমার আঙিনায়, তাদের চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু গল্পের মর্মস্থলে প্রবেশ কবে তারা জটিলতা বিস্তাব করবাব অবকাশ পায়নি— তুমি যেন উদ্ধতভাবেই জানিয়েছ এতে তোমাদের হস্তক্ষেপের দবকার নেই, সব দরজাতেই লটকিয়ে দিয়েছ 'অনধিকাব প্রবেশ অনভিপ্রেত'। শোভাকে মাঝে-মাঝে এমন করে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছ, যে তাকে উপলক্ষ্য করে একটা অপঘাতের প্রত্যাশায় অনেক পাঠকই হয়তো উৎসুক হয়ে উঠবে। তোমার মনের কোণে সেরকম দুরভিপ্রায় যদি থাকে তবে সেটাকে তুমি ঠেলে রেখেছ নেপথ্যের অগোচরে— সদ্য পাত পেড়ে রস ভোগ করতে দাওনি পাঠকদের— লালায়িত রসনা নিয়ে তারা হয়তো দুঃখিত হয়ে ফিরবে।... তোমার গল্পের বিশেষত্ব এই যে যেখানে শেষ হোলো বই, গল্পটা রয়ে গেছে তার পরের দিকে। তুমি দেখালে বান ডেকে আসছে, তারপর বললে, বাস, আর দরকার নেই, ভাঙচুর শুরু হবে সে তো ধরা কথা, অলমতি বিস্তরেণ।... এই তোমার গল্প না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছ সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে। ইতি ২৫ অক্টোবর, ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ

একটা কথা বলে রাখি, 'কুন্তলা' নামটা[১] ভালো লাগল না। কুন্তল মানে চুল, আ-কার যোগ করে তাতে স্ত্রীত্ব আরোপ করা বৃথা। কেউ কেউ মেয়ের নাম রাখেন অনিলা— অনিল মানে হাওয়া। হাওয়াকে হাওয়ানী বলে ছদ্মবেশে চালানো যায় না। চুলকে চুলা বললে আরো দোষের হয়।..."

পত্র নং ৫ : চিঠিপত্র ১৬

১. 'বাসরঘর' উপন্যাসের নায়িকার নাম।

বুদ্ধদেব বসু উত্তর দিলেন

২৯/১০/৩৫

শ্রীচরণেষু,

'বাসরঘর' সম্বন্ধে আপনার চিঠি পেয়ে সার্থক মানছি লেখকজন্ম।... আমাদের অধিকাংশ লেখকের ভাগ্যেই জীবদ্দশায় সত্যিকারের সমাদর জোটে না : আমরা অকারণে নিন্দিত হই— এবং তার চেয়েও যা শোচনীয়— প্রশংসিত হই ভুল কারণে। কবি প্রকৃত মর্মগ্রহণের আশা করেন পেশাদার ক্রিটিকের কাছ থেকে নয়, তাঁরই সমধর্মীর কাছ থেকে— অর্থাৎ তাঁর রচনার যাচাই যদি কেউ করতে পারেন, অন্য কবিই পারবেন। খবরের কাগজে তিন কলাম সুখ্যাতি বেরুলেও আমি বিচলিত হই না, কিন্তু আমার কোনো সমধর্মী— যাঁর উপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে— একটুখানি 'ভালো লেগেছে' বললেই নিজেকে যেন সার্থক লাগে। এই অ-ফরমায়েশি স্বতঃস্ফূর্ত চিঠি যে আমার মনে খুব একটা খুশির ঢেউ তুলবে, সেটা স্বাভাবিকমাত্র।

খুব সংকোচের সহিত একটা কথা বলতে চাই। আপনি যদি অনুমতি করেন, এই চিঠিটি আমি কোনো মাসিকপত্রে প্রকাশ করি। আত্ম-বিজ্ঞাপন— না-হয় তা-ই হ'লো।... কথাটা একটু খুলে বলি। 'বাসরঘর' বইটি আমি যেমন করে কল্পনা ও রচনা করেছি তার মধ্যে এটুকু অভিনবত্ব নিশ্চয়ই আছে : গল্পকে আগাগোড়া বর্জন ক'রে গল্প বলা। যে-দেশে উপন্যাসের পাঠক পাব্লিক লাইব্রেরির চাঁদা-দেনে-ওয়ালা রেলের বাবু ও ভোজনান্ত শ্লথাঙ্গী ডেপুটি-গৃহিণী, সে-দেশে এ-ধরনের বই পাগলের প্রলাপ। আপনার এই চিঠিটি প্রকাশিত হ'লে উপন্যাসের *এই নতুন রূপটির* একটু দাঁড়াবার জায়গা হয়-তো হয়— অবিশ্যি সেই সঙ্গে আমারও পায়ের নিচে মাটি ঠেকে। আমার নিজের কথা বাদ দিয়ে বলতে পারি, এই ধরনের রচনা যে উপন্যাস বলে গ্রাহ্য, এই ধারণাই দেশের অনেক 'শিক্ষিত' লোকের মনেও নেই। অথচ ভবিষ্যৎ বাংলা উপন্যাসের যে-সব রাস্তা খোলা দেখতে পাচ্ছি এটা তার মধ্যে প্রধানতম। আপনার স্বীকৃতির কথা শুনলে লোকের হয়তো একটু চমক লাগবে : হয়তো তারা পুরোনো ও প্রিয় সংস্কারের মোহ কাটিয়ে এই নতুন গল্প-রূপকে বোঝবার চেষ্টা করবে। দরকার আছে তার। কী যে কতগুলো অন্ধ ধারণা থেকে আমাদের দেশের লোক *এখনো* উপন্যাস যাচাই [করে] আপনার 'চার অধ্যায়' সম্পর্কিত অর্থহীন আলোচনাগুলো তার আর-এক প্রস্থ প্রমাণ দিয়েছে। আপনার চিঠিটি আমি এই কারণেই প্রকাশ করতে চাই : নয়তো আত্মপ্রচার সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই অত্যন্ত লজ্জিত।

আপনি আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

বুদ্ধদেব

[বুদ্ধদেব বসুর ৪-সংখ্যক চিঠি : চিঠিপত্র ১৬]

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' বোধহয় রবীন্দ্রনাথের তত ভালো লাগেনি। এই চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু,

'বাসরঘর' উপলক্ষ্যে যে চিঠিটা লিখেছিলুম সেটা কোনো মাসিকপত্রে ছাপতে ইচ্ছা কবেচ। ছাপতে পারো।

তোমার 'হঠাৎ আলোর ঝলসানি' [যদ্দৃষ্ট] পড়ে মনে হলো লেখাগুলিতে আলোর ঝলক ভালো করে লাগেনি। নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতির স্বাদটুকু নিয়ে স্বগত উক্তি অনেক সময়ে শরতের রিক্তবর্ষণ মেঘখণ্ডের মতো আকাশপটে কাজলকালীর নিবিড় রেখা কিম্বা সোনালি তুলির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখে না। আমার অনুভূতি আমাব কাছে একান্তই প্রত্যক্ষ— অন্যের কাছে তাকে প্রত্যক্ষতা দিতে গেলে পাঠককে 'আমি' করে তুলতে হয়। অর্থাৎ নিজেকে নিজের লেখার নায়ক করে দেখানো চাই। নিজের মতামত প্রকাশ করা সহজ, কেননা সে প্রকাশ নয় সে ব্যাখ্যা, কিন্তু নিজের মেজাজ, নিজের ভালোমন্দ লাগা জৈব পদার্থ, তার সহযোগে নিজেকে ব্যক্ত করবার রসই তার রস।

পাদটীকা অংশের লেখায় জোর আছে। ইতি ৩০ অক্টোবর ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পত্র নং ৬ : চিঠিপত্র ১৬]

বইটি কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর খুব ভালো লেগেছিল। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' বেরোবার পর তিনি সমালোচনা লিখলেন—অগ্রহায়ণ ১৩৪২-এর 'বিচিত্রা'য়।

"... বুদ্ধদেবের কপালে যে নিন্দা-প্রশংসা জুটেছে তার একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে 'অতি'। এই 'অতি' জিনিশটাকে আমি ডরাই... এই কারণেই বুদ্ধদেবের কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে আমার কখনো উৎসাহ হয়নি। এ-ক্ষেত্রে সমালোচনার অর্থ হচ্ছে বাক্‌বিতণ্ডা।... আজকে যে তাঁর নতুন বইখানির প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েছি, তার কাবণ... এ-প্রবন্ধগুলি আমরা যে-জাতীয় প্রবন্ধ লিখি সে জাতীয় প্রবন্ধ নয়। অর্থাৎ এ-সব প্রবন্ধে এমন কোনো বিষয় নেই যা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেতে পারে।... এই শ্রেণীর প্রবন্ধকেই যথার্থ সাহিত্য বলা হয়। এ-জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান গুণ হচ্ছে তা কিছুই প্রমাণ করতে চায় না, কোনো-কিছু শিক্ষা দিতে চায় না।... আমার মতে 'মৃত্যু জল্পনা'ই এ-পুস্তকের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। দেহ ও মন ঐকান্তিক অবসাদগ্রস্ত হলে, মানুষের অর্ধমৃত অর্ধজীবিত মনের যে-অবস্থা হয় তার চমৎকার বর্ণনা। আমি যথার্থ পাঠককে এ-প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি।..."

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

উপন্যাস লিখছেন 'বাসরঘর', 'পারিবারিক'। ছোটোদের জন্য সাগর-রহস্য। 'কান্তিকুমাবের পঞ্চকাণ্ডে'ব গল্পগুলি— এই গল্পগুলির প্রধান চরিত্র কান্তিকুমারেব মধ্যে তাঁব এই সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভৃগু গুহঠাকুরতাব ছায়া আছে। হানস আন্ডেবসেনের গল্পের অনুবাদ করলেন :

"একদিন আমাব কাছে এলেন গঙ্গাচবণ দাশগুপ্ত নামে একটি প্রৌঢ় সজ্জন— ডেভিড হেযাব ট্রেনিং কলেজেব অধ্যাপক, সম্প্রতি প্রকাশন-কর্মে উদ্যোগী হযেছেন। তাঁব ইচ্ছে হানস আন্ডেবসেনেব গল্পগুচ্ছ বাংলা তর্জমায ছাপেন— আমি কি তর্জমা ক'বে দেবো? আমি এক কথায বাজি।... গঙ্গাচবণবাবুব ফবমাশ ছিলো তিন খণ্ডেব জন্য : 'অপৰূপ ৰূপকথা' নামে দুটি খণ্ড দ্রুত বেবিযে গেলো; কিন্তু তৃতীযটি, আমাব অজ্ঞাত কোনো কাবণে, তিনি প্রকাশ কবলেন না, পাণ্ডুলিপিও তাঁবই কাছে আটকে বইলো। কিন্তু সেই লুপ্ত বচনাব জন্য আমি দুঃখ কবি না— কেননা, এখন বুঝি, অচিবস্থাযী কিছু অর্থ ছাডা অন্য একটি প্রাপ্তিও আমাব ঘটেছিলো— আমি পেযেছিলাম একটি সোনাব মোহব যা দিনে-দিনে সুদে বেডে চলে : আমাব যৌবনে-পডা যে-ক'টি লেখক আজ পর্যন্ত আমাব সঙ্গে চলেছেন, হানস আন্ডেবসেন তাঁদেবই একজন।"

—*আমাব যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ ১০৬

'কালেব পুতুল' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বচনা আবম্ভ হল— দশ বছব ধ'বে লিখবেন।

এপ্রিলে বেবোল 'বাডিবদল' উপন্যাস, 'বাসবঘব' বেবোল সেপ্টেম্ববে। জুনে বেবোল ছোটোগল্প-সংগ্রহ 'ঘরেতে ভ্রমব এলো'।

১৯৩৬ ।। বয়স আঠাশ

এডোয়ার্ড টমসনের আলোচনা

'টাইম্‌স লিটেরারি সাপ্লিমেন্টে'র ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার ১৯৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার এডোয়ার্ড টমসন কৃত আলোচনা —যার সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মন্তব্য একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাংলা কবিতার প্রথম আন্তর্জাতিক আলোচনা এটি, সে-হিশেবে ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। টমসনের মৃত্যুর পর, আষাঢ় ১৩৫৩ সংখ্যা 'কবিতা'য় 'বিদেশী সাহিত্য' বিভাগে বুদ্ধদেব এই রচনাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ :

"... সম্প্রতি 'পরিচয়ে'ব একটি জুড়ি পত্রিকা হয়েছে, 'কবিতা', শুধু কবিতার জন্য। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা সমান বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেরিয়েছে ; যে-সব গতানুগতিক পদ্য এখনো লেখা হচ্ছে ভূরিপরিমাণে, যে-সব অসংখ্য বই 'ফুলহার', 'মুক্তামালা' বা (আরো সংক্ষেপে) শুধু 'মা' নাম নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তা থেকে তার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। প্রথম কবিতাটি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা, ঔপন্যাসিক রূপে ইতিপূর্বে তিনি সুপবিচিত। 'ইলেকট্রনেব নৃত্য' বা জ্যামিতিক বিশ্বের সঙ্গে প্রতিতুলনা করেছেন সেই সব বিচিত্র দৃশ্যের, সেই মায়ার, যার আকার নিয়ে বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ে ধরা দেয়। আর-একটি কবিতা, তার লেখক শ্রীযুক্ত সমর সেন, শিরোনামে ধারণ করেছে শ্রীযুক্ত এজরা পাউন্ডের Amor stands upon you : ...

বাংলাদেশ কবিতার দেশ। দ্বৈত তার সরলতা— একদিকে গঙ্গা, বিশাল পুরাকীর্তিত, আর-একদিকে শালসমাচ্ছন্ন উচ্চভূমি। সীমাহীন দিগন্তের চেতনা বাঙালির মজ্জাগত, বাংলা কবিতায় 'দিগন্ত' কথাটি কখনোই দূরপরাহত নয়। দ্রুত সূর্যাস্তের জন্য প্রস্তুত যে-দেশের শ্বেত আকাশ, অবাধ সমতলের আর নদীপ্রান্তিক বালুবিস্তারের সেই লীলাভূমিতে 'দিগন্ত' কথাটি স্বতই যেন জেগে ওঠে। ভোর চিৎকার ক'রে লাফ দিয়ে ওঠে আকাশে, আর সন্ধ্যা ঝাঁপ দিয়ে নামে অতলে।

বাংলা ভাষাও কাব্যপ্রাণ, তার শব্দসম্পদ এখনো চ্যুত হয়নি আদিম জীবন থেকে, যে-জীবন তার সৃষ্টির উৎস— তার শব্দরাশি প্রায়ই প্রাকৃত ধ্বনির অনুকরণ এবং সর্বদাই গীতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময়। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর আর একজন কবি, বাংলার নব্য লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা কৃতী তাঁদের অন্যতম, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু এই শব্দের দ্যোতনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। তাঁর শব্দব্যবহারে কবিতায় যেন

আলোর ঝলক লাগে, আর রঙের তীক্ষ্ণতা চমক দেয়। 'কবিতা'য় প্রকাশিত একটি কবিতাই এর উদাহরণ। চিল্কা হ্রদে সকালবেলায় আনন্দের উচ্ছ্বাস বর্ণনা করতে গিয়ে সেই জলের আর আলোর আর ঢেউয়ের বিকম্পিত উজ্জ্বলতাকেই যেন তিনি মূর্ত করেছেন এই কটি কথায়, 'চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে'। কখনো-কখনো, তাঁর বন্ধুদের মতো, তিনিও অত্যন্ত বেশি বিদ্যাবত্তার বিপদ এড়াতে পারেন না, বিদ্বান বিশ্ববাসী হবার, বিশ্বের সাহিত্য ও উপকথা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জানবার বিপদ। কবিতার ৭ পৃষ্ঠায় এমন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আছে যা প্রায় সেই স্বপ্ন-তন্দ্রিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের লেখা হ'তে পারতো, যিনি বলেছেন অর্ধ-শতাব্দী আগে 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' লিখে, আর তারই পাশাপাশি বাইবেলের সেই কাহিনীকে সুন্দর ক'রে গ্রহণ করা হয়েছে— ক্ষীয়মাণ বন্যার উপর রামধনুর আবির্ভাব। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল 'সবুজ সন্ধ্যাতারা'। ভারতীয় সূর্যাস্ত মনে আনবার চেষ্টা করলে পাঠক হয়তো ভাববেন যে সবুজ সন্ধ্যাতারা এসেছে আমাদের উত্তর-দেশের দীর্ঘায়ত সন্ধ্যা থেকে, কোলরিজের Dejection ওড থেকে, যে-কবিতার প্রসঙ্গে বায়বন তাঁর প্রসিদ্ধ প্রশ্নটি করেছিলেন— 'কেউ কি কখনো সবুজ আকাশ দেখেছে?'

বস্তুত, বর্তমান যুগ ও সর্বদেশেব সাহিত্য সম্বন্ধে এই কবিরা এতই সচেতন যে তাঁদের রচনায় প্রতিনিয়তই সন্ধানী, পান্থ ও পথিকৃৎ মনেব চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু এঁদের উদ্দেশে আমরা নিশ্চয়ই সে-কথা বলতে পারি, যে-কথা লোএল বলেছিলেন 'এনডিমিঅনে'র কীট্‌সকে লক্ষ্য ক'বে— 'সুখী সেই তরুণ কবি, যাঁর রচনায় আছে উচ্ছলতার দোষ— সেই দোষই তাকে বাঁচাবে যদি সেই সঙ্গে থাকে রূপায়ণের ক্ষমতা। সে-ক্ষমতা থাকলে আজ হোক, কাল হোক, উচ্ছলতার দোষ শোধিত হবেই।' এই কবিরা এমন একটি আন্দোলনের প্রতিভূ, বাংলা চিন্তাকে যা নতুন রূপ দেবে, আর বাংলার ভিতর দিয়ে সর্বভারতীয় চিন্তাকে।"

টমসনের রচনাটির প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব। তবে তার মধ্যে যেসব তথ্যগত ত্রুটি ছিল সেগুলির উল্লেখ করলেন নিজস্ব মন্তব্যে—

"টমসনের এই প্রবন্ধে তথ্যের কিছু ভুল ছিলো : 'পরিচয়' কখনোই দ্বিমাসিক ছিলো না, বুদ্ধদেব বসুকে 'পরিচয়'-গোষ্ঠীভুক্ত বললে ঠিক কথা বলা হয় না, এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতিও উপন্যাসে নয়, ছোটো গল্পে। তাছাড়া 'বন্যার উপরে ইন্দ্রধনু'তে বাইবেলের এবং 'সবুজ সন্ধ্যাতারা'য় কোলরিজের প্রভাব টমসনের কল্পনা মাত্র, উভয় ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য দৈবানুগত। কিন্তু এ-সব ত্রুটি মোটেও মারাত্মক নয়। মোটের উপর তাঁর আলোচনায় সৎবুদ্ধি, রসজ্ঞতা এবং বাংলার জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে। আজকাল শোনা যাচ্ছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা লেখবার উদ্যোগ করছেন অনেকেই— এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কে কী বলেছেন তাঁরা তা জানতে চান— আশা করি এই উদ্ধৃতি তাঁদের পক্ষে ঔৎসুক্যকর হবে।"

'অনুরাধা' নাটক ও 'লিট্‌ল থিয়েটার'

বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু উভয়েই ভক্ত ছিলেন নাটক লেখার, মঞ্চে অভিনয় করার। পাঠকের মনে থাকবে, নোয়াখালি-বাসের শেষ দিকে পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে নাটকের দল গড়েছিলেন বুদ্ধদেব— অভিনয় করতেন 'মেঘনাদবধকাব্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' ইত্যাদি কাব্য থেকে নির্বাচিত অংশ, স্থানীয় 'এলিটবৃন্দের' প্রশংসাও পেতেন (দ্র. ১৯২১)। বিশেষ করে অভিনয় করার সময় তাঁর কৈশোরের শত্রু তোতলামি শাসনে থাকত— অভিনয়ে উৎসাহের সেটা হয়তো একটা বড়ো কারণ ছিল। মধ্য যৌবনে অভিনয়ও করেছেন তিনি— ফাসিস্টবিরোধী সংঘের প্রযোজনায় 'রথের রশি' নাটকে। আর মঞ্চোপযোগী নাটক লেখা আরম্ভ হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে, যখন তাঁর লেখা 'একটি মেয়ের জন্য' নাটকটি, সামান্য কাটছাঁট করে, জগন্নাথ হল্‌-এ অভিনয়ের জন্য অনুমোদন করেছিলেন অধ্যক্ষ রমেশচন্দ্র মজুমদার (দ্র. ১৯৩০)। প্রতিভা বসুও ছোটোবেলা থেকেই নাটকে ও অভিনয়ে উৎসাহী— যখন তিনি বুদ্ধদেবের 'যেদিন ফুটলো কমল' উপন্যাসের নাট্যরূপ ঢাকার মঞ্চে টিকিট কেটে, স্ত্রীপুরুষের মিলিত অভিনয় হিশেবে উপস্থাপিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ১৭ পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি (দ্র. ১৯৩৩)। 'অনুরাধা' সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

> "সুধীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন 'গদ্য-পদ্যেব বিরোধভঞ্জন' সেই কথাটা তখন নতুন উঠেছে— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই প্রথম। আমরা পেয়েছি 'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ'— একটাতে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কথ্যরীতি, অন্যটায় গদ্যের কাব্যিক ব্যবহার। হাতে-হাতে ঘুরছে এজরা পাউন্ড আর টি. এস. এলিয়ট, মুখে-মুখে বাংলা পদ্যর রূপান্তর-প্রস্তাব। এই সব কথাবার্তার ধাক্কায় আমি আস্ত একটা কাব্য-নাট্য লিখে ফেললাম— তার পটভূমি হাল-আমলের কলকাতা, ছন্দ প্রবহমান পয়ার, মাঝে-মাঝে ছিলো অদৃশ্য যুক্তবর্ণ একমাত্রায় বসানো— যে কাজটি পরে আরো সুষ্ঠুভাবে করেছিলো সুভাষ তার 'পদাতিকে'ব কবিতায়। আমাব সেই 'অনুরাধা' নাটক কখনো বই হ'য়ে বেরোয়নি,[১] তার কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করলে কৌতূহলজনক হ'তে পারে। শুরুতে ছিলো দীর্ঘ একটি প্রস্তাবনা :
>
> রাত্রি হ'য়ে এলো শেষ। ধূসর মসৃণ
> পথ শূন্য প'ড়ে আছে, যেন অন্তহীন
> প্রতীক্ষার দীর্ঘ দৃষ্টি অপল্লব চোখে
> পার হ'য়ে পৃথিবীর সবুজ আলোকে
> মিশে গেছে সময়ের সুড়ঙ্গ-গহ্বরে।

---

১. নাটকটি পরে ছাপা হয়েছে '৩০শে নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী' ১৯৮৭-তে।

নির্ভুল নিয়মে অনুক্রমি পরস্পরে
প'ড়ে আছে যুগ্ম ট্রাম-লাইন...

সংলাপে হালকা চালের চেষ্টা ছিলো।

লেখাটার বিচারে বসলে তেতো-কড়া অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু উপস্থিত জরুরি কথাটা এই যে এটাকে উপলক্ষ ক'রে আমরা অনেকগুলো আনন্দের সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম। আমরা এটাকে মঞ্চে চড়াতে যাচ্ছি, আমাদের ছোটো বাসার ঘরটিতে মহড়া চলছে— দলে জুটেছে প্রেমেন, আমাদের চিত্রকর-বন্ধু যে বাঁশিও বাজায়, এক আত্মীয় যিনি অভিনয়ে অভ্যস্ত, আর একটি ঢাকার মেয়ে যে অল্পস্বল্প গাইতেও পারে— নাটকের মধ্যে গানও আছে কয়েকটা, রানু সুর দিয়েছে। রানুই সাজবে নায়িকা, আমি নায়ক— যেহেতু অত লম্বা পার্ট মুখস্থ করতে আর-কেউ রাজি নয়। একটা শান-বাঁধানো বড়ো-শড়ো উঠোন ছিলো বাড়িটায়— সেখানে স্টেজ খাটিয়ে আলো ভাড়া ক'রে অভিনয় হ'লো এক শীতের সন্ধ্যায়, আমাদের নিমন্ত্রিত গুণী-মানীরা এলেন প্রায় সকলেই, কেউ-কেউ পরের দিন চিঠিও লিখলেন।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ ১০৩

প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথা থেকে :

"'কবিতা' পত্রিকা বেরুবার অনতিপরেই বুদ্ধদেবকে বললাম, 'এসো, আমরা এবার একটা নাটকের দল গড়ি।'

সন্ধেবেলা প্রেমেনবাবু এলে তাঁকে বলা হল। বুদ্ধদেব বললেন, 'মন্দ কী?' কথাটা শুনে প্রেমেন মিত্র বিষম উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'খুব ভালো, খুব ভালো। কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রী পাব কোথায়?'

আমি বললাম, 'কেন, আমরা, আমরাই তো কতজন আছি।'

'আমরা, আমরা। মানে আমিও নয়তো?'

হাসতে হাসতে অস্থির।

আমি বললাম, 'আহা, এতে হাসির কী আছে? আপনি তো নিশ্চয়ই, আপনার স্ত্রীকেও আনতে হবে, বুদ্ধদেব আছেন, অনিল ভট্টাচার্য আছে, আমি আছি, দাদা আছে—'

... স্ত্রী-পুরুষের নাটুকে দল তখন কী ভয়ংকর ব্যাপার তা আমি বিবাহের পূর্বে বুদ্ধদেবের 'যেদিন ফুটলো কমল' করেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কিন্তু জেদটা আমার যায়নি, ইচ্ছেটাও যায়নি।

শেষ পর্যন্ত নাটক আমরা সত্যিই করলাম একটা। স্ত্রী-পুরুষে মিলেই করলাম। বুদ্ধদেব প্রেমেন মিত্র অনিল ভট্টাচার্য সবাই নামলেন সেই নাটকে।...

বুদ্ধদেব নাটকের দলটির নাম দিলেন লিট্‌ল থিয়েটার। নাটকটির নাম 'অনুরাধা'। বুদ্ধদেবই লিখে দিলেন সেই উপলক্ষে। নাটকটি পয়ারে লেখা।

আমাদের যোগেশ মিত্র রোডের বাড়ির ভিতরে সুন্দর বাঁধানো একটি ছোট উঠোন ছিল। সেই উঠোনেই মঞ্চ বেঁধে করা হল সেই নাটক। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে তখনকাব সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবা অনেকেই নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে আমন্ত্রণ পেয়েই চলে এলেন দেখতে। তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীও এসেছিলেন। এসেছিলেন অমল হোম এবং খোদনদি, শিশির ভাদুড়ী এসেছিলেন কিনা মনে পড়ছে না, তবে এলে নিশ্চয়ই এত বড়ো ঘটনাটা ভুলতাম না। তাঁকে আমি আর বুদ্ধদেব গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। খুব উতরোল নাটকটি।"

—*জীবনের জলছবি*, প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ. ১১৯

নাটকটি অভিনীত হয় খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি— কারণ শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের 'পরিচয়ের আড্ডা' গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি, 'পরিচয়ে'র আড্ডায় এই নাটকের আলোচনা হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি (পৃ. ১১)।

পি. ই. এন ক্লাব : আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে পরিচয়

"অনুরাধা নাট্যানুষ্ঠানেব কযেক মাস আগে— বর্ষার শেষ তখন [অর্থাৎ ১৯৩৫ সাল]— ভাবতীয পি. ই. এন. ক্লাবেব একটি শাখা স্থাপিত হ'লো কলকাতায —উদ্যোক্তা মণীন্দ্রলাল বসু ও সুধীরকুমার চৌধুরী, আমবা অনেকেই সভ্যশ্রেণীভুক্ত। তার উদ্বোধন উপলক্ষে যে-মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হয়েছিলো, সেটি আমার খুব মনে পড়ে।

... গিয়ে দেখি চেনা-অচেনা অনেকেই এসেছেন : সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, আধা-সাহিত্যিক, এবং কতিপয় অজ্ঞাতগোত্র বা 'নন-ডেসক্রিপ্ট'— শুনেছিলাম 'এন' অক্ষরটিতে তাঁদেরও জন্য স্থান আছে। একটি লম্বা টেবিলে বিশিষ্টতমদের জন্য ব্যবস্থা; আমরা বসেছি, আরো সুখজনকভাবে, এক-এক টেবিলে চারজন ক'রে।... দুটি বক্তৃতা হ'লো— আমার অন্তত দুটিব বেশি মনে পড়ে না— প্রথমটি শরৎচন্দ্রের।

শরৎচন্দ্র এলেন একটু দেবি ক'রে, কোনো খাদ্য গ্রহণ করলেন না— সেদিন বোধহয় তাঁর উপবাস ছিলো অথবা তিনি ভিন্ন নিয়মে চলেন। শুভ্র খদ্দব পবেছেন, তাঁর চুল ধূসরাযমান ও ঈষৎ বিস্রস্ত, মুখের ছাঁদ কৃশ ও দৃষ্টি উজ্জ্বল— যে আমি যৌবনপ্রাপ্তিব পরে তাঁর লেখা আর ভালোবাসতে পারিনি আর সেই কারণে তাঁর কাছেও ঘেঁষিনি কখনো— সেই আমারও তাঁকে দেখে সম্ভ্রম হ'লো। তিনি বললেন খুব ঋজুভাবে : যে-অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিশেবে আমন্ত্রিত তার প্রশংসা করলেন না, বরং তিরস্কার করলেন এই ব'লে যে আমাদের মতো দেশে এটা একটা বিলাসিতামাত্র, সাহিত্যিকের বৃত্তি অথবা জীবনের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। শরৎচন্দ্রের পর উঠে দাঁড়ালেন ঝকঝকে অন্নদাশঙ্কর, 'পথে-প্রবাসে' লিখে টাটকা খ্যাতিমান; ধীরে-ধীরে, সযত্নে কথা বেছে, অনেক শ্লেষ ও যমক মিশিয়ে শরৎচন্দ্রকে খণ্ডন করলেন তিনি : 'আমরা লাঞ্চন খেতে এসেছি, লাঞ্ছন হ'তে

আসিনি—' তাঁব এই কথাটায ঝিবিঝিবি হাসি ব'যে গেলো। অন্নদাশঙ্কব খুব বাহবা পেলেন আমাদেব কাছে, কিন্তু আমি মনে-মনে শবৎচন্দ্রেব সঙ্গে একমত হযেছিলাম।

সেদিন আমাব টেবিল-সঙ্গীদেব মধ্যে একজন ছিলেন আবু সযীদ আইয়ুব — তাঁব লেখা দেখেছিলাম 'পবিচযে' কিন্তু আগে বোধহয সাক্ষাৎ হযনি।.. তাঁব আদি বাসভূমি যে বিহাব, ও মাতৃভাষা ছিলো কৈশোব পেবিযেও উর্দু, ইংবেজি 'গীতাঞ্জলিব'ব সম্মোহনে প্রথম উৎসুক হন বাংলাব দিকে, আব তাব পব থেকে ভাষায ও বেশবাসে ও মানসতায হ'যে ওঠেন পুবোদস্তুব বাঙালি— এ-সব কথা আমি অনেক কাল পবে তাঁবই মুখে শুনেছিলাম, কিন্তু সেই প্রথম দেখায কল্পনাও কবিনি তিনি জাত-বাঙালি নন।

যতদূব মনে পড়ে, সেই ভোজেব সভায হুমাযুন কবিবেব সঙ্গেও আমাব প্রথম দেখা হযেছিলো— আব তাবপব খুব অল্প সমযেব মধ্যে তিনি আমাকে কাছে টেনেছিলেন। সুপুরুষ নন— কিন্তু তরুণ অশ্বেব মতো চঞ্চল ও প্রাণবন্ত, যেমন ক্ষিপ্র তাঁব বুদ্ধি তেমনি তাঁব উদ্যম অপবিমাণ। তাঁব উৎসাহেব দুটি প্রধান বিষয বাজনীতি ও সাহিত্য, অথবা বলা যায তাঁব মন ও-দুটি অসবর্ণ কক্ষে বিভক্ত— আমাব সঙ্গে তাব সংযোগ অবশ্য সাহিত্যেব সূত্রেই। বছবদুই পবে 'পবিচযে'ব প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা তাঁব 'চতুবঙ্গ' যখন বেব কবলেন [আশ্বিন ১৩৪৫], তখন আমি বইলাম তাঁব সহকর্মী, প্রথম বছবে তাঁব সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক, তাবপব বহুকাল ধ'বে লেখক হিশেবে সম্পৃক্ত। উত্তবকালে, স্বাধীন ভাবতে, তিনি যখন দিল্লিব দপ্তবে তুঙ্গ স্থানে অধিষ্ঠিত, তখনও তাঁকে দেখেছি সাহিত্যেব প্রতি আসক্ত ও বাংলা ভাষায চর্চাপবাযণ। এবং, সাবা দিল্লি-কলকাতাব সবকাবি মহলে বাঙালি সাহিত্যিকেব দবদী বন্ধু যে তাঁব মতো আব কেউ ছিলেন না, এ-কথাও আমি প্রত্যক্ষভাবে জেনেছিলাম— অন্যদেব উদাহবণ থেকেও, আমাব নিজেব জীবনেও। এক দারুণ অর্থসংকটেব সমযে, আমি নিরুপায হ'যে তাঁকে একটি চিঠি লেখা মাত্র, তিনি আমাকে নিশ্বাস ফেলাব অবকাশ ক'বে দিযেছিলেন ছ'মাসেব জন্য য়ুনেস্কোব একটি প্রকল্পেব সঙ্গে আমাকে যুক্ত ক'বে; আমাব প্রথম বিদেশযাত্রাও তাবই পবামর্শ ও উদ্যোগে ঘটেছিলো— আমাব নিজেব কল্পনায তা ছিলো না।"

—*আমাব যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ ১০৭

'কবিতা' পত্রিকা থেকে প্রকাশনার আরম্ভ

'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশেব প্রায সঙ্গে সঙ্গেই আবম্ভ হল গ্রন্থপ্রকাশ কবা। প্রতিভা বসু লিখেছেন :

"কবিতা বিষযে যে খেদ বা অসম্মানেব প্রতিক্রিয়ায কবিতা নামক পত্রিকাব সৃষ্টি, কবিতাভবন প্রকাশনসংস্থাও সেই খেদেবই অন্য বকম পবিণাম। পববর্তী জীবনে যাঁবা গণ্যমান্য শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠিত লেখক তাঁদেব প্রায় সকলেব লেখাই কবিতা

পত্রিকায় বা কবিতাভবন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' উল্লেখযোগ্য।... আরো একটা বিষয়েও কবিতাভবনই অগ্রাধিকারের দাবিদার। বইয়ের প্রচ্ছদ, নির্ভুল ছাপা এবং বানান-এর জন্যেও কবিতাভবন সেই একই অধিকারের দাবি করতে পারে। এবং সেই সব উদ্দেশ্যেই কবিতাভবনের জন্ম। এই সংস্থা থেকে প্রথম কী বই বেরিয়েছিলো মনে নেই। স্মৃতি অনেক সময়েই ভ্রমের অধীন হয়ে পড়ে। সেই ভ্রম যদি আমাকে বিপথে চালিত না করে তবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নামে জীবনানন্দের বইটিই প্রথম। দ্বিতীয়টি আমাব গল্পের বই 'মাধবীব জন্য', যে বইয়ের প্রচ্ছদ আমার একান্ত ইচ্ছায় বিখ্যাত চিত্রকব রমেন চক্রবর্তী এঁকে দিয়েছিলেন। ওরকম সুন্দর প্রচ্ছদ, সুন্দর ছাপা, নির্ভুল বানান উৎকৃষ্ট কাগজেব বই বাংলা সাহিত্যজগতে প্রথম।"

—*জীবনের জলছবি*, প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ. ১৫১

জীবনানন্দ দাশ

"'প্রগতি'ব সময়েই টের পেয়েছিলাম আমার মধ্যে একটি অংশ আছে প্রচারকের : সাহিত্যে আমাকে যা আনন্দ দেয় তাতে অন্যেরাও আনন্দিত হোক এই ইচ্ছার বেগ আমি সামলাতে পাবি না; তার তাড়নায় এমন অনেক কাজ ক'রে থাকি যাকে চলিত বাংলায় বলে 'বনের মোষ তাড়ানো'। আমার এই বৃত্তিটি নির্বাধ ছাড়া পেলো 'কবিতা' বেরোবার পর, কেননা তখনই একের পর এক দেখা দিচ্ছেন নানা বয়সের নতুন ধরনের কবিরা, দেখা দিচ্ছেন বা প্রাপ্ত হচ্ছেন পরিণতি— বাংলাভাষায় কবিতা লেখা কাজটি হ'য়ে উঠছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশাপূরণের উপায় নয়, রীতিমতো একটি আন্দোলন, যার মুখপত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে 'কবিতা' পত্রিকা। আমি জানি না সেটা আন্দোলন বা সমাপতন, কবিতা নিয়ে কোনো 'আন্দোলন' সম্ভব কিনা সে-বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই;— তবে অন্তত 'কবিতা' পত্রিকা এজন্যে কোনো বিশেষ গৌরব দাবি করতে পারে না; আসল কথা, লগ্ন ছিলো অনুকূল ও পত্রিকাটি ভাগ্যবান; আর আমার কৃতিত্ব হয়তো এটুকু যে উৎসাহের ঝোঁকে দু-একবার ভুল ক'রে থাকলেও মোটের উপর আমি ঠিক-ঠিক ঘোড়াগুলিকেই ধরেছিলাম।

জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী; দ্বিতীয় দফায় সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়;— প্রথম দশ বছরে যাঁরা অপর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন কবিতায়; আর তারপর তৃতীয় কিস্তির নরেশ গুহ, অরুণ সরকার... এঁদের বিষয়ে... কিছু বলার প্রয়োজন করে না।..."

—'আমাদের কবিতাভবন', বুদ্ধদেব বসু। শারদীয় দেশ ১৩৮১

কিছু বলার যে আজ আর প্রয়োজন করে না, তার কারণ হল এঁদের মধ্যে অনেককেই, 'কবিতা' পত্রিকার পাতায়, কবি হিশেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বুদ্ধদেব

বসু। আর যাঁর জন্য তাঁকে তীব্রতম ও দীর্ঘতম লড়াই চালাতে হয়েছিল, তাঁর নাম জীবনানন্দ দাশ। এই লড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল 'প্রগতি' পত্রিকার সময় থেকেই। অজস্র লিখেছেন তিনি, জীবনানন্দ সম্পর্কে— সেই ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত। তর্ক করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, পঙ্‌ক্তি ধরে ধরে বিশ্লেষণ করেছেন, ভাঁজে ভাঁজে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন জীবনানন্দের রহস্য। আজ বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের যে প্রতিষ্ঠা আমরা দেখতে পাই, তার ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বুদ্ধদেব না থাকলে জীবনানন্দের কবিতা আদৌ প্রকাশিতই হত কিনা সন্দেহ। অন্তত আর কেউ যে এইভাবে তাঁর কবিতা ছাপেননি, সে তথ্য তো স্বপ্রকাশ।

জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' আখ্যা তাঁরই দেয়া। এই বাক্যবন্ধটির অতিব্যবহারে বিরক্ত হয়ে 'কালের পুতুল' গ্রন্থের নিউএজ-সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন : "বইখানা প্রায় পূর্বের আকারেই প্রকাশ করা হ'লো এই ভরসায় যে পরবর্তী সমালোচকেরা, জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলার সময়, অন্তত তাতে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করবেন।"

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হল ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে। আখ্যাপত্রটি এই রকম :

ধূ স র পা ণ্ডু লি পি

জীবনানন্দ দাশ
প্রণীত

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২ কর্ন্‌ওয়ালিস স্ট্রিট
কলিকাতা

পরের পৃষ্ঠায়, মুদ্রণ-বিবরণে রয়েছে :

প্রথম সংস্করণ :
ডিসেম্বর ১৯৩৬
অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

দাম দুই টাকা

প্রকাশক : জীবনানন্দ দাশ
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
প্রিন্টার— শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে বুদ্ধদেব বসুকে।

কৌতুকের সঙ্গে লক্ষণীয়, আখ্যাপত্রের নিচে ডি. এম. লাইব্রেরির নাম রয়েছে, প্রকাশনার নাম যেখানে থাকার কথা সেখানেই। কিন্তু পরপৃষ্ঠায় মুদ্রণ-বিবরণে লেখা আছে, 'প্রকাশক : জীবনানন্দ দাশ'! আবার, কবিতাভবনের বার্ষিকী 'বৈশাখী'র ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে (ফ্যাক্‌সিমিলি দ্র.) যে কবিতাভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকাতেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নাম রয়েছে!

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কবিতাভবন থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে 'কবিতাভবন' এর পরের বছরের কথা— 'কবিতাভবনে'র নামে প্রথম বই প্রকাশিত হয় সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'। ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে প্রতিভা বসু জানিয়েছেন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নিয়ে বাড়িতে এত উত্তেজনা ছিল, যে ও-বইটি যে অন্য কোনো জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তা তিনি কল্পনাও করেননি। বুদ্ধদেবই পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন, প্রায় সমস্ত কবিতা তাঁরই সম্পাদিত পত্রিকায় বেরিয়েছিল; তার প্রুফ দেখা— তার জন্য অর্থসংগ্রহের চিন্তা— বুদ্ধদেব যে বইটির ধাত্রীর কাজ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, এর চেয়ে বড়ো সত্যি কথা আর হ'তে পারে না। সহজীবী কবির রচনা নিয়ে এত উত্তেজনা— সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এব সঙ্গে তুলনীয় অপর কোনো ঘটনা আছে কিনা জানি না।

কী শর্তে, কী আর্থিক ব্যবস্থায় গোপালদাস মজুমদার মহাশয় এ-বই প্রকাশ করতে রাজি হয়েছিলেন তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়তো কোনো দিনই আর জানা যাবে না। বুদ্ধদেবের পরিবারের সদস্যদের কাছে শুনেছি, বইগুলো দীর্ঘকাল ডাঁই হয়ে পড়ে থেকেছে কবিতাভবনেই। প্রকাশের পরে দু-তিন বছর ধরে প্রায় প্রতি সংখ্যা 'কবিতা'য় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, কখনো-কখনো পূর্ণপৃষ্ঠা। তাতে ডি. এম. লাইব্রেরির নামটিও ছাপা থাকত, কিন্তু এরকম মনে করবারই কারণ রয়েছে যে বুদ্ধদেবের খরচেই বিজ্ঞাপনগুলি ছাপা হত।

দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা কবিতায় (চৈত্র ১৩৪৩) এ-বইয়ের দীর্ঘ এগারো পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করলেন বুদ্ধদেব, সবিস্তারে বোঝালেন আধুনিক অর্থে প্রকৃতির কবি কাকে বলে, জীবনানন্দের ছন্দের বিশেষত্ব ঠিক কোনখানে, কেন তাঁর কবিতা অবশ্যপাঠ্য। উপসংহারে লিখলেন :

> **"এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম কেননা জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে বিবেচনা করি, এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমার নিজের তাঁর কবিতা অত্যন্তই ভালো লাগে, কিন্তু আশা করি নেহাৎই আমার ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা এই মতামত গঠিত হ'তে দিইনি। আমাদের**

বৈশাখ ১৩৫০

কবিতা ভবন

প্রকাশিত

বইয়ের তালিকা

কবিতা

অজিত দত্ত
পাতালকন্যা ১৷৷০

অমিয় চক্রবর্তী
অভিজ্ঞান বসন্ত ১৷৷০

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
মৈনাক ১৲
শিবির ১৷৷০

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়
বর্ষশেষ ১৷৷০
বসুন্ধরা ৸০

জীবনানন্দ দাশ
ধূসর পাণ্ডুলিপি ২৲

বিমলচন্দ্র ঘোষ
দক্ষিণায়ন ১৷৷০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সঞ্চারী ১৲

বিষ্ণু দে
পূর্বলেখ ১৸০

বুদ্ধদেব বসু
কঙ্কাবতী ২৲
নতুন পাতা ২৲
দময়ন্তী ২৷৷০
বিদেশিনী ৷৷০

কবিতা

মণীন্দ্র রায়
একচক্ষু ১৲

মণীশ ঘটক
শিলা-লিপি ২৲

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
স্নায়ু ১৲

সমর সেন
কয়েকটি কবিতা ১৷০
গ্রহণ ১৲
নানা কথা ৸০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
পদাতিক ৸০

প্রবন্ধ, ভ্রমণ, ছোটো গল্প

বুদ্ধদেব বসু
সমুদ্রতীর ১৲
সব-পেয়েছির দেশে ১৷৷০

জ্যোতির্ময় রায়
পদ্মনাভ ১৷০
দৃষ্টিকোণ ১৷৷০

প্রতিভা বসু
মাধবীর জন্য ১৸০

কবিতা ভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা

দেশে কোনো ক্ষেত্রেই কোনোরকম স্ট্যান্ডার্ড নেই, সাহিত্যে একেবারেই নেই। প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হন অসাহিত্যিক কারণে। আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন সমাজের মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝে নাড়া দেয়াই দরকার। এ-দেশে মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে ভালোবাসেন (যদি আজকালকার দিনে এমন কেউ থাকেন) তাঁরা 'ধূসব পাণ্ডুলিপি' নিজের গরজেই পড়বেন, কারণ এ-বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন। বিশেষ ক'রে, 'শকুন', 'পাখীরা', 'অবসরের গান', 'মৃত্যুর আগে', 'ক্যাম্পে', এসব কবিতা প'ড়ে তাঁরা স্বতঃই উপলব্ধি করবেন যে বাংলা কাব্যেব ক্ষেত্রে এক অপূর্ব শক্তির আবির্ভাব হযেছে।"

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন

ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যুকে উপলক্ষ করে ভারতে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত হল। দেশ জুড়ে শোকসভা হয়েছিল, কলকাতার প্রধান সভার সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার-ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এবং প্রধান বক্তা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) দর্শক হিসাবে যোগদানের সুযোগ পাওয়া গেল কারণ প্রায় একই সময়ে সেখানে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের [Progressive Writers' Association অথবা সংক্ষেপে PWA] পত্তন ঘটে। লক্ষ্ণৌয়ে প্রগতি লেখক আন্দোলনের উদ্বোধনী অধিবেশন কংগ্রেস সপ্তাহে হওয়ায় বেশ সাড়া পড়ে। অংশগ্রহণ যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য সরোজিনী নাইডু, হিন্দী-উর্দু সাহিত্যের দিকপাল প্রেমচন্দ্‌ আর একাধারে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতা এবং প্রখ্যাত উর্দু কবি মৌলানা হস্‌রত মোহানি।

প্রগতি লেখক সংঘের বিপক্ষে কলকাতায় 'স্টেটসম্যান' কাগজ দারুণ চিৎকার শুরু করেছিল; ম্যাকসিম গর্কির মৃত্যুর পর দেশ জুড়ে 'গর্কি দিবস' অনুষ্ঠানের যে আহ্বান সংঘ দেয় তাকে কমিউনিস্ট দৌরাত্ম্যের এক নিদর্শন বলে প্রচার চালানো হয়। তা সত্ত্বেও দেশের মেজাজ ছিল আমাদের অনুকূল; প্রগতি আন্দোলন রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল।..."

—*তরী হতে তীর*, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ২য় সং, অধ্যায় ১৩

সব লেখকই অবশ্য এই আন্দোলনে শামিল হননি, কেউ কেউ বিরোধিতাও করেছিলেন— যেমন বনফুল, এবং মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলাল তাঁর 'বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক' প্রবন্ধে লিখলেন :

"সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া ভদ্রবেশী বর্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে।... আজ যুগধর্মের সুযোগে, মানবসভ্যতার এই

অতিশয় সংকটময় দুর্দিনে— ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা জাতে উঠিবাব জন্য বিষম কোলাহল করিতেছে।"

বুদ্ধদেব বসু এখন রিপন কলেজে পড়াচ্ছেন; তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী হলেন বিষ্ণু দে এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— এঁরা উভয়েই সাম্যবাদী-ভাবাপন্ন এবং প্রগতি লেখক সংঘের উৎসাহী সমর্থক; তা ছাড়াও বুদ্ধদেব যাঁদের মতামতকে তখনই গুরুত্ব দিতেন— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বয়োকনিষ্ঠদের মধ্যে সমর সেন— এঁদের মধ্যে সংঘ বিষয়ে সমর্থনের অভাব ছিল না।

অক্টোবরের মাঝামাঝি দার্জিলিং যাবার প্রস্তাব ভেস্তে গেল পাসপোর্ট না পাওয়ায়। তখন দার্জিলিং যেতে ভারতীয়দেরও সরকারি অনুমতি প্রযোজন হত। অনুমতি না পাওয়ায় তাঁরা চলে গেলেন গোপালপুর ও ওয়ালটেয়ার। এই ভ্রমণের স্মৃতিতে রচিত হবে 'সমুদ্রতীর' গ্রন্থ।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

উপন্যাস লিখছেন 'পরিক্রমা'।

ছোটোদের গল্পসংগ্রহ বেরোল 'শনিবারের বিকেল', এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে লেখা 'আজগুবি জানোয়ার'। অক্টোবরে প্রকাশিত হল 'পারিবারিক' উপন্যাস এবং ছোটোগল্প সংগ্রহ 'নতুন নেশা'।

১৯৩৭ ।। বয়স ঊনত্রিশ

দুশো-দুই রাসবিহারী অ্যাভিনিয়ু

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ :

"গিরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতেও আমরা খুব বেশিদিন ছিলাম না। বাড়িওলাই আমাদের উঠে যেতে বলেছিলেন। ওঁরা দোতলা বাড়িতে তেতলা করবেন অতএব আমরা না গেলে সেটা করা যাচ্ছে না। আসলে বোধহয় তা নয়। বাড়ি ভাড়াটা আমরা প্রায়ই ঠিকমতো দিতে পারতাম না। মধ্যে মধ্যেই এক দু'মাস বাকি পড়ে যেত। কে জানে সেজন্যই হয়তো উঠে যেতে বলল। বাড়িটা এবং পাড়াটা আমাদেরও খুব ভালো লাগছিল না। আবার শুরু হল বাড়ি খোঁজা। যে বাড়ির ঠিকানা কোনো লেন হবে সে বাড়িতে বুদ্ধদেব থাকবেন না। বাড়ির ঠিকানা হওয়া চাই রোড। বিবাহের পূর্বে ছিলেন রমেশ মিত্র রোডে, বিবাহের পরে বসা রোড, যোগেশ মিত্র রোড, গিরিশ মুখার্জি রোড। অতএব সেই রোড না হয়ে লেন হবে আর গলি ঘুপচি হবে, সে সব চলবে না।

সুতরাং বাড়ি পাওয়া সমস্যা হল, ভাড়া বেশি দেবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু পছন্দের বহরটা বেশ বড়। আমি বললাম, 'চলো বালিগঞ্জে যাই।' আমার বালিগঞ্জের উপর খুব আকর্ষণ।... কিন্তু দিদিমা বললেন, 'বালিগঞ্জে যাওয়া চলবে না। ভবানীপুর ছেড়ে আমি এক পা-ও নড়ব না।'

... বাড়িওলা শেষে আমাদের বেশ বিরক্তই করতে লাগলেন বাড়ি ছাড়ার জন্য। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আমার এক দাদামশায়ের বাড়ির একতলায় এসে উঠলাম। একতলাটা খালি ছিল। বাড়িটা বালিগঞ্জ প্লেসে। এই দাদামশায় আমার বাবার মামা। ইনি ডেভিড হেয়ার কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। নাম ছিল মনোরঞ্জন মিত্র। এই দাদমশায়ের স্ত্রী অর্থাৎ আমার দিদিমার মতো অমন শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রমহিলা আমি সারাজীবনে খুব কম দেখেছি। বুদ্ধদেব ভাড়ার কথা বলাতে দাদামশায় এক ধমক লাগালেন, বললেন, 'তোমরা যে এখানে এসেছ তাতে আমরা কত খুশি হয়েছি জান? আর তোমরা নিজেরা তো আসনি, আমিই আসতে বলেছি। যদ্দিন অন্যত্র পছন্দমতো বাড়ি না পাও এখানেই থাকবে।...

একদিন বিকেলে আমি, সমর আর বুদ্ধদেব দাদামশায়ের বাড়ি বালিগঞ্জ প্লেস থেকে হেঁটে হেঁটে ট্রামলাইনের দিকে আসছিলাম। বোধহয় তখনো বেড়াবার অছিলায় আমরা বাড়ি খুঁজতেই যাচ্ছিলাম।... ট্রামলাইনের কাছাকাছি এসেই আমার একটা 'টু লেটে'র দিকে লক্ষ্য পড়ল। রমণী চ্যাটার্জি রোডের উল্টোদিকের

রাস্তায় রাসবিহারী অ্যাভিনিউর উপরে। আমি বললাম, 'বাড়িটা দেখবে?' সমর বলল, 'কী হবে দেখে, আপনারা তো ভবানীপুর ছাড়া থাকবেন না।' তবু বললাম, 'চলুন না দেখি, দেখতে দোষ কী।' বুদ্ধদেব বললেন, 'রাস্তাটা ভারি সুন্দর। কী চওড়া।' রাস্তা পার হ'য়ে ঢুকে পড়লাম 'টু লেট' লেখা বাড়ির মধ্যে। দারোয়ান দৌড়ে এল, বাড়ি দেখাল। বাড়ি দেখে যত না মুগ্ধ বাথরুম দেখে ততোধিক। দক্ষিণে জানলাওলা মস্ত বাথরুম, বাথটাব আছে, বেসিন আছে, ঝর্না আছে। অবশ্য বাড়িও ভালো। বিরাট বিরাট দুটি পাশাপাশি ঘর, এক একটি ঘরের সাইজ আঠারো আর বাইশ, সামনে তিনদিকে দেওয়াল ও একদিকে চিকওলা চৌকো রীতিমতো ভালো সাইজের বসবার ঘর, রান্নাঘরে চিমনিওলা উনুন, ধোঁয়ার ব্যাপার নেই, পাশেই আর একটি ঘরে বাসন মাজার বেসিনসহ স্টোবরুম। ব্যস্। বুদ্ধদেব তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেললেন।

কিন্তু ভাড়া? সেটা যে বাজেটের বাইরে। দরোয়ান বলল, আপনি কত দিতে পারবেন এখানে লিখে রেখে যান, আমি সাহেবকে দেখাব। বাড়িটার আরো একটা মস্ত আকর্ষণ ছিল দুই ঘরে দুটি সিলিং ফ্যান। যা আমরা কিছুতেই কিনতে পারছি না। বাড়িভাড়া ষাট অথবা পঁয়ষট্টি, বুদ্ধদেব লিখলেন পঞ্চান্ন। আমাদের পক্ষে পঞ্চান্ন টাকা কম নয়।..."

—*জীবনের জলছবি,* প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ. ১৪০

বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথা থেকে :

"১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকালে আমাদের অবস্থা দাঁড়ালো প্রায় নির্গৃহ— সুশীল মিত্রের ফ্ল্যাট ছেড়ে ভবানীপুরেই কিঞ্চিৎ-ভালো আর-একটা নিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে বাড়িওলাটি ছল-ছুতো ক'রে তুলে দিলেন আমাদের— যেহেতু, আমার অনুমান, আমি দু-এক মাস ঠিক সময়মতো ভাড়া মেটাতে পারিনি। অগত্যা অস্থায়ীভাবে মাথা গুঁজে আছি বালিগঞ্জ প্লেসে রানুর এক আত্মীয়বাড়িতে— কলেজে তখন লম্বা ছুটি, আমি লেখা-পড়ার কাজ মুলতুবি রেখেছি আপাতত : আমার এবং আমাদের প্রধান কর্ম দাঁড়িয়েছে গৃহশিকার— কলকাতাবাসীর সনাতন শৈলীতে পায়ে হেঁটে, পথে-পথে ঘুরে, বিনা নিশানায়, ভাগ্যবিশ্বাসী। ব্যাধ যেমন পাখির সন্ধানে, নাগর যেমন অলিন্দবর্তিনী রমণীর প্রতি, তেমনি আমরা দৃষ্টি হেনে চলি ডাইনে-বাঁয়ে, ইতি-উতি ঊর্ধ্বমুখ— যাতে কোনো টু লেট-চিহ্ন অমনোযোগে ফশকে না যায়। চিহ্নটি অপ্রতুল নয় বালিগঞ্জে— কিন্তু যেটা পছন্দ হয় সেটা আমাদের নাগালের বাইরে, যেটা সাধ্যে কুলোয় সেটা মনে ধরে না। এদিকে আমাদের প্রয়োজন অতি জরুরি।

একদিন বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছি রানু আর সমর সেন আর আমি— রাসবিহারী অ্যাভিনু ধ'রে লেকের দিকে যাচ্ছিলাম বোধহয়— হঠাৎ রানু ব'লে উঠলো, 'ঐ যে একটা টু লেট!' সত্যি তা-ই— মস্ত উঁচু দুটো গাছের ডালপালার ফাঁকে সেই ঈপ্সিত দুটি ইংরেজি শব্দ— যেন আশার পতাকা, আশ্রয়ের সংকেত। আমরা উঠে এলাম বাড়ির দরোয়ানকে নিয়ে দোতলায়— ঝকঝকে নতুন ফ্ল্যাট,

মস্ত বড়ো-বড়ো দুটো ঘর, দক্ষিণে ঢাকা বারান্দা, লম্বা সরু ঝোলানো বারান্দা রাস্তার দিকে, রান্নাঘরে ধূম্রশাসন চুল্লি বসানো, বড়ো ঘর দুটিতে মরালশুভ্র দুটি পাখা ঝুলছে। আর বাথরুমটি— পুবে-দক্ষিণে জানলা-বসানো এনামেল-উজ্জ্বল, যেন স্বপ্ন, বা আমারই একটি স্বপ্নের পরিপূরণ— কেননা আমি মনে-মনে বহুকাল ধ'বেই বাথরুমবিলাসী, একটি গদ্যপ্রবন্ধেও সেই কথাটি ব্যক্ত করেছিলাম। আমাব ভিতু প্রশ্ন : 'ভাড়া কত?' 'আপনারা কী দিতে চান লিখে দিন।' সে রাত্রে আমার দুরুদুরু বুক, কেবলই মনে হচ্ছে যথোপযুক্ত মূল্য আমি লিখিনি, কিন্তু পরদিন সকালেই বাড়িওয়ালার সম্মতিবার্তা পৌঁছলো; আমরা উঠে এলাম নিকটতম মাসপয়লায়[১]— জুন মাসের লম্বা-হ'তে-থাকা দিনগুলি ভ'রে উঠলো এই নতুন বাসাব চেতনায়। এই সেদিন পর্যন্ত আমার অভ্যস্ত ভবানীপুর এলাকা আমি ছাড়তে চাইনি, বালিগঞ্জে প্রথম এসেছিলাম বাধ্য হ'য়ে— কিন্তু ঐ ফ্ল্যাট আর রাস্তা আর পরিবেশ দু-দিনেই আমাব মন ভুলিয়ে নিলো।

এক অপরিণত প্রান্তিক পল্লী বালিগঞ্জ— বলা উচিত নতুন বালিগঞ্জ, কেননা লোকের মুখে বিশেষণটি ত্যক্ত হয়নি।... অসুবিধে অনেক— শহর দূরে, দোকানপাট অল্প, বিবল। বাস নেই বাসবিহারী অ্যাভিন্যু-তে, নিতম্বদেশ দুলিয়ে-দুলিযে পুবোনো আমলেব ট্রাম চলে একটি— মশা ছেঁকে ধরে সন্ধ্যাব পর, শেয়ালের কোরাস ওঠে সুতীক্ষ্ণ; গড়িয়াহাটের মোড় থেকে কয়েক পা দক্ষিণে হাঁটলেই অস্পষ্ট অজানা দেশ প্রতিভাত হয়— অন্ধকারে গা-ছমছম-করা, ভুতুড়ে। কিন্তু প্রকৃতির যেটি অন্য মুখ তাও এখানে অগুণ্ঠিত— অথবা বলা যায় মানুষের চেষ্টার সঙ্গে প্রকৃতির একটি সুন্দব সামঞ্জস্য ঘটেছে। পুবে-পশ্চিমে দীর্ঘ চ'লে গেছে উদারবক্ষ বাসবিহারী অ্যাভিন্যু, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোদে অবারিত — সারাক্ষণ আমাদের চোখের সামনে— তার ধূসর বর্ণ বৃষ্টির জলে উজ্জ্বল, জ্যোৎস্নায় ইস্পাতের মতো নীলাভ, স্তব্ধ রাত্রে আধো-অন্ধকারে স্বপ্নিল।... চৈত্রের সকালে হালকা একটি সুগন্ধ ভাসে বাতাসে, গুল্মোর অথবা অ্যাকেশিয়ার গুঁড়োয় [আসলে সোনাঝুরি] হলুদ হ'য়ে থাকে আমাদের সরু বারান্দাটি; ঘরে ব'সে দেখি সারা সিঙ্গি পার্ক কৃষ্ণচূড়ায় লাল হ'য়ে আছে।... রিপন কলেজে কণ্ঠব্যায়াম, শেয়ালদা-পাড়ার কুশ্রীতা, 'কবিতা'য় বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য ড্যালহৌসি পাড়ায় ঘোরাঘুরি— এ-সবের পরে সন্ধ্যা নামে অনেক পাখির কাকলি নিয়ে, স্নিগ্ধ; ট্রেনের শব্দে ভারি হ'য়ে ওঠে রাত্রি, আর কখনো-বা— বেশি রাত্রে— প্রতিবেশী গারাজের টিনের চালে বৃষ্টির শব্দে হঠাৎ আমার পুরানা পল্টন মনে পড়ে।

বলা বাহুল্য, এই অবস্থাটা অধিককাল টিঁকে থাকেনি। দেখতে-দেখতে কৈশোর থেকে পূর্ণযৌবনে উত্তীর্ণ হ'লো আমাদের রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, আর, তারপর, দুটো-একটা ঐতিহাসিক ঘটনার ধাক্কায়, ত্বরান্বিত প্রগতি অথবা পতনের টানে পৌঁছে গেলো কংক্রীট-কঠিন ফুশফুশরহিত প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে, প্রায় বার্ধক্যসীমায়। কিন্তু আমরা আর ঠাঁই নাড়লাম না, কেননা— ক্রমশ-প্রকাশিত নানান অসুবিধে

১. এই লেখা পড়ে মনে হয় তাঁরা এ বাসায় উঠে এসেছিলেন ১ জুন ১৯৩৭।

ও মালিন্য সত্ত্বেও— ফ্ল্যাটটি যেন গ্রথিত হ'য়ে গেছে আমাদের জীবনের মধ্যে : সেই আমাদের কবিতাভবন, দু-শো দুই, টু-ও-টু, যা ছেড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে কষ্টে আমি জেগে উঠেছি অনেকদিন। আর সেখানেই— অনেক সুখে ও দুঃখে, সংযোগে ও বিয়োগে, সম্প্রসারণে ও সংকোচনে, অনেক বৃক্ষ ও সৌন্দর্য ও বন্ধুতার মৃত্যু পেরিয়ে, অনেক আলো-অন্ধকারে ঘুরে-ঘুরে, অনেক আরম্ভ ও অবসান অতিক্রম ক'রে— একে-একে আমাদের উনত্রিশ বছর কেটে গেলো— প্রায় একটি জীবৎকাল, কিন্তু আজ মনে হয় একটি মুহূর্তের বেশি নয়।"

—*আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম. সং, পৃ. ১১১

কবিতাভবন

আষাঢ় ১৩৪৪ (অর্থাৎ জুন ১৯৩৭) : দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যায় আলাদা কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে বিজ্ঞাপন বেরোল :

'কবিতা'র নতুন ঠিকানা
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ
কলিকাতা

এই সংখ্যাতেই, সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে প্রথম পাচ্ছি 'কবিতাভবন' শব্দটি। বাড়ির ঠিকানায় নেই, কিন্তু বইয়ের বিজ্ঞাপনে আছে— এ থেকে মনে হয়, হয়তো প্রথমে 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশন বিভাগের নাম হিশেবেই শব্দটি নির্বাচন করা হয়েছিল। তবে, ঢেউয়ের উপর নৌকোওয়ালা কবিতাভবনের বিখ্যাত চিহ্নটি এখনো সৃষ্টি হয়নি—সেটির দেখা পাওয়া যাবে ১৯৪২ থেকে।

২০২-এর আড্ডার প্রথম যুগ : প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ

"এই বাড়িতে আসার পরেই প্রেমেনবাবুর আসাটা খুব ক'মে গেল। দূরত্বই তার একমাত্র কারণ নয়, তিনি ততদিনে ফিল্ম লাইনে ঢুকে গেছেন। সেখানে ঢোকার পরেই তাঁর পুরাতন বন্ধুদের আড্ডায় আসার সময়ও হয় না, বোধহয় প্রয়োজনও হয় না। সমর [সেন] আর কামাক্ষী [প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়] আসেন, কামাক্ষীপ্রসাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবীপ্রসাদও আসেন। কামাক্ষী যে ঠিক কবে থেকে এই আড্ডার সদস্য হয়েছেন মনে নেই। অজিত দত্ত কাছাকাছিই একটা বাড়ি নিয়ে উঠে এসেছেন এ পাড়ায়, যখন প্রথম এসেছিলাম তখন বোধহয় তিনি মাইসোর রোডে ছিলেন, পরে ডোভার রোডে এলেন।

... বিষ্ণু দে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন। গলার স্বর খুব নিচু ছিল। যেদিন আসতেন কী যে গুণগুণ করে বলতেন, বুদ্ধদেবের অট্টহাসিতে ঘর ফেটে যেত। রসা রোডের বাড়িতে থাকতে মাঝে মাঝে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আসতেন।

তিনিও একজন দুর্দান্ত গল্পবলিয়ে লোক ছিলেন।... রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে আসার পরে তাঁর ভ্রাতা বিমলাপ্রসাদও আসতে শুরু করলেন।... যাঁদের কবিতা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আরো একখানা নতুন মুখ এ বাড়িতে এসেই প্রথম দেখলাম, তাঁর নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দেবীপ্রসাদের বন্ধু। ... স্বভাবে অতি মৃদু, অতি লাজুক। এই প্রতিশ্রুতিমান কবিটির প্রতি বুদ্ধদেব কবিতা পড়েই স্নেহে আপ্লুত ছিলেন। মনে আছে এঁর কবিতা যখন প্রথম এলো ডাক খুলে বুদ্ধদেব সারা বাড়ি চমকিত ক'রে আমাকে ডেকে পড়তে দিয়েছিলেন। ... প্রসঙ্গত আরেকটি ছেলের কথাও মনে পড়ছে।... আমাদের ফ্ল্যাটের সদর দরজা সর্বদাই খোলা থাকত।... একটি আঠারো বছরের কালো স্বাস্থ্যবান ছেলে একদিন ঝড়ের বেগে ঘরে এলো। বাইরে জুতো খুলে এসেছে। কোনো একটা বানান নিয়েই হোক বা কবিতা নিয়েই হোক, ভালো মনে নেই, কারো সঙ্গে বাজি ধরেছে। বুদ্ধদেবের কাছে এসেছে সেই সমস্যাব সমাধান করতে। ছেলেটির নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য।...

এই সময়ে বুদ্ধদেব বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে প্রত্যেক মাসে কোথাও না কোথাও একটা সাহিত্যিক সভা বসাবার প্রস্তাব করলেন।... আমাদের বাড়িতে যেদিন সভাটি বসল, সেদিন কখনো যা ঘটে না বা ঘটেনি, সুধীন দত্ত তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী ছবিকে নিয়ে এলেন। ঘটনাটা এত অপ্রত্যাশিত যে সকলেই প্রায় চমকে গেলেন। সুধীনবাবুর বাড়িতেও পবিচয়ের আড্ডা বসত, মহিলাবর্জিত আড্ডা।

এই সভাব নিয়ম ছিল লেখকদেব মধ্যে কেউ না কেউ তাঁর লেখা নতুন এমন একটি গল্প বা কবিতা পাঠ করবেন যা তখনো পর্যন্ত কোথাও ছাপা হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন এরকমই একটা গল্প প'ড়ে মুগ্ধ করলেন সকলকে। এই সভাটি আমাদের বাড়িতেই বসেছিল। সেই সভায় যামিনী রায় আব অতুল গুপ্ত মশাইও উপস্থিত ছিলেন।"

—'*জীবনের জলছবি*', প্রতিভা বসু। ৩য় সং, পৃ. ১৩৯

প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আষাঢ় ১৩৪৪ (বর্ষ ২ সংখ্যা ৪) পর্যন্ত— অর্থাৎ ২০২-তে আসার পর একটিমাত্র সংখ্যা। পরের সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪৪) থেকে সম্পাদক হিশেবে নাম দেখছি শুধু বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের। কারণ হিশেবে, প্রতিভা বসুর মতোই, বুদ্ধদেবও জানিয়েছেন (আমাদের কবিতাভবন, পৃ. ১৭) : "প্রেমেনের আর উৎসাহ নেই— বোধহয় সেই সময়েই তার সিনেমা-সংস্রব শুরু হচ্ছিলো।" কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের যুগ্ম সম্পাদনায় বেরোল 'নিরুক্ত' পত্রিকা। যদি সিনেমা সংস্রবই একমাত্র কারণ হত তবে তিনি অন্য আরেকটি পত্রিকা — বিশেষত, যে-পত্রিকা 'কবিতা'র প্রতিদ্বন্দ্বী হবার উচ্চাশা পোষণ করছে— তার সঙ্গে যুক্ত হতেন না। এ-সম্পর্কে শ্রীপ্রভাতকুমার দাস তাঁর 'কবিতা পত্রিকা : সূচিগত ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন (পৃ. ২৩) :

"... প্রধানত আধুনিক গদ্য কবিতা বিষয়ে মতান্তর হেতুই, প্রেমেন্দ্র 'কবিতা'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, এবং এ ঘটনাও গুরুত্বপূর্ণ যে, 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যার অন্যতম কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পরবর্তী দ্বাদশবর্ষব্যাপী 'কবিতা' থেকে একই কারণে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। মূলত 'কবিতা' পত্রিকার আশ্রয়ে যে আধুনিক কবিতার নবতম ধারাটি প্রবাহিত হ'তে শুরু করেছিল তার বিরোধিতার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'নিরুক্ত' নামের একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকে ১৩৪৭-এর আশ্বিন মাসে।"

'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাতেই কবিতা ছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ('নীলিমাকে') —তারপর আবার দীর্ঘ বারো বছর বাদ দিয়ে, চৈত্র ১৩৫৬ সংখ্যায় ('বিভাবরী')। ইতিমধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'কবিতা' পত্রিকা ছেড়ে-আসা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে 'নিরুক্ত' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর কবিতা-আন্দোলন বিষয়ে নানা বিরোধী মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে— প্রকাশিত হয়েছে 'পূর্বাশা'তেও। অথচ তাঁদের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাটি পূর্বাশা প্রেস বিনামূল্যে ছেপে দিয়েছিল (দ্র. 'আমাদের কবিতাভবন', অধ্যায় ১)। এই মনান্তরের কারণ জানতে পারি সত্যপ্রসন্ন দত্তর একটি চিঠিতে। সুবীর রায়চৌধুরীকে লেখা এই চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন (২৮ জানুয়ারি ১৯৯০-তে লেখা) :

"গোল বাধল দ্বিতীয় সংখ্যায়। দ্বিতীয় সংখ্যার পাণ্ডুলিপি বুদ্ধদেববাবু যথারীতি আমাদের প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। প্রুফ দেখার সময় আমি সঞ্জয়বাবুর একটি কবিতা নিয়ে বুদ্ধদেববাবুর প্রেরিত পাণ্ডুলিপির প্রুফের সঙ্গে ঐ কবিতাটির প্রুফ দিয়ে দিই; বুদ্ধদেববাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সঞ্জয়বাবুর কবিতাটি বাদ দিয়ে দিলেন।"

—'কবিতা ও সেযুগের লেখকসমাজ', সুবীর রায়চৌধুরী। দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৭

যেটা লক্ষ করবার মতো বিষয় তা হল, 'নিরুক্ত' বা 'পূর্বাশা'তে বুদ্ধদেব ও তাঁর 'কবিতা' পত্রিকার সম্পর্কে নানা সময়ে আক্রমণাত্মক ও বিদ্রূপময় লেখা বেরোলেও, 'কবিতা'য় কখনো তার কোনো প্রত্যুত্তর দেবার বা প্রতি-আক্রমণ করবার কোনোরূপ চেষ্টা করা হয়নি। বরং, আমরা পরে দেখতে পাব, 'কবিতা'র পর প্রথম কবিতা বিষয়ক পত্রিকা বলে 'নিরুক্ত'র প্রশংসাই করেছেন তিনি।

সঞ্জয়-সত্যপ্রসন্নর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিছুদিন পর জোড়া লেগে যায়। কবিতাভবনে আসতেও আরম্ভ করেন তাঁরা— বাস্তবিক, বুদ্ধদেবের সন্তানরা জানতেনই না (দময়ন্তীর সাক্ষ্য) যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁদের কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল কখনো। প্রেমেন্দ্র অবশ্য আর ফিরে আসেননি।

আসলে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে কবিতাকে স্থান দিতেন বলেই, আধুনিক বাংলা কবিতার বুদ্ধদেবের মতো পৃষ্ঠপোষক আর কেউ কখনো হলেন না।

'কবিতা' পত্রিকায় অশ্লীলতার সমস্যা

'কবিতা'র বর্ষ ৩ সংখ্যা ২ (পৌষ ১৩৪৪) সংখ্যাটি নিয়ে এক অস্বস্তিকর সমস্যার সৃষ্টি হল। এই সংখ্যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর দীর্ঘ কবিতা 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা' ছাপা হচ্ছিল। বুদ্ধদেব লিখেছেন :

"কবিতাভবন-দুশো-দুই ঠিকানা থেকে 'কবিতা'র যখন কয়েকটি মাত্র সংখ্যা বেরিয়েছে, আমার পূর্বপরিচিত জুজুবুড়ির পাল্লায় আর একবার আমাকে পড়তে হ'লো। পত্রিকা তখন ছাপা হচ্ছে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে : তাঁদের মুদ্রণ অনবদ্য, সময়নিষ্ঠা নির্ভুল, ব্যবহার ভদ্র— চিন্তামণি দাস লেনের নতুন বাড়িটিও কলকাতার ছাপাখানার মানে অত্যুজ্জ্বল। সেদিন পৌষ-সংখ্যা বেরোবার কথা, আমার কলেজ বড়োদিনের জন্য ছুটি হয়ে গেলো— ইদানীং আমার শ্বশুরালয়ে পরিণত ঢাকায় যাচ্ছি দু-একদিনের মধ্যে, তার আগে 'কবিতা'র বিলিব্যবস্থা চুকিয়ে দেয়া চাই। খোশমেজাজে প্রেসে গিয়েছি চালান আনতে কিন্তু আমি ঢুকতেই সবগুলো মুখ জ'মে গেলো হঠাৎ, চোখ নিচু হ'লো টেবিলে; কোনো প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব পাচ্ছি না। অবশেষে একজন কর্মকর্তা বললেন পত্রিকা তৈরি, কিন্তু চালান দেবার অসুবিধা আছে। 'কী অসুবিধে?' উত্তরে তিনি, পত্রিকা খুলে বিশেষ একটি পৃষ্ঠায় তর্জনী রাখলেন— আগে লক্ষ করলে এসব অশ্লীলতা তাঁরা ছাপতেন না, কিন্তু এখন চালান আটকানো ছাড়া উপায় নেই। আমি বিমূঢ় : কেননা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর সেই কবিতাটায় আদিরসের এমন-কিছু উগ্রতাও ছিলো না যা কবিতার পাতায় এর আগে প্রকাশ পায়নি। তবে কি 'স্তন', 'উরু', 'স্ত্রীদেহের সম্পদ' ইত্যাদি শব্দগুলোতেই তাঁরা সন্ত্রস্ত? তর্কে বা অনুনয়ে কাউকে টলাতে না-পেবে হঠাৎ একটি মস্তিষ্ক ঢেউয়ের প্রেরণায় আমি ব'লে ফেললাম, 'যদি অতুলচন্দ্র গুপ্ত ভরসা দেন তাহ'লে চলবে?' এতক্ষণে কর্মকর্তাটির মুখের পেশি শিথিল হ'লো, আমি সন্ধে লাগতেই অতুল গুপ্তের কাছে ছুটলাম : আইন-ব্যবসায়ে উচ্চাসীন সেই উদারস্বভাব প্রৌঢ় সাহিত্যিক তক্ষুনি কয়েক লাইন মাভৈবাণী লিখে আমার হাতে দিলেন, ফাঁড়া কেটে গেলো। প্রেস বদল করলাম পরের সংখ্যা থেকে— কিন্তু এ রকম একটি অদ্ভুত অপঘাত আর ঘটেনি।"

—'আমাদের কবিতাভবন'। শারদীয় দেশ ১৩৮১

শুধু প্রেস বদল নয়। পরের সংখ্যা থেকে মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিশেবেও বুদ্ধদেব বসুর নামই ছাপা হতে লাগল।

'কবিতা' পত্রিকা ও 'কবিতাভবনে'র কর্মক্ষেত্রের ক্রমবিস্তার

"পরবর্তী দশকের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ত্রৈমাসিকটিকেই কেন্দ্র ক'রে আমার সাহিত্যিকজীবন বিচিত্র ভাবে পল্লবিত ও সম্প্রসারিত হয়েছিলো— অনেক প্রস্ফুটন ও বিসর্জন এবং কিছুটা হিশেবহীনতার মধ্য দিয়ে। প্রথম ডাল বেরোলো কবিতাভবন— একটি প্রকাশন-সংস্থা, কিন্তু ব্যবসায়িক অর্থে কোনো সংস্থা নয়।

ধবনটা সেই বমেশ মিত্র বোডেব গ্রন্থকাবমগুলীবই মতো, কিন্তু প্রযাসে আবো সবল ও বহুমুখী। লেখকেবা যে যাব ব্যযে বা বন্ধুব সাহায্যে বই ছাপেন, আমি নিযেছি তত্ত্বাবধানেব ভাব, কবিতাভবন নামাঙ্কন নিযে পবপব বেবিযে যাচ্ছে বই, পত্রিকা, পুস্তিকা 'কঙ্কাবতী' 'ধূসব পাণ্ডুলিপি', পদাতিক', 'অভিজ্ঞানবসন্ত', কবিতাব বই আবো অনেকগুলো, একজন নতুন কথাসাহিত্যিক, প্রতিভা বসু, স্ফূর্ত হযেছেন। আমবা চালিযে যাচ্ছি চাব-আনা মূল্যেব ষোলো পৃষ্ঠাব কবিতাপর্যায 'একপযসায একটি [১৯৪২]— তাব মধ্যে একটি বইযেব নাম 'বনলতা সেন'— এবং কিছু কাল পবে, এবই গদ্য-পবিপূবক স্বৰূপ বানুব এক্তিযাবভুক্ত একটি ছোটোগল্প-গ্রন্থমালা [পৌষ ১৩৫০]।

—তদেব, পৃ ১৮

কবিতাভবন থেকে যেসব কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হযেছিল নানা সমযে, যথাস্থানে তাদেব পবিচয আছে।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

ছোটোগল্প লিখছেন, এবং ছোটোদেব জন্য গল্প। 'কঙ্কাবতী' বই হযে বেবোল জুলাইতে।

'শেষেব বাত্রি' : একটি কবিতাব জন্মকথা

" 'কঙ্কাবতী'ব 'শেষেব বাত্রি' কবিতাটা প্রথম স্তবকেব পব অনেক দিন আব এগোযনি। সেটি লিখেছিলাম আমাব ঢাকাব জীবনেব শেষ দফায [অর্থাৎ ১৯৩০ ৩১]— তাবপব কলকাতায এসে বাসা বাধলাম, বিযে কবলাম, আমাব প্রথম সন্তান ও 'কবিতা' পত্রিকা একই দিনে ভূমিষ্ঠ হ'লো। ততদিনে সেই প'ডে থাকা স্তবকটিকে হযতো ভুলেও গিযেছিলাম, অন্তত পুবোনো খাতাব পাতা ওল্টাতে আব লুব্ধ হইনি— মনে প'ডে গেলো যখন 'কঙ্কাবতী' বই ছাপাবাব তোডজোড চলছে। বইযেব শেষ কবিতা হিশেবে এটা নেহাৎ মন্দ হবে না মনে হ'লো— তাবই তাগিদে আবো কযেকটা স্তবক তৈবি ক'বে কবিতাটাকে ঘাটে ভিডিযে দিলাম।

'তৈবি ক'বে' কথাটাই এখানে ঠিক। কেননা তখন আমি আব 'কঙ্কাবতী'ব আবহাওযায বাস কবছি না, পুবানা পল্টনেব প্রান্তব আব বাতাস আব চন্দ্রোদয আব তাবাব আলো থেকে দূবে চ'লে এসেছি— শুধু ভৌগোলিক অর্থে নয, মনেব দিক থেকেও। তবু, সেই পাঁচ বছব আগেকাব সুবে সুব মেলাতে আমাব যে কোনো অসুবিধে হ'লো না এই অভিজ্ঞতাটি আমাব পক্ষে নতুন।"

—*কবিতা ও আমাব জীবন*, বুদ্ধদেব বসু। ১৯৭৩

১৯৩৮ ।। বয়স তিরিশ

শান্তিনিকেতন যাওয়া : প্রথমবার

'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে 'চণ্ডালিকা'র অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে সাতদিন রইলেন (১৯-২৬ মার্চ)। এই সময় বুদ্ধদেব তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'রে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

এখনি ফিরে চলেছি শান্তিনিকেতনে। তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে ছিল সংবাদ দেবার সুযোগ পেলুম না। যদি শান্তিনিকেতনে যেতে পার তাহলে কথাই নেই নতুবা আগামী বৎসরের প্রথম সপ্তাহে যখন কলকাতায় আর একবার আসাব সম্ভাবনা আছে তখন একবাব দেখা হতে পারবে। [১১ চৈত্র ১৩৪৪]

রবীন্দ্রনাথ

পরপর আরো দুটি চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথ— ভাষা থেকে বোঝা যায়, বুদ্ধদেবের পত্রের উত্তরে। এই সামান্য চিঠিদুটি থেকে তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়।

কল্যাণীয়েষু

তুমি যেদিন খুশি এসো, যখন তোমার খুশি আমাব সঙ্গে দেখা করতে পারো —আলো কমে এসেছে, কাজকর্ম থেকে ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছি। যাদের দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল আছে আমার দেখা পেতে তাদেব বাধবে না। ইতি ৩।৪।৩৮ [২০ চৈত্র ১৩৪৪]

রবীন্দ্রনাথ

কবে আসবে খবর দিয়ো

আবার লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু

সুখবর। সপরিজনে সবান্ধবে এসো। কোন গাড়িতে আসবে খবর দাওনি কেন? ইতি ২৮ চৈত্র ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ

[দ্র. চিঠিপত্র/১৬]

এই শান্তিনিকেতন ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেছেন বুদ্ধদেব, 'পূর্বস্মৃতি' প্রবন্ধে, তাঁর শান্তিনিকেতন বিষয়ক গ্রন্থ 'সব পেয়েছির দেশে'তে :

" ১৯৩৮-এর ঈস্টরে শান্তিনিকেতন শেষবার গিয়েছিলুম, তখন রবীন্দ্রনাথ সদ্য

রোগমুক্ত। আমরা ছিলুম 'পুনশ্চ'তে, কবির বাসা তখন 'শ্যামলী'। 'শ্যামলী'র পিছনে নিচু একটি আমগাছের ছায়ায় বেতের চেয়ারে রোজ সকালে তিনি বসতেন, সামনের টেবিলে সকালের ডাক জমে উঠতো, ছেঁড়া দু-একটি লেফাফা ঝরা পাতার সঙ্গে মাটিতে এসে মিশতো— আমরা সে-সময়ে তাঁর পাশে এসে বসতুম। সে-সময় সমর সেন ছিলেন সেখানে, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন।... আমরা মাঝরাত্তিরে পৌঁচিয়েছিলুম;... স্টেশন থেকে ট্যাক্সি এসে গেস্ট হাউসের দরজায় দাঁড়াতেই টুক ক'রে দোতলার একটি জানালা খুলে গেলো;...

... ম্যানেজরকে জিজ্ঞাসা করলুম আহার্য কিছু মিলবে কিনা; তিনি মাথা নাড়লেন। চা? খানিক পরেই কয়েক পেয়ালা চা এসে হাজির।... সমরবাবু বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ আপনাদের জন্য 'পুনশ্চ' ঠিক ক'রে রেখে কাল আপনাদের অপেক্ষা করছিলেন, আপনারা এলেনও না, খবরও পাঠালেন না, বোধহয় তিনি রাগ করেছেন।...'

পরদিন সকালে এক পেয়ালা চা খেয়ে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় উত্তরায়ণের এক পরিচারক শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি ট্রে এনে আমাদের সামনে রাখলো। ঢাকনা খুলে দেখি বিচিত্র ও বিস্তর সুখাদ্যে ট্রে-টি ভর্তি। কাল রাত্রে আমাদের যে খাওয়া হয়নি সে-খবর যে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছিয়ে গেছে এবং সেই সঞ্চিত ক্ষুধা নিবারণের বিপুল আয়োজন যে সঙ্গে-সঙ্গেই প্রস্তুত, এতে অবাক যেমন হলাম, খুশিও হলাম তেমনি।...

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি প্রথম কথা বললেন, 'যেমন তোমরা নিশাচর, তেমনি শাস্তি পেলে তো? কাল রাত্রের উপবাসটা কেমন লাগলো? যদি কখনো এখানকার ভ্রমণকাহিনী লেখো আশা করি ঐ কথাটা বাদ দিয়ে যাবে।'

কবি তখন অল্পদিন রোগশয্যা ছেড়ে উঠেছেন, কিন্তু রোগের কোনো গ্লানি আর নেই। সেই চিরপরিচিত উজ্জ্বল মহান মুখশ্রী, সেই তীক্ষ্ণ আরক্ত-অপাঙ্গ চোখ, সেই উদার গম্ভীর স্বচ্ছ ললাট। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের চোখ যেন কোনো মোগলসম্রাটের মতো, তাতে তাঁর কবিপ্রতিভা যত না ধরা পড়ে তার চেয়ে এ কথাটাই বেশি ফোটে যে তিনি স্বভাবতই রাজা। তাঁর চোখের দিকে তাকাতে যেন ভয় করে।... অন্যপক্ষে তাঁর হাসিটি মানবিক মধুরতায় ভরা, শ্বেতশ্মশ্রুর আবরণ ঠেলেও সে-হাসি বড়ো সুন্দর হ'য়ে ফোটে, তা দেখলে মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম ও আশ্বাস পাওয়া যায়।... গ্যেটে সম্বন্ধে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'Here is a complete man'; রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সেই কথা। সব বই পড়া হ'লে, সব দেশ দেখা হ'লে কোনো প্রৌঢ় পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলতে পারেন, এতদিনে দেখলুম একটা সম্পূর্ণ মানুষ।

সে-সময়ে কবির শেষ বই বেরিয়েছে 'প্রান্তিক', 'বাংলা কাব্য- পরিচয়ে'র সংকলনকার্যে তিনি তখন ব্যস্ত। দেখতুম তাঁর টেবিলের উপর আমাদের ক'জনের কবিতার বই। বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্বন্ধে বলতেন, 'এ বুঝিয়ে দিতে পারো তো শিরোপা দেবো।' বলা বাহুল্য, সে-রকম কোনো চেষ্টাই আমি করিনি, আর কবি

এ নিয়ে আমাকে বেশি ব্যস্তও করেননি।...

ববির ও তাঁর পরিবারের অনুপম আতিথেয়তার আনন্দস্নানে দিন চারেক কাটিয়ে সেবার কলকাতায় ফিরলুম।... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ই ঠাকুরদের বিশেষত্ব, বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা এই পরিবারটি একই সঙ্গে খাঁটি স্বদেশী ও খাশ বিলেতি। এঁদের আতিথেয়তাতেও সেটা ধরা পড়ে। ইওরোপীয় সৌজন্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা— যেটা আমাদের কাছে হৃদয়াবেগের অভাব ব'লে ঠেকে— উভয়পক্ষের চরম তৃপ্তি কিন্তু তাতেই। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির আতিথেয়তায় এ-জিনিশটি আছে, আবার বাঙালি স্নেহপ্রবণতারও যে অভাব নেই তার প্রমাণ পেলুম আসবার দিন যখন প্রতিমা দেবী বিস্কুটের টিনে ভ'রে নানাবকম খাবার আমাদেব সাজিয়ে দিলেন।..."

বুদ্ধদেবরা শান্তিনিকেতনে থাকতে-থাকতেই রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখেছিলেন এডোয়ার্ড টমসনকে, সেটি এখনে উদ্ধৃত করার যোগ্য :

"I suppose you know our poet Buddhadeva Bose who in his literary adventure is struggling to cross the boundaries of the literature that carries the signature of Rabindranath. Fortunately for the peace of mind of his readers he is not altogether successful in his efforts, and his writing still pursue the legible limits of sanity. He asks my help for securing the appointment in the School of Oriental studies. But I have already recommended Sudhindra for the post. The task is not at all difficult for any Bengali young man who knows English literature as well as his own and Sud [Sudhindra] no doubt is fully qualified for it. But one thing which can be said on behalf of B [Buddhadeva] is that the opportunity will be valuable for his own education if he can find himself in touch in your country of a higher type of humanity. Sud has already gone through his experience of life in the West and no fuller development is possible in his case."

১৭।৪।১৯৩৮-এ লিখিত। দ্র. চিঠিপত্র ১৬, পৃ. ৪১৫

বুদ্ধদেবের অবশ্য যাওয়া হয়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুধীন্দ্রনাথও সেবার স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ যাননি।

'বাংলা কাব্যপরিচয়'

আগস্ট মাসে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়' নামক সংকলনগ্রন্থ (শ্রাবণ ১৩৪৫)। গ্রন্থটি সমাদৃত হয়নি। কবিরা অনেকেই আপত্তি করেছিলেন তাঁদের প্রতিনিধিমূলক কবিতা স্থান পায়নি ব'লে (তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অন্যতম), পাঠকরাও খুশি হননি। 'কবিতা' পত্রিকায় বইটির ক্ষুব্ধ সমালোচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব। এই বইটি দেখেই, আধুনিক বাংলা কবিতার একটি দর্পণপ্রতিম সংকলন প্রকাশ করবার ইচ্ছা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল।

"গুজব শুনছি এডওঅর্ড টমসনের উদ্যোগে একটি 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স' বেরোবে খোদ রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়— কিন্তু তার বদলে একদিন বেরোলো বিশ্বভারতী থেকে 'বাংলা কাব্যপরিচয়' আমাদের জন্য গভীরতর নৈরাশ্য নিয়ে, এমন একটি নিশ্চরিত্র সংগ্রহ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক। মাত্র কয়েক মাস আগে আমি ভোগ ক'রে এসেছি সপরিবারে ও সবান্ধবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য, ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধে আমি উচ্ছল; তবু যেহেতু কবিতা আমি ভালোবাসি এবং রবীন্দ্রনাথ আমার প্রিয়, তাই কবিতায় [আশ্বিন ১৩৪৫] একটি আলোচনা আমাকে লিখতেই হ'লো— প্রতিকূল ব'লেই বহুবিধ যুক্তি সহকারে বিস্তারিত ['কবিতা'য় প্রকাশিত দীর্ঘতম গ্রন্থসমালোচনা এটি— সেই সংখ্যার ৫৫ থেকে ৭৫ পর্যন্ত একুশ পৃষ্ঠা তার বিস্তার]। সংখ্যাটি বেরোনোমাত্র কাটা গেলো আমাদেব বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপন— কিন্তু আমি রইলাম এবং এখনো আছি অনুতাপহীন; ভাবলে আমার এখনো মনে হয় সেই প্রেমের-কবিতা-বর্জিত গদ্যকবিতারহিত পাঠ্যবইগন্ধী সংকলনটি জ্যোতিষ্মান রবীন্দ্রনাথ-নামের নিতান্তই অযোগ্য। আমার ভাগ্যে অধিকদিন আমাকে রাহুর দৃষ্টি পোয়াতে হয়নি, রবীন্দ্রনাথ অচিরে ক্ষমা করেছিলেন; আমাকে সৌহার্দ্য দিয়েছিলেন পুলিনবিহারী সেন, যাঁর জীবন রবীন্দ্রনাথে উৎসর্গিত।"

—'আমাদের কবিতাভবন', বুদ্ধদেব বসু। শারদীয় দেশ ১৩৮১

'নিখিল-ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'

ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়াল হল্-এ 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর। নানা প্রদেশ থেকে বহু খ্যাতনামা লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সারা দেশের লেখক ও শিল্পীদের নিয়ে এত বড়ো সর্বভারতীয় সম্মেলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল, দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন সমস্যা ও তাতে প্রগতি লেখক-শিল্পীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি তখন শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব নিয়ে ব্যস্ত। নিজে আসতে পারেননি —লিখিত ভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সভার আরম্ভে সেটি পাঠ করা হয়। তারপর সম্মেলন পরিচালনার জন্য একটি সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়, তার সদস্য হলেন মুলকরাজ আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত সুদর্শন।

দ্র. 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', নেপাল মজুমদার। ১ম সং, ৫ম খণ্ড। অধ্যায় : প্রগতি লেখক সম্মেলন

বুদ্ধদেব এই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘে'র প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন,

সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হওয়াই তার প্রমাণ। 'কবিতা' পত্রিকায় এই সংঘের ক্ষণজীবী মুখপত্র 'প্রগতি'র বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল :

প্রগতি

প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার সমাবেশ

ভারতী ভবন— ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

লেখকগণ : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতি।

কার্ল মার্কস, আঁদ্রে জিদ, ঈ. এম. ফর্স্টার, টি. এস. এলিয়ট, উজবেকিস্থানের কবি গোলাম গফুব, তুর্কমান কবি কারাবিয়েফ, রুষ কবি ব্লখ, আরব কবি খলিল জিব্রান প্রভৃতিব রচনার অনুবাদ আছে। মূল্য— ১।।. টাকা

নেপাল মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে :

"ববিবার তৃতীয অধিবেশনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় হইয়াছিল, কবি বুদ্ধদেব বসুব ভাষণ। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য : আধুনিক লেখকের অবস্থা (Bengali Literature Today : Position of Modern Writer)।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেববাবু তখনকার দিনের 'প্রগতি লেখক সংঘ'এর একজন প্রধান ব্যক্তি। তখনকার দিনে তাঁহার বক্তব্য ও চিন্তাধারা সম্পর্কে এখনকার কালের পাঠকদের কৌতূহল হওয়াটা স্বাভাবিক এইজন্যই তাহার সারমর্ম এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করিলাম। তাছাড়া বুদ্ধদেববাবু এখন দলত্যাগী— গোষ্ঠীত্যাগী। এই কারণেও তাঁহার আগের দিনের জবানবন্দী শুনিতে অনেকেরই আগ্রহ থাকিবে।..."

[বুদ্ধদেব বসুর পঠিত প্রবন্ধের অংশবিশেষের নেপাল মজুমদার-কৃত সারানুবাদ]

"বাংলাদেশের বুর্জোয়া সমাজ আজ অবক্ষয়ের মুখে। ভারতের বৃটিশ শাসনের সূচনায় একটি বিরাট জিনিষ সম্পন্ন হয় : তা হচ্ছে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসসাধন এবং সেই সঙ্গে দেশে এমন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হলো ইতিপূর্বে যার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। উনবিংশ শতাব্দীটা ছিলো অবাধ উন্নতি ও বিকাশের যুগ। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দুরন্ত প্রভাবে বাংলাদেশে এক মহান সাহিত্যের উদ্ভব হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তই হলেন আধুনিক ভারতের প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি। যে-দুর্বার সাহিত্যধারা তিনি প্রবাহিত করে গেলেন তা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথে পরিণতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এবং পারিপার্শ্বিক এক শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে দেশের এক সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যধারার অধিকারী হয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম-সংস্কার আন্দোলন— আমরা যাকে বলি ব্রাহ্মধর্ম— তিনি তারই প্রবল

অনুপ্রেরণা বা উন্মাদনা লাভ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত যা আমাদের এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিখরে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করল। যে সমাজের মধ্যে তিনি অবস্থান করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ উপস্থিত হয়নি এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেছেন, এই কাব্যরচনার ব্যাপারটা খুবই প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান কাজ।...

বোধ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভা আমাদের বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমস্ত সৃজনশীল ও প্রগতিশীল শক্তিকে আত্মস্থ করে তা প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। কেননা কাব্যে অথবা গদ্যে যাঁরাই তাঁর অনুগামী তাঁরা তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করলেন আর আজ তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।... যে যুগ রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছে, বহুদিন আগেই তা অতিক্রান্ত হয়েছে। আর রবীন্দ্রোত্তর শিল্পীরা —যাঁরা তাঁদের যুগের তুলনায় অনেক পরে এসেছেন— অতি সহজেই তাঁরা এমন সব প্রচলিত সাহিত্যিক ধারার আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছেন, আজকের দিনে যার কোনো বাস্তব সত্যতা বা বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই।...

... প্রকৃত গণসংযোগ স্থাপিত হলে পরে আমাদের সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হবে। কিন্তু সত্যিকারের অভিজ্ঞতা আর তত্ত্বগত অনুভূতি —এ দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তা আমাদের বুঝে নিতে হবে।...

যদি কোনো তরুণ লেখক মনে করে থাকেন যে মজুর ধর্মঘট অথবা সাংহাই বোম্বাই ইত্যাদি সম্পর্কে লিখলেই তাঁর দ্রুত সাফল্যলাভ ঘটবে তাহলে তাঁর এই অন্বেষণ সত্যিই খুব দুঃখজনক ব্যাপার হবে— বিশেষ ক'রে তিনি যদি প্রতিভাসম্পন্ন হন। অবশ্য আমি একথা এক মুহূর্তের জন্যও বলি না যে, যখন চারদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ঘটে চলেছে তখন লেখক তা থেকে দূরে বা নির্লিপ্ত থাকবেন বা থাকতে পারবেন। পরন্তু, *প্রয়োজন হলে আসুন আমরা সমস্ত লেখকেরা মিলে প্রোপাগ্যান্ডা বা প্রচারকার্যে নিজেদের নিয়োজিত করি। কিন্তু একথা যেন না বলি যে, এইটাই হচ্ছে সাহিত্যের সর্বোচ্চ দিক, বা আদৌ এটা সাহিত্য। কেননা যদিও সমস্ত শিল্পকর্মই গভীর অর্থে প্রচারকার্য, সমস্ত প্রচারকার্যই কিন্তু শিল্পকর্ম বা আর্ট নয়।*" [*বাঁকা হরফ* আমার : স. সে]

[তদেব]

বুদ্ধদেবের মূল রচনাটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, সেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রগতি লেখক সংঘে'র মুখপত্র 'প্রগতি' পত্রিকায়। সেটি দেখার সুযোগ হয়নি— এখানে আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে নেপাল মজুমদার-কৃত সারানুবাদের উপর। তবু আশা করি উপরে-উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ-ক'টিকে বুদ্ধদেবের রচনা না হোক, অন্তত বক্তব্য বলে চিনে নেয়া যাবে— বিশেষ করে উদ্ধৃতিটির শেষ বাক্যদুটিতে। এই দুটি বাক্য পড়ে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, সাময়িকতার প্রয়োজনে বুদ্ধদেব প্রচারকে যতই তাৎক্ষণিক মূল্য দিন না কেন, খাঁটি সাহিত্যের সঙ্গে তার পার্থক্যের বোধ কখনোই তাঁর মন থেকে অবসৃত হয়নি— কোনো 'প্রগতি'র

প্রয়োজনেই নয়।

কিন্তু আঘাত পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেবের প্রবন্ধটি হয়তো এত তাড়াতাড়ি হাতে পৌঁছয়নি তাঁর, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম টিপ্পনি-সহ বেরিয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায়, তাঁর একটি বাক্যের ভুল উদ্ধৃতি সহ : The age of Rabındranath is over। এরই অভিঘাতে কয়েকদিন পর রচিত হল রবীন্দ্রনাথের 'সময়হারা' কবিতা :

"খবব এল, সময আমার গেছে
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই;
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো
টানছে ধুলো।
হাল আমলের ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায় জোড়াতাড়ার দিন।
...
সময় আছে কিম্বা গেছে দেখার দৃষ্টি সেই
সবার চক্ষে নেই—
এই কথাটা মনে রেখে, ওরে পুতুলওলা,
আপন সৃষ্টি-মাঝখানেতে থাকিস আপন-ভোলা।
...
এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপ মাত্র—
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা উদ্ধৃত করে 'শনিবারের চিঠি'তে বুদ্ধদেবের উপর তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করা হল [মাঘ ১৩৪৫]। 'পূর্বাশা' এবং 'অগ্রণী'র মতো 'প্রগতিশীল' পত্রিকাও বুদ্ধদেবের উপর প্রসন্ন হল না। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশায় লেখা হল :

"শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অতি সম্প্রতি বামপন্থী হয়েছেন। গল্পে তাঁর বামপন্থার উদাহরণ পেয়েছি আমরা— প্রবন্ধে তিনি আক্ষেপ করেছেন, চড়বার জন্যে তাঁরও একটা মোটর থাকবে না কেন?... প্রগতি সম্মেলনের বক্তৃতায়ও বুদ্ধদেববাবু

সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্বন্ধে অন্ধ থেকে এই আক্ষেপ করেছেন যে তাঁদের সাহিত্য বহুল প্রচার লাভ করছে না।... [বুদ্ধদেববাবুর] বইগুলি সংস্কারাচ্ছন্ন একজন পেটি বুর্জোয়া লেখকের বুর্জোয়াজীবনের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। বুদ্ধদেববাবু প্রগতি আন্দোলনকে আপন সাহিত্যপ্রচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেই নিরস্ত নন। তাঁর কবিতা পত্রিকাশ্রিত একদল বন্ধুকেও তিনি সঙ্গে নিতে চান।... সময়েব মাপকাঠি হাতে নিয়ে যদি বুদ্ধদেববাবু 'রবীন্দ্রস্রষ্টাযুগ অতীত হয়েছে' বলে থাকেন, তবে তাঁব সেই শিশুসুলভ যথার্থবাদিতা উপহাসেবও অযোগ্য।"

পূর্বাশা : পৌষ ১৩৪৫

সঞ্জয় ভট্টাচার্য এখনো পুরোনো কথা ভুলতে পারেননি— এই উদ্ধৃতির সবটাই বুদ্ধদেবের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ, যার হাতিয়ার হল যুক্তি নয়, বিদ্রূপ ও কটূক্তি। সমকালের কাছ থেকে সদর্থক সমালোচনার বদলে এই ধরনের ব্যঙ্গোক্তি ভরা আক্রমণ পেতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর আচরণ বা সাহিত্যকৃতি বিষয়ে সহৃদয় আলোচনা তাঁর সমকালে নিতান্ত বিরল।

বুদ্ধদেবের উপর এসব লেখার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানা যায় না। শুধু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রচিত স্মৃতিকথায় এই সময়ের উল্লেখ করে লিখেছিলেন :

"কী বলেছিলাম ঈশ্বরের দয়ায সবই বিস্মৃত হয়েছি; শুধু একটা কথা, যেহেতু 'অমৃতবাজার' সেটাকে হেডলাইনে বিঁধে খেলিয়েছিলো এবং তা নিয়ে বাগবিতণ্ডাও মন্দ হয়নি, এখনো আমাকে কৌতুকের কণ্ডূয়ন জোগায় মাঝে-মাঝে। The age of Rabindranath is over। শুনেছি রবীন্দ্রনাথও ব্যথিত হয়েছিলেন কথাটা শুনে। তিনি কি জানতেন না ঘোষণাকারীর এক দণ্ড রবীন্দ্রনাথ বিনা চলে না?"

—'আমাদের কবিতাভবন'। শারদীয় দেশ ১৩৮১

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

ছোটোগল্প লিখছেন, বড়োদের ও ছোটোদের জন্য। এবছর কোনো নতুন উপন্যাসে হাত দিলেন না। 'পরিক্রমা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হল। ছোটোদের জন্য গল্পসংকলন বেরোল দুটি— শ্রাবণ ১৩৪৫-এ 'গল্প-ঠাকুর্দা, পৌষে 'এক পেয়ালা চা'। গত চার-পাঁচ বছর ধরে এই গল্পগুলি মৌচাক ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দুটি ভ্রমণকাহিনিও বেরোল— জুলাইতে 'সমুদ্রতীর', অগস্টে 'আমি চঞ্চল হে।'

১৯৩৯ ।। বয়স একত্রিশ

করিমগঞ্জের সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক মন্তব্যে বিতর্ক

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ :

"সিলেট এবং কবিমগঞ্জ থেকে একটি সাহিত্যসভার আমন্ত্রণ এল বুদ্ধদেবেব কাছে। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললাম, চলো চলো আমার বেশ কযেকদিন ঢাকা থাকা হ্‌যে যাবে। সভাসমিতি বিষয়ে বুদ্ধদেবের অনীহা অতি প্রবল। আমাব ঢাকা যাবার আগ্রহের উগ্রতা দেখে বুদ্ধদেব রাজি হ্‌যে গেলেন। আসলে বুদ্ধদেব নিজেও ঢাকা যেতে ভালোবাসতেন। দিন দশেকের অথবা সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি নিলেন কলেজ থেকে।...

... কবিমগঞ্জে গিয়ে একটি পরিবারের বাড়িতেই ওঠানো হল আমাদের। আদর-যত্নের কোনো অভাব ছিল না, উপরন্তু পরিবারেব মধ্যে থাকার দরুন, বাচ্চা নিয়ে এতটুকুও অসুবিধে হল না। সেখানে তিন দিন থেকে চতুর্থ দিনেব দিন সিলেটে গেলাম। সেখানে গিযেও একটি পরিবারের বাড়িই অতিথি হলাম। পরিবারের কর্তাব নাম ত্রিগুণা সেন। যে ত্রিগুণা সেন পরবর্তী জীবনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা।...

বুদ্ধদেব যাবার দরুন সেখানকার সাহিত্যপ্রেমী ব্যক্তিদের এবং ছাত্রদের আনাগোনা অবারিত হল। এরই মধ্যে একটি ছাত্র তার লেখা কিছু কবিতা নিয়ে এলো, নাম মৃণালকান্তি, একান্তই ছেলেমানুষ, হয়তো আই. এ. পরীক্ষার্থী। রীতিমতো ভালো কবিতা লিখেছেন। সেই কবিতাগুলোর মধ্যে থেকে বেশ কিছু কবিতাই ছাপা হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায়। সেখানে আরো একজন কবিও দেখা করলেন বুদ্ধদেবের সঙ্গে। তাঁর নাম অশোকবিজয় রাহা।[১] "

—*জীবনের জলছবি।* ৩য় মু, পৃ. ১৪৭

করিমগঞ্জের এই সাহিত্যসভায় বুদ্ধদেব যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে তাঁর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক মন্তব্য নিয়ে সে-সময় তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। নানা পত্রিকায়, বিশেষত যুগান্তর-অমৃতবাজার গোষ্ঠী, বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে নানারূপ অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করে বুদ্ধদেবের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করলেন। অন্তত রবীন্দ্রনাথ যাতে তাঁকে

---

১. অশোকবিজয় রাহার কবিতা 'কবিতা'য় প্রথম বেরোয় এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই— আষাঢ় ১৩৪৭ সংখ্যায়। মৃণালকান্তিকে অবশ্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাঁর কবিতা প্রথম 'কবিতা'য় বেরিয়েছিল আষাঢ় ১৩৫৪ সংখ্যায়।

ভুল না বোঝেন, তার জন্য বুদ্ধদেব তাঁকে এই চিঠিটি লেখেন :

"... তা ছাড়া অমৃতবাজার কিছুদিন যাবৎই মস্ত হেডলাইন সহযোগে আমাকে অপদস্থ কববার চেষ্টা চালাচ্ছে— ওবা যে-অভদ্রভাবে আমাকে ভদ্রসমাজে উপস্থিত করে তা দেখলে আমার লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে করে। যা-ই হোক, করিমগঞ্জের সাহিত্যসভায় আমি যে-প্রবন্ধটি পড়েছিলুম তার একটি কপি এইসঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি— শ্রীহট্ট শহরে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলুম তা এই প্রবন্ধেরই সারাংশ। আমাব একান্ত অনুরোধ এই আপনি দয়া করে লেখাটির উপব একবার চোখ বুলোবেন —আধুনিক সাহিত্যেব সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমি এতে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি। শ্রীহট্টে আমি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলুম, 'রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ কবা খুবই শক্ত'; বোধ হয় সে-কথাই এমন বিকৃত হ'য়ে রটেছে।

আপনার চরণে আমার অসংখ্যপ্রণাম। [২৯.৫.৩৯]

বুদ্ধদেব বসু

—*রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র* ১৬ : বুদ্ধদেব বসুব চিঠি, নং ১৬

বুদ্ধদেবের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল করিমগঞ্জের পত্রিকা 'পল্লীবাণী'তে, নাম ছিল 'সাহিত্যিক প্রগতি'। সেখান থেকে কিছু অংশ পড়তে গেলে বাঁধাঁ লাগবে আমাদের, এই প্রবন্ধ কেমন করে রবীন্দ্র-বিরোধী বলে ব্যাখ্যাত হয়েছিল ভেবে অবাক লাগবে। বাস্তবিক, রচনাটির যদি কোনো দোষ থাকে তা রবীন্দ্র-বিরোধিতা নয়, অত্যধিক রবীন্দ্রভক্তি :

"... ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরেজশাসনের ফলে বাংলাদেশেই প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিনে রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও যৌবন। এই মধ্যবিত্ত তখন সমস্ত বিষয়েই অগ্রণী, দেশের ভবিষ্যতের তাঁরাই নিয়ন্তা। চারদিকেই তখন আশা ও উৎসাহের আন্দোলন, একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের ফিউডল সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটছে। সেই নবজন্মে ধাত্রীর কাজ যাঁরা করেছিলেন,... তাঁদেরই কীর্তি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলো।

এই কারণেই রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি নিঃসংশয় বিশ্বাস পাওয়া যায়, যার পটভূমিকায় আধুনিকদের নাস্তিকতা আজ এমন উগ্র হয়ে ফুটেছে। তাঁর সময়ে, তাঁর সমাজে, তাঁর শ্রেণীতে তিনি আন্তরিক বিশ্বাসী ছিলেন, না-হওয়া অসম্ভব ছিলো, শিল্পী হিশেবে এটা তাঁর সৌভাগ্য। যে কোনো জীবন্ত বিশ্বাস শিল্পীর পরম সহায়ক। মানুষের ও ঈশ্বরের চোখে কবির যে একটি বিশেষ সার্থকতা আছে, এ-বিষয়ে মুহূর্তের জন্যও রবীন্দ্রনাথকে সন্দিহান হতে হয়নি। তাঁর গীতিকবিতার সানন্দ স্বতঃস্ফূর্ততা আজও তাই এমন আশ্চর্য।

... আধুনিক বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথই সৃষ্টি করলেন। তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ আধুনিককালে হয়তো সার্থক নয়, যে-কোনো আদর্শেই একটা সময়ে ভাঙন ধরে। কিন্তু কোনো আদর্শ কি রীতি কি নীতির চাইতে অনেক বড়ো জিনিশ তিনি আমাদের

দিয়েছেন; আমাদের মাতৃভাষাই তাঁর কাছ থেকে আমরা পেযেছি। আজ আমরা যারা লিখছি, এবং আমাদের পরে যারা লিখবে, চিরকালের বাঙালি লেখক এই অর্থে ববীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী।

সত্যি বলতে, রবীন্দ্রনাথের পরে এবং রবীন্দ্রনাথেরই জন্য, বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিকের দিক ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। কোনো ভাষা কতদূর পবিণত, অনুৎকৃষ্ট লেখকেব রচনা দিয়েই বোধহয় তার বিচার ভালো হয়। আমাদের ভাষা যে তৈরি হযেছে তাব প্রমাণ এই যে আজকের দিনে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট লেখকও শব্দব্যবহারের কৌশল জানেন বলে মনে হয়। এ কুশলতা তাঁদের নিজস্ব নয়, তা ভাষাবই বক্তে-মাংসে নিহিত।"

উৎস : রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ১৬ গ্রন্থপরিচয, পৃ. ৪১৯

প্রতিভা বসুর সংগীতচর্চার শেষ ও সাহিত্যচর্চার আরম্ভ

শ্রীহট্ট ও করিমগঞ্জের সাহিত্যসম্মেলন থেকে ফেরার পথে শরীর খারাপ বলে প্রতিভা বসু থেকে গেলেন ঢাকায় পিত্রালয়ে। স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"বুদ্ধদেবেব ছুটি ফুবিযে গেছে, একাই ফিরতে হল তাঁকে। ভদ্রস্থ হয়ে উঠতে প্রায় মাসদুই লেগে গেল। এই সময়ে বুদ্ধদেব লিখলেন, 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সুবোধ মজুমদার বলেছেন, আমি এবং তুমি দুজনে মিলে যদি একটি প্রেমের উপন্যাস লিখে দি, উনি ছাপবেন এবং ভালো টাকা দেবেন।'

সুবোধ মজুমদার আমাকে কেন লিখতে বললেন সেটা অবশ্য আমি বুঝতে পাবলাম না। কেননা আমি তো বিবাহের পরে কখনোই কিছু লিখিনি। বিবাহের পূর্বেও যে কিছু লিখেছিলাম তা-ও তাঁর জানবার কথা নয়, এতই নগণ্য। 'ভারতবর্ষে' দুটি কবিতা, 'নবশক্তি' এবং কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় একটি কাগজে একটি গল্প ব্যতীত লেখকজীবনের আর কোনো সম্বল আমার ছিল না। বিবাহের পরে আমি যে শুধু গানের সঙ্গেই সংস্রবচ্যুত হয়েছিলাম তাই নয়, ওরকম একজন ডাকাবুকো সাহিত্যিককে বিবাহ করে কিছু লিখব এমন দুঃসাহসও আমার ছিল না। গানের সঙ্গে সংস্রবচ্যুত হবার জন্য অবশ্য বুদ্ধদেবকে একবিন্দুও দায়ী করা যায় না। গান করা বিষয়ে আমার নিজেরই কোনো ইচ্ছে বা উৎসাহ বাল্যকাল থেকেই নেই।... বিবাহের পরে গান বন্ধ করবার সুযোগ নেওয়াটা আমার পক্ষে হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধদেব নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক তো বটেই এবং পূর্বেই বলেছি, কারো মধ্যে এতটুকু স্ফুলিঙ্গ দেখলেই তাকে উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করে যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলে ধরবার জন্যেও তিনি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা। সংগীত বিষয়েও তাঁর আগ্রহ যদি সেই মাত্রায় না থাকুক, তার শতাংশের একাংশও থাকত তাহলেও হয়ত আমি এই চর্চা অব্যাহত রাখতে বাধ্য হতাম। একেই তো গান একটা সরব ব্যাপার, তার একটা আয়োজন আছে। তানপুরা চাই, তবলা চাই, সেই তবলা বাজাবার একজন বাদক চাই, অবসর চাই, একাগ্রতা চাই, সেসব বুদ্ধদেব বসুর

পবিবেশে ছিল না। সেখানে যে আড্ডা বসত সেটা একান্তই সাহিত্যের আড্ডা। গানেব প্রবেশাধিকার সেখানে শূন্যের অঙ্কে। বুদ্ধদেব বা বুদ্ধদেবের বন্ধুরা কখনো আমাকে গান করবার অনুরোধ জানাননি। আমিও তাতে দুঃখিত হইনি।...
যতদিনে কলকাতা ফিরে এলাম ততদিনে বই প্রায় শেষ। অবসর মতো পড়ে বুদ্ধদেব আমাকে এতটাই সাধুবাদ দিলেন যে রীতিমতো অহংবোধে আক্রান্ত হলাম। এসব বিষয়ে বুদ্ধদেবের স্ত্রীপুত্রকন্যা কারো জন্যই কোনো দুর্বলতা ছিল না, যা ভালো তা ভালো যা মন্দ তা মন্দ।...
বুদ্ধদেব বললেন, 'তুমি তো প্রায় শেষ ক'বেই এনেছো বইটা, এটা তোমার লেখা ব'লেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। তোমার লেখায় আমি কোথায় আমার লেখা ঢোকাবো? বরং আরেকটা বই লেখা যাবে যেটা সত্যি সত্যি অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমাব।' সুতরাং আমিই শেষ করলাম বইটা। কিন্তু ছাপবে কে? আমাব লেখা বই যে কোনো প্রকাশকই নেবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কবিতাভবন থেকেই বেরুল সেটি। সেটিই আমার প্রথম উপন্যাস, নাম 'মনোলীনা'। শুধু প্রথম উপন্যাসই নয়, বিবাহিতা মেয়ের স্বামী বর্তমানেও প্রেমে পড়ে পুনর্বিবাহেব গল্প হিশেবেও প্রথম। তখন আমি খুব নিন্দিত হয়েছিলাম সন্দেহ নেই, যা এখন জলভাত।"

—*জীবনেব জলছবি*। ৩য় মু, পৃ. ১৪৯

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

"গ্রামোফোন কোম্পানির উৎসাহ ক'মে যায়নি, কিন্তু বিয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে বানুর গানের চর্চা শুকিয়ে গেলো। সে তোড়জোড় বেঁধে শুরু করেছিলো কয়েকবার, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে চালাতে পারেনি : নিয়মিত ওস্তাদের বেতন জোগাতে গেলে বাজাবখরচে টান পড়ে আমাদের, সাহিত্যিক-অধ্যুষিত হাস্যরোলমুখর ছোটো ফ্ল্যাটে খেয়ালের তান পাখা মেলতে পারে না। উপরন্তু অন্তরায় দাঁড়ালো আমাদের শিশুকন্যাটি; রানু হার্মোনিয়াম খুলে গানে টান দিলেই সে ভয় পেয়ে তার মায়ের মুখ চেপে ধরে, জীবনের প্রবলতর ধ্বনির কাছে সুবশিল্পকে পিছু হটতে হয়। হয়তো এও এক বাধা ছিলো যে আমি রাগসংগীতে বধির, এবং রানুর নিজেরও নেই সেই জেদ এবং উচ্চাশা, যার উশকোনি বিনা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা একলা বেশিদূর এগোতে পারে না। কিন্তু এ-রকম সময়েই, তার গান যখন নানা দিক দিয়ে বিপন্ন, তার অন্য একটি পুরোনো বিদ্যা সে ঝালিয়ে নিচ্ছিলো— একটি শব্দহীন অনাড়ম্বর চর্চা, যার জন্য বাদ্যযন্ত্র তবলচি ওস্তাদ কিছুরই প্রয়োজন করে না, শুধু একটি কলম আর কিয়ৎপরিমাণ কাগজ পেলেই চলে। মাঝে-মাঝে তার দুপুর সন্ধ্যার অবকাশ কাটায় গল্প লিখে— কাঁচা লেখা সেগুলো; কিন্তু হঠাৎ একদিন কোনো এক ঝোঁকে লিখে ফেললো 'অনর্থক' নামে একটা গল্প— সেই তার প্রথম, আমি যেটাকে মন খুলে ভালো বলতে পারলাম; 'চতুরঙ্গে' সেটা বেরোবার পর অনেক গুণীজ্ঞানীও প্রশংসা করলেন। রানুর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে দুটো কথা আমাদের অনবরত শুনতে হয়েছে; নির্বোধেরা

বলেছে তাব গল্পগুলি আমি লিখে দিচ্ছি, আব বুদ্ধিমানেবা তাকে আমাব উপবে স্থান দিযেছেন। এই শেষেব কথাটা আমাব পক্ষে প্রীতিকব, এবং তা শুধু ব্যক্তিগত কাবণেই নয; তাব গদ্যেব সহজ মাধুর্য, আমি জানি, আমাব আযত্তেব বাইবে, তাব সংলাপবচনা ঈর্ষাযোগ্য ভাবে স্বাভাবিক, সুধীন্দ্রনাথেব একটি চিঠিতে লেখা এই মন্তব্যেব সঙ্গেও আমি একমত।

বাডিতে একটিমাত্র লেখাব টেবিল, আমি যেটি প্রায সাবাক্ষণ জুডে থাকি। বানু লেখে মেঝেয ব'সে, দবজাব পাল্লায ঠেসান দিযে— তাব হাঁটুতে লেখাব প্যাড, তাব মনোযোগ বাববাব বিস্রস্ত। কখনো তাকে উঠে যেতে হয ভৃত্যেব কথায, বান্নাব তদাবকে, কখনো সন্তানেব খুনসুটি আবদাব মেটাবাব জন্য, কোনো আত্মীয বেডাতে এলে আদব-আপ্যাযনও তাকেই কবতে হয। ভার্জিনিযা উলফ-বর্ণিত 'নিজেব জন্য আলাদা ঘব' তাব কল্পনাতেও নেই সে লিপ্ত হ'যে আছে ওতপ্রোতভাবে তাব ঘবকন্নায, সন্তানপালনে— আব আমিও, আগে যেমন দিদিমাব উপব, তেমনি এখন বিবিধ দৈনন্দিন ব্যাপাবে তাবই উপব নিশ্চিন্ত নির্ভব কবে থাকি। আব এমনি ক'বে, সংসাবেব 'অণুকোটি চৌষট্টি' দাবিব ফাঁকে-ফাঁকে সে লিখে যাচ্ছে একেব-পব-এক গল্প-উপন্যাস, কবিতাভবনেব সীমাবদ্ধ প্রচাব সত্ত্বেও দিনে-দিনে বাডছে সেগুলিব পাঠকেব এবং বিশেষত ভক্ত পাঠিকাব সংখ্যা— হযতো সে লেখায কখনো পুরুষ সাজে না ব'লে মেযেবা তাব সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মন মেলাতে পাবে।.."

—'আমাদেব কবিতাভবন', শাবদীয দেশ ১৩৮১

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

এবছব একটিমাত্র বই বেবোল তাঁব, ছোটোদেব জন্য গল্পসংগ্রহ 'এক পেযালা চা', ডিসেম্ববে। 'নতুন পাতা'ব কবিতা-বচনাব শেষ পর্যায চলছে; ছোটোদেব উপন্যাস, 'দস্যুব দলে ভোমবা', লিখে উঠলেন, ছোটো গল্পও লিখছেন, লিখছেন 'এক পযসায একটি' গ্রন্থেব কবিতা। 'কালো হাওযা' উপন্যাস আবম্ভ কবলেন।

সবচেযে বেশি ব্যস্ত বযেছেন 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলন নিযে— তিনি সম্পাদক নন, কিন্তু তিনিই সব। কবিতাভবন ও এম. সি সবকাবেব যৌথ উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হবে আগামী বছব।

১৯৪০ ।। বয়স বত্রিশ

দ্বিতীয়া কন্যা দময়ন্তীর জন্ম হল ৯ জানুয়ারি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক'

ফেব্রুয়ারি মাসে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই, 'পদাতিক'। তেইশটি কবিতার সংকলন, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২।

বুদ্ধদেব বসু একেবারে গোড়া থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী পাঠক। আষাঢ় ১৩৪৫ (জুলাই ১৯৩৮) সংখ্যা 'কবিতা'য় তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ করেন বুদ্ধদেব— তখন তিনি লিখতেন সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে। এর বছরখানেক আগে থাকতে তিনি নানা পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছেন। 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরিয়েছে কার্তিক ১৩৪৯ পর্যন্ত— তারপর সম্ভবত রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে সুভাষ কবিতাভবন থেকে দূরে সরে যান। এই বই বেরোবার সময় বুদ্ধদেব বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তাঁর কবিতার। এক কপি বই রবীন্দ্রনাথকেও পাঠালেন, সঙ্গের চিঠিতে লিখলেন : "আমি নিজে সুভাষের কবিতার বিশেষ অনুরাগী, এত অল্প বয়সে এতখানি শক্তির প্রকাশ আমার তো বিস্ময়কর মনে হয়।" [রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ১৬, পৃ. ১৯৫]। পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যার 'কবিতা'য় এ-গ্রন্থের আশ্চর্য আলোচনা করলেন বুদ্ধদেব। সে-আলোচনার কিছু-কিছু অংশ :

> "দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি। কিন্তু 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বেরোবার পর থেকে সে-সম্মান হ'লো বিষ্ণু দে-র ভোগ্য, যতদিন না সমর সেন দেখা দিলেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' নিয়ে। সম্প্রতি এই ঈর্ষিতব্য আসন সমর সেনেরও বেদখল হয়েছে, বাংলার তরুণতম কবি এখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।"

স্মর্তব্য, উল্লিখিত দুটি বইই প্রকাশ করেন বুদ্ধদেব; 'উর্বশী ও আর্টেমিস' 'গ্রন্থকার-মণ্ডলী' থেকে, 'কয়েকটি কবিতা' 'কবিতাভবন' থেকে।

> "অভিনন্দন তাঁকে আমরা জানাবো, কিন্তু তা শুধু এই কারণে নয় যে তিনি এখন কবিকনিষ্ঠ। কিংবা নিছক এ-কারণেও নয় যে তাঁর কবিতা অভিনব যদিও তাঁর অভিনবত্ব পদে-পদেই চমক লাগায়। তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান।...

সুভাষ মুখোপাধ্যায দুটি কাবণে উল্লেখযোগ্য; প্রথমত, তিনি বোধহয প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমেব কবিতা লিখে জীবন আবম্ভ কবলেন না। এমনকি, প্রকৃতিবিষযক কবিতাও তিনি লিখলেন না।... দ্বিতীযত, কলাকৌশলে, তাঁব দখল এতই অসামান্য যে কাব্যবচনায তাঁব চেযে ঢেব বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেবও এই ক্ষুদ্র বইখানায শিক্ষণীয বস্তু আছে ব'লে মনে কবি।...

ঈশ্বব-অবিশ্বাসী পাঠকেব পক্ষে যদি ববীন্দ্রনাথেব কবিতা উপভোগেব কোনো বাধা না থাকে, তাহ'লে সাম্যবাদে সন্দিহান পাঠকেব পক্ষেও 'পদাতিক' উপভোগ্য হ'তে পাবে না তা নয।...

জনগণেব কবি হ'তে যাওযাব... বিপদ সম্বন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায অনবহিত নন। 'পদাতিকে' বযেছে সবলতাব পাশাপাশি জটিলতা, নিঃসংকোচ, উচ্চ ঘোষণাব পাশে-পাশে ব্যঙ্গেব চাতুবী, ধ্বনিব বিচ্ছুবিত আভা। সমসামযিক অনেক কবিব কাছেই তিনি পাঠ নিযেছেন— বিশেষত বিষ্ণু দে ও সমব সেনেব কাছে— কিন্তু তাঁব লেখা অন্য কাবো অক্ষবেব উপব মকশো কবা নয। এত অল্প বযসে যে নিজেব একটি বিশিষ্ট বীতি তিনি নির্মাণ কবতে পেবেছেন, এতেই তাঁব প্রতিভাব পবিচয।..

সুভাষ মুখোপাধ্যাযেব ছন্দেব কান নিখুঁত, ছন্দ নিযে এই ৩২ পৃষ্ঠাব ক্ষুদ্র গ্রন্থে নানাবকম পবীক্ষায তিনি সফল হযেছেন; নতুন ধ্বনি অন্বেষণেব দিকে তাঁব এই ঝোঁক যদি ববাবব বজায থাকে, তাহ'লে বাংলা ছন্দেব বড়ো বকমেব কোনো পবিণতি তাঁব কাছে আশা কবা অন্যায হয না।..

'পদাতিকে' দুটি দিকই আমি দেখিযেছি : প্রথমে, সবল, চড়া গলাব কবিতা, যা 'জনপ্রিয' হবাব দাবি বাখে, অন্যদিকে জটিল বিন্যাসেব সংস্কৃতিবান কবিতা। দু-দিক বজায বাখা চলবে না, এক দিক ছাড়তে হবে। যদি তিনি বিশ্বাস কবেন যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ কবাই তাঁব কর্তব্য, তিনি তা কববেন মানুষ ও কর্মী হিশেবেই, কবি হিশেবে নয। কিন্তু যখন এবং যতক্ষণ তিনি কবি, কবিতাব উৎকর্ষই হবে তাঁব সাধনা। হয তাঁকে কর্মী হ'তে হবে, নযতো কবি। তিনি কোন দিক ছাড়বেন?"

[পবে 'কালেব পুতুল' গ্রন্থে সংকলিত]

'আধুনিক বাংলা কবিতা' : প্রথম সংস্করণ

জুলাই মাসে, কবিতাভবনের উদ্যোগে প্রকাশিত হল আধুনিক কবিতার সংকলনগ্রন্থ, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। সম্পাদনা করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

"প্রগতিশীলদের সঙ্গে আমার রুচিভেদ, যা কালক্রমে খুব স্পষ্ট হযে উঠেছিলো

— আমি তা প্রথম টের পেলাম যখন 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনগ্রন্থটি প্রস্তুতির পথে।

কয়েক বছর আগে [১৯২৭] নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবী বের করেছেন তাঁদের 'কাব্য-দীপালি'— সেটাই বোধহয় প্রথম কাব্যসংকলন বাংলাভাষার, আর সেই হিশেবে উত্তরকালের স্মরণযোগ্য— কিন্তু প্রথম দর্শনে আমরা কেউ খুশি হতে পারিনি। মস্ত আকারে জমকালো বাঁধাই উপহারযোগ্য রাজসংস্করণ, ভালো কবিতা অনেক আছে কিন্তু সন্নিবেশে বিশিষ্ট কোনো রুচির পরিচয় নেই— আর পাঠ্যবস্তুকে প্রায় ছাপিয়ে উঠেছে ইন্দ্রধনু-রঙা বাজারচলতি হাফটোন-চিত্র অনেকগুলো, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে একটি স্বচ্ছবসনা কিন্তু আধুনিক অন্তর্বাসে লজ্জা-বাঁচানো উর্বশীকে দেখে আমরা খুব হেসেছিলাম।

'কবিতা' বেরোবার পর থেকেই ঝাপসাভাবে ভাবছিলাম কথাটা, 'বাংলা কাব্যপরিচয়ে'র ধাক্কায় মনে হ'লো আর দেরি নয়— আধুনিক কবিতার পর্যাপ্ত একটি সংকলন এখন প্রয়োজন। বন্ধুরা জোর গলায় সমর্থন করলেন, দ্রুত দানা বাঁধলো ব্যাপারটা।..."

—'আমাদের কবিতাভবন'। শারদীয় 'দেশ', পৃ. ২১

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"প্রগতি লেখক সম্মেলন শেষ হওয়ার সময়েই পরিকল্পনা হয় যে এ হেন একটি সংকলন বার করা চাই— সোৎসাহে এগিয়ে এলেন বুদ্ধদেব বসু, তখনই তাঁর কবিতাভবন কর্মব্যস্ত, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ, আমাদের মতো ব্যক্তি তখনো তাঁর চোখে বর্জনীয় সাব্যস্ত হইনি। আইয়ুব বিদ্বান এবং সাহিত্যিক, আব আমি কিঞ্চিৎ 'অন্তেবাসী' হয়েও একটু যেন 'জাতে উঠেছিলাম'— সংকলনের কাজ অবশ্য প্রধানত করলেন আইয়ুব, বুদ্ধদেববাবু এবং অন্যান্য কবিবন্ধুদের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে। সঞ্চয়ন সম্পূর্ণ হবার পর ভাব ও ভাষায় সমৃদ্ধ এক ভূমিকা লিখল আইয়ুব, কিন্তু আমার অনেকটা অসাহিত্যিক মগজে কতকগুলো চিন্তা গিজগিজ করছিল, যা আমাকে বাধ্য করল লেখাতে দ্বিতীয় এক ভূমিকা — 'vct' করাবার জন্য দেখলাম কবি (এবং তখন নিষ্ঠাবান মার্কসবাদী বলে খ্যাত) অরুণ মিত্রকে, তিনি তারিফ জানিয়েছিলেন, অন্তত আমার গদ্যের ছটাকে! বুদ্ধদেববাবু কিন্তু কাব্য ব্যাপারে আমার অনধিকারচর্চায় অপ্রসন্ন হয়েছিলেন— তাঁর 'কবিতা' ত্রৈমাসিকীতে সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত আইয়ুবের ভূমিকার প্রভূত প্রশংসা করে আমারটি সরাসরি অগ্রাহ্য করবার সুপারিশ করলেন..."

—*তরী হতে তীর*। ২য় সং, পৃ. ৩১১

বুদ্ধদেব বসু লিখছেন :

"সম্পাদক-পদে বৃত হলেন এমন দু-জন যাঁরা বৈদগ্ধ্যবান কিন্তু নিজেরা কবি নন —আইয়ুব ও হীরেন মুখোপাধ্যায়; কবিতা-নির্বাচনে সমবায়-নীতি অনুসৃত হ'লো; প্রথম খশড়া-তালিকাটি আমি পেশ করলাম। সপ্তাহে একবার বা দুবার ক'রে সান্ধ্য

/

বৈঠক বসে কবিতাভবনে; নিয়মিত আসেন আইয়ুব, বিষ্ণু দে, সমব সেন, ক্কচিৎ কখনো নানা কাজে ব্যস্ত হীবেন মুখার্জি; আব আসেন তরুণতব এমন অনেকে যাঁবা কবিতা পড়েন ও বচনাও কবেন— দুশো-দুইযেব ছোটো বাবান্দা উপচে পড়ে এক-একদিন, অকুলোন হয আসনেব এবং চাযেব পেয়ালাব। অনেক আলোচনা ও অবান্তব কথা ও বিতর্ক ও কৌতুক-বিনিময়েব মধ্য দিযে সমাধা হ'লো নির্বাচনকর্ম, দুই সম্পাদকেব দুটি ভূমিকাও তৈবি। বড়ো বই, নিজেদেব সাধ্যে কুলোবে না; নির্ভবযোগ্য প্রকাশক চাই। আমাব প্রথমেই মনে পড়লো সুধীব সবকাবকে; তাঁব জনবহুল দোকান-ঘব এড়িযে চ'লে এলাম এক সন্ধ্যায তাঁব বাড়িতে, নিভৃতে বলাব অবকাশেব জন্য। অল্প জ্বব নিযে তাঁব চাবতলাব ঘবে শুযেছিলেন তিনি, আমাব প্রস্তাব শুনে উঠে বসলেন এবং অধিক বাক্যব্যয বিনা সম্মত হলেন[১]— তাঁব কাছে এতখানি উৎসাহ আমাব প্রত্যাশাব মধ্যে ছিলো না, কেননা আধুনিক কবিতা তখনো জাতে ওঠেনি। প্রকাশেব পব প্রচাব হ'লো অত্বব এবং সীমিত, কিন্তু মনীষীবা অনাদব কবলেন না— নিষ্ঠাবান সমালোচনা লিখলেন দু-জন প্রবীণ কাব্যবসিক পণ্ডিত; 'কবিতা'য অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ও বিপন কলেজেব অধ্যক্ষ ববীন্দ্রনাবাযণ ঘোষ 'পবিচযে'।

আমবা সকলেই আনন্দিত যে বই বেবিযেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো তা আমাব মনে হ'লো অপবিপূর্ণ। আমবা আবম্ভ কবেছিলাম 'লিপিকা' দিযে; কথা ছিলো বিশ শতকেব সত্যিকাব প্রতিনিধি হবে বইটা; কিন্তু নির্বাচনকালেই লক্ষ কবেছিলাম সেই ধবনেব কবিতা প্রাধান্য পাচ্ছে যাকে তখনকাব ভাষায বলা হ'তো 'সমাজচেতন', তুলনায অন্য জাতেব কবিবা উপেক্ষিত হচ্ছেন— ভূমিকাদুটিতেও সেই ভঙ্গি সুপবিস্ফুট। আমাব পক্ষে সবচেযে বড়ো বেদনাব কাবণ জীবনানন্দ —যাঁব 'ধূসব পাণ্ডুলিপিব পবেও আবো অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা বেবিযে গেছে ততদিনে, অথচ যিনি স্থান পেযেছিলেন অতি সংকীর্ণ; আমি বহু তর্ক ক'বেও অন্যদেব বোঝাতে পাবিনি যে জীবনানন্দ শুধু 'বর্ণনাধর্মী' লিপিকাব নন, অতি গভীব ভাবনাঋদ্ধ এক কবি— আমাদেব মধ্যে অন্যতম প্রধান। আমি অগত্যা আপোশ কবেছিলাম যাতে অন্তত বইটা বেবিযে যায এবং বন্ধুতা অটুট থাকে, কিন্তু অসন্তোষ ভুলতে পাবিনি।"

—'আমাদেব কবিতাভবন'। পৃ. ২১

১. প্রথম সংস্কবণেব মুখপাতে ছিল :

প্রকাশক কবিতাভবন

———

এম. সি. সবকাব অ্যান্ড সন্স লিমিটেড

১৪ কলেজ স্কোয়াব, কলিকাতা

চোদ্দ বছব পবে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্কবণ যখন বেবোল, দেখা গেল, 'প্রকাশক : কবিতাভবন' বাক্যাংশটি অন্তর্হিত হয়েছে। শুধু এম. সি. সবকাবেবই নাম রয়েছে প্রকাশক হিশেবে।

বুদ্ধদেব বসুকে লেখা আবু সয়ীদ আইয়ুবের কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার শারদীয় ১৪০২ সংখ্যায়, শ্রীসুমন গুণ-এর সম্পাদনায়। চিঠিগুলো পডলে বোঝা যায় এ গ্রন্থের সম্পাদক নির্বাচন, দুই সম্পাদকেব দুটি ভূমিকা লেখা ইত্যাদি ব্যাপারেব পশ্চাদ্‌ভূমি— এবং কবিতা নির্বাচনে অ-কাব্যিক বিবেচনা কীভাবে প্রশ্রয় ও অগ্রাধিকার পেয়েছিল তাব আংশিক ইতিহাস।

২৯।৩।৪০ তারিখে আইয়ুব লিখছেন :

"... অমিয চক্রবর্তীব নতুন বই পড়ে আমাব ধাবণা জন্মেছে যে তাঁকে মাত্র ৪ পৃষ্ঠা দিযে আমবা সুবিচাব কবিনি। আমাব মনে হয 'একমুঠো'তে 'চেতন স্যাকবা' এবং 'যুদ্ধেব খবব' নানাদিক দিযে উল্লেখযোগ্য কবিতা। অন্তত প্রথমোক্তটি আমাদেব সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবা উচিত। এতে বিষ্ণুবাবুবও সমর্থন আছে; হীবেনবাবুব সমর্থন না হলেও অনুমোদন পেযেছি। আপনি কী বলেন? যদি দুটোই নিতে চান আমাব আপত্তি নেই। 'বৃষ্টি' তো আমাব গোডা থেকেই খুব পছন্দ ছিল; আমাব যতদূব মনে পড়ে আপনাব উৎসাহেব অভাবেই সেটাকে বাদ দেওযা হযেছিল। অথচ 'কবিতা'ব সমালোচনায আপনি তাব ভূযসী প্রশংসা কবেছেন। সেটাও নিলে ভাল হত না?... অমিযবাবুব কবিতাব সংখ্যা বাডিযে দিলে আবেকটা সুবিধা এই যে (এটা অবশ্য খুব বড কথা নয) আমাদেব সংকলনগ্রন্থ যে দলগত সে অভিযোগটা কিঞ্চিৎ পবিমাণে খণ্ডিত হবে।..."

১১।৫।৪০ তাবিখেব আবেকটি পত্রাংশ উদ্ধাব কবি। এ থেকে বোঝা যাবে, কবিতা নির্বাচনে কী ধরনের দুর্বিবেচনা কাজ কবেছিল এই গ্রন্থে। এটিও আইয়ুব লিখছেন বুদ্ধদেব বসুকে :

"... anthology ঠেসে ছাপবাব জন্য অন্যান্য কবিদেব সম্বন্ধেও আমাদেব পৃষ্ঠাব অনুমান ভুল হযেছে। তাই পৃষ্ঠাগণনা ছেড়ে দিযে আমি লাইন গুণে দেখলাম। আপনাব মোট লাইনসংখ্যা হযেছে ৩০৫, সুধীনবাবুব ৩৮৬। বিষ্ণুবাবুব সমস্ত কবিতা আমাব হাতে না থাকাতে গুণতে পাবিনি। আন্দাজে তাকে সুধীনবাবুব সমান জাযগা দেওযা হযেছিল, তবে 'শিখণ্ডীব গান'-এব অংশেব বদলে 'পদধ্বনি' নেওযাতে কিছু বেড়ে থাকবে। আপনাব প্রস্তাব মত 'দমযন্তী' (১৫১ লাইন) এবং 'পূর্বরাগে'ব দ্বিতীয় খণ্ড (১২০ লাইন) যোগ কবলে আপনাব মোট লাইন সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৭৬, অর্থাৎ সুধীনবাবুব চেযে ১৯০ লাইন (anthology-র ৭½ পৃষ্ঠা) বেশি। সেটা হীরেনবাবুব আব আমাব মতে সংগত নয, আপনারও এতে মতদ্বৈধ হবে না আশা করি। আগেব কথা অনুযায়ী আপনাকে যদি সুধীনবাবুর সঙ্গে সমান জায়গা দেওয়া হয় (তা সে Anthology-র যত পৃষ্ঠাই হোক) তা হলে আপনাব ৮০ লাইনের মতো রচনা আরও নিতে হয়। যে তিনটি কবিতার উল্লেখ কবেছেন তার মধ্যে 'পূর্বরাগ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডটাই আমার সব চেয়ে বেশি পছন্দ— "যাঁদের মতামতের মূল্য আছে" তাঁদের সঙ্গে কোনো রকম পদসাম্যের দাবি না কবেই একথা আমি বলছি। কিন্তু সুধীনবাবু বিষ্ণুবাবুর 'ম্যালে'কে

উৎকৃষ্টতম মনে করেন, এবং পরিমাণের দিক থেকেও (৭৭ লাইন) তার সমীচীনতা লক্ষ্য করে আমরা সেইটে নেওয়াই স্থির করলাম।..."

২২।৫।৪০ তারিখে লেখা আইয়ুবের আরো একটি চিঠি : এটি ততোধিক আশ্চর্যজনক :

"... আপনি যা লিখেছেন, হীরেনবাবুর ভূমিকায় ঠিক সে কথাটা নেই। "এই অনাড়ম্বর কবির 'লাল ইস্তাহার'এ যে অবৈকল্য পাওয়া যায়, সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠালব্ধ সাম্যবাদী কবিদের লেখায় তা দুর্লভ"— এই গোছের কিছু আছে। এই মতটা আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্কও করেছি, কিন্তু তবু যদি এটা তিনি তাঁর ভূমিকায় প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেন, তা হলে বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য তো হতেই পারে না, তার কোনো অধিকারও আমার আছে বলে মনে করতে পারছি না। দুটো ভূমিকা ব্যাপারটাই একটু বিসদৃশ, কিন্তু তার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই হতে পারে যে দুজন সম্পাদকের মধ্যে মূলগত প্রভেদ রয়েছে।...

সাম্যবাদী সাহিত্য সম্বন্ধে হীরেনবাবুর সঙ্গে আমার (আপনার) ঘোরতর মতবিরোধ আছে একথা জেনেই তো আপনি আমাদের দুজনকে সম্পাদকপদে বরণ করেছিলেন। হীরেনবাবু ঠাট্টা করে বলেছিলেন বটে যে তিনি sleeping editor থাকবেন, কিন্তু seriously কি তেমন কোনো কথা তাঁর সঙ্গে হয়েছিল? আজ যদি তিনি তাঁর বিশিষ্ট মতকে ভূমিকায় ব্যক্ত করবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন (এবং আমি বিরোধী মত প্রকাশ করেছি বলে স্বতন্ত্র ভূমিকা লেখেন), তাহলে আমাদের অপছন্দ হলেও অবদমিত করবার চেষ্টা করব আপনি কি আমি তো এখনো এতখানি হিটলার কিম্বা স্টালিনভক্ত হইনি[১]। অবশ্য ইচ্ছা করলেই আপনি হীরেনবাবুকে এ-বিষয়ে সোজাসুজি লিখতে পারেন; আপনার কথায় তিনি তাঁর ভূমিকায় কিছু বদল করবেন এটা মোটেই আশ্চর্য নয়। তার সময় এখনও আছে।

কাল দুপুরে সমরবাবু এসে অনুরোধ করে গেছেন যে আমি হীরেনবাবুকে এ সম্বন্ধে যেন কিছু না বলি, এবং আপনার লেখা চিঠি তাঁকে না দেখাই।..."

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' একটি বিস্মৃতপ্রায় গ্রন্থ, গবেষক-ভিন্ন অপর পাঠকের তার সম্পর্কে অধিক কৌতূহল না থাকারই কথা। আজ ৪৫ বছর ধরে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বললে

---

১. এ-চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি থেকে বোঝা যায়, সম্পাদক-নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই শেষ কথা বলবার অধিকার বুদ্ধদেবের ছিল, যদিও বইটির প্রথম পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল 'প্রগতি লেখক সংঘে'র কলকাতা অধিবেশনের সময়; এই অনুচ্ছেদ থেকে আরো বোঝা যায়, হীরেন্দ্রনাথই দ্বিতীয় ভূমিকা লেখার জন্য জেদ করেছিলেন এবং সেটা (প্রস্তাব এবং ভূমিকা, উভয়ই) আইয়ুবের পছন্দ হয়নি।

লোকে বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত গ্রন্থটিকেই বুঝে থাকে। বাংলা আধুনিক কবিতার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রারম্ভিক গ্রন্থ হিশেবে প্রায় দুই প্রজন্ম ধরে এটি স্বীকৃত —আজকের অনেক তরুণ পাঠকের হয়তো জানাও নেই যে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণটি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদনা করেননি। কী পরিস্থিতিতে ও কোন পদ্ধতিতে সেই প্রথম সংস্করণটি পরিকল্পিত ও সম্পাদিত হয়েছিল, কেন শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেবকেই এ-গ্রন্থ সম্পাদনা করতে হল তা বোঝবার জন্য এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাটুকুর হয়তো প্রয়োজন আছে। বুদ্ধদেবের জীবনকে বুঝতে গেলে এই গ্রন্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপের কাজ করে; যেসব কারণে তিনি ক্রমশ যৌথ কর্মে আস্থা হারিয়ে নিঃসঙ্গতার দিকে সরে গেলেন, এই গ্রন্থ তার মধ্যে অন্যতম বলে মনে হয় আমাদের। যেহেতু 'প্রগতি লেখক সংঘে'র সম্মেলনে এর পরিকল্পনা স্থির হয়েছিল, তাই সমবায়িক পদ্ধতিতে কাজ করতে চেয়ে বুদ্ধদেব সম্পাদনার দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে—যাঁরা নিজেরা কবি নন কিন্তু বিদগ্ধ পণ্ডিত। কিন্তু দেখা গেল, নির্বাচনের সময়ে তাঁরা কবিতার কাব্যগুণ ব্যতীত তার অন্যান্য পার্শ্বিক গুণের উপর গুরুত্ব দিলেন। ভূমিকা লিখলেন দৃষ্টিকটুভাবে দুজনে দুটি, শুধু তাই নয়, হীরেন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকায় আইয়ুবের বক্তব্যকে আক্রমণ পর্যন্ত করলেন। যেমন, আইয়ুব তাঁর ভূমিকায় লিখেছিলেন : "আমাদের দেশে যাঁরা সাম্যবাদী কবিতা লিখতে সুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে এক দল হচ্ছেন যাঁরা ভাব কিম্বা ভঙ্গি কোনো দিক থেকে কবি নন। এঁরা যে-কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদিঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনার বশেই কবিতা লিখছেন। এতে তাঁদের প্রপাগ্যান্ডার কাজ কতখানি হাসিল হয় বলা শক্ত, তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁদের সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে না দেখে পারে না।" আর হীরেন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকায় লিখলেন : "তাঁরা 'যে কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন,' সেই প্রবর্তনায় যে কবিতা লিখতে পারবেন না, এমন কথা কেউ জোর গলায় বললে অন্যায় করবেন।... মার্কস্‌পন্থা যে কাব্যরাজ্যেরও পাসপোর্ট, তাও বলা হচ্ছে না। কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতিবিকাশের আশা নেই বুঝলে, যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ, সে অভিজ্ঞতার রং আর প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য।"

সমর সেনও লিখেছেন :

"বুদ্ধদেবের 'কবিতা'র আড্ডা ছিল অন্য ধরনের, অনেক বেশি ঘরোয়া, তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। বুদ্ধদেববাবু ছোটোখাটো মানুষ ছিলেন কিন্তু

কোনো কারণে যখন হেসে উঠতেন, তখন ঘরে যেন বাজ পড়ত। ওঁর অট্টহাসি থেকে বোঝা যেত যে, মনে কোনো ময়লা বা বিদ্বেষ নেই। নবীন লেখকদের অবাধ সুযোগ ও উৎসাহ দিতেন। কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল যখন, হীরেনবাবু ও আইয়ুব কবিতাভবন-এর উদ্যোগে আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনে মন দিলেন। কোন কবির কটা কবিতা যাবে এই নিয়ে গাত্রদাহ। সংকলনে হীরেনবাবু ও আইয়ুব বিভিন্ন মতাদর্শে আলাদা আলাদা ভূমিকা লেখেন।"

—*বাবুবৃত্তান্ত*। ১ম সং, পৃ. ১৩০

রবীন্দ্র-রচনাবলি

রবীন্দ্র-রচনাবলি প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। বুদ্ধদেব প্রথম দিকে ভেবেছিলেন, যেমন-যেমন খণ্ড প্রকাশিত হবে তিনি 'কবিতা'য় তার আলোচনা করে যাবেন, যদিও পরের দিকে এই সংকল্প তাঁর বজায় থাকেনি। কিন্তু প্রথম খণ্ডের এই আলোচনাটি বুদ্ধদেবকে বোঝবার পক্ষে বিশেষভাবে মূল্যবান —এটি বেরিয়েছিল 'কবিতা'র পৌষ ১৩৪৬ সংখ্যায়— তাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় ছিল তা এই নিবন্ধে স্বচ্ছভাবে বিম্বিত হয়ে আছে। বস্তুত আর কোনো সাহিত্যিক, কি সমালোচক, রবীন্দ্রনাথের এমন অকৃপণ অথচ যথার্থ প্রশস্তি রচনা করেছেন বলে জানা নেই।

"... রবীন্দ্রনাথ যে সেই বিরল মানবদের একজন, মহাকবি আখ্যা যাঁদের সম্বন্ধে সত্যই প্রযোজ্য, আজ আর তা নিয়ে কোনো তর্ক নেই। বস্তুত, গত কুড়ি বছর ধ'রেই এ-সত্যটি বাঙালি সমাজে প্রতিভাত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মহিমার কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি মহৎ তাঁর সমগ্রতায়। পৃথিবীর অন্যান্য মহাকবিদের স্মরণ করলে বুঝতে পারি বিক্ষিপ্ত রচনায় কি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিতে তাঁর মহত্ত্ব নয়। ... বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তির চাইতে তাঁর সমগ্র কবিতাটি বড়ো, এবং যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতা বা কবিতা-সংগ্রহের চাইতে সমগ্র রচনাবলি বড়ো। এই কারণে কাব্যসংগ্রহে তাঁর প্রতি সুবিচার করা শক্ত, সমগ্রভাবে না-দেখলে তাঁকে ভালো ক'রে দেখা যায় না। এবং সমগ্রভাবে দেখলে এ কথা মানতেই হয় যে পৃথিবীতে তিনি অতুলনীয়।... সত্যি বলতে, পৃথিবীর মহৎ কবিকুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতুলনীয় সুদ্ধ এই কারণে যে তিনি একা, তাঁর জীবনের সাধনায় নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোনো কবি তা করতে পারেননি। এত বড়ো কাজ যে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাঁকে চোখের সামনে না দেখলে আমরা বিশ্বাস করতে পারতুম না। কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর দেখা যায় না। তাঁর চেয়ে বলশালী কল্পনা, গাঢ়তর আবেগ, মানবচরিত্রে সূক্ষ্মতর সৃষ্টি, কথার আরো গভীর জাদুকর ইঙ্গিতময়তা— পৃথিবীর সাহিত্য খুঁজলে হয়তো এ সবই পাওয়া যাবে, কিন্তু

এ-কথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো কবি সম্বন্ধে বলা যায় না যে তিনি একা স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি একাধারে আমাদের আদি ও আধুনিকতম কবি, তিনিই প্রথম ও তিনিই শ্রেষ্ঠ। ছন্দ তিনি দিয়েছেন, গান তিনি দিয়েছেন, গদ্য তিনি দিয়েছেন; আজ আমরা যে-ভাষায় কথা বলি ও লিখি, এ আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তাঁর দীর্ঘ জীবনেও আমরা সকলে ভাগ্যবান, কেননা তাঁর জীবনের রথ বারে বারেই তাঁর কীর্তিকে পিছনে ফেলে যায়। তিনি চির চঞ্চল, কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন না, তাঁর হাতে রীতি কখনো মুদ্রাদোষে অধঃপতিত হয় না, কেননা একটি রীতি তিনি একবারেব বেশি ব্যবহার করেন না। তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ রীতিতে ও বিষয়বস্তুতে স্বতন্ত্র; নিজের কৃতিত্ব কখনো তাঁকে সম্মোহিত করেনি ব'লে 'ক্ষণিকা'র পর 'বলাকা', 'বলাকা'র পর 'লিপিকা', 'লিপিকা'র পর 'পুনশ্চ', অন্য দিকে 'গল্পগুচ্ছে'র পর 'ঘরে বাইরে' ও 'ঘরে বাইরে'র পর 'পয়লা নম্বর' সম্ভব হয়েছে।... ষাট বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, সাহিত্যের অজস্র রূপ ও রীতি, ভঙ্গি ও সুর তিনি সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভাবন করেছেন আঙ্গিকের অফুরন্ত কলাকৌশল, যা অবলম্বন ক'রে বাংলা সাহিত্য আজ ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে বিশ্বের সাহিত্য-অলকায় নিজস্ব মর্যাদার দাবি রাখে।"

—'রবীন্দ্র-রচনাবলী'

কিন্তু তাই বলে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের অন্ধ স্তব কখনো করেননি; যেখানে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে সেখানে আপত্তি জানিয়েছেন তীব্রতম ভাষায়। রবীন্দ্ররচনাবলির তৃতীয় খণ্ডে 'চোখের বালি'র সমালোচনায় ('কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৭) উপন্যাসটির সমাপ্তি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বুদ্ধদেব লিখলেন—

"... বস্তুত বিনোদিনীর এই তুচ্ছ পরিণাম আমাদের মন কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না, কেবলই মনে হয়, এ মিথ্যা, এ ফাঁকি। শেষ পরিচ্ছেদটি গল্পের আভ্যন্তরীণ উপাদান থেকে অনিবার্যভাবে গ'ড়ে ওঠেনি; এটি উপর থেকে বসানো হয়েছে, ছাপার অক্ষরে যা ঘটলো জীবনেও তাই ঘটেছিলো এ আমাদের বিশ্বাস হয় না, মনে হয় এটুকু লেখকের মনগড়া। আর এ-কথা ভেবে আমাদের বিস্ময় কিছুতেই শেষ হয় না যে হস্তলিপিপুস্তকের নীতিবচনের কাছে লেখক বিনোদিনীকে ও তাঁর শিল্পী বিবেককে বলি দিলেন কেমন ক'রে? শেষ পর্যন্ত এই মীমাংসাতেই আমাদের পৌঁছতে হয় যে যে-শুভ সাহস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি আরম্ভ করেছিলেন, শেষ মুহূর্তে তা তাঁকে ত্যাগ করেছিলো, তাই হিন্দু বিধবার বিবাহ ঘটাতে তিনি সাহস পাননি, জীবন যাকে কিছুই দেয়নি অথচ সম্পূর্ণভাবে যে জীবনের যোগ্য তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে হীনচেতা দীনস্বভাব মহেন্দ্র, নষ্ট হবার পুরোপুরি ইচ্ছা যার আছে, অথচ পুরোপুরি নষ্ট হবারও শক্তি নেই, তাকে ফিরিয়ে দিলেন তার সুখের সংসার। এ অবিচার জীবনে নিত্যই ঘটছে ব'লেই একে সাহিত্যে পাংক্তেয় বলি কেমন ক'রে— কারণ জীবনের তো কাউকে বিশ্বাস করবার বালাই

নেই, তাই যে-কোনো অরাজকতা সেখানে সম্ভব; সাহিত্যের প্রধান দায় লোককে বিশ্বাস করানো, তাই তা অসংখ্য নিয়মে বাঁধা।

... বিনোদিনীর প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ বরাবর বজায় রেখেছেন ব'লেই শেষ মুহূর্তের অবিচারের অন্যায় আরো বড়ো হ'য়ে ধরা পড়ে, অথচ 'চোখের বালি'তে যে-চরিত্র সত্যই ঘৃণ্য, অর্থাৎ মহেন্দ্র, তাকে কোনো শাস্তিই তিনি দিলেন না। যে-মহত্তর নীতিজ্ঞান ঔপন্যাসিকেব কাণ্ডারী, তার বিচারে এ-সমাপ্তির কোনোই সমর্থন নেই।"

এই সমালোচনা 'কবিতা'য় পড়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে চিঠি লিখলেন—

২০ জুন ১৯৪০

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের কবিতায় চোখের বালির সমালোচনার শেষ অংশে যে মন্তব্য দিয়েছ তা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। চোখের বালি বেরবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। মাসিকপত্রে অনেক সময়ে লেখকদের অসতর্ক করে দেয়, লেখায় সস্তাদামের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করবার দিকে ঝোঁক আসে। এই দুষ্কর্ম করেছি, কিন্তু তাতে ফল পাইনি, পাঠকেরা যথেষ্ট চোখ রাঙিয়েছিল।... একটা জিনিশ দেখে খুশি হলুম, যদিও তুমি মাস্টারি করচ তবু তোমার লেখায় পণ্ডিতি ঢুকে তাকে ক্লাস পড়ানোর তলায় কাৎ করে ফেলেনি।

রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

তিনটি বই বেরোল এ-বছর। 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থ বেরোল অগস্টে, প্রতিভা বসুকে উৎসর্গ করা; ১৯৩৩ সালের স্মৃতিচারণে এই কবিতাগুলির কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি। শ্রাবণ ১৩৪৭-এ বেরোল 'পথের রাত্রি' নামক ছোটগল্প-সংগ্রহ, ছোটোদের জন্য। গতবছর লেখা 'দস্যুর দলে ভোমরা' নামক ছোটোদের উপন্যাসটিও বেরিয়ে গেল।

'কালো হাওয়া' উপন্যাস শেষ করলেন।

১৯৪১ ।। বয়স তেত্রিশ

সপরিবারে শান্তিনিকেতনে

সে মাসে সপরিবারে গেলেন শান্তিনিকেতন— রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এই দ্বিতীয় ও শেষবার। এই দুবার শান্তিনিকেতন ভ্রমণের স্মৃতি থেকে বই লিখেছিলেন 'সব পেয়েছির দেশে'। সেই বই থেকে :

"দুতিনদিন থাকবো মনে ক'রে বেরিয়েছিলুম; কিন্তু পরিপূর্ণ পদ্মের মতো এক-একটি দিন যখন ফুটে উঠতে লাগলো, এক-এক ক'রে তেরো দিন থেকে গেলুম।... স্বয়ং কবির সস্নেহ দৃষ্টি ছিলো আমাদের 'পরে।...

... চা দিতে ওবা একটু দেরি করতো। ইতিমধ্যে সুধাকান্তবাবুর লিপি এসে পৌঁছতো, 'গুরুদেব আপনাদেব জন্য অপেক্ষা কবছেন, আপনারা আসুন।' আমি ব্যস্ত হ'য়ে চায়ের তাড়া দিতুম, সঙ্গীদের ডাকাডাকি করতুম। সকালে কবির সঙ্গে ঘন্টাখানেক কাটতো, ফিরে এসে দ্বিতীয়বারের চা।...

[ছুটি। ছুটি।]

কঠিন বোগসংকটের ছায়ায়, দেশব্যাপী জয়ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথেব আশি বছর পুরলো। শুনেছিলুম তাঁর রোগযন্ত্রণার, তাঁর ইন্দ্রিয়বিকলতার কথা। মনে ভয় ছিলো, কেমন না জানি তাঁকে দেখবো। হয়তো দু'একটিব বেশি কথা বলবেন না, হয়তো আগেকার মতো নিঃসংশয় নিঃসংকোচে তাঁর পাশে গিয়ে বসা চলবে না। প্রথম দিন সন্ধ্যায় তাঁকে দেখলুম বাইরের বারান্দায়, মনে হ'লো ক্লান্ত, রাত্রির আসন্ন ছায়ায় ভালো ক'রে যেন দেখতে পেলুম না। পরের দিন সকালে যখন তাঁর কাছে গেলুম, তিনি বসেছিলেন দক্ষিণের ঢাকা বারান্দায়। পবনে হলদে কাপড়, গায়ে শাদা জামা। এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন ক'রে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি।...

কে বলবে তাঁকে দেখে যে তাঁর অসুখ! আমরা যাওয়ামাত্রই আরম্ভ হ'লো তাঁর কথা। কণ্ঠস্বর ঈষৎ ক্ষীণ, মাঝে-মাঝে একটু থামেন, কিন্তু কথার জন্য কক্ষনো হাৎড়াতে হয় না, ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি আপনিই মুখে এসে বসে।... সেদিন এক ঘন্টার উপরে প্রায় অনর্গল কথা বললেন, সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা জীবনদর্শন হাস্যপরিহাস মেশানো এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ঝরনায় নেয়ে উঠলুম। এঁর অসুখ! ভাবা যায় না। এই প্রদীপ্ত মনীষা, জীবনের ছোটো-বড়ো সমস্ত ব্যাপারে এই জ্বলন্ত উৎসাহ, ভাষার উপরে এই রাজকীয় কর্তৃত্ব— এর সঙ্গে কোনোরকম রোগ কি বৈকল্যকে সংশ্লিষ্ট করতে আমাদের মন একেবারেই বিমুখ হয়। অথচ সত্যি তিনি

অসুস্থ, অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁর রোগে যন্ত্রণা যেমন, ছোটোখাটো বিরক্তিকর আনুষঙ্গিকও কম নয়।...

তাঁকে দেখে, তাঁব কথা শুনে যখন বেরিয়ে আসতুম, রোজই নতুন ক'রে মনে হ'তো যে সমস্ত জীবন ধন্য হ'য়ে গেলো। তিনি হুবহু তাঁর শেষের দিককার গদ্য বইগুলোর মতো কথা বলেন, অতি সাধারণ কথাকেও অসাধারণ ক'বে বলবার ক্ষমতায় তাঁর গল্পের সকল পাত্রপাত্রীকে তিনি হার মানান, উপমা রূপক থেকে-থেকে ফুটে উঠছে ফুলের মতো, হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ঝিলকিয়ে উঠছে কৌতুক। তাঁর নিটোল সুন্দর স্বর্ণঝংকৃত কণ্ঠস্বর আর তাঁর উচ্চারণের স্পষ্ট, দৃঢ অথচ ললিত ভঙ্গিব সঙ্গে সকলেই তো পরিচিত, তাঁর মুখে শুনলে বাংলাকে অনেক বেশি জোরালো ও মধুর ভাষা ব'লে মনে হয়। তাঁর অভ্যর্থনার মধুরতা ও আলাপের আন্তবিকতা ভোলবার নয়। অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতুম পাছে বেশিক্ষণ থাকা হ'য়ে যায়, পাছে তাঁব কাজের কি বিশ্রামেব ক্ষতি করি। তিনি একটু থামলেই মনে হ'তো এখন বোধহয় ওঠা উচিত। কিন্তু তিনি একটার পর একটা নতুন প্রসঙ্গ পাডতেন— এখানে অনেকেই বললেন যে এত কথা আর এত ভালো কথা কবি অনেকদিন বলেননি।

[গীতময় ইন্দ্রধনু]

আমবা যখন গেলুম তখন একটি নতুন ছোটো গল্প তিনি সদ্য শেষ করেছেন। আরো অনেক নতুন ও নতুন ধরনের ছোটো গল্প তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতে পারতুম— যদি কোনো উপায়ে ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গেই বচনা হ'য়ে যেতো। 'যোগাযোগে'র দ্বিতীয় পর্ব সম্পূর্ণ ভাবা আছে, আমাদের বললেন সেই গল্প, রোমাঞ্চিত হ'য়ে শুনলুম। এই আশ্চর্য গল্প মানসলোকের সীমানা পেরোবে না, অসম্পূর্ণ রইলো 'যোগাযোগে'র মতো মহৎ উপন্যাস। বড়ো লেখায় হাত দেবার উপায় নেই, ছোটোদের জন্য ছড়া বাঁধেন, গল্প গাঁথেন, কখনো কবিতা, কখনো সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন— হঠাৎ হয়তো একটি ছোটো গল্প বেরিয়ে যায়, কি রুদ্র তেজে জ্ব'লে ওঠে রণদীর্ণ উন্মত্ত সভ্যতার প্রতি অভিশাপ— এই ভাবে যেটুকু পারেন তৃপ্ত রাখেন মহান আকাঙ্ক্ষা, অক্লান্ত শক্তি।...

... আতিথেয়তার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, কিছুতেই ঠিক তাঁর মনের মতোটি হয় না; নিয়তকুশলকারী তাঁর পরিজনবর্গ, কিংবা অতিথিরা স্বয়ং, অনেক ক'রে বললেও তাঁর মনে এ-সন্দেহ থেকেই যায় যে অতিথির যত্নে বুঝি কোনো ত্রুটি হচ্ছে। আমরা ঠিক সময়ে চা পাচ্ছি কিনা, রাত্রে আলো পাচ্ছি কিনা, পাখার অভাবে হয়তো কষ্ট হচ্ছে— এ-সব বিষয়ে প্রায়ই খোঁজ নিতেন, আর আমাদের উত্তরগুলো যে নেহাৎ ভদ্রতাপ্রসূত নয়, সত্যি যে আমরা খুব সুখে আছি এ-বিষয়ে কখনোই তাঁকে খুব তৃপ্ত করতে পেরেছি বলে মন হয় না। একদিন সকালে উত্তরায়ণে চা খাচ্ছি, একটু পরেই কবির কাছে যাবো, সুধাকান্তবাবু আমাদের বললেন, 'শুধু খেলে হবে না, কী-কী খেলেন তা তাঁকে গিয়ে বলতে হবে— বুঝলেন?' আমরাও কবির কাছে গিয়ে এক-এক ক'রে সবগুলো জিনিশের

নাম আউড়িয়ে গেলুম— খেয়ে খুশি হয়েছি একথা শুনে তিনি কত খুশি। রতন কুঠিতে সাপের রব যখন উঠলো তিনি ভাবলেন আমরা খুবই ভয় পেয়েছি। বিকেলের দিকে সুধাকান্তবাবুকে ডেকে বললেন, 'উদীচীর উপরতলাটা পরিষ্কার করে দিতে বলো— ওদের সেখানে নিয়ে এসো।' সুধাকান্তবাবু বললেন, 'এখন সব লোকজন চ'লে গিয়েছে, ও বড্ড অসুবিধে।' কবি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'সে তো ঠিকই। লোকজন ডাকবে, ঘর সাফ করবে, জিনিশপত্র সরাবে —সে তো খুবই অসুবিধে। এদিকে ওরা হয়তো সারা রাত জেগে ব'সে থাকবে —সেটাও অসুবিধে। কোন্‌টা বড়ো অসুবিধে ভেবে দেখো।'

এ-কথা সুধাকান্তবাবুর মুখেই পরের দিন শুনেছিলুম। কথাটা শুনে যেমন লজ্জিত হয়েছিলুম, তেমনি রোমাঞ্চিতও হয়েছিলুম কবির স্নেহমাধুর্যে। আমরা প্রথম যেদিন চ'লে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম কবি বললেন, 'না, যেয়ো না। কলকাতায় এখন বড্ড গরম, ছুটি তো আছে, এখানে উপভোগ করো।' আমরা আসাতে তিনি যে সত্যি খুশি হয়েছেন সেটা বারে-বারেই ফুটেছে এমনি নানা ছোটো-ছোটো কথায় ও ঘটনায়। অবাক লেগেছে আমাদের, যে-আনন্দের ঢেউ মনে লেগেছে তা অনির্বচনীয়। এ যেন বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁকে কোনো আনন্দ দিতে পারি এমন-কোনো যোগ্যতাই আমাদের নেই, আমবাই তাঁর কাছ থেকে দু'হাতে লুঠ ক'রে নিয়েছি যা পেরেছি। তিনি অকৃপণ হাতে দিতে ভালোবাসেন, দিতে পেরেছেন ব'লেই খুশি হয়েছেন। কবি ব'লে তাঁকে ভালোবেসেছি চিরকাল, গুরু ব'লে তাঁকে মেনেছি, তাঁর মধ্যে পেয়েছি জীবনের ভিত্তি; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর যে-স্নেহস্পর্শ এবার পেলাম তার স্মৃতি মন থেকে মিলোবে না যতদিন বেঁচে আছি।"

[জীবনসম্রাট]

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কথা বলে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথও তৃপ্ত হতেন, তাঁর বুদ্ধি ও কল্পনা উত্তেজিত হত। তার প্রমাণ হিশেবে তাঁর একটি চিঠির উল্লেখ করা যায়। চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন বুদ্ধদেব শান্তিনিকেতনে থাকাকালীনই। চিঠির ভাষা থেকে বোঝা যায়, আগের দিন বুদ্ধদেবের সঙ্গে তর্ক উঠেছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ এতই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে রাত জেগে চিঠিটি লিখে পরদিন বাহকের হাতে বুদ্ধদেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ চিঠি, দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত, তার বিষয়বস্তু : মানুষ কি শুধুমাত্র ইতিহাসের দ্বারাই চালিত, না কি তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধের দ্বারা? চিঠির তারিখ ২৪ মে ১৯৪১। চিঠিটি আরম্ভ হচ্ছে এইভাবে :

"কল্যাণীয়েষু

বুদ্ধদেব, কাল তোমার সঙ্গে যখন সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম তখন আমি মনে-মনে বারবার জানছিলুম যে অত্যুক্তি করছি। এ রকম জেনেশুনে অত্যুক্তি করার কারণ এই যে..."

সম্পূর্ণ চিঠিটি প্রবন্ধ আকারে 'সাহিত্য, গান, ছবি' শিরোনামে ১৩৪৮ সালের আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে আসার কয়েকদিন পর বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই চিঠিটি পান :

কল্যাণীয়েষু,

এবারে আশ্রম থেকে তুমি অনেক ঝুড়ি বকুনি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছ। আশা করি তার বারো আনাই আবর্জনা নয়। বাজে বকুনির বাহুল্যে প্রমাণ করে খুশির প্রাচুর্যকে, সেটা নিন্দনীয় নয়। তোমাদের ক'দিন এখানে ভালো লেগেছিল। ভালো লাগা জিনিসটা ফুল ফোটার মতোই রমণীয়, সেটাতে চারদিকের লোকেরই লাভ, সেইজন্য আমরাও তোমার আনন্দসম্ভোগের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি।... আশা করি তোমাদের কুলায় আনন্দকাকলিতে ভরে উঠেছে। আকাশে ঘন মেঘ সূক্ষ্ম বৃষ্টির জালে অবকাশকে আবৃত করে আছে। এই রকম মেঘাচ্ছন্ন দিনে মন চায় সেই রকম কথার প্রবাহ যাতে বাক্য আছে বিতণ্ডা নেই, ভালো মন্দর বিচার নিয়ে বিতর্ক নেই। অলস মুহূর্তগুলি মুচমুচে চিঁড়েভাজার মতন এসে পড়ে পাতে, জুড়োতে বিলম্ব হয় না।

ওদিকে বাগানে ময়ূরটা ডেকে ডেকে উঠছে কেবল জানাতে যে খুশি হয়েছি। ইতি ৪।৬।৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ

চিঠিপত্র-১৬ খণ্ডে বুদ্ধদেবকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৩৬টি চিঠি দেখা যায় — প্রথম চিঠির তারিখ ৫ নভেম্বর ১৯৩২, শেষ চিঠির তারিখ এই ৪ জুন ১৯৪১। মৃত্যুর দুমাস আগে লেখা।

শান্তিনিকেতনে জমি কেনা

প্রতিভা বসু লিখেছেন :

"সেবারই শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লী নাম দিয়ে বিশ্বভারতী আরেকটি পল্লী স্থাপন করেন। আগের পল্লীটির নাম ছিল এনড্রুজ পল্লী। সেটা ছিল শ্রীনিকেতনে যাবার পথে উত্তরায়ণের উত্তরে। আর এটি হল উত্তরায়ণের পূর্বে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আগেই আমরা আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপনটি হল দু-বিঘা করে জমির বিনিময়ে আড়াইশো টাকা দিয়ে আজীবন বিশ্বভারতীর সদস্য হওয়া। জমিটা উপলক্ষ, আজীবন বিশ্বভারতীর সদস্যপদটাই ছিল বুদ্ধদেবের আকর্ষণের বস্তু।...

রথীবাবু চোখের তলায় মানচিত্র ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন কোন জমি পছন্দ, সেটাই নিন।' ক্রেতা হিসেবে আমরাই প্রথম কিনা জানি না, তবে প্রথম না হলেও দ্বিতীয় তৃতীয়র অধীনে। কেননা যে জমিই চাইলাম সে জমিই তথাস্তু।

আড়াইশো টাকা সংগ্রহ কবতে বুদ্ধদেবেব যথেষ্ট বেগ পেতে হযেছিল। সেই একচল্লিশ সালে আড়াইশো টাকাব মূল্য নিতান্ত কম ছিল না। বুদ্ধদেব তাঁব স্বভাব অনুযাযী বন্ধুদেবও জোটালেন। আমাদেব সঙ্গে কবি অজিত দত্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ এবং পঙ্কুবাবুও জুটলেন।.. পাঁচ বছবেব মধ্যে বাড়ি তুলতে হবে, আব জমি দান বিক্রি চলবে না। নিবানব্বই বছবেব লিজ।"

শান্তিনিকেতনের আরো কথা

"বতনকুঠিতে থাকাকালীন ব্যক্তিগতভাবে বযসেব যথেষ্ট তাবতম্য থাকা সত্ত্বেও ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে বুদ্ধদেবেব একটা বন্ধুতাব সম্পর্ক স্থাপিত হযেছিল। আমবা প্রত্যেক সকালেই প্রাতবাশেব পব উত্তবাযণে চলে যেতাম। ববীন্দ্রনাথ সেই সমযে উত্তবাযণেই ছিলেন। . আমবা আমাদেব ছোট কন্যাটিকে নিযে যেতাম। ববীন্দ্রনাথেব ইচ্ছেতেই নিতাম। প্রায দেড বছবেব গোলগাল ঝাঁকড়া চুলেব শিশুটি যখন তাব টলটলে পাযে হেঁটে গিযে ববীন্দ্রনাথেব হাঁটুব সমান উচ্চতা নিযে সামনেব দুটি দাঁত বাব কবে হাসত ববীন্দ্রনাথ বস্তুতই খুশি হযে হাতেব বেড়ে টেনে নিযে বলতেন, 'কী চাই?' কী যে সে চায বোঝা না গেলেও সে তাব কলকল ভাষায কিছু বলতো। ববীন্দ্রনাথ যেন বুঝেছেন এইভাবে মাথা নেড়ে বলতেন, 'ঠিক। ঠিক।'

ববীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা কবলেন, 'এই মেযেব নাম কী হল?' সেই একই কথাব পুনবাবৃত্তি কবে পুনবায বললাম, 'আপনি একটা বেখে দিন।' তবে এই কথাব মধ্যে আগেব বাবেব মতো ছলনা ছিল না। আমবা নিজেবাই নাম চাইবাব বাসনা নিযে এসেছিলাম। বলতে সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ববীন্দ্রনাথ বললেন, 'ঐ তো দুটো নাম পড়ে আছে নাও না, চন্দনা আব কাকলি। তা তোমাদেব মেযে যেমন কলকল কবে তাতে কাকলি নামটাই মানাবে ভালো।'[১]

আমবা থাকতে থাকতেই ববীন্দ্রনাথেব শবীব আবো খাবাপ হযে পড়ল। পিছনেব বাবান্দায এসে বোজ আব বসতে পাবেন না। আমাদেব সকলেবই খুব মন খাবাপ। কলকাতা ফেবাব দিনও এগিযে এলো। ছুটি আবো কিছুদিন ছিল অবশ্য, কিন্তু আতিথ্য ভোগেবও তো একটা সীমা আছে?...

একদিন বিকেলে বতনকুঠিব চত্ববেব আড্ডায না বসে উত্তবাযণেব চত্ববে বথীবাবুব আড্ডায গিযে দেখা গেল আড্ডাব ব্যক্তিবা ছড়িয়ে ছিটিযে বসে আছেন। ববীন্দ্রনাথ বসে আছেন সামনেব বাবান্দায। দেখে এত আনন্দ হল। উনি তবে ভালো আছেন? তা হলে কি মেঘ কেটে গেল? আমবা কলকাতায ফেবাব দিন ঠিক কবে বথীবাবুকে বলেছিলাম। সেদিন ববীন্দ্রনাথকে বাবান্দায দেখে সাহস কবে উঠে গেলাম কাছে। বলা যায বিদায় নিতেই উঠে গেলাম।

---

১. রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব এই নাম বদলে রাখেন 'দময়ন্তী'।

... দু-চার কথার ফাঁকে বুদ্ধদেব আমাদের ফিরে যাবার কথাটাও বললেন। শুনে একটু ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন, 'আমার তো যদ্দুর ধারণা, গ্রীষ্মের ছুটি ফুরোতে আরো বেশ কিছুদিন দেরি আছে। সে-কটা দিন থাকা যেতে পারে।'

সেদিন আমরা বাতাসে উড়ে রতনকুঠিতে এসে পৌঁচেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ নিজের মুখে আমাদের থাকতে বলেছেন, এর চেয়ে বড় সম্মান, বেশি সুখ আর কী থাকতে পারে আমাদের জীবনে?

পরের দিন সকালে সুধাকান্তবাবু দুটি কিশোরীকে নিয়ে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, গুরুদেব বলেছেন— অতিথিদের তোমরা যথেষ্ট এন্টারটেইন করো না তাই অতিথিরা থাকতে চায় না। সেজন্যই আজ এদের নিয়ে এলাম। এরা গান শোনাবে।'

.. এই দীর্ঘ জীবনে আরো অনেকের কাছে অনেক গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সেই স্বর্গীয় মুগ্ধতার স্বাদ আর কখনো পাইনি। এই গল্প অনেকবার অনেকের কাছে বলেছি, ছাপার অক্ষরে লিখেছি, সহস্রবার বললেও মনে হয় বলার আনন্দ আমার অক্ষুণ্ণই থাকবে। বলতে আমার ভালো লাগে। সেই কিশোরীই ভবিষ্যতে সেই কণ্ঠস্বরের যাদুতে সারা জগতের কত মানুষকে যে মুগ্ধ করেছে তার সংখ্যা অগণ্য। তার নাম কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মোহর।"

—*জীবনের জলছবি,* প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ. ১৫৪

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর স্মৃতি

"মেঘলা ছিলো সেই দিন, বৃষ্টিহীন; আমার মন সকাল থেকে উন্মন। রিপন কলেজের জন্য বেরিয়েও অন্য টানে চ'লে এলাম চিৎপুর পাড়ায়— বেলা তখন এগারোটা হবে হয়তো। আঙিনায় ভিড় জমেনি তখনও, তাই পারলাম অনায়াসে তেতলায় উঠে আসতে; উঠেই বুঝলাম কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে পৌঁচেছি। ঘরে, বারান্দায় অনেক লোক ছড়ানো-ছিটোনো, আমার চেনা মুখ অনেক; কিন্তু কারো চোখেই কোনো ভাষা নেই, কারো মুখে কোনো কথা ফুটছে না শুধু বিশ্বভারতীর আপিশ-কামরায় ব'সে গেঞ্জি-গায়ে স্থূলকায় একটি সাংবাদিক অনবরত বার্তা বলছেন টেলিফোনে। ধীরে কাটছে মিনিটের পর নিঃশব্দ মিনিট নিশ্চিতের অপেক্ষায়; হঠাৎ দেখলাম আমার সামনে অমিয় চক্রবর্তী : চোখের কোণ মুছে তিনি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নেই, একটা shell পড়ে আছে।' কিছুক্ষণ পরে— বেলা দুপুর পেরিয়ে গেছে তখন— ভেসে এলো কোনো নেপথ্য থেকে চাপা একটা আর্তনাদ— একটাই মাত্র— জানি না সেটা ভক্ত সেবক নীলমণির কিনা— অনেকে তাঁদের হাতঘড়িতে চোখ ফেললেন,[১] চারদিকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে

১. সময়টা ছিল বেলা ১২-১০ মিনিট। দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং, পৃ. ২৫৩

পড়লো। সেই কক্ষ এখন উন্মুক্ত যেখানে তিনি শযান; আবৃত দেহেব এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছে বৃহৎ পদযুগল, আব অন্য প্রান্তে উন্নত নাসায উদাব ললাটে শোভমান তাঁব মহান মস্তক— শুধু শ্মশ্রুতে ও কেশগুচ্ছে আব ঘনত্ব নেই, বোধহয চিকিৎসাব কাবণে ছাঁটা হযেছিলো। আমবা শ্রেণীবদ্ধ হ'যে একে-একে ঢুকছি এক দবজা দিযে, বেবিযে আসছি প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'বে অন্য দবজায, আমাব চেনা একটি কবিতাপ্রযাসী সুবর্ণবণিক যুবক ফিশফিশ ক'বে বললো, 'আমাব বিযেব পবে এক বছব কাটেনি, আমি মড়া ছোঁবো না— কিছু মনে কবলেন না তো?'

পববর্তী ঘটনাগুলি আমি পর্যাযবদ্ধভাবে মনে কবতে পাবছি না, একটা দৃশ্য অন্যটাব মধ্যে মিশে যাচ্ছে। আঙিনায ভিড় ফুলে উঠলো— ফুলে, ফেঁপে, ছড়িযে যাচ্ছে ফুটপাত— আমবা দেখছি বোদ্দুব-পড়া বাবান্দাব বেলিঙে হেলান দিযে তাবপব হঠাৎ এক সমযে আমাব মনে হ'লো, অতর্কিতে এবং বিনা ঘোষণায, সেই জনতাব স্রোতেই প্রখব বেগে কোথায ভেসে গেলেন ববীন্দ্রনাথ— যে-ভাবে দক্ষিণেব বাড়িব অন্য এক ঠাকুব দেখেছিলেন ও এঁকেছিলেন, ঠিক যেন তেমনি, অথবা হযতো দৃশ্যেব চেযে অবনীন্দ্রনাথেব ছবিটাকেই আমি বেশি ভাবছি। বাস্তায একটা অতিবিক্ত-সংখ্যা 'আনন্দবাজাবে' পাতা জোড়া হেড-লাইন 'আশি বছব বযসে ববীন্দ্রনাথেব জীবনদীপ নির্বাণ' সবই জানি, তবু যেন বিশ্বাস কবাব জন্য ছাপাব অক্ষবে দেখা চাই। কলেজ স্ট্রিট-হ্যাবিসন বোডেব মোড় শবযাত্রা যেন বিশৃঙ্খল একটা ঝলক মাত্র, ভালো দেখা গেলো না। পড়ন্ত বেলায বৌদ্রপ্লাবিত এসপ্ল্যানেড কাজ ফেলে দিযে সকলেই আজ বাস্তায— শামলা-পবা উকিল ব্যাবিস্টাব, আলখাল্লায খ্রিস্টান সন্ন্যাসী, পীত-বসন, গৈবিক বসন, জনসাধাবণ, প্রায মনে হয় উৎসব, কোনো মিছিল— কিন্তু মিছিল নয, লোকেবা ছুটছে এলোমেলো, দিগ্বিদিকে, যেন উদ্ভ্রান্ত, কোথায যাবে কী কববে দিশে পাচ্ছে না। ঝাপসা মনে পড়ে নিমতলা ঘাটে প্রবেশেব চেষ্টা কবেছিলাম একবাব ঢুকতে না-পেবে, বাস্তাব দিকে বেবোতেও না-পেবে, অগত্যা গঙ্গাব পাড়ি বেযে নেমে নৌকো নিযে মযদানেব কাছে নেমেছিলাম এসে আমবা কযেকজন বলছি 'আমবা', কিন্তু অন্যদেব বিষযে আমাব স্মৃতি অস্পষ্ট— শুধু মনে পড়ে অজিত চক্রবর্তীকে, বোধহয ফিবতি-পথে দেখা হ'যে গেলো . তাঁব সঙ্গে ব্রিস্টল হোটেলে ব'সে দু-জনে পান কবলাম দু-গ্লাশ শেবি অথবা ভের্মুথ— কেন হঠাৎ চিবন্তন চাযেব বদলে সুবা তা বলতে পাববো না, তখনও আমি অ্যাল্কহল-সেবনে অভ্যস্ত হইনি,— কিন্তু বোধহয সেইজন্যেই, এই দিনটিকে আমাব কোনো বিশেষ আচবণেব দ্বাবা চিহ্নিত কবাব জন্য।"

—'আমাদেব কবিতাভবন', পৃ ২৫

লক্ষ না-করে পাবা যায় না এই বর্ণনার সঙ্গে 'তিথিডোব' উপন্যাসে বর্ণিত ববীন্দ্রনাথেব মৃত্যুদিনের বর্ণনাব মিল— যে দিনটিতে, উদ্‌ভ্রান্তভাবে একসঙ্গে

ঘুরতে ঘুরতে, স্বাতী আব সত্যেন পরস্পরেব মনেব অত্যন্ত কাছে চলে এসেছিল। মিল রয়েছে ভ্রমণসূচিতে— জোড়াসাঁকো থেকে কলেজ স্ট্রিট হয়ে নিমতলা, তাবপব সেখান থেকে নৌকাযোগে এসপ্লানেড; এমনকি, তারপরকার দৃশ্যটি —বার-এ বসে আধুনিক কবি ধ্রুব মিত্রের মদ্যপান করার দৃশ্য— সেটি পর্যন্ত কাল্পনিক নয়।

'বৈশাখী'র প্রকাশ

কবিতাভবনেব বার্ষিকী 'বৈশাখী' প্রকাশিত হল। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : "যেহেতু সুধীন্দ্র দত্ত তাঁব 'পবিচযে'ব দপ্তব থেকে বানুব 'মাধবীব জন্য' গল্পটা প্রত্যাখ্যান কবেছিলেন, আব আমাব সেটাকে মনে হযেছিলো উৎকৃষ্ট— তাই গল্পটাকে লোকচক্ষেব গোচবে আনাব উপায হিশেবে, আমাব মাথায খেললো একটি বার্ষিকীব কল্পনা যাতে গদ্য-পদ্য সমস্ত বকম লেখা স্থান পাবে : সে-ই আমাদেব 'বৈশাখী', যাব পবে নানান মহলে বার্ষিকী প্রকাশেব ধূম পড়ে গিযেছিলো।"

—তদেব।

'কবিতা' পত্রিকায প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায, প্রথম পর্যায় 'বৈশাখী'ব মোট পাঁচটি খণ্ড বেরিযেছিল :

প্রথম খণ্ড	:	১৩৪৮
দ্বিতীয় খণ্ড	:	১৩৫০
তৃতীয খণ্ড	:	১৩৫১
চতুর্থ খণ্ড	:	১৩৫২
পঞ্চম খণ্ড	:	১৩৫৩

পরে বিচ্ছিন্নভাবে আরো কয়েকটি খণ্ড বেরিয়েছিল।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

এই সময়ে যে সব কবিতা লিখছেন তা গ্রন্থভুক্ত হচ্ছে বা হবে 'এক পয়সায় একটি', '২২শে শ্রাবণ', 'বিদেশিনী', 'দময়ন্তী' ইত্যাদি বইতে। এই সময়ে তাঁর কবিতায় ছায়া পড়ছে সাম্যবাদী দর্শনের। কবিতাগুলি নানা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও, পরবর্তীকালে এর অনেক কবিতা তিনি বর্জন করেছিলেন।

মার্চে বেরোল ছোটোগল্পের সংগ্রহ, 'ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প'; অগস্টে 'সব পেয়েছির দেশে'— শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কাহিনি; 'ঘুমের আগের গল্প' নামে ছোটোদের জন্য একটি গল্পগ্রন্থ বেরোল এ মাসে। আরেকটি ছোটোদের বই, 'ভদ্রতা কাকে বলে', প্রকাশিত হল কার্তিক মাসে (১৩৪৮)।

১৯৪২ ।। বয়স চৌত্রিশ

'এক পযসায একটি' গ্রন্থমালা

ফেব্রুযাবিতে বেবোল 'এক পযসায একটি' গ্রন্থমালাব প্রথম বই, বুদ্ধদেব বসুব কাব্যগ্রন্থ 'এক পযসায একটি'। ষোলো পৃষ্ঠাব বই, ষোলোটি কবিতা— দাম ষোলো পযসা, অর্থাৎ চাব আনা। যামিনী বাযেব কবা প্রচ্ছদ। 'কবিতা'ব চৈত্র ১৩৪৮ সংখ্যায জানানো হল :

> "সম্প্রতি আমবা কবিতাব একটি সুলভ গ্রন্থমালা প্রকাশে উদ্যোগী হযেছি। এই গ্রন্থমালাব নাম 'এক পযসায একটি'। এই নামটিকে কিছু বিদ্রূপ, কিছু হযতো ঔদ্ধত্য আছে— তা থাক। কিন্তু নামটিব সার্থকতা এইখানে যে ষোলো পৃষ্ঠাব এক-একটি কবিতাব বই চাব আনা মূল্যে যে-কোনো শ্রেণীব পাঠকই অনাযাসে কিনতে পাববেন— একথা মনে বেখেই আমাদেব উদ্যম।"

'কবিতা'য প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায, এই সিবিজে আঠাবোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হযেছিল :

১	এক পযসায একটি	বুদ্ধদেব বসু
২	মাটিব দেযাল	অমিয চক্রবর্তী
৩	সোনাব কপাট	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায
৪.	উডকি ধানেব মুডকি	অন্নদাশঙ্কব বায
৫	২২শে শ্রাবণ	বুদ্ধদেব বসু
৬	ভানুমতীব মাঠ	অশোকবিজয বাহা
৭	ওপাবেতে কালো বং	সুধীবচন্দ্র কব
৮	মন-পবন	মঙ্গলাচবণ চট্টোপাধ্যায
৯	কযেকটি নাযক	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায
১০.	উলুখড	বিমলচন্দ্র ঘোষ
১১.	বনলতা সেন	জীবনানন্দ দাশ
১২.	চন্দ্রবালা	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায
১৩.	খোলা চিঠি	সমব সেন
১৪.	কালো হবফ	অমল ঘোষ
১৫	ভ্রমণ	হবপ্রসাদ মিত্র
১৬.	বাজধানীব তন্দ্রা	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায
১৭.	ঘুমোও নগব	তডিৎকুমাব সবকাব
১৮.	গৈবিক	অনিলবঞ্জন বিশ্বাস

বুদ্ধদেব বসুর কবিতাসংগ্রহের গ্রন্থপরিচয়ে (২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫) নরেশ গুহ লিখেছেন :

"অতি প্রতিকূল পরিবেশেও কবিতার চর্চা যে সমানই জরুরি, তার একটি চমকপ্রদ প্রমাণ দেখতে পাওয়া গিয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, অন্ধকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অকালে, তুমুল অগস্ট আন্দোলনের টালমাটাল বছরে। কবিতাভবন থেকে এই সময় মাসে-মাসে ক্ষুদ্রাকার অথচ অভিনব, শস্তা অথচ মূল্যবান, একটি ক'রে কবিতার পুস্তিকা বেরুতে থাকে যার নাম 'এক পয়সায় একটি'। সিগনেটের প্রথম পুস্তিকারও ঐ একই নাম।...

মনে রাখা দরকার যে সৃষ্টিধর্মী কোনো কিছু লেখা বা ছাপানোর ব্যাপারটা সেই দুর্দিনে হয়ে উঠেছিলো নিতান্তই ব্যয়সাধ্য একটি দুষ্কর্ম।... যুদ্ধে বা সমাজসংস্কারে সহায়তা করতে না পারলে কবিতা জিনিশটাকেই মনে করা হচ্ছিলো বিলাসিতা। উপরন্তু, জীবনানন্দ যাদের বলতেন 'দারুণমাস্তুলের কর্ণধার'— তাঁরা সবাই প্রায় সমস্বরে বিরোধীতা করছিলেন বাংলা কবিতার এই নবোদগত আধুনিকতার। এই সব প্রতিকূলতাকে তাচ্ছিল্যের অট্টহাসি দিয়ে উড়িয়ে দেবার ইচ্ছে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো, প্রথম দিকে খানিকটা হালকা সুরে রচিত, আধুনিক বাংলা কবিতার এই সুবেশ গ্রন্থমালা।."

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ

"প্রগতি লেখক সম্মেলনের দ্বিতীয় সর্বভারত সম্মেলনের পর [১৯৩৮] কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া ভাব এসেছিল, কিন্তু তাকে না কাটিয়ে উপায় রইল না যখন ৪২ সালের ৮ই মার্চ তারিখে মর্মান্তিক এক ঘটনা থেকে বোঝা গেল সেদিনের নিদারুণ বিপদ। ঐ দিন ঢাকায় তরুণ সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের সুপরিকল্পিত আক্রমণে নিহত হলেন, অকালে নিভে গেল বাংলা সাহিত্যে এমন একটি প্রতিভা যার মধ্যে দেখা গিয়েছিল মহত্ত্বের সুস্পষ্ট আভাস, সঙ্গে সঙ্গে সবল, সরল, সজাগ এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব যা পরাধীন নিপীড়িত সমাজে নির্বিত্তের মুক্তি প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে সকলের সমাদর পেয়েছিল। প্রকৃতই সোমেন চন্দ রেল আর সুতাকল শ্রমিক থেকে বিদগ্ধ কলাবিদ পর্যন্ত বহুজনের একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এই কদর্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মার্চ মাসের শেষাশেষি কলকাতায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সম্মেলন হল, যোগ দিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রভৃতি খ্যাতনামা— বলাই বাহুল্য যে গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, অরুণ মিত্রের মতো ব্যক্তি সাগ্রহেই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ স্থাপনে অগ্রসর হলেন।"

—*তরী হতে তীর*, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ২য় সং, পৃ. ৩৬৮

'রথের রশি'তে অভিনয়

"সম্ভবত ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে সদ্যস্থাপিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘের পক্ষ থেকে কলেজ স্ট্রিট ওয়াই. এম. সি. এ-তে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' অভিনয় করলেন বাঙালি সাহিত্যিকেরা— ভূমিকায় নামলেন হিরণকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসুর মতো ব্যক্তি। এটা যখন লিখছি তার কদিন আগে বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যু হয়েছে— নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতদ্বৈধ হলেও ভুলব না কখনো যে সেই দুর্দিনে তিনি ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনে যোগদানে সংকুচিত হননি, নিজে লিখেছেন, তাঁর স্ত্রী প্রতিভা দেবী 'ফ্যাশিজ্‌ম ও নারী' পুস্তিকা লিখে দিয়েছেন আমাদের জন্য।"

—তদেব। পৃ. ৩৪৫

বুদ্ধদেবের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সহচর নরেশ গুহ লিখেছেন :

"বুদ্ধদেব বসু কদাপি মার্কসপন্থী হয়েছিলেন ব'লে জানি না, কিন্তু প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত ছিলেন, অন্তত প্রথম দিকে। এটা শুধু সামাজিকতা কিম্বা বন্ধুত্বের খাতিরে ব'লে মনে হয় না, তখনকার রচিত কবিতাবলীতেও এই তৎকালীন মানসিক পরিমণ্ডলের অনিবার্য ছাপ পড়েছিল। ... 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটিই ধরা যাক [রচনাকাল : ১৯৪২] :

"... অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।"

এই উচ্চারণ সম্পূর্ণই প্রগতিবাদী ব্যাকরণ সম্মত। কবিকে সরাসবি 'জীবনের জয় হবে' ব'লে স্বাস্থ্যকর ঘোষণা করতে হবে, এই ছিল তখনকার সর্বাধুনিক নান্দনিক মনোভাব। কবির কাজ হল মানবজীবন এবং মানবসমাজের প্রগতিতে ঘোরতর আস্থার বাণী ঘনঘন অন্যদের মনে করিয়ে দেওয়া, যাতে তাঁরা হতাশায় ভেঙে না পড়েন অথবা উদাসীন হ'য়ে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন না করেন। রূপদক্ষ কারিগরদের একমাত্র প্রশংসাযোগ্য করণীয় হল উদার স্বাধীন নির্ভীক ভাবী সমাজ গড়ার কাজে আশাভরসা জুগিয়ে যাওয়া। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে এই কবিতাটির পিছনেও ঐ রকম মনোভাবই মোটামুটি কাজ করছে।"

—'ছিলে না বনের মৃগ' : নরেশ গুহ
'শব্দমন্ত্র' পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, ১৯৭৪

প্রগতি আন্দোলন ও বুদ্ধদেব বসু

বাংলার প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে বুদ্ধদেব বসু প্রথম দিকে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তারপর এক সময়ে সরেও আসেন। তাঁর এই আচরণের নানা রকম ব্যাখ্যা শোনা যায়। যাঁরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং যাঁরা

দেননি, উভয় দলের মানুষের কাছেই এজন্য তিনি অপ্রিয় হয়েছিলেন। কেন তিনি যোগ দিয়েছিলেন, এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক কতখানি ছিল, কেন তিনি শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে নিলেন, এসব প্রশ্ন এখনও কোথাও কোথাও আলোচিত হতে শোনা যায়। সুতরাং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছবার চেষ্টা করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে প্রগতি লেখক সংঘের যে প্রথম অধিবেশন হয় তাতে বুদ্ধদেব ছিলেন না— কিন্তু তাতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর রিপন কলেজের সহকর্মী এবং তখনকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আড়াই বছর পর, ১৯৩৮ সালের ২৪-২৫ ডিসেম্বর কলকাতায় এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বুদ্ধদেবকে— সভাপতিমণ্ডলীর তিনি অন্যতম সদস্য। অনুমান করে নেয়া যায়, এই আড়াই বছর ধরে এ নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছিলেন বুদ্ধদেব, পাঠ করেছিলেন যা কিছু পাঠযোগ্য, এবং মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছিলেন অব্যবহিত পূর্ব থেকে সাম্প্রতিকতম কাল পর্যন্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাবলি।

বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪), মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০) ও আরো নানা হিংসাত্মক ঘটনায় অজস্র আদর্শবাদী তরুণ তখন রাজবন্দী; সদ্যপ্রতিষ্ঠিত 'কবিতা' ও 'পরিচয়' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহকদের একটা বড়ো অংশ ছিলেন এই রাজবন্দীরা। এঁরা ক্রমে আকৃষ্ট হচ্ছেন মার্কসবাদের দিকে— যদিও ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৩৪ সালেই বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছে।

১৯৩৩-এ জর্মানিতে ক্ষমতা দখল করলেন অ্যাডল্‌ফ হিটলার। ১০ মে বার্লিনের রাজপথে নাৎসি বাহিনী বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থাবলি দিয়ে বহ্ন্যুৎসব করল। জর্মানিতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। ১৯৩৫ সালের ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন (World Congress of Writers for the Defence of Culture)— যোগ দিলেন আঁদ্রে জীদ, আঁদ্রে মালরো, ই. এম, ফর্স্টার, অলডাস হাক্‌সলি, লীটন স্ট্রেচি প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ। ভারত থেকে গিয়েছিলেন মুল্‌করাজ আনন্দ।

এই বছরেরই শেষ দিকে লন্ডনে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র ও সাহিত্যকর্মী মিলে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের (Progressive Writers' Association বা সংক্ষেপে PWA) পরিকল্পনা রচনা করেন। একটি প্রচারপত্র লেখা হয়। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল ভারতে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশন হল লক্ষ্ণৌতে; এই সংঘ World Congress for the Defence of

Peace-এর সঙ্গে যুক্ত হল, প্যারিস, মার্সাঈ এবং ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিনিধি পাঠাল। সংঘের প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জওহরলাল নেহরু, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ইত্যাদিরা।

১৮ জুন গোর্কির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হল। সোভিয়েট লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি ম্যাক্সিম গোর্কিই প্রথম প্রচার করেন যে, ফ্যাসিজমের মতো সর্বগ্রাসী প্রলয়কে রুখতে হলে সারা পৃথিবীর সাহিত্যিক এবং শিল্পীদেরও একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন আছে। তিনি এই আন্দোলনের জীবন্ত প্রতীক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ১২ জুলাই 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র পক্ষ থেকে কলকাতায় অ্যালবার্ট হল-এ তাঁর শোকসভা হল। এই সভাতেই ঘোষিত হল 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের সংবাদ। সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মুন্সী প্রেমচন্দ্‌, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, নন্দলাল বসু, সরোজিনী নাইডু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ১৬ অগস্ট এই সংঘ কর্তৃক আহূত গোর্কির স্মরণসভায় আশুতোষ হল-এ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

২০ নভেম্বর রোমা রোলাঁ বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানালেন, স্পেনের সাধারণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট নেতা ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর আক্রমণের বর্বরতা প্রতিহত করবার জন্য। ১৯৩৭-এর জানুয়ারি সংখ্যা মডার্ন রিভিয়ু-তে সেই আবেদনের অনুবাদ প্রকাশিত হল। এখানকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগল তাতে। মার্চে স্থাপিত হল League against Fascism and War-এর সর্বভারতীয় কমিটি। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ, স্পেনে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে সাধারণতন্ত্রীদের সমর্থন ও সাহায্য করবার জন্য স্বদেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন।

এইভাবে, ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হল দেশে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই আন্দোলনের মার্ক্‌সীয় চরিত্র তখনো খুব নগ্নভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। প্রথমত, নিষিদ্ধ থাকার ফলে পার্টির পক্ষে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে এই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা স্বভাবতই সম্ভব হয়নি; দ্বিতীয়ত, মার্কসীয় দর্শনের অর্থনিরূপণে ভারতে তখনো চলছে পি. সি. যোশীর যুগ : দলের বাইরে শিল্পী বা সাহিত্যিককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পার্টির পক্ষ থেকে তখনো কোনো নীতিগত বাধা ছিল না। রনদিভে-র যুগ, কিংবা ঝ্‌দানভের ফতোয়ার কাল আরম্ভ হতে তখনো কয়েক বছর দেরি ছিল। তৃতীয়ত এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধ, মার্ক্‌সবাদের প্রসার নয়। বিদেশে ও দেশে বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা অনেকেই ছিলেন ঘোষিতভাবে মার্ক্‌সবাদের বিরোধী— এবং তাঁদের মধ্যে,

রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই ছিলেন বুদ্ধদেবের প্রাণাধিক প্রিয়।

এবং এইবার এর সঙ্গে যোগ দেয়া যায় বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত কারণটি। তিনি লিখেছেন, দুটি কারণে তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন: "নাৎসিদের আমি ঘৃণা করি— কিন্তু শুধু সে-কারণেই নয়। আমার প্রিয় বন্ধু ও প্রিয় কবিরা অনেকেই দেখছি প্রগতির পথিক, আর আমার চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা বন্ধুপ্রীতি।"

এই আন্দোলনে যোগ দেয়ার ফলে তাঁর সাহিত্যিক পরিমণ্ডল আবিল হয়ে উঠল।

১৯৪১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে জর্মানির সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্তন হল নাটকীয়ভাবে। সারা পৃথিবীর, এবং সেই সঙ্গে ভারতের, কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের পক্ষে ঝুঁকে পড়লেন। যুদ্ধে সাহায্যকারী শিল্পগুলিতে যাতে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে উৎপাদন ব্যাহত না হয়, সেদিকে নজর রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে বৃটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল। প্রগতি আন্দোলন ১৯৩৮-এর পর থেকে ঝিমিয়ে পড়েছিল, তাকে চাঙ্গা করে তুলে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হল।

১৯৪২-এর ৮ মার্চ, ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগদানের জন্য রেলশ্রমিকদের মিছিল পরিচালনা করার সময় রাজনৈতিক গুণ্ডাদের আক্রমণে সোমেন চন্দ নিহত হলেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে মার্চের শেষে গঠিত হল 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ'— সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নেতৃত্বে তা ছাড়াও ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, হিরণকুমার সান্যাল, অরুণ মিত্র প্রমুখেরা— সম্মেলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেবের সক্রিয় উৎসাহ এখনো অম্লান। কলেজ স্ট্রিট ওয়াই-এম-সি-এ'তে সংঘের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি'র অভিনয় হল, অভিনয়ে অংশ নিলেন বুদ্ধদেব। প্রতিভা বসু পুস্তিকা লিখে দিলেন 'ফ্যাসিজ্‌ম ও নারী'। সংবাদপত্রের যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলেন বুদ্ধদেব, সোমেন চন্দের মৃত্যুতে কবিতা লিখলেন 'প্রতিবাদ', 'কবিতা' পত্রিকায় সোমেন চন্দের শোকপ্রস্তাব লিখলেন (আষাঢ় ১৩৪৯)। এই সময়েরই রচনা তাঁর 'এক পয়সায় একটি' ও '২২শে শ্রাবণ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি, যার মধ্যে সাম্যবাদী দর্শনের স্পষ্ট প্রভাব। পুস্তিকা লিখলেন 'সভ্যতা ও ফাসিজ্‌ম', এমনকি 'সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি' নামেও একটি।[১] রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম জন্মদিনের

১. উৎস: "বুদ্ধদেব বসু: 'প্রগতি' থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘ'", সুবীর রায়চৌধুরী। কলকাতা ২০০০, ১৩৯১। বিজন রায় (সুশোভন সরকার) লিখিত 'জাপানী শাসনের

অনুষ্ঠানে ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিকবৃন্দ ওভারটুন হল-এ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটক অভিনয় করেন; বুদ্ধদেব এই নাটকেও অভিনয় করলেন কবির ভূমিকায়।

তবে একটি কথার এখানে উল্লেখ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠই হোক, সোভিয়েট দেশের সংস্কৃতি নিয়ে যত চর্চাই তিনি করুন, বুদ্ধদেব তাঁর নিজস্ব পরিচয় কখনোই বিস্মৃত হননি, নিজের মূল্যবোধ থেকে চ্যুত হননি, এমন কিছু লেখেননি যার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় তিনি স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৩৮-এর প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে লিখিত ভাষণে বলেছিলেন : "প্রয়োজন হ'লে আসুন আমরা সমস্ত লেখকরা মিলে প্রোপাগ্যান্ডা বা প্রচারকার্যে নিজেদের নিয়োজিত করি। কিন্তু একথা যেন না বলি যে এইটাই হচ্ছে সাহিত্যের সর্বোচ্চ দিক, বা আদৌ এটা সাহিত্য। কেননা যদিও সমস্ত শিল্পকর্মই গভীর অর্থে প্রচারকার্য, সমস্ত প্রচারকার্যই কিন্তু শিল্পকর্ম বা আর্ট নয়।" (নেপাল মজুমদার-কৃত অনুবাদ।) এই বাক্যটি নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয় প্রকৃত বুদ্ধদেব বসুকে।

এই বক্তৃতার দুমাস আগে 'কবিতা' পত্রিকাতেও লিখেছিলেন :

> "যাকে অস্পষ্টভাবে প্রগতি বলা হয়, সে বস্তুটি আর যাই হোক কবিতা কি সাহিত্য যাচাই করবার নিকষ নয়। সমাজশোধনের কাজে ব্যবহার্যতার পরিমাণ হিশেব ক'রে সাহিত্যের বিচার চলে না।... আমার প্রগতিশীল বন্ধুরা যখন প্রশ্ন করেন যে আধুনিক বাঙালি লেখক তাঁর বিষয় নির্বাচনে আজকের দিনের বিশেষ কতকগুলো ঘটনা বা সমস্যা এড়িয়ে যান কেন, তখন এই অভিযোগের আমি কোনো উত্তর খুঁজে পাইনে। লেখক তো বিষয়কে নির্বাচন করেন না, বিষয়ই লেখককে নির্বাচন করে। উপরন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা আজকের দিনের কোনো সমস্যারই একচুল সমাধান হবে; সুতরাং এ-অভিযোগ সত্য হ'লেও সামাজিক দিক থেকে কোনো আশঙ্কা দেখি না।"
>
> —'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৫

এই লেখা থেকে খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়, বুদ্ধদেব প্রগতি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তার রাজনৈতিক কারণে নয়— তাঁর নিজস্ব মানবিক আদর্শের কারণে।

১৯৪৩ সাল থেকে এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। যুদ্ধের নতুন নামকরণ হল 'পীপল্‌স ওয়ার'।

আসল রূপ' পুস্তিকার চতুর্থ প্রচ্ছদে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে এই দ্বিতীয় পুস্তিকাটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালে বুদ্ধদেব নিজের গ্রন্থাবলির যে তালিকা প্রস্তুত করেন ['বুদ্ধদেব বসুর সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী (১৯৩০-৪৫): কবিতাভবন'] তাতে তিনি এই পুস্তিকাদুটির উল্লেখ করেননি। '২২শে শ্রাবণ' গ্রন্থেরও দুটি বাদে সমস্ত কবিতা তিনি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে বর্জন করেছিলেন।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন-প্রসূত সহিংস প্রতিরোধী কার্যকলাপকে 'ফিফ্‌থ কলাম্‌নিস্ট' আখ্যা দেয়া হল। পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যোশী-যুগ শেষ হয়ে গিয়ে রনদিভে-যুগ আরম্ভ হল— যার মূল কথা হল, পার্টির দর্শনে যাঁদের ঘোষিত আস্থা নেই, পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেও তাঁদের স্থান নেই।

১৯৪৪ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'পরিচয়' পত্রিকার স্বত্ব দান করে দিলেন 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'কে। ১৯৪৫-এ ফ্যাসিশক্তির পরাজয়ের পর সংগঠনের নাম পুনরায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' হ'য়ে গেল— কিন্তু এখন এই সংগঠনকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে কমিউনিস্ট পার্টির লৌহহস্ত। কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হল পরের বছর : যুদ্ধশেষে লেনিনগ্রাদে রুশ লেখক সম্মেলনে ঝ্‌দানভ গোর্কির 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। সে ব্যাখ্যা এই : পার্টির নির্দেশ এবং ছক মেনে নিয়ে তবেই শিল্প-সাহিত্য গড়তে হবে, এবং কমিউনিস্ট সংস্কৃতিতে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রভাব থাকা চলবে না।

বুদ্ধদেব বসুর মতো তীক্ষ্ণভাবে ব্যক্তিত্ববাদী মানুষের পক্ষে এই সব শর্ত মেনে নিয়ে সংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকা অসম্ভব ছিল। ১৯৪৩ সাল থেকেই, সম্ভবত সংঘের চরিত্রবদল লক্ষ করেই তিনি নিজেকে ক্রমে স্খলিত করে নিলেন এই আন্দোলন থেকে : ফিরে এলেন স্বধর্মে, নিঃসঙ্গতায়, নিজের মায়াবী টেবিলে, নিজের মুখোমুখি।

মূল্য তাঁকে কম দিতে হয়নি এজন্য। এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বিমুখ হলেন। কবিতাভবনের আড্ডা আর তেমন জমে ওঠে না[১]। 'পরিচয়ে'র মতো সদ্য-রং-বদলানো পত্রিকাও এবার তাঁর পশ্চাদ্দংশন করতে আরম্ভ করল। অবিচলিত বুদ্ধদেব নিজস্ব বিশ্বাসে নিষ্কম্প্র থেকে নিজের কাজে ফিরে গেলেন।

স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"এই প্রগতিশীলতার জের টেনে, যুদ্ধ তখন জ'মে উঠেছে, উদ্ভূত হ'লো একটি ফ্যাসিবিরোধী লেখকসংঘ, ধরমতলায় ঘরভাড়া নিয়ে, ঈষৎ ঘটাপটা ক'রে। আমি রইলাম সংযুক্ত, যেহেতু নাৎসিদের আমি ঘৃণা করি— কিন্তু শুধু সে-কারণেই নয়। আমার প্রিয় বন্ধু ও প্রিয় কবিরা অনেকেই দেখছি প্রগতির পথিক, আর আমার চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা বন্ধুপ্রীতি। কিন্তু সেই বন্ধুদেব সঙ্গেই, যত দিন যায়, আর ঘটনাস্রোত ফেনিল এবং ফেনিলতর হ'য়ে ওঠে, ততই একটি ব্যবধান আমি অনুভব করি; যেন তাঁদের সব কথা আমি বুঝি না, যেটুকু বুঝি মানি না, অথচ পুরোনো সৌহার্দ্যের মুখ চেয়ে তা বলতেও কুণ্ঠিত হই। হয়তো তাঁরাও লক্ষ করেন

---

১. দিল্লি থেকে সমর সেনের একটি চিঠিতে দেখছি, বুদ্ধদেব বসুকে লেখা, তারিখ ১৭।১।৪৩ : "কামাক্ষীর চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম যে আপনাদের সান্ধ্য মজলিশ আজকাল আর বসে না..."

'অনুষ্টুপ', সমর সেন সংখ্যা। পৃ. ৩৩ (চিঠিপত্র)

আমাব অস্বস্তি, আমাব আস্থাব অভাব— মনে-মনে তাঁবাও হয়তো ক্ষুণ্ন। এ-অবস্থায, উভয পক্ষেব সদিচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও, বন্ধুতায ফাটল ধবলো অনিবার্যভাবে, ঘটলো একেব-পব-এক বিচ্ছেদ— মসৃণ ও মৃদু, আব কখনো বা রূঢভাবে, অকস্মাৎ। পথ ভিন্ন হ'যে গেলো।...

সুখেব হযনি আমাব পক্ষে, যুদ্ধকালীন কলকাতাব সেই মোডবহুল জটিল বাজনীতি, যাব উপাযেব মধ্যে একটা ছিলো সাহিত্য ও সাহিত্যিকেবা। কবিতাভবনেব সান্ধ্য আড্ডায আমাকে শুনতে হয অনেক তর্ক যাতে আমাব মন নিঃসাড হ'যে থাকে, সহ্য কবতে হয অনেক নিষ্ফল অশান্তি, মুখে একটি কুস্বাদ নিযে শুতে যাই কোনো-কোনো বাত্রে। যেন জুটে গেছে হাতেব মুঠোয কোনো আলাদিনেব দীপ, কোনো অব্যর্থ বিশল্যকব মাদুলি— এমনি সুবে কথা বলেন অনেকে সব সমস্যাব সমাধান এবং সব প্রশ্নেব জবাব নিযে তাঁবা তৈবি। ঠিক উল্টো পিঠে, আবাব পবস্পবেবও বিরুদ্ধে, পাডায-পাডায আবো কযেকটি ছাউনি পডলো— নানা বঙেব নিশেনেব তলায আশ্রয নিলেন আমাদেব খ্যাত এবং অখ্যাত অনেক কবি সাহিত্যিক। যা ছিলো ধাবণায অতি উদাব তা পবিণত হলো কঠিন এক-একটি মতবাদে : ঐ 'প্রগতি' ব্যাপাবটা হ'যে উঠলো একটি ট্রেডমার্ক, তরুণ ও তরুণতব লেখকদেব পক্ষে সহজ একটি কৃতকার্যতাব উপায— সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায তফাৎ ঘুচে গেলো। আমি আছি দর্শকেব ভূমিকায দূবে, কখনো বা 'কবিতা'য লিখছি প্রতিবাদ— আমাব কথা কেউ কানে তুলছেন না তা নয, কিন্তু সংখ্যায তাঁবাই বহুগুণ বেশি যাঁবা আমাব তিলকহীনতায অসন্তুষ্ট। তাঁবা কেউ আমাকে নবম সুবে জপাতে চান, কেউ কবেন ব্যঙ্গ অথবা ভর্ৎসনা।.. অনেক বিক্ষেপ ও বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষেব মধ্য দিযে, উদ্যমেব অনেক অপব্যয এবং আবেগেব অনেক ব্যর্থতা পেবিযে, ধীবে-ধীবে আমাব অনুভূতি হ'লো যে সব গতি ও প্রগতি ও পতন ও বিতর্কেব পবে অবশেষে কোনো এক গভীব বাত্রে নিজেব মধ্যে নির্বিষ্টতা ভালো।"

—*আমাদেব কবিতাভবন*। বুদ্ধদেব বসু, শাবদীয় দেশ ১৩৮১, পৃ. ২১

'কবিতার পত্রিকা'

১৯৩৫ সালে যখন 'কবিতা' পত্রিকা বেরিয়েছিল তখন শুধুই কবিতার জন্য একটি পত্রিকা ছিল এক অভাবনীয় প্রস্তাব। কিন্তু সাত বছরে অবস্থার বদল হয়েছে অনেকটাই। 'কবিতা'ব কার্তিক ১৩৪৯ সংখ্যায় এই বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখলেন, 'কবিতার পত্রিকা' :

"কবিতাই বোধহয় বাংলাদেশে— এমনকি সমস্ত ভারতবর্ষে— প্রথম কবিতা-পত্রিকা। এ-কথা গর্ব ক'বে বলছি না, তথ্য হিশেবেই বলছি। এ-পত্রিকাটির পবিকল্পনা প্রথম যখন আমাদের মনে আসে আমরা তখন এর অভ্যর্থনা বিষয়ে ঘোর সন্দিগ্ধ ছিলুম, কিন্তু এ-ধরনের পত্রিকার যে প্রয়োজন ছিলো তার প্রমাণ

এই যে কিছুদিনেব মধ্যেই পব-পব আবো কযেকটি কবিতা পত্রিকা বাংলাদেশে দেখা দিলে, তাব মধ্যে অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্তই' সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বসেটি-ব Germ-এব অনুসবণে 'জীবাণু' নামে একটি পত্রিকা কিছুদিন তরুণ লেখকদেব কাব্যচর্চা পবিবেশন ক'বে বন্ধ হ'যে গেছে। সম্প্রতি তরুণতব কবিযশোপ্রার্থীদেব দু-একটি মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। 'পবিক্রমা' নামে একটি সুদৃশ্য পুস্তিকাব দুটি সংখ্যা আমবা পেযেছি। এটি ঠিক পত্রিকা ব'লে বোধ হ'লো না, মাঝে মাঝে এক-এক গুচ্ছ কবিতা বহন ক'বে পাঠকদেব জানানি দিযে যাওযাই বোধহয এব উদ্দেশ্য। আহমেদাবাদ থেকে প্রকাশিত একটি গুজবাটি কবিতা পত্রিকাও আমবা কিছুদিন ধ'বে পাচ্ছি, এটিবও নাম 'কবিতা'। সব শেষে বেবিযেছে 'একক' নামে একটি পত্রিকা, এটিও শুধু কবিতাব "

অমিতাভ সেন

'কবিতা'য যাবা লিখতেন, বা 'কবিতা' পত্রিকাকে ঘিবে যাঁবা ছিলেন তাবা যে সবাই বুদ্ধদেব বসুব কবিতাব আদর্শে বিশ্বাস কবতেন তা নয। 'কবিতা'ব নিযমিত লেখকদেব মধ্যে অনেকেই পবস্পবেব বচনা পছন্দ কবতেন না, আধুনিক কবিতা নিযে ব্যঙ্গবিদ্রূপও সেই প্রথম যুগে যথেষ্টই হত। এই বকম ব্যঙ্গেব জন্য বিখ্যাত ছিলেন অমিতাভ সেন। তাঁব প্রসঙ্গে বাধাপ্রসাদ গুপ্ত লিখেছেন .

" ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি বুদ্ধদেব বসুব 'কবিতা'ব প্রথম দিকেব কোনো এক সংখ্যায 'ডাইনামিক' কবিতা ছাপিযে তাকে খানিকটা বিপাকে ফেলেছিলেন। কাবণ সেই 'ডাইনামিক' কবিতাগুলো ছিল এধাব-ওধাব থেকে জড়ো কবা এক এক লাইনেব অসংলগ্ন সমষ্টি।"

—'আমাদেব যুবকালেব আড্ডা ঝাঁকিদর্শন, দেশ ৯ জুলাই ১৯৮৮

কবিতাদুটি বেবিযেছিল কার্তিক ১৩৪৯ সংখ্যায— নাম ছিল 'আকাশে সন্ধ্যা' এবং 'ভিত্তি'। একটি উদ্ধৃত কবি :

আকাশে সন্ধ্যা

(সমব সেন-কে)

এখন বাতাস নড়ে কেঁচোব বিবরে,
শূন্যাকাশে খাবি খায সৈন্যময বালকেব দল—
সেই সব বালকেবা মৃত্যুব মতন বিদ্বান।
বালিহাঁস জড়ো কবে বহিযাছে গভীব উদ্যান।

—পাখিবা কখন চলে গেছে
লেখাপড়া সব শেষ কবে

আদার জাহাজ তাই কাল;
ব্যাপারিরা দর করে শূন্য ক্ষেতে গিয়ে।
তবুও দয়ার কথা তোলে নাকো তারা
অদৃশ্য দানের শ্বেত স্রোতে
ভরে তোলে পশু দিনগুলি।
হয়তো যখন কেউ মরে গেছে খ্যাতি ভালোবেসে—
শূন্য, খুনী, ঋণ আর মাতৃস্নেহ দিয়ে গড়েছে আকাশ এক;
অথবা বাতাস এক— প্রাসাদের মতন বাতাস।
... মৃত মাঠে চরে পীত ঘাস।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এই সংখ্যাতেই (কার্তিক ১৩৪৯) শেষবারের মতো প্রকাশিত হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা— নাম, 'চীন'। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"... আমি তখন লেখা ছেড়ে আস্তে-আস্তে পার্টির কাজে ডুবছি। মাঝে-মাঝে বুদ্ধদেব বসুব বাড়ি যাই। বেআইনি কাগজপত্র পড়াই, চাঁদা আদায় করি, বিবৃতিতে সই নিই। আমার নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প তাঁর মধ্যে সংক্রামিত কবতে পেরেছি মনে করে খুশি হয়ে ফিরে আসি। কিছুদিন পরে গিয়ে দেখি আমার সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে।... উল্টে আমাকেই কিনা বলেন, পার্টির খপ্পরে পড়ে লেখা নষ্ট করছি। সেই রাগে দীর্ঘদিন তাঁর মুখদর্শন করিনি।"

—'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু', 'কলকাতা', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, '৬৮ ৬৯'



কবিতাভবনের অভিজ্ঞানচিহ্ন। এবছর থেকে এই চিহ্নটির ব্যবহার আরম্ভ হল 'কবিতা' পত্রিকার প্রচ্ছদে, কবিতাভবনের প্রকাশিত গ্রন্থে ও বিজ্ঞাপণে, কবিতাভবনের চিঠির কাগজে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণই সম্ভবত প্রথম গ্রন্থ যাতে এই অভিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

কবিতা লিখছেন— প্রকাশিত হবে '২২শে শ্রাবণ', 'বিদেশিনী', 'দময়ন্তী ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থে। উপন্যাস লিখলেন 'জীবনের মূল্য', এবছরই বেরিয়ে গেল। ছোটোদের জন্য দুটি উপন্যাস লিখে উঠলেন— 'ছায়া কালো-কালো' এবং 'ভূতের মতো অদ্ভুত'— দুটিই বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, দেবসাহিত্য কুটিরের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিরিজে। দু'বছর আগে লেখা উপন্যাস 'কালো হাওয়া' বেরোল ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে। কবিতার বই— 'এক পয়সায় একটি', '২২শে শ্রাবণ'।

১৯৪৩ ।। বয়স পঁয়ত্রিশ

'যুগবতী-যুগবর্তী' বিতর্ক

বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের শেষতম প্রবন্ধগুলির সংগ্রহ, 'সাহিত্যের স্বরূপ'।[১] গ্রন্থে একটি শব্দের চেহারা নিয়ে তর্ক জমে উঠল বুদ্ধদেব বসু ও পুলিনবিহারী সেনের মধ্যে। বুদ্ধদেব লিখেছেন :

"আগে একবার পুলিনবিহাবী সেনের উল্লেখ করেছি; তাঁব বিষয়ে আরো একটু না বললে এই লেখাটাব অঙ্গহানি হবে। কেননা, দু-চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বাদ দিয়ে তিনিই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি যিনি একেবারে অন্তকাল পর্যন্ত উৎসাহী ছিলেন 'কবিতা' বিষযে; খুঁটে-খুঁটে প্রতিটি সংখ্যা পড়তেন এবং কারণ ঘটলেই জানাতেন তাঁব মতামত— কোনো কিছু অপছন্দ হলে সে-কথাটিও গোপন বাখতেন না। 'রবীন্দ্র-রচনাবলি' যখন সদ্য বেরোচ্ছে আর সেই সুযোগে আমি প্রথম পড়ছি ধারাবাহিকভাবে ববীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্যরচনা, তখনকার দ্রুতরচিত অব্যবহিত বিভিয়ুগুলো থেকে শুরু ক'বে 'কবি রবীন্দ্রনাথে'র প্রবন্ধপর্যায় পর্যন্ত আমার তথ্যের ভুল শুধরে দিয়েছেন পুলিন সেন, জুগিয়েছেন আমার জিজ্ঞাসার উত্তবে নতুন তথ্য : প্রয়োজনমতো আমাকে দেখতে দিয়েছেন 'সবুজপত্রে'র বাঁধানো খণ্ড বা হয়তো কোনো অচলিত পুস্তক; কল্পনাপ্রবণ মানুষের তথ্যের প্রতি যে-অনীহা থাকে সেটা কাটিযে উঠতে আমাকে তিনি বাধ্য করেছিলেন। মাঝে-মাঝে তর্কও চলেছে তাঁর সঙ্গে আমার— একবার ঈষৎ উল্লেখ্যভাবে ছাপার অক্ষবে,[২] রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাঁব 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইটা যখন প্রকাশিত হল। বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্যের স্বরূপ'— যেটা প্রথম বেরিয়েছিলো কবিতাব

১. রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৫০। এই গ্রন্থের এগারোটি প্রবন্ধের মধ্যে চারটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'কবিতা' পত্রিকায় :
   ১. গদ্যকাব্য : 'কবিতা', পৌষ ১৩৪৩
   ২. সাহিত্যের স্বরূপ : 'কবিতা', বৈশাখ ১৩৪৫
   ৩. সাহিত্যবিচার : 'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৮
   ৪. সাহিত্যের মূল্য : 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৮

২. পুলিনবিহারী সেনের দুটি চিঠি বেরিয়েছিল 'কবিতা'য় এই তর্ক উপলক্ষে— আশ্বিন ১৩৫০-এ প্রথমটি, 'যুগবতী না যুগবর্তী?' এবং কার্তিক ১৩৫০-এ দ্বিতীয়টি, 'যুগবতী-– যুগবর্তী'।

একটি বিশেষ সংখ্যায়[১]— তার উপসংহারে, আমাদের আধুনিক কবিতার সঙ্গে 'হাড়-বের-করা, শিং ভাঙা, কাকের ঠোকর-খাওয়া ক্ষতপৃষ্ঠ' দুগ্ধহীন একটি গাভীর তুলনা টেনে রবীন্দ্রনাথ শেষ বাক্যটিতে বলেছিলেন যে দৈবাৎ গোরুটা যদি 'সুস্থ সুন্দর হয় তাহলে মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে... মরতে হবে সমালোচকের কসাইখানায়'— 'কবিতা'য় তা-ই ছিলো লেখন, কিন্তু বইয়ে দেখলাম 'যুগবতী' কথাটা রূপান্তরিত হয়েছে 'যুগবর্তী'তে। আমি প্রতিবাদ করলাম, পুলিন সেন তা মানলেন না; বিতর্কে যোগ দিলেন রাজশেখর বসু[২] ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৩];— ব্যুৎপত্তি, ব্যাকরণ ও অর্থের ঔচিত্য নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা হ'লো। আমি সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করিয়েছিলাম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে, যিনি ঐ শেষ বাক্য দুটি 'কবিতা'র প্রুফে স্বহস্তে বসিয়ে দিয়েছিলেন— 'যুগবতী'র সুষ্ঠু স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগে আমাকে মুগ্ধ ক'রে। কিন্তু আমি মূঢ়ের মতো একটি কাজ করেছিলাম সেই প্রুফের পাতাটি সযত্নে রেখে না দিয়ে, আর যেহেতু দলিল ভিন্ন ইতিহাস সিদ্ধ হয় না, তাই— রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি চমৎকার নতুন শব্দ স্থান পেলো না বাংলা অভিধানে, কবির কৌতুক ব্যাকরণের মাঠে মারা গেলো।"

—'আমাদের কবিতাভবন', পৃ ২৮

ছোটোগল্প-গ্রন্থমালা

গতবছরের 'এক পয়সায় একটি' কবিতা-গ্রন্থমালার পর, এবছর কবিতাভবন থেকে বেরোল ছোটোগল্প-গ্রন্থমালা। প্রতিভা বসু লিখেছেন :

"কবিতাভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজ যখন বেরুলো তখন সেই সিরিজের কবিতার সম্পাদক হলেন বুদ্ধদেব বসু, গল্পের সম্পাদক হলাম আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে আমাকে বললেন, 'তাই নাকি, তবে তো আপনার সম্পাদনায় আমার গল্পই প্রথম যাওয়া উচিত।' তাই হলো, কয়েকদিনের মধ্যেই গল্প নিয়ে এসে হাজির। আমরা ঠিক করেছিলাম সাধ্যমতো প্রত্যেক লেখককেই টাকা দেবো। টাকা ছাড়া গল্প চাওয়া বা পাওয়া দুটোই দুঃসাধ্য। তখনকার দিনের সব বিখ্যাত লেখকই লিখেছিলেন সেই সিরিজে, টাকাও নিয়েছিলেন। কিন্তু মানিকবাবুকে দেওয়া গেল না। মোটা কাচের চশমার ফাঁকে তার সেই দুই উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি প্রজ্জ্বলিত করে আমাকে ভস্ম করে দিয়ে বললেন, 'লেখা আমি স্বেচ্ছায় দিয়েছি, টাকার জন্যে দিইনি।"

—*জীবনের জলছবি*, ৩য় মু, পৃ. ১৫১

১ 'কবিতা'র প্রথম বিশেষ সংখ্যা— বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪, বৈশাখ ১৩৪৫— নাম ছিল 'কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধের বিশেষ সংখ্যা'।

২ ও ৩. আশ্বিন ১৩৫০ সংখ্যায় এঁদের আলোচনা দুটিও প্রকাশিত হয় : রাজশেখর বসুর 'যুগবতী ও যুগবর্তী' এবং সুনীতিকুমারের 'প্রসঙ্গ : যুগবতী ও যুগবর্তী'।

কবিতাভবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"মানুষটা কিছু অদ্ভুত ছিলেন। অদ্ভুত এবং অদম্য। এই ধবনেব চবিত্র গল্প উপন্যাসে পাওযা যায। বাস্তবজীবনে আমাদেব কাছে মানিকবাবুব তুলনা মানিকবাবুই। স্পষ্টবাদিতায় তিনি দ্বিতীযবহিত, কূটকাপট্যেব ধাব ধাবেন না, এমনকি মনেব গোপন কথা অনাযাসে উচ্চাবণ কবতেও দ্বিধাহীন। বেশভূষাব প্রতি এতই অমনোযোগী যে মাঝে-মাঝে যা-তা কাণ্ড কবতেন। দুমড়োনো মোচড়ানো একটি অতি দামি তসবেব পাঞ্জাবিব সঙ্গে আধমযলা এক ধুতি পবে তাব সঙ্গে ধুলিধূসবিত একজোড়া ফিতে বাধা ইংবিজি জুতো পাযে দিযে এসে এলিযে বসে হাঁক দিতেন, 'বুদ্ধদেববাবু আছেন নাকি?' 'আবে আসুন আসুন,' বুদ্ধদেব খুশি হযে উঠতেন। 'আজ জানেন কত সাংসাবিক কর্তব্য আমি পালন কবেছি? এবাব আব কেউ বলতে পাববে না আমি অসামাজিক। আপনাব স্ত্রীকে ডাকুন, খুব ভালো কবে এক কাপ চা না খেলে আমি আব বাঁচবো না।' পটভর্তি চা-ও আসত, কিঞ্চিৎ খাবাবও আসত, আমিও আসতাম। পোশাক দেখে আমাব হাসি পেত। চা ঢেলে দিতে দিতে বলতাম, 'তাই বুঝি আজ এত সেজেছেন?' 'সেজেছি, না?' নিজেব জামাটা দেখতেন, জুতোটা দেখতেন, বলতেন, 'ভালো, না?'

'হ্যা, খুব ভালো।'

তীব্র দৃষ্টিতে তাকিযে থেকে বলতেন, 'তবে হাসলেন কেন?' ক্ষ্যাপা মানুষ। ধীবে-আস্তে বুঝিযে-সুজিযে বলতাম, 'জুতোটা খুব ভালো কিন্তু ধুতিব সঙ্গে যায না। জামাটা খুব দামি, কিন্তু একটু ইস্তিবি থাকা দবকাব।'

হঠাৎ খুশি হযে গিযে বলতেন, 'তাই, না?' বাগ আব খুশি মানিকবাবুব পাশাপাশি। এবকম একটি ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্বেব সঙ্গে এমন একটি মধুব সাবল্যেব সমাবেশ বড একটা দেখা যায না। একদিন বাশিকৃত বই নিযে এসে ধুপ কবে ফেলে দিলেন সোফাব উপব। আমাকে বললেন, 'আপনাব জন্য এনেছি। আপনাব গানেব উপহাব। আমাব সব বই আছে এখানে। উঃ, পাব্লিশাবগুলো এমন যে আমাব বই আমাকেই দিতে চায না। বলে, সব তো কবেই নিযে গেছেন। একেবাবে গাড়োল।'

—*জীবনেব জলছবি*, প্রতিভা বসু। ৩য মু, পৃ ১৫১

'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থ ও তার পরিশিষ্ট

মে মাসে প্রকাশিত হল 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থ। এই বইয়ের শেষ অংশে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে কবিতার ভাষাব্যবহার ও ছন্দ নিয়ে একটি আলোচনা আছে। পরবর্তী সংস্করণে বুদ্ধদেব এই প্রবন্ধটিকে বর্জন করেন, অপর কোনো গদ্যগ্রন্থ বা তাঁর গ্রন্থাবলিতেও এটি স্থান পায়নি। অথচ, কবিতায় ব্যবহার্য শব্দ বিষয়ে তাঁর যে-মত এতে প্রকাশিত হতে দেখি, মোটামুটি সেই মতই তিনি আজীবন মেনে

চলেছেন।— এবং আজকের দিনে কবিতায় ভাষাব্যবহারের যে-রীতি প্রতিষ্ঠিত, অনাধুনিক কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিতার ভাষাব্যবহারের যে-পার্থক্য, তাও এই নিয়মগুলির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। বুদ্ধদেব এটিকে তাঁর রচনাবলি থেকে বর্জন করলেও এই নিয়মাবলি এখন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আজকের দিনে এর ব্যত্যয় করে কবিতা লেখা প্রায় অসম্ভব। তার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল।

"এই কবিতাগুলির [অর্থাৎ 'দময়ন্তী' গ্রন্থের] বিষয়ে আঙ্গিকের দিক থেকে দু'একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি। বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন— এই ছিলো আমার সাধনা। রচনাকালে নিজের মনে-মনে নিম্নলিখিত অনুশাসন গ্রহণ করেছিলুম :

১। বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবো না।

২। 'সাধু' ক্রিয়াপদ 'হইবে' 'বলিব' 'করিতেছে' প্রভৃতি ব্যবহার করবো না।

৩। 'কাব্যিক' ক্রিয়াপদ 'ফুটি' 'চলিছে' 'হতেছে' ইত্যাদিও বর্জনীয়।

৪। 'কাব্যিক' শব্দকে সম্পূর্ণ বয়কট ক'রে চলবো। 'মম' 'তব' 'কভু' 'যেথা' 'মোদের' 'সাথে' 'মাঝে' 'আঁধার' 'সনে' 'তবে' 'মতন' 'পরান' এই ধরনেব কথাগুলিকে কাছেই ঘেঁষতে দেবো না।

৫। মতো অর্থে প্রায়, দাও অর্থে দেহ, দেখতে অর্থে দেখিবাবে, এলাম অর্থে এনু, পারি না অর্থে নারি এ-সবও নির্মমরূপে বর্জনীয়। প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলবো। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প, হাওয়াকে পবন, পৃথিবীকে ভুবন বলবো না। মুখের কথায় এদের যা বলি কবিতাতেও তা-ই বলবো। অধিকরণে-'তে' ('ঘরেতে', 'টেবিলেতে') পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক রীতি হ'লেও, কিংবা সেইজন্যেই, প্রাদেশিকতা ব'লে বর্জনীয়।

৬। অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক; সংস্কৃত শব্দ বেশি ক'রে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন? সূর্যকে রবি কিংবা আকাশকে গগন বলবো না, কেননা ওগুলো আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা, কিন্তু 'রতি-হ্রস্ব' কি 'স্বতঃশ্লথ' বলতে দোষ নেই, কেননা ও-ধরনের কথা আমাদের মৌখিক আলাপে কখনো ব্যবহৃতই হয় না।

এই অনুশাসনগুলি মেনে নিয়ে কাব্যরচনা সহজ হয়নি। 'বন্দীর বন্দনা' 'কঙ্কাবতী'র কবিতা হু-হু ক'রে লিখেছিলুম, কিন্তু 'দময়ন্তী'র এক-একটি কবিতা লিখতে বিস্তর সময় লেগেছে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আশা করি সে-পরিশ্রমের চিহ্ন কবিতাগুলির মুখশ্রীকে মলিন করতে পারেনি। গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি। দেখা গেছে এ দু'য়ের সম্বন্ধ তেল-জলের সম্বন্ধ নয়।...

বলা বাহুল্য, তালিকাভুক্ত নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মেনে চলা সম্ভব হয়নি। বিচ্যুতি ঘটেছে। 'যেদিন শরীরে তোর *মুঞ্জরিবে*—' ('দময়ন্তী'), 'কালের কুটিল গতি

গর্ভবতী *কবিবে* কঙ্কালে ' ('ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'), 'বৃষ্টিব ঝর্ঝব সুব *ঝবিছে* মধুব' ('ছন্দ') · দুটি 'কাব্যিক' ও একটি 'সাধু' ক্রিয়াপদ পাওয়া গেলো। 'যে-ভয়ে কখনো গান্ধিব কভু অববিন্দেব চবণ শবণ' না-লিখে পাবিনি। 'শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্ম' কবিতায় অকপটেই কাব্যিক বীতিকে স্বীকাব ক'বে নিয়েছি, কিন্তু এ-স্বীকৃতি এ-বইয়েব ঐ একটিমাত্র কবিতাতেই। 'পূর্ববাগে' ধবণীকে এড়াতে পাবিনি, 'সাগব-দোলা'য় সাগবকে সগৌববে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। সাবধানী পাঠক অন্বেষণ কবলে আবো ব্যতিক্রম হয়তো পাবেন, কিন্তু খুব বেশি পাবেন না। মোটামুটি, এবং যথাসম্ভব যত্নে, নিয়মগুলি মেনে চলেছি।

কোনো থিওবি ক'বে কবিতা লেখা যায় না এ অতি পুবোনো কথা। যে কোনো কবি যে-কোনো থিওবিই করুন নিজেই তা লঙ্ঘন কববেন, কবতে বাধ্য। এই প্রবন্ধেব গোড়াব দিকে যে-অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ কবেছি সে সম্বন্ধেও এই কথা। অক্ষবে অক্ষবে পালনেব কথা ওঠে না, মোটামুটি একটা দিকনির্ণয়েব আভাস হিশেবেই ওটা নিতে হবে। শুধু আমাব একলাব কথা নয়, বাংলা পদ্যেব ও কবিতাব নতুন একটা পবিণতিব পথ এদিকে খোলা আছে বলে আমি বিশ্বাস কবি। আমি নিজে 'কাব্যিক' শব্দেব বিবোধী হ'য়েও হঠাৎ ববীন্দ্রনাথেব উদ্দেশে একটা কবিতায় লিখে ফেলেছিলুম

'প্রাণে *মোব* আনো *তব* বাণী, গানে *মোব* আনো *তব* সুব।

এ-কবিতা প'ড়ে অন্নদাশঙ্কব আমাকে লিখেছিলেন, 'শেষটায় আপনিও 'মোব' লিখলেন।' না-লিখতে পাবলেই খুশি হতুম বইকি। কিন্তু এখানে মোব আব তব বাদ দিতে গেলে কবিতাব ছন্দ, সুব, ভাষাবিন্যাস সমস্তই বদলে ফেলতে হয়, তাব মানে এ-কবিতাটি আব লেখাই হয় না, অন্য কবিতা লিখতে হয়।... মোটামুটি কথাটাকে তাহলে এভাবে বলা যাক যে 'কাব্যিক' ভাষা যতদূব সম্ভব এড়িয়ে চলতেই হবে, কিন্তু যদি কখনো আন্তবিক ভাবাবেগেব প্রেবণায় দু'একটি কথা অনিবার্যভাবে এসেই পড়ে, তাহ'লে সুদ্ধু সেইটে এড়াবাব জন্য কবিতাব স্বতঃস্ফূর্ত সহজ রূপটিকে নষ্ট না-ক'বে, কিংবা সমস্ত কবিতাটিই বর্জন না-ক'বে ববং সেটাকে সহ্য কবাই ভালো। কবিতা সম্বন্ধে কোনো আঁটোসাঁটো ধবাবাঁধা আইনকানুন কোনোদিনই সম্ভব নয়, সবই মোটামুটিব ব্যাপাব। এবং এই প্রবন্ধেব উপসংহাবে এ-কথাও স্মবণ কবি যে সব থিওবিই ক্ষণস্থায়ী, শেষ পর্যন্ত যা টেঁকে তা কবিতাব প্রাণবস্তু, যা সকল থিওবিকে অতিক্রম কবে যায়।"

এই বচনাটিব সমালোচনাও কবেছিলেন তিনি— অনেকদিন পবে, 'কবিতা ও আমার জীবন' প্রবন্ধে, ১৯৭৩ সালে :

"চাবদিকে তখন বব উঠেছে কবিতাব ভাষাকে মুখেব ভাষাব কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। 'দময়ন্তী'ব কবিতাগুলোতে সেই দিকেই চেষ্টা ছিলো আমাব... আব শুধু কবিতা লিখে খুশি না-থেকে, কিছুটা অসতর্ক উৎসাহেব ধাক্কায়, বইটাতে একটা জাঁকালো ঘোষণাপত্র জুড়ে দিয়েছিলাম। আমাব আদর্শ ছিলো এজবা পাউণ্ডেব ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো— আধুনিক যুগে পদ্য কী-ভাবে লিখতে হবে তাব

কয়েকটা নিয়ম বেঁধে দিতেও আমি দ্বিধা করিনি। 'সনে', 'ছিনু', 'মম', 'তব' প্রভৃতি 'কাব্যিক' শব্দ ছেঁটে ফেলতে হবে, আকাশকে 'গগন' বা সূর্যকে 'তপন' বলা কখনোই চলবে না, 'সাধু'ভাষার ক্রিয়াপদগুলোকে উপড়ে ফেলা চাই, একমাত্রিক মিল সসম্মানে স্থান পাবে— নিয়মাবলির চুম্বক হ'লো এই। চল্লিশ দশকের সংলগ্নতায় সূত্রগুলির প্রয়োজন ছিলো মানতেই হবে— 'সাধু' ক্রিয়াপদ ও 'কাব্যিক' ভাষা বর্জনের প্রস্তাবটি কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয়েছিলো; কিন্তু সে-সময়ে আমি লক্ষ করিনি যে 'দময়ন্তী' বইটার মধ্যেই আমার উক্ত নিয়মগুলির অনেক ব্যতিক্রম ঘ'টে গেছে— আমায় চিঠি লিখে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন। 'দময়ন্তী' যখন দ্বিতীয়বার ছাপা হ'লো আমি আমার সাধের নিবন্ধটিকে বিসর্জন দিলাম, সেটাকে আমার কোনো বইয়েরও অন্তর্ভূত করিনি।"

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'কালো হাওয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিচ্ছেন— নাম হবে 'মায়ামালঞ্চ'। 'অদর্শনা' উপন্যাস আরম্ভ করলেন।

কবিতার বই 'বিদেশিনী' বেরোল মার্চে, 'দময়ন্তী' মে-তে। দুটি বইই কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত, দুটিরই প্রচ্ছদ এঁকে দেন যামিনী রায়। 'বিদেশিনী' বইটি আকৃতিতে ডিমাই $^{১}/_{১৬}$, অর্থাৎ সাধারণ বাংলার বইয়ের একটি পৃষ্ঠাকে মাঝখান দিয়ে আড়াআড়ি আবার ভাঁজ করলে যা হবে।

ছোটো গল্পের সংগ্রহ বেরোল 'খাতার শেষ পাতা'।

১৯৪৪ ।। বয়স ছত্রিশ

'মাযামালঞ্চ' নাটক

'কালো হাওযা' উপন্যাসেব নাট্যরূপ 'মাযামালঞ্চ' প্রকাশিত হল ৩ মার্চ। ৩-৪-৫ এপ্রিল, পবপব তিন দিন এই নাটকেব অভিনয হল 'শ্রীবঙ্গম' মঞ্চে। তাব স্মৃতিকথা লিখেছেন প্রতিভা বসু।

"... বুদ্ধদেব তাব 'কালো হাওযা' উপন্যাস অবলম্বন কবে 'মাযামালঞ্চ' নামে একটি বডোসডো নাটক লিখে দিলেন। কিন্তু কুশীলববা কোথায? কলকাতাব বেডিযোব স্টেশন ডিবেক্টব তখন প্রভাত মুখার্জি নামে একটি নবীন যুবা, দেখতে অসম্ভব সুন্দব, ব্যবহাব অতি মনোবম। বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা ক'বেই সে প্রথম ২০২ বাসবিহাবী অ্যাভিনিউব বাডিতে এলেও আমাব সঙ্গে বৌদি পাতিযে দু'দিনেই ঘবেব মানুষ।.. অভিনয কবতে এক কথাতেই সে বাজি।

এবপব বেবীকে ধবলাম। বেবী হাসতে হাসতে এতো অস্থিব হল যে মনে হল যেন এক মস্ত বসিকতা কবছি তাব সঙ্গে। টুনুবাবু [অজিত দত্তব ডাকনাম] শুনে তো মূর্ছা যান আব কি।

বাজি ধবেই বেবীকে আমি দলে টানলাম। পঙ্কুবাবুব স্ত্রী লীলাকে অনুনয বিনয কবে বাধ্য কবলাম দলে আসতে, দেখা গেল তবু কম পডছে মেযে।... মাঝে মাঝেই বুদ্ধদেবেব কাছে একটি সুশ্রী তরুণ ফুল হাতে নিযে দবজাব বাইবে দাঁডিযে মৃদুস্ববে ডাকত, 'বেযাবা, বেয়াবা—' এবকম ভাবে আব কেউ ডাকত না, তাই বুদ্ধদেব আগন্তুককে না দেখেই বলতেন, 'কে? শেখব? এসো এসো।' ছেলেটিব নাম শেখব সেন।... আমাদেব নাটকেব কথা শুনে এবং দুটি মেযেব জন্য আমবা আটকে গেছি জেনে সে বলল, 'আমি দুটি মেযেকে জানি, তাবা দেখতেও ভালো, অভিনয কবতেও পাববেন।' আমাদেব সাগ্রহ সম্মতি নিযে সত্যি সে দুটি মেযে নিযে এসে হাজিব হলো। একজন কল্যাণী মুখোপাধ্যায, লেখক সুধীবঞ্জন মুখোপাধ্যাযেব সদ্যবিবাহিতা পত্নী, আব একজন তপতী মুখোপাধ্যায,[১] কল্যাণীব ভগ্নী। মেযেদুটি প্রথম দিনই আমাদেব নাটকেব সব সদস্যেবই প্রিয হযে উঠল। ... কযেক দিনের মধ্যেই আমি তাদের প্রাণাধিকা বানুদি হয়ে গেলাম... এই দুটি মেযে পেযে আমাদেব বিহার্সাল পূর্ণ বেগে জমে উঠল। 'পাববো না, পাববো না' বলা লাজুক বেবীও সংকোচ কাটিযে দিব্যি মুখব হযে গেল। বিহার্সেল ছ'মাস

১. পরে কবি মনীন্দ্র রায়ের দ্বিতীয়া স্ত্রী। ক্যানসারে মৃত্যু ২৪.১২.৯২।

ধবে চলেছিল[১]। আনন্দেব বন্যায ভেসেছিলাম আমবা।.. জ্যোতির্ময বায হলেন আমাদেব প্রমটাব। ঘব ভর্তি হযে যেত লোকে। শোবাব ঘবে সব সবিযে প্রশস্ত মেঝেতে আসব বিছানো হত। বিহার্সেল চলত যতটা, ইযার্কি ফাজলামি বসিকতা উচ্চবোলে অকাবণ হাসি, কাবো পিছনে লাগা এসব চলত তাব চেযে বেশি। সন্ধ্যা সাতটা থেকে বাত বাবোটা বেজে যেত এক পলকে। তাও কাবো উঠবাব ইচ্ছে নেই। বাড়ি যাবাব তাড়া নেই।...

এই বিহার্সেলে মাঝে-মাঝে বিখ্যাত পবিচালক নিউ থিযেটার্সেব বিমল বাযও আসতেন। পবে বম্বে যান। তাঁব সঙ্গে কবে কী সূত্রে পবিচয হযেছিল এবং সেই পবিচয বন্ধুত্বে পর্যবসিত হযেছিল সে কথা মনে নেই।

বিহার্সেল যখন পেকে এল, হাউস বুক কববাব এবং কাব কী ধবনেব পোশাক প্রযোজন সে-সবেব প্রশ্ন উঠল তখন নিউ থিযেটার্সেব আর্ট ডিবেক্টাব সৌবেন সেনকে নিযে এলেন তিনি। সৌবেন সেন এসে কযেকদিনেব মধ্যেই নিজেব উপব সব কিছুব দায-দাযিত্ব নিযে নিলেন। আমবা সকলেই প্রায অজানিতভাবে নির্ভব কবতে লাগলাম তাঁব উপবে। হল তিনিই বুক কবলেন, পোশাক পবিচ্ছদেব ব্যবস্থা, মেকআপ ম্যান ঠিক কবা, মঞ্চসজ্জা, সবই তখন তাঁব হাতে। আবো অনেক খুঁটিনাটি সব প্রস্তুত বেখে বুদ্ধদেবকে একেবাবে নির্ভাব কবে দিলেন। একটা সহজাত ব্যক্তিত্ব ছিল ভদ্রলোকটিব। ভাব গ্রহণ কববাব মতো বুদ্ধি এবং শক্তি দুই-ই প্রবল ছিল।

আমাদেব বিহার্সেল ফুবিযে গিযে স্টেজে যখন যাব যাব গুণযোগ্যতাব পবিচয দেবাব সময হল, তখন সকলেবই মন খাবাপ। পবপব তিন দিন [৩-৪-৫ এপ্রিল] শ্রীবঙ্গমে এই নাটক অভিনীত হযেছিল, প্রশংসায অনেক কাগজ পঞ্চমুখও হযেছিল।. টিকিট বিক্রিও কম হযনি, তথাপি দেখা গেল ঘাটতি হযেছে প্রায এক হাজাব টাকা।

.. পবে জানলাম ঐ ধাবটা হযেছিল নিউ থিযেটার্সেব কাছে পোশাক-পবিচ্ছদ মেকআপম্যান মঞ্চসজ্জাব উপকবণ ইত্যাদিব জন্য। সৌবেন সেন বুদ্ধদেবকে বলেছেন ওটা নিযে আপনি ভাববেন না, আমি অন্যান্য কাজেব মধ্য দিযে ধীবে আস্তে ওটা শোধ কবে দেব। এই সমযটায সৌবেন সেনই বুদ্ধদেবেব প্রাত্যহিক বন্ধু এবং সহায হযে উঠেছিলেন।"

—*জীবনেব জলছবি*, ৩য় মু, পৃ ১৬২

কবিতাভবনের আনন্দময় আবহাওয়া : তপতী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ

"... 'কবিতাভবন' আমাব কাছে অচিবেই হযে উঠল আনন্দনিকেতন, যেখানে 'নেভাব এ ডাল মোমেন্ট'। বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুব সংস্পর্শ আমাব জীবনে

১ নাটক মঞ্চস্থ হয় ৪ এপ্রিল ১৯৪৪— অর্থাৎ এই বিহার্সাল এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলি শুরু হয় অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ নাগাদ।

স্বর্গের আনন্দ বয়ে এনেছিল।... আমি জীবনে সবচাইতে ভালোবেসেছি রানুদিকে। রানুদির মতো অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ভালোবাসবার ক্ষমতা আমি আর কারো দেখিনি। রানুদির স্থান আমার কাছে একেবারে পৃথক।

রিহার্সেল চলছে। বুদ্ধদা পাণ্ডুলিপি প্রায়ই কাটাকুটি করে চলেছেন। আমরাও নাক গলিযে যে যা পারি পরামর্শ দান করছি।... মনে পড়ছে টেবিলে ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বুদ্ধদার মুখ। সকালে লিখতে বসতেন, সন্ধ্যাতেও লিখতেন। আমি চিরকালই সমানে কথা বলে যাই, গান করি। কবির ব্যাঘাত হচ্ছে, তা কী করব?... এমন হয়েছে বুদ্ধদা বলেছেন, 'পুষি, একটু থাম। লিখছি যে।'...

কবিতাভবনের দোতলার ফ্ল্যাটটি খুব বড়ো নয়, তবে প্রশস্ত। দক্ষিণের বারান্দায় বসবার ব্যবস্থা, সেখানেই বসতো আড্ডা, তর্ক, হাসি, আনন্দ, গান। সারাক্ষণ চা আসতো, ভৃত্য ছিলো কালীচরণ ও পরিচারিকা ভুবন। রিহার্সেল শুরু হত সন্ধ্যায়, চলত মধ্য রাত পর্যন্ত। নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডিরেক্টার সৌরেন সেন রোজ রিহার্সেলে থাকতেন। পারফেক্ট না হলে সৌরেনদার মন উঠত না।... লীলাদি সর্বক্ষণ বানুদিব লম্বা আযনায় নিজেকে দেখতেন। বাহাদুরদা আর আমি মিলে তা নিযে খুব হাসাহাসি করতাম। তখন কেবল হাসি, হাসি, আর হাসি। আনন্দের, হাসির বুদ্বুদ উঠত যেন ভেতর থেকে।

[এর সঙ্গে তুলনীয়, কবিতাভবন বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য : "আমাদের বাড়িতে বালক পাপ্লাকেই তাঁর শুধু sane মনে হত— হাসতে হাসতে আঙুল নাড়িয়ে বলতেন, 'It's a madhouse'।" : আমাদের ২০২ : মীনাক্ষী দত্ত। ৩০শে নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী, ১৯৮৭]

একদিন মনে আছে সন্ধ্যায় সকলে সমবেত হয়েছি রিহার্সেলের জন্য। বুদ্ধদা বললেন, আজ এই পূর্ণিমার রাত্রে আর ঘরে রিহার্সেল নয়, চল লেকে যাই। আকাশে এত জ্যোৎস্না, সব তো আলোয় ভরে গেছে, ঘরে থাকার অর্থ হয় না।

বুদ্ধদা এমনিতে ঘরকুনো লোক ছিলেন, কিন্তু সেদিন মুক্ত আকাশের তলায় অপূর্ব সন্ধ্যাটি কাটাবার প্রস্তাব করেন। সবাই লেকে গিয়ে আমরা রিহার্সেল দিয়েছিলাম। সেখানে প্রথম শুনি বুদ্ধদেব বসুর গলায় কবিতার আবৃত্তি— প্রথমে 'ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে, সুরঙ্গমা', তারপর 'কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না'। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কানে ভেসে আসছে তাঁর সেই গলা।"

—'মায়ামালঞ্চ ও আমি', তপতী মুখোপাধ্যায়।
৩০শে নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী/২, ১৯৮৭, পৃ. ১২৯

'মায়ামালঞ্চ' নাটকের উৎসর্গপত্র

"মায়ামালঞ্চ নাটকের উৎসর্গপত্রের সেই বিখ্যাত কবিতা নিশ্চয়ই পাঠকের স্মরণে

আছে— 'ভুলিবো না এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে/জীবন করে না ক্ষমা...।' কবি মণীন্দ্র রায়ের প্রথম স্ত্রী রমার মৃত্যুতে বুদ্ধদেব বসু এই কবিতা লিখেছিলেন, এবং মায়ামালঞ্চ তাঁকে উৎসর্গ করেন। আমাদের রিহার্সেল চলাকালীন হঠাৎ একদিন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এসে খবর দেন রমা আগুনে পুড়ে মারা গেছে। মণীন্দ্র রায়, রমা ও তাঁদের বন্ধু শিবনারায়ণ রায় বেড়াতে গিয়েছিলেন ভুবনেশ্বরে। রাঁধতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লেগে রমা মারা যায়। মণীন্দ্ররা তখন বাড়িতে ছিলেন না।"

—'মায়ামালঞ্চ ও আমি', তপতী মুখোপাধ্যায়
৩০শে নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী/২, ১০৮৭, পৃ. ১৩১

মায়া-মালঞ্চের প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি

মহামায়া	কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
অরিন্দম	রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
হৈমন্তী, তাঁর স্ত্রী	লীলা দাশগুপ্ত
মিনি, তাঁর বড়ো মেয়ে	প্রতিভা বসু
বুলি, তাঁর ছোটো মেয়ে	তপতীদেবী চট্টোপাধ্যায়
অরুণ, তাঁর একমাত্র পুত্র	পরিতোষ সোম
উজ্জ্বলা, অরুণের স্ত্রী	উমা দত্ত
নিরঞ্জন, অরুণের কলেজ-দিনের বন্ধু	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
নীরদ ডাক্তার, অরিন্দমের বন্ধু	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
মহাদেব	শেখর সেন

[স্থান ও সময়] কলকাতা ১৯৩৮
প্রথম অভিনয় ১৯শে ফাল্গুন ১৩৫০
— শ্রীরঙ্গম —
রচনা ও পরিচালনা বুদ্ধদেব বসু। প্রযোজনা কবিতাভবন
[উৎস : প্রথম অভিনয়ের প্রোগ্রাম]

জীবনানন্দ সম্পর্কে মোহভঙ্গ আরম্ভ

জীবনানন্দের কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেব ক্লান্তিহীনভাবে লিখে গেছেন— সেই 'প্রগতি'র যুগ (১৯২৭) থেকে। কিন্তু এই সময়ে এসে দেখতে পাচ্ছি, জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হতে আরম্ভ হয়েছে। চৈত্র ১৩৫১ সংখ্যা 'কবিতা'য় জীবনানন্দের 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখলেন :

" 'সিন্ধুসারসে' বর্ণনা সুন্দর, শব্দ-সমাবেশ চিত্তহারী, কিন্তু সেগুলি সবই যেন

জীবনানন্দর অন্যান্য উৎকৃষ্ট কবিতা থেকে আহৃবিত; সেই হিজল বন, হলুদ পাতা, হেমন্তের কুয়াশা, মেঘের দুপুরে সোনালি চিল— পড়তে-পড়তে এ-সন্দেহ মনে উঁকি না-দিয়েই পারে না যে কবি নিজের পুনরুক্তি করছেন। সে-সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় 'মনোবীজ', বিভিন্ন কোরাস' ইত্যাদি কবিতায় এসে; সেখানে দেখতে পাই যে যা ছিলো ভঙ্গি, তা হয়েছে মুদ্রাদোষ, যা ছিলো অনন্যতা তা হয়েছে কেন্দ্রচ্যুতি। যে সব কবিতায়— এবং জীবনানন্দর আরো সাম্প্রতিক কবিতায়— তিনি অফুরন্তভাবে নিজের পুনরুক্তি ক'রে যাচ্ছেন। পুনরুক্তি মাত্রেই দোষের নয়— রবীন্দ্রনাথ পুনরুক্তির সম্রাট, কিন্তু তাঁর প্রতিটি পুনরুক্তি একটি নূতন সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য সেগুলি পুনরুক্তি ব'লে মনেই হয় না। জীবনানন্দর ক্ষেত্রে তা হয়নি; 'মহাপৃথিবী'র শেষের দিকে যে-সব কবিতা আছে, সেগুলি যেন কতগুলি বাঁধাধরা বাক্যের বিচিত্র ও অদ্ভুত সংস্থাপন মাত্র, বাক্যগুলি সুন্দর, কিন্তু সবটা মিলিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। একে পুনরুক্তি না ব'লে নিজের অনুকৃতি বলতে হয় এবং কোনো কবি যখন নিজের অনুকরণ করেন তখন দেবতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মনে হয় জীবনানন্দ স্বরচিত বৃত্তের মধ্যে বন্দী হয়েছেন, প্রার্থনা করি তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসুন, তাঁর কাব্যক্ষেত্রে যৌবনের ফুল ফোটার পরে এবারে প্রৌঢ়দিনের পাকা ফসল ফলুক। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠ রচনা আশা করা যায়, অথচ এই বয়সের কাছাকাছি এসে আমাদের কবিরা যদি স্তিমিত হ'য়ে পড়েন, তার চেয়ে দুঃখের আর কী হ'তে পারে।"

এখানে আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি বুদ্ধদেব জীবনানন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হননি, আশা প্রকাশ করেছেন তিনি আত্ম-অনুকরণের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসবেন একদিন। কিন্তু এর দু'বছর পর আশ্বিন ১৩৫৩-র 'কবিতা'য় আমরা দেখতে পাব, জীবনানন্দর স্খলন তাঁর কলমে হাহাকারের মতো বেজে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের নামে সাহিত্যপুরস্কার ঘোষণার আবেদন

এই সংখ্যা 'কবিতা'র সম্পাদকীয়তে রবীন্দ্র-মেমোরিয়েল কমিটির কাজকর্মের সমালোচনা করে লিখলেন :

"রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আমরা লিখেছিলাম যে বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টির জন্য একটি পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের নামে স্থাপিত হওয়া উচিত। এই সুযোগে সে-প্রস্তাব আবার উপস্থিত করছি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিবিধ সাহিত্য-পুরস্কারের প্রবর্তন হয়েছে, অথচ যে-বাংলাদেশ সাহিত্যবিষয়ে চির-অগ্রণী, যে-বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সেই দেশের ও সেই ভাষার সাহিত্যের জন্য আজ পর্যন্তও একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা হ'লো না। রবীন্দ্র-মেমোরিয়েল কমিটি কি এ-বিষয়ে উদ্যোগী হবেন?"

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে সাহিত্য-পুরস্কার দেয়ার প্রস্তাব বুদ্ধদেবই প্রথম উত্থাপন করেন।

নজরুলের গানের প্রথম তালিকা

পরপর দুই সংখ্যা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হল নজরুলের প্রায় ১৮০০ গানের রেকর্ডের প্রথম পঙক্তি। নজরুলের গানের কোনো সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করার এটি সম্ভবত প্রথম প্রচেষ্টা।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'দ্রৌপদীর শাড়ি' গ্রন্থের কবিতা রচনা আরম্ভ হয়েছে। 'রূপান্তরে'র কবিতাও লিখছেন। লিখছেন 'হাওয়া বদল' গ্রন্থের ছোটোগল্পগুলি। পিরানদেল্লোর গল্প সম্পাদনা, দুটি গল্পের অনুবাদ। 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থের প্রবন্ধমালা সমাপ্ত হল। 'গল্পসংকলন' গ্রন্থের কয়েকটি গল্প লেখা হল।

কবিতার বই বেরোল 'রূপান্তর'। ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত ও কবিকর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিমিত সংস্করণ। প্রথম প্রকাশ ১৯ জুলাই– বুদ্ধদেব-প্রতিভার দশম বিবাহবার্ষিকীর দিন। উৎসর্গ : সৌরেন সেন।

'অদর্শনা' উপন্যাস। 'মায়া-মালঞ্চ' নাটক। ছোটোগল্প সংকলন– 'হাওয়া বদল'। অনুবাদ– 'হাউই', অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প। ১৩৫১ ব.।

১৯৪৫ ।। বয়স সাঁইত্রিশ

‘কবিতা’ পত্রিকায় ববীন্দ্ররচনা

আষাঢ ১৩৫২ সংখ্যা ‘কবিতা’য প্রকাশিত হল ‘কবিতা’ব দশ বছবে প্রকাশিত ববীন্দ্রনাথেব বচনাব সম্পূর্ণ সূচি। এটি সংকলন কবেছিলেন পুলিনবিহাবী সেন। তালিকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধাব কবা হল এখানে। যোগ কবা হল কবিতাব প্রথম পঙক্তিগুলি— এবং সে-সময কোনো-কোনো বচনা অপ্রকাশিত বলে নির্দেশ কবা হযেছিল, তাব মধ্যে যেগুলি পববর্তীকালে গ্রন্থভুক্ত হযেছে, তাদেব গ্রন্থনির্দেশ কবে দেযা হল।

প্রথম বর্ষ।। আশ্বিন ১৩৪২-আষাঢ ১৩৪৩

পৌষ।।

ছুটি (আমাব ছুটি চাব দিকে ধু ধু কবছে) পত্রপুট

চিঠি . বুদ্ধদেব বসুকে লেখা, ৩ অক্টোবব ১৯৩৫ চিঠিপত্র ১৬

দ্বিতীয বর্ষ।। আশ্বিন ১৩৪৩-আষাঢ ১৩৪৪

আশ্বিন।।

স্বপ্ন (ঘন অন্ধকাব বাত) শ্যামলী

পৌষ।।

মুক্তপথে (বাঁকাও ভুরু দ্বাবে আগল দিযা) সানাই

গদ্যকাব্য (প্রবন্ধ) সাহিত্যেব স্বরূপ

আষাঢ।।

স্মবণ (যখন বব না আমি মর্ত্যকাযায) সেঁজুতি

আশ্বিন।।

আফ্রিকা (“উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে” ইত্যাদি কবিতাটিব পাঠান্তব) : পত্রপুট (২য সং, ১৩৪৫)

অলস মিলন (সেদিন তুমি দূরের ছিলে মম) * সানাই

(গ্রন্থের নাম : দূববর্তিনী)

বৈশাখ।।

সাহিত্যেব স্বরূপ (প্রবন্ধ) সাহিত্যের স্বরূপ

চতুর্থ বর্ষ।। আশ্বিন ১৩৪৫-আষাঢ় ১৩৪৬

আশ্বিন।।

ইস্‌টেশন (সকাল বিকাল ইস্‌টেশনে আসি) — নবজাতক

আষাঢ়।।

শিল্পী — গ্রন্থভুক্ত হয়নি

পঞ্চম বর্ষ।। আশ্বিন ১৩৪৬-আষাঢ় ১৩৪৭

আশ্বিন।।

শেষ হিসাব (চেনাশোনার সাঁঝবেলাতে) — নবজাতক

পৌষ।।

রোম্যান্টিক (আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক) — নবজাতক

চৈত্র।।

বিপ্লব (ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল) — সানাই

আষাঢ়।।

আসাযাওয়া (ভালোবাসা এসেছিল) — সানাই

ক্ষণিক (এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি) — সানাই

ষষ্ঠ বর্ষ।। আশ্বিন ১৩৪৭-আষাঢ় ১৩৪৮

আশ্বিন।।

রেশ (বাঁশরি আনে আকাশবাণী) — বীথিকা (সংযোজন)

পৌষ।।

এই মহাবিশ্বতলে (এই মহাবিশ্বতলে) — রোগশয্যায়

চৈত্র।।

মিলের কাব্য (নারী আর পুরুষকে যেই...) — প্রহাসিনী

আষাঢ়।।

সাহিত্য-বিচার (পত্রাকার প্রবন্ধ) — সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের মূল্য (প্রবন্ধ) — সাহিত্যের স্বরূপ

সপ্তম বর্ষ।। আশ্বিন ১৩৪৮-আষাঢ় ১৩৪৯

আশ্বিন।।

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যের উৎস (প্রবন্ধ) — সাহিত্যের স্বরূপ
[প্রথমাংশ বুদ্ধদেবকে লেখা চিঠি; দ্বিতীয়াংশ আষাঢ় ১৩৪৮ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'সাহিত্য ও শিল্প' প্রবন্ধের সারাংশ]

কার্তিক।।

একটি গদ্যকবিতা (এতদিন পরে আমার দ্বারে...) — গ্রন্থভুক্ত হয়নি

চিঠি : যামিনী রায়কে, ২৫.৫.৪১ — গ্রন্থভুক্ত হয়নি

মৃত্যুশোক : অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা, ৮ আষাঢ় ১৩২৪ — চিঠিপত্র/১৬

ছড়া (অলস মনের প্রদোষেতে) 'ছড়া' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

পৌষ।।

"পূর্বযুগে অশোক গাছে..." [বুদ্ধদেব বসুকে লেখা পত্রাকারে কবিতা : ফ্যাকসিমিলি মুদ্রণ] 'প্রহাসিনী'ব 'অনাদৃতা লেখনী' কবিতার ৫-১০ ছত্র

আধুনিক বাংলা কবিতা (কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত সংকলন বিষয়ে বুদ্ধদেবকে লেখা চিঠি, ২০-৮-৪০) চিঠিপত্র/১৬

আষাঢ়।।

প্রার্থনা (কামনায় কামনায় দেশে দেশে) ফ্যাকসিমিলি মুদ্রণ, পরিশেষ

বুদ্ধদেব বসুকে লেখা তিনটি চিঠি : প্রথমটি পৌষ ১৩৪২ থেকে পুনর্মুদ্রণ। দ্বিতীয়টির তাবিখ ৩ জানুয়ারি ১৯৩৬ (চিঠিপত্র/১৬ : ৭ নং) তৃতীয়টিব ১.৭.৩৯ (চিঠিপত্র/১৬ : ২০ নং চিঠি)

কার্তিক / পৌষ / চৈত্র / আষাঢ়

পত্রগুচ্ছ ১-১৮, অমিয চক্রবর্তী ও সুশীলচন্দ্র মিত্রকে।

নবম বর্ষ।। আশ্বিন ১৩৫০-আষাঢ় ১৩৫১

আশ্বিন / কার্তিক / পৌষ / চৈত্র / আষাঢ়

পত্রগুচ্ছ ১৯-৪৫ এবং পত্রখণ্ড ১-৩ : অমিয় চক্রবর্তীকে।

দশম বর্ষ।। আশ্বিন ১৩৫১-আষাঢ় ১৩৫২

আশ্বিন।।

পত্রগুচ্ছ ৪৬-৫০ : অমিয় চক্রবর্তীকে

এছাড়া কার্তিক ১৩৪৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা একখানি ছবির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে।

আশ্বিন ১৩৫২-তেও বুদ্ধদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের তিনটি চিঠি প্রকাশিত হয়। প্রথমটিতে লিখছেন :

"কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো ভাষায় ভাবে ও অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে। সাধারণত বাংলা কাগজে সমালোচনা অত্যন্ত ফিকে হয়— তোমার লেখার মধ্যে বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, অনেকটাই ফাঁকি বলে মনে হয় না। তোমার প্রবন্ধে আমর প্রশংসার কথা পেলুম সেটা নিঃসন্দেহে আমার পক্ষে উপভোগের বিষয়। কিন্তু এর মূল্য হচ্ছে তোমার রচনার মূল্যে।..."

[২২।৩।৪০]

'কবিতা'য় ভালো কবিতা পাওয়ার সমস্যা

'কবিতা' পত্রিকায় ভালো কবিতার সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে, এই দুশ্চিন্তা কিছুদিন থেকে বুদ্ধদেবকে পীড়া দিচ্ছিল। অথচ ভালো কবিতা তো ফরমাশ দিয়ে

পাওয়া যায় না। তাই তিনি ভাবছিলেন, পত্রিকার চরিত্র বদল করবেন কিনা। একাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় [আশ্বিন ১৩৫২] সম্পাদকীয়তে লিখলেন :

"... এই সংখ্যার দৃশ্যরূপে ও আন্তরিক বস্তুতে কিছু নূতনত্ব লক্ষিত হবে— এখন থেকে সাধারণভাবে সাহিত্যকলার ও বিশেষভাবে কাব্যকলার বিচিত্র বহুমুখী আলোচনা হবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনে পাঠকদের সহযোগ কামনা করি। 'কবিতা'য় প্রকাশিত কোনো আলোচনা সম্বন্ধে কোনো কথা যদি তাঁদের মনে হয়, কিংবা স্বতন্ত্রভাবে কাব্যকলাব যে-কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু যদি বক্তব্য থাকে, তাহ'লে সে-সব মন্তব্য যথাসাধ্য সুসংবদ্ধ সংক্ষিপ্তরূপে পত্রাকারে লিখে পাঠালে আমরা প্রকাশ করতে যথাসম্ভব সচেষ্ট থাকবো। যেখানে নানাদিক থেকে নানারকম আলোচনার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের মনের নাড়িতে-নাড়িতে চিন্তার স্রোত স্বাধীন ও সতেজভাবে প্রবাহিত হ'তে পারে, কবিতার আতিথ্যে সেখানে কৃপণতা হবে না।"

তবে কবিতার পত্রিকা থেকে কবিতা আলোচনার পত্রিকায় 'কবিতা'কে রূপান্তরিত করা শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি।

পুত্রের জন্ম

২ অক্টোবর জন্ম হল পুত্র শুদ্ধশীল (পাপ্পা)-এর। প্রতিভা বসু লিখেছেন : "আমার শিশুরা জন্মায় রাজসিকভাবে। বুদ্ধদেব কখনোই আমাকে কোনো নার্সিং হোমে বা হাসপাতালে পাঠাতে নারাজ। সারাদিন পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেখতে যাবেন এটা তিনি ভাবতে পারেন না। সুতরাং বাড়িটাই হয়ে ওঠে নার্সিং হোম। কলকাতার সব চাইতে নামি দামি গাইনির হাতে থাকি আমি, সর্বোচ্চ মূল্যে যিনি প্রসব করান, তার সঙ্গে নার্স আসে, আয়া আসে, একেবারে এলাহি কাণ্ড। এই মুহূর্তে যাঁর একহাজার টাকা ধার, তাঁর পক্ষে আবার এই ধার বহন করা নিশ্চয়ই দুরূহ।... আমার কন্যাদুটির বেলায়ও যেমন প্রথম থেকেই বিখ্যাত ডাক্তার সুবোধ মিত্র দেখেছিলেন, তৃতীয়টির বেলায়ও তেমনি তাঁর চিকিৎসাধীনই রইলাম আমি। কিন্তু আসল সময়ে তিনি কোনো জরুরি কাজে বাইরে থাকবেন বলে তখনকার সময়ের আর একজন বিখ্যাত ডাক্তার সুধীর বোসকে ঠিক করে দিয়ে গেলেন। যথাসময়ে দুটি কন্যার পরে আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মালো।"

—*জীবনের জলছবি*। ৩য় মু, পৃ. ১৬৫

'কবিতা'র নজরুল সংখ্যা

নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মুগ্ধতা কিশোরবয়স থেকে— 'আমার ছেলেবেলা' এবং আরো নানা স্থানে নজরুল সম্পর্কে সশ্রদ্ধ, সবিস্ময় এবং সপ্রেম উল্লেখ পাই। 'কবিতা' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ যুগ্মসংখ্যাটি 'নজরুল

সংখ্যা' হিশেবে প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় নজরুলের হস্তাক্ষর, গ্রন্থপঞ্জি, দুটি অপ্রকাশিত গান ছাড়াও নজরুল সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখলেন জীবনানন্দ দাশ, লীলাময় রায় (ছদ্মনামে অন্নদাশঙ্কর), আনওয়ারুল ইসলাম। স্মৃতিকথা লিখলেন নলিনীকান্ত সরকার ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রবন্ধটিতে নজরুলের মূল্যায়ন করলেন বুদ্ধদেব :

> "বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্র দত্ত তাঁর খ্যাতির চরম চূড়ায় অধিষ্ঠিত, তাঁর প্রভাব সে-সময়টায় বোধহয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয়— কেনই বা না থাকবে— কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি তাঁর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে ঘোষণা কবেছিলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করলে, স্বীকার করলে— তাঁর বই রাজরোষ এবং প্রজানুরাগ লাভ ক'রে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগলো— অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি। এটা কবির পক্ষে বিরল ভাগ্যের কথা : কিন্তু যে-লেখা বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকপ্রিয় হয় তাকে আমরা ঈষৎ সন্দেহের চোখে দেখি, কারণ ইতিহাসে দেখা যায় সে-সব লেখা প্রায়ই টেঁকসই হয় না। নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি— তাঁর পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে।...
>
> অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ— এবং প্রধান দোষ। প'ড়েই বোঝা যায় যে যা-কিছু তিনি লিখেছেন, হু-হু ক'রে লিখেছেন; ভাবতে বুঝতে মাজা-ঘষা করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি। ... 'আমি চির শিশু, চির কিশোর'— একথা বিদ্রূপের বাঁকা হাসির সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে সত্য হয়েছে। পঁচিশ বছর ধ'রে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর-পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রতিভা-প্রদীপে ধীশক্তির শুভ্র শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হ'তে পারেনি কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে, রূপলোক থেকে ভাবলোকে উত্তীর্ণ করেনি। প্রেরণার প্রবলতা বিপথগামী হয়েছে আত্মস্থ স্বাধীন সচেতনতার অভাবে; রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্বন্ধে যেমন বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায় যে, তাঁর প্রতিভা ছিলো, কিন্তু প্রতিভার গৃহিণীপনা ছিলো না।...
>
> গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে বেশি ক'রে দিতে পেরেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলির মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাঁর গানের। বীর্যব্যঞ্জক গানে— চলতি ভাষায় যাকে স্বদেশি গান বলে— রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের

পরেই তাঁর স্থান, 'দুর্গম গিরি কান্তারমরু' উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী। সাধারণভাবে বলা যায় যে তাঁর গান তাঁর কবিতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর— গানের ক্ষুদ্র আকারে তাঁর অতিকথনের দোষ প্রশ্রয় পেতে পারেনি— 'বুলবুল', 'চোখের চাতকে' কিছু-কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে বেশি বলা হয় না।...

শোনা যায়, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি— পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এত বেশি গান লেখেননি। কথাটা অসম্ভব নয়— শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির ফরমাশে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন ক'রে যাচ্ছিলেন— প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামি গান, হাসির গান— সব রকম। সে-সব গান বোধহয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি; তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা জানিনে। নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই ক'রে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়— সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম-কোমল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনাপূর্ণ। সে-কবি শুধুই বীররসের নন, আদিরসের পথে তাঁর সচ্ছন্দ আনাগোনা, এমনকি হাস্যবসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর। 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারা'র কবি হিশেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানিনে, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানেব মালা তিনি পরিয়ে দিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়। আর কবিতাতেও তাঁর আসন নিঃসংশয়, কেননা কবিতায় তাঁর আছে শক্তি, আছে স্বাচ্ছন্দ্য, আছে সচ্ছলতা, আর এগুলিই কবিতার আদিগুণ।"

রিপন কলেজ থেকে পদত্যাগ

এগারো বছর অধ্যাপনা করবার পর সহসা একদিন বুদ্ধদেব রিপন কলেজের চাকরি থেকে পদত্যাগ করলেন। কলেজে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সেই সময়কার সহকর্মী, অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত লিখেছেন :

"কলেজের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি যে অবিচার করেছিলেন তার তুলনা হয় না; ক্ষীণদেহ ক্ষীণকণ্ঠ নতুন অধ্যাপককে সবচেয়ে বাজে ক্লাশগুলি দেওয়া হত। তখন রিপনে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে একটা করে প্লাকড্ সেকশন থাকত, সব কলেজের ফেল-করা ছেলেদের নিয়ে। ঐ ক্লাশে পড়াতে দেওয়া হত আমাদের মতো নতুন অধ্যাপকদের। আমি কাজ চালিয়ে নিয়েছিলাম। বুদ্ধদেবের অস্বস্তির সীমা ছিল না। উচিত কাজ হত তাঁকে ছোট ছোট অনার্স ক্লাশগুলি দেওয়া, কিন্তু সেগুলির ভার নিতেন পীর-পয়গম্বরেরা— যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত পাঠ্যবইয়ের বাইরে আর কোনো কিছু পড়তেন না।...

কলেজের আর্থিক অবস্থাও এই সময়ে খারাপ হয়ে পড়েছিল। জাপানি বোমার ভয়ে তখন কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে।... কলেজে দুঃস্বপ্নের দিন নেমে এল। ছাত্র নেই, শিক্ষকরাও প্রমথ বিশীর ভাষায় 'ভাগবত' বা 'পরমভাগবত'।

দিনাজপুরে কলেজের শাখা খোলা হল। আয় বাড়াবার জন্য কমার্স ক্লাস খোলা হল। যে রিপন কলেজ প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে আমাদের মাইনে দিয়ে দিত সে কলেজে কিস্তির ব্যবস্থা হল। অনেকেই পালাবার পথ খুঁজছেন অন্য চাকরিতে। বিষ্ণু দে চলে গেলেন প্রথমে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে এবং পরে প্রেসিডেন্সিতে।... নৃপেন চট্টোপাধ্যায় আগেই বিলাতে চলে গিয়েছিলেন। আমি গেলাম ইসলামিয়া কলেজে।...

আমার মনে হয়েছে যে রিপন কলেজে পড়ানোর অভিজ্ঞতা বুদ্ধদেবের কাছে শিক্ষক বৃত্তিতেই অনীহা এনে দিয়েছিল। ওঁকে দিনাজপুরের শাখা কলেজে পাঠাবার কথা যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের দুর্মতির কথা মনে পড়লে অবাক হতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধদেব পদত্যাগ করলেন।..."

—"বুদ্ধদেব বসু : স্কুলে আর কলেজে", ভবতোষ দত্ত। ৩০শে নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৭, পৃ. ৩৫

প্রতিভা বসু লিখেছেন :

"... সহসা একদিন বুদ্ধদেব তাঁর কর্মস্থলে পদত্যাগপত্র লিখে দিয়ে এলেন। শোনা গেল যুদ্ধের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ নাকি কলেজটিকে অন্যত্র কোথাও কোনো মফস্বল শহরে সরিয়ে নিতে চান, বুদ্ধদেবকে তাঁরা সেখানে বদলি করতে চাইছেন। সেটা বুদ্ধদেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এই কাজ তাঁর ভালোও লাগছিল না। ছেড়ে দিয়ে এসে বললেন, 'রাগ করলে না তো?' রাগ আমি করিনি তবে চিন্তায় না ডুবেও পারিনি। তিনটি সন্তান নিয়ে সংসার, অসুস্থ দিদিমা, কী করে চালাবো সেটাই সমস্যা। কোনো জবাব না পেয়ে কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কিছু বলছ না যে?' হেসে বললাম, 'আমার বলা না-বলায় কী যায় আসে, তুমিই তো কর্ণধার, তুমি যা ভালো বুঝেছ তাই করেছ।' বললেন, 'এটা তোমার রাগের কথা।' আমি বললাম, 'একেবারেই না। তবে লেখার আয়ে চালানো কঠিন হবে বলেই ভয়। কবিতাভবন করেও তো কিছু লাভ হয়নি বরং বেশ ধার হয়েছে। চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঠিক অবশ্য হল। স্টেটসম্যান পত্রিকায় সপ্তাহে একদিন একটা কলম লিখেই কলেজে যা পাচ্ছিলেন তারই কাছাকাছি একটা সংখ্যা মাসিক বরাদ্দ হল[১]। কিন্তু জীবনের প্রথমে যখন চাল কয়লা মুদি মনোহারীর ধারে বিধ্বস্ত ছিল বাড়িটা, তখন ছাপাখানা, কাগজ, প্রেস দপ্তরির ধারে আবার ঠিক সেরকম চেহারাই হল।"

—*জীবনের জলছবি*। ৩য় মু, পৃ. ১৬৬

দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেবের চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি আকস্মিক ছিল না। তাঁকে সম্ভবত বদলি করা হয়েছিল (বা তিনি আভাস পেয়েছিলেন যে বদলি

১. স্টেটসম্যানের কাজটি আসলে গত বছর থেকেই আরম্ভ করেছিলেন। হতে পারে যে সেই ভরসাতেই কলেজের অরুচিকর কর্মটি ত্যাগ করবার সাহস পেয়েছিলেন। প্রতিভা বসুর মৌখিক সাক্ষ্য অনুযায়ী, বুদ্ধদেব কলেজে বেতন পেতেন ১৭৫ টাকা; আর স্টেটসম্যান থেকে পেতেন ৩৫০ টাকা।

করার আয়োজন হচ্ছে) কলেজের দিনাজপুর শাখায়, সেখান থেকে তাঁর নিজের কাজ করা— প্রকাশনা-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ, পত্রিকা চালানো, বন্ধুসংসর্গ — কোনোমতেই সম্ভব হত না। তাছাড়া হয়তো বেতনসংকোচনও হত— এখনই অধ্যাপকদের বেতন কিস্তিতে দেয়া আরম্ভ হয়েছিল। এই অবস্থায়, স্টেটসম্যানের কাজটা পাওয়ায় তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হয়ে যায়। আর তা ছাড়া, ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়িক অভিজ্ঞতার পর, রিপন কলেজের পরিবেশ তাঁর অসহ্য লেগেছিল প্রথম থেকেই :

"হ্যারিসন রোডের উপর প্রাঙ্গণহীন এই কলেজটি দেখে প্রথমে আমি কৌতুকবোধ করেছিলাম, রমনার বিদ্যালয়-বিলাসিতার পরে মনে হয়েছিলো হাস্যকর। তারপর দেখলাম, কৌতুকটা ঠিক মোলায়েম নয়— অবস্থাভেদে কটু, বিস্বাদ, ঝাঁঝালো। বাড়িটা চারতলা হলেও অপরিসর, ছাত্রসংখ্যা কোন না হাজারতিনেক হবে; সিঁড়ি আর করিডরগুলি গিজগিজ করে ঘণ্টা বাজলে, বাদলার দিনে ছাতার জলে জুতোর ময়লায় ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। আর সারাক্ষণই যত্রতত্র দেখা যায় একটি ভাসমান ভিড়— বিদ্যার্থী যারা ফুটপাতে অবকাশরঞ্জনের উপায় খোঁজে না তারা ঘুরে বেড়ায় কলেজের অলিগলি চাতালগুলিতে সরবে এবং বিশৃঙ্খলভাবে, তাদের কাছে শৃঙ্খলা কেউ প্রত্যাশাও করে না। কেমন করেই বা তা করা যায়, যখন ছাত্র-কমনরুম ব'লে চিহ্নিত একতলার ঘরটি এঁদো এবং অন্ধকার, তাদের নিকটতম বিচরণস্থান শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, আর ক্লাশঘরেও তাদের বসতে হয় মাছপাতুরিব মতো অতিঘনিষ্ঠ, কাউকে হয়তো জানলার তাকে পা ঝুলিয়ে— ভাগ্যে সবাই উপস্থিত থাকে না (যদিও কোনো স্বচ্ছ কৌশলে জুটিয়ে নেয় তাদের বহুবাঞ্ছিত 'পি' অক্ষরটি) তাই টেনেবুনে দিনের কর্ম সমাধা হয়। এ-অবস্থায়, বলাই বাহুল্য, সংখ্যালঘু উৎসুক ছেলেরা পুষ্টি পায় না, অমনোযোগী অসংখ্যেরা উদ্দাম হয়ে ওঠে। প্রথম বছরে, সদ্যনিযুক্ত কনিষ্ঠ শিক্ষক, আমি পড়াতে পেয়েছিলাম এমন দুটি সেকশনে যেখানে ফেল-করা জঞ্জালের স্তূপ পৃথক্কৃত : এক বিপুল ও বলীয়ান যুবসমাজ— যাদের যৌবন মাঝে-মাঝে উচ্ছ্রিত হয় শৃগালতুল্য চীৎকার বা মেঝের উপর জুতো ঘষটানির কোরাসে, আর যারা, পরীক্ষা যখন আসন্ন, অকস্মাৎ অভাবিতভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় পাশের তুকতাক জেনে নেবার জন্য— 'ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন্স' নামক পরিভাষাটি আমি তাদেরই মুখে প্রথম শুনেছিলাম।... এমনি চলে দিনের-পর-দিন এই বিদ্যের বাজার : এক কুশ্রী পরিবেশে, বিশুদ্ধ ব্যাবসাদারি আবহাওয়ায়— অনুশীলনহীন, উৎসাহরহিত, শুধু পাশ করা আর পাশ করানোর কঙ্কালসার উদ্দেশ্যের মধ্যে আবদ্ধ।...

... আমার জীবনে বেসুরো একটা ব্যাপার ছিলো রিপন কলেজ, ততদিনে প্রায় অসহ্য বলা যায়, কেননা প্রথম এসে যেটুকু বা সৌষ্ঠব দেখেছিলাম তা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো; এদিকে সাহিত্যদরদী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মৃত [মৃত্যু : ৬/১২/১৯৪৩], আর নতুন কর্তৃপক্ষ উঠে পড়ে লেগেছেন আমাকে তাঁদের

সম্প্রতি-খোলা দিনাজপুর শাখায় চালান করতে— যে-প্রস্তাব আমার অবশ্য বিবেচনারও বাইরে। অনেক দিন ধ'রেই ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলাম— সেখানকার মাসান্তিক মজুরিটাই তুচ্ছ হয়ে গেছে; হঠাৎ একদিন মনস্থির ক'রে, কাউকে কিছু না-জানিয়ে, সাধারণ ডাকে কয়েক লাইনের একটি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম। স্বস্তি।"

—'আমাদের কবিতাভবন' শারদীয় দেশ ১৩৮১, পৃ. ৩৩

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

উপন্যাস লিখছেন : 'বিশাখা'। এপ্রিল-মে মাসে লিখে উঠলেন বড়ো গল্প 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা'— ছোটোগল্প-গ্রন্থমালার ১৭-১৮ যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশিত হল। ৩ সেপ্টেম্বর বেরোল তাঁর 'গল্পসংকলন'— এটিও কবিতাভবনের প্রকাশনা।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম গ্রন্থপঞ্জি কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হল— ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে তাঁর যত বই বেরিয়েছে তার তালিকা, দাম চার আনা। এখানে দেখতে পাচ্ছি, সংস্করণ বাদ দিয়ে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা এখন ৭৮। তা ছাড়া আছে ইংরেজিতে রচিত দুটি পাঠ্যপুস্তক— English for Boys and Girls, Primer Readers I-V, এবং The World We Live in। দুটিই প্রকাশ করেছিলেন ঢাকার সন্তোষ লাইব্রেরি। প্রথমটির তারিখ ১৯৩৮, দ্বিতীয়টির ১৯৩৯।

১৯৪৬ ।। বয়স আটত্রিশ

কবিতাভবনের আড্ডা ও সাহিত্যসভা

বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ :

"কবিতাভবনে আড্ডা চলে বিশুদ্ধ বাঙালি শৈলীতে, আয়োজনহীন, স্বতঃস্ফূর্ত : সন্ধে থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত দরজা খোলা, অতিথিরা যাওয়া-আসা করেন যেমন খুশি, সপ্তাহে প্রতি দিন বারো মাস, প্রায় একটা সন্ধ্যাও ফাঁকা যায় না। একান্ত চায়ে আপ্যায়ন— উপসংহারে কখনো-কখনো পান আর আনুষঙ্গিক বড়ো জোর কখনো ডালমুট বা পাঁপর-ভাজা। এ-ই ছিলো তখনকার দিনের রেওযাজ, নানামহলেই এই ধরনের কেন্দ্র ছিলো— নীরেন রায় বলতেন, 'চার-ভাগের এক ভাগ লোক বাড়ি না-থাকলে কলকাতার বাকি তিন ভাগ সন্ধ্যা কাটাবে কোথায়?' কিন্তু একবাব, কিছুটা আনুষ্ঠানিকভাবে, আমি একটি সাহিত্যসভার প্রবর্তন করেছিলাম— ততদিনে 'পরিচয়' হস্তান্তবিত ও সুধীন্দ্রের শুক্রবার-সন্ধ্যা লুপ্ত হ'য়ে গেছে[১]। মাসে দু-বার বৈঠক— শনিবার সন্ধ্যায় বা রবিবার সকালে —কবিতাভবনের অব্যবহিত গোষ্ঠীর বাইরে আরো অনেকে আমন্ত্রিত হন, চায়েব সঙ্গে কিছু সারবান খাদ্যেরও ব্যবস্থা থাকে, লেখকরা তাঁদের নতুন রচনা প'ড়ে শোনান, প্রবীণদের উপস্থিতির জন্য ভিন্ন একটা স্বাদ পাওয়া যায়। চারটি বা পাঁচটি অধিবেশন মনে পড়ে : দুশো-দুইয়ে, কামাক্ষীদের বাড়িতে, মজুমদার গৃহের[২] দোতলায়। যামিনী রায় এসেছেন, তাঁর শিল্পীজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে-বলতে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছেন : 'আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলো আমি কী-কী মিশিয়ে রং তৈরি করি। আমি বললাম— 'প্রস্রাব মিশিয়ে!' সাহিত্যের কথা

---

১. "'পরিচয়' এর পরিচালনাভার সুধীনবাবু '৪৪ সালের শেষের দিকে তুলে দেন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখকসংঘের হাতে—।" *'তরী হতে তীর'*, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২য় সং, পৃ. ৩৬৫। এই তথ্য থেকে উল্লিখিত সাহিত্যসভার সময়ের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

২. মজুমদার গৃহ : যতীন্দ্রমোহন ও শোভনা মজুমদার। "তাঁরা বিত্তবান : চৌরঙ্গি টেরাসে তাঁদের বাসভবনটি একাধিক অর্থে উদার একটি হর্ম্য ; আর যতীন্দ্রমোহন যাকে বলে একটি উত্তম মিশুক, শতকরা একশো পরিমাণে বহির্মুখী। তিনি ভালোবাসেন নিরপেক্ষভাবে মানুষের সঙ্গ, যান সব নাগরিক অনুষ্ঠানে, আবর্তিত হন কলকাতার নানান মহলে, খুব সহজে নতুন বন্ধু ক'রে নিতে পারেন। আমাদের কবিতাভবন গোষ্ঠীর সঙ্গেও অচিরে তাঁর হৃদ্যতা জন্মালো— অথবা বলা যায় এই গোষ্ঠীতে গৃহীত হলেন সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত মজুমদার।"

—'আমাদের কবিতাভবন', বুদ্ধদেব বসু, শারদীয় 'দেশ' ১৩৮১, পৃ. ৩৩

উঠলে সবচেয়ে অল্প কথায় সবচেয়ে লাগসই মন্তব্যটি করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত — তিনি আধুনিকদের স্নেহ করেন কিন্তু সর্বতোভাবে সমর্থন করেন না। একদিন সকালে এলেন সুধীন্দ্র দত্ত— তখন কর্ম করছেন এ. আর. পি.-তে,[১] ব্যস্ত— এলেন দেরি ক'রে ('Sunday is the day one sleeps until late'); আমার একটা লম্বা লেখা শুনলেন ধৈর্য ধ'রে শেষ পর্যন্ত ('ভালো হয়নি—' পড়তে-পড়তেই মনে হচ্ছিলো আমার); অন্যদের অনেক আগেই উঠে পড়লেন কথাবার্তা বেশি না-ব'লে; 'পরিচয়ে'র সুধীন্দ্রনাথকে ঠিক যেন চেনা গেলো না। দুশো-দুইয়ে এক সন্ধ্যায় আমার কন্যা ছুটে এসে রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'বাবা বাবা, রবীন্দ্রনাথ এসেছেন।' আমরা কয়েকজন মিলে ধ'রে-ধ'রে ফুটপাত থেকে দোতলা পর্যন্ত উত্তীর্ণ ক'রে দিলাম প্রমথ চৌধুরীকে। একবার কী ভাগ্যে পেয়েছিলাম জীবনানন্দকে— কবিতাপাঠের আসর ছিলো সেদিন; তিনি এসেই বললেন, তাঁর দাঁত-ব্যথা, আমরা অনেকে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রেও তাঁকে দিয়ে একটি ছোটো কবিতাও পড়াতে পারলাম না— 'আমার দাঁত-ব্যথা, বড্ড দাঁত-ব্যথা', বলতে-বলতে গালে হাত চেপে তাঁর চিরাচরিত শশক-পদক্ষেপে উঠে চ'লে গেলেন। আর সেই তিনি, কয়েক বছর পরে, সেনেট-হাউসের জনসভায় মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়েছিলেন [২৯ জানুয়ারি ১৯৫৪], দূর দেশে এই খবরটি পেয়ে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম— এবং দুঃখিত, যে আমার ভাগ্যে তা শোনা হ'লো না।"

—'আমাদের কবিতাভবন', শারদীয় দেশ ১৩৮১, পৃ. ৩৪

অর্থাভাব

অর্থাভাব এখন এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে ছ'বছরের জন্মদিনে ছোটো মেয়েকে একটি উপহার কিনে দেবার সামর্থ্য নেই। কী করেছিলেন তার বদলে, তার বর্ণনা আছে সতেরো বছর পরে লেখা এই চিঠিটিতে, ৭।৪।৬৩-তে লেখা :

"... একদিন আমি টেবিলে ব'সে-ব'সে শুনছি বারান্দায় তিতিরের [প্রথম নাতনি —তার বয়স এই সময়ে চার বছর— আজকের লেখিকা কঙ্কাবতী দত্ত] গলা — 'ও রুমি, ও রুমি, আমায় চিনবে না কো তুমি, আমি তোমার পরি-মা!' ওর কচিগলায় এত ভালো শোনাচ্ছিলো লাইনগুলো! আমার মনে প'ড়ে গেলো, কবিতাটা যখন লিখেছিলুম তখনকার কথা। এত অর্থাভাব চলছিল তখন যে তোর জন্মদিনে একটা ভালো উপহার কিনবো এমন সাধ্যও ছিলো না। সেইজন্যে ৮ই জানুয়ারি রাত্তির জেগে-জেগে ঐ কবিতাটা লিখেছিলুম, তক্ষুনি কপি করে, একপাতা চকোলেটের সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলুম তোর বালিশের তলায়। তখনকার

১. "Sudhindranath had been with the A.R.P. since 1942; in '45, at the end of the war, he joined 'The Statesman' as an assistant editor."

Sudhindranath Datta, Amiya Dev, 1st ed. p. 69

তুই ঐ কবিতা আর চকোলেট পেয়ে যত অবাক আর খুশি হয়েছিলি তা ভাবলে মনে হয় আমার আর কোনো কবিতার ভাগ্যে ও-রকম অভ্যর্থনা জোটেনি। তারপর পর পর তোর আরো তিন জন্মদিনে ঐ কবিতার জের চললো।"[১]

—'বুদ্ধদেব বসুর চিঠি : কনিষ্ঠা কন্যাকে'। 'দেশ'

'কবিতা' পত্রিকার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা

'কবিতা'য় ছাপার জন্য ভালো কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না —এই সমস্যা অনেকদিন ধরে ভাবাচ্ছে বুদ্ধদেবকে। কেন পাওয়া যাচ্ছে না, যদি না-ই পাওয়া যায় তাহলে কী করা কর্তব্য, এ-সব বিষয় নিয়ে দীর্ঘ ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন আশ্বিন ১৩৫৩-এর 'কবিতা'য়। ভালো কবিতা কেন পাওয়া যাচ্ছে না তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলেন। আমরা দেখতে পাই তাঁর বিশ্লেষণ, অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এসেও কত অব্যর্থ ও প্রাসঙ্গিক। এ-লেখা গতকালই লেখা হতে পারত :

"'কবিতা'র দ্বাদশ বর্ষের প্রাবম্ভে এই প্রশ্ন মনে জাগলো যে প্রথম পাঁচ-ছ বছব আমরা যে-পবিমাণে ভালো কবিতা পরিবেশন কবতে পেবেছি, যে-অনুপাতে আশাপ্রদ ও অজ্ঞাত নবীনদেব পাদপ্রদীপের সামনে আনতে পেরেছি, এখনও কি তা-ই পারছি? স্বীকার করতেই হয়, না। গেলো কয়েক বছর ধ'রে যে-সব কবিতা আমরা প্রকাশ করেছি, তার অধিকাংশই কোনোরকমে প্রকাশযোগ্য মাত্র, তার বেশি কিছু না। ও-সব প্রকাশ না-ক'রে, দুটি-চারটি মাত্র কবিতা রেখে 'কবিতা'কে প্রধানত সমালোচনা-পত্রিকায় পরিণত করবার কথাও আমাদের মনে হয়েছে [আশ্বিন ১৩৫২ সংখ্যাব সম্পাদকীয় : দ্র. ১৯৪৫ সাল] কিন্তু ভেবে দেখেছি যে তাহ'লে 'কবিতা' নামের অর্থ আর থাকে না, আমাদেব মৌল লক্ষ্য থেকেও অনেকখানি চ্যুত হ'তে হয়। বাংলাদেশের মাসিকপত্রাদিতে কবিতার সম্মান নেই, এ-কথা বারো বছর আগে যতখানি সত্য ছিলো এখন আর ঠিক ততটা না-হ'লেও এখনও প্রয়োজন আছে এমন একটি পত্রিকার, কবিতা যেখানে পাদপূরণ নয়, এমনকি অলংকরণও নয়, কবিতাই যার প্রধান উপাদান ও আলোচ্য, কবিরা যেখানে একান্তরূপে সজাতিসঙ্গে নিশ্বাস ফেলে বাঁচবেন, বিরূপ, বিরুদ্ধ ও বিপরীত প্রতিবেশিতায় পীড়িত হবেন না। কাব্যকলা সম্বন্ধে আরো বেশি পাঠককে উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যরচনায় উন্মুখ নবীনদের উৎসাহিত করতেও আমরা চাই; সেইজন্য অবিশ্রাম নতুন লেখকদের স্থান না দিলে, 'কবিতা'র সার্থকতাই

১. মোট চারটি কবিতা লিখেছিলেন, কনিষ্ঠা কন্যার পরপর চারটি জন্মদিনে—"পরিমা-র পত্র রুমিকে", "রুমির পত্র পরিমা-কে", "পরিমা-র পত্র বাবাকে", "রুমির পত্র বাবাকে"। অসামান্য এই কবিতা চারটি এখন পাওয়া যাবে তাঁর 'বারোমাসের ছড়া' কাব্যগ্রন্থে, 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতাসংগ্রহে'র তৃতীয় খণ্ডে।

অনেকখানি নষ্ট হয়।”

ভালো কবিতা কেন লেখা হচ্ছে না এর পর তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করছেন বুদ্ধদেব :

“... আজকের দিনে আধুনিক মত হচ্ছে এই যে লেখা জিনিশটা হচ্ছে লাল কিম্বা কালো, ভালো কিম্বা মন্দ নয়, আর সেইজন্য ভালো লেখবার চেষ্টাই নবীনরা করছেন না। যদি উলটো মতটাই চলতি মত হ'তো, তাহ'লে এই সব লেখকরাই ভালো লিখতেন। যথার্থ অসাধাবণত্ব সব সময় সম্ভবই নয়, কিন্তু সব সময়ই সাহিত্যের স্রোত ব'য়ে চলে— আর সেই সব লেখা, যার সার্থকতা শুধু সাহিত্যের সচলতা রক্ষায়— তাও ভালো হয়, দীপ্তিশালী হয়, কখনো-কখনো স্থায়ীও হয় যে-অন্তর্লীন শক্তির প্রেরণায়, তাকেই বলে ঐতিহ্য, বলে আদর্শ। বর্তমানে সেই আদর্শ দেশত্যাগী ব'লেই বাংলা কবিতার অধঃপাত ঘটেছে— শুধু কবিতার কেন, সমস্ত সাহিত্যের।...

... আর কিছু না : কোনো-একটি ছেলে, কবিতার দিকে যার ঝোঁক আছে, সে ব'সে-ব'সে পাঁচ বছর ধ'রে প্রাণপণে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করুক, মানে, প্রাণপণে ববীন্দ্রনাথের মতো লিখতে চেষ্টা করুক, প্রত্যহ লিখুক, অবিশ্রাম লিখুক —এ-কথা বাজি রেখে বলা যায় যে পাঁচ বছর পরে সে এমন কিছু লিখবে যা খাঁটি কবিতা, এবং রচয়িতার স্বকীয়তা যাতে সুস্পষ্ট। কিন্তু এরকম কোনো প্রস্তাবে সম্মত হতে নবীনেরা ইচ্ছুক নন আজকাল। তাঁরা শ্রমবিমুখ, তাঁরা নিকৃষ্ট অর্থে শৌখিন। মিলিয়ে-মিলিয়ে পদ্য লেখার শিক্ষাও তাঁরা নেবেন না, কেননা ছন্দ মিল ইত্যাদি জিনিশগুলি তাঁদের ধারণায় অতিশয় সেকেলে। ছন্দোবদ্ধ পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের অভ্যাস করেন না এঁরা, ছন্দোবোধকে জাগ্রত করেন না— যতই ভাঙাচোরা হোক, যতই এলিয়ে পড়ুক, আর তো ভয় নেই, গদ্যকবিতা কিম্বা ফ্রী ভর্স বললেই হ'লো। ‘কবিতা’য় প্রকাশের জন্য অযাচিত যত লেখা আমরা পাই, তার মধ্যে এমন খুব কমই থাকে যা একটা নির্দিষ্ট ছন্দে লেখা, ঠিক গদ্যকবিতাও যে বেরিয়ে আসে তা নয়, অধিকাংশই গদ্যপদ্যের মাঝামাঝি একটা ছন্দোহীন ছন্নছাড়া অবস্থায় বিরাজমান, মিলের পাট তো প্রায় উঠেই গেছে।... নবীনদের মধ্যে একজনকে দেখি না যিনি একটা আঁটোসাঁটো স্তবকবিন্যাস অবলম্বন ক'রে, মিলের জটিল গ্রন্থি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ রেখে পঁচিশ কি তিরিশ লাইনের একটি কবিতা লিখে উঠতে পারেন [১]— পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মতো ক'রেও একাজ তাঁরা পারেন ব'লে মনে হয় না। এ-সব বিদ্যায় যাঁরা সিদ্ধ, এগুলিকে অগ্রাহ্য করার অধিকার তাদেরই শুধু আছে।... আজকাল যাঁরা নতুন লিখছেন, সে-শিক্ষাকে তাঁরা সময়ের অপব্যয় ব'লে মনে করেন। কোনোরকমে ভাঙাচোরা কয়েকটি লাইন পর-পর সাজিয়ে— না,

১. মনে রাখতে হবে এটা ১৯৪৬ সাল, বাংলা কবিতার অসম্ভব উষর সময় সেটা—তখনো ছন্দমিলের চমক-লাগানো নতুনত্ব নিয়ে এসে পৌছননি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণেরা।

কথাটা ভুল হ'লো— পর-পর বসিয়ে ছাপাবার জন্য অধীর হ'য়ে পড়েন তাঁরা, এবং যা-হোক একটি বই যদি বের করতে পারেন, অমানুষিক শ্রম করেন তার প্রশংসাপত্র সংগ্রহের জন্য।... আবার বলি : এ-রকম যে হচ্ছে তার কারণই আদর্শের অভাব। মানে, যুবজনের মনে এই ধারণাই কাজ করছে যে লেখার সৌকর্যটা কিছু না, বানান-ব্যাকরণ কুসংস্কার মাত্র, লেখার বিষয়টা যুগোপযোগী হ'লেই হ'লো।... হট্টগোলে গলা মেলালেই কোনো-না-কোনো মহল থেকে একটু-না-একটু বাহবা যখন নিশ্চিতই, তখন আর কষ্ট করে কে।...

দেশে আজ সাহিত্যিক দল ব'লে কিছু নেই, লেখার আবহাওয়া তাই চ'লে গেছে। তার বদলে আছে পোলিটিকাল পার্টি : দল কথাটা শুনলে শিউরে উঠতেন, এমন লোকও আত্মনিয়োগ করেছেন পার্টির পরিচর্যায়। সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক দল থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী— কিন্তু সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক দল, রাজনীতি চর্চার জন্য সাহিত্যিক সমিতি, কিংবা সাহিত্যের আলোচনার জন্য রাজনৈতিক বৈঠক— এই সব নিদারুণ অপভ্রংশের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়। সাহিত্যিক দলের সঙ্গে এসব দলের মস্ত তফাৎ এইখানে যে সাহিত্যগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় স্বভাবতই, যথাসময়ে তার জন্ম, মৃত্যুও যথাসময়ে, আর এরা কৃত্রিম, মানে বানানো, মানে রীতিমতো সংঘবদ্ধ— সেই অর্থে সংঘবদ্ধ যেটা যুদ্ধে বা বাণিজ্যে অপরিহার্য, কিন্তু সাহিত্যে কালান্তক। বিশেষ কোনো-একটা মত প্রচারের জন্য এই সব দল চেষ্টা দ্বারা গঠিত হয়েছে, বিশেষ-এক রকমের জ্ঞান বিতরণের, বিশেষ-এক ধরনের সংবাদ বিকীরণের জন্য। সাহিত্যের মূল্য যে মতে নয়, তথ্যে নয়, তত্ত্বে নয়, সাহিত্য আর সাংবাদিকতা যে স্বতন্ত্র, এই কথাটা দেশের লোককে ভুলিয়ে দেবার জন্য প্রতিদিন মুদ্রাযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে অক্ষৌহিণী বাক্-বাহিনী। এই বিকৃতি, এই আদর্শহীনতার ফলেই নবীনদের মধ্যে যেটুকু সাহিত্যশক্তি আজ আছে, তা কিছুতেই বিকশিত হ'তে পারছে না।"

এই আলোচনারই সূত্র ধ'রে, এই সম্পাদকীয়র শেষাংশে, প্রায় হাহাকারের মতো বেরিয়ে এল জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ। কুড়ি বছর ধ'রে যে জীবনানন্দের জন্য তিনি লড়াই করে এসেছেন, যাঁর অধিকাংশ কবিতা তিনিই প্রকাশ করেছেন তাঁর পত্রিকাগুলিতে; গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ছাপাবার জন্য ঘুরে বেরিয়েছেন প্রকাশকদের দুয়ারে-দুয়ারে, প্রবন্ধ লিখে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অখ্যাত কবিকে, তাঁর বিষয়ে বিদ্রূপের জবাব দিয়েছেন— সেই জীবনানন্দের পতনকে এই সাম্প্রতিকতার ধারার সঙ্গেই যুক্ত করলেন বুদ্ধদেব :

"আর শুধু নবীনদের কথাই বা বলি কেন। যাঁরা প্রবীণ, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে অগ্রগণ্য তাঁরাই অনেকে সংক্রমিত, উদ্‌ভ্রান্ত, ধর্মচ্যুত। জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল? এ-প্রশ্ন সাধারণভাবে সাধারণ পাঠক করতে পারেন, আমরা তাঁর অদ্বিতীয় ভক্ত ব'লে বিশেষভাবে করতে পারি। অন্যদের বাদ দিয়ে বেছে-বেছে তাঁর নামই করলুম এই কারণে যে উদাহরণ হিশেবে তিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন।

জীবনানন্দ দাশ আমাদের নির্জনতম স্বভাবের কবি। এই নির্জনতার বিশিষ্টতাই তাঁর প্রাক্তন রচনাকে দীপ্যমান করেছিলো। মনে-মনে এখনো তিনি নির্জনের নির্ঝর, তাঁর চিত্ততন্ত্রী এখনো স্বপ্নের অনুকম্পায়ী। কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওঅরের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেইজন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত ক'রে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েননি। করুণ দৃশ্য, এবং শোচনীয়। এর ফলে তাঁর প্রতিশ্রুত ভক্তের চক্ষেও তাঁর কবিতার সম্মুখীন হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ ব'লে আপত্তি, নয়; নিঃসুর ব'লে আপত্তি, নিঃসাড় ব'লে। হয়তো ওরই মধ্যে তাঁর পরিণতির সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন, কিন্তু প্রচ্ছন্নই। তা যে পরিস্ফুট হ'তে পারছে না তার কারণই এই যে হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। মনের অচেতনে তাঁর এই কথাই কাজ করছে যে আমি যদি এখনো মাকড়সার জাল, ঘাস আর শিশিরের কথা লিখি, তবে আর কি তার পাঠক জুটবে? তবু কবিতায় মাঝে-মাঝে রোম-বার্লিন দেখলে লোকে এ-কথা অন্তত ভাববে যে লোকটা নিতান্তই ম'রে যায়নি। হয়তো তাঁর মন এখনো প'ড়ে আছে ঘাসে, শিশিরে, জলে, ছায়ায়, আকাশে— প্রকৃতির কবি তিনি, তাছাড়া কিছুই নন— হয়তো কেন, নিশ্চয়ই; কিন্তু সেই তাঁর স্বদেশ থেকে, তাঁর রাজত্ব থেকে মনকে সরিয়ে এনে তিনি নিজেকে বন্দী করেছেন চলতি আন্দোলনের আন্দামানে— এই নিষ্ঠুর অত্যাচারও যে কোনো-একজন কবি নিজের উপরে করতে পারলেন, তার জন্য কবিকে দোষ দেবো, না সেই আন্দোলনকে, না আন্দোলনের জনক বর্তমান সময়কে, সে-বিষয়ে মন স্থির করা শক্ত।"

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'তিথিডোর' উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন। তিন বছর লাগবে শেষ করতে। গল্প লিখলেন 'একটি কি দুটি পাখি', ছোটোগল্প-গ্রন্থমালার ২৯-সংখ্যক বই হয়ে বেরোল। কবিতা লিখছেন 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র।

রাইনার মারিয়া রিলকে-র কবিতা অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। ৬৫টি কবিতার অনুবাদ করবেন বাইশ বছর ধরে।

জুলাই মাসে বেরোল 'বিশাখা' উপন্যাস। সমালোচনাগ্রন্থ 'কালের পুতুল' বেরোল ২ অক্টোবর।

১৯৪৭ ।। বয়স ঊনচল্লিশ

কবিতাভবনে বুদ্ধদেব বসুর কাজের পরিবেশ

প্রতিভা বসুর পরিবার দেশভাগের বলি হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে তাঁরা ধনী না হলেও সচ্ছল গৃহস্থ ছিলেন। রেফিউজি হয়ে আসার পর চরম দুর্দশার মধ্যে পড়লেন তাঁরা— আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন পড়েছিলেন। বাঁশের বেড়ার ভাঙাচোরা ঘরে গাদাগাদি করে থাকা, কোনোদিন অর্ধাহার কোনোদিন অনাহার। এই সময়কার এই পরিবারটির দুর্দশার বর্ণনা পাই প্রতিভা বসুর 'জীবনের জলছবি'তে। বুদ্ধদেব-প্রতিভা বসু সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাঁদেরও আর্থিক সাধ্য নিতান্ত সীমিত। তা ছাড়া প্রতিভা বসুর পিতার বিষয়বুদ্ধিহীনতার জন্যও তাঁদের ভুগতে হয়েছে কম নয়। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল (যেমন আরো অনেকেরই ছিল) যে এসব দেশভাগ দাঙ্গা ইত্যাদি সাময়িক ব্যাপার, শিগগিরই এসব দুর্দৈব কেটে যাবে, তাঁরা আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে শান্তির বসবাস করতে পারবেন। এই বিশ্বাসে তিনি সরকার-প্রদত্ত স্বল্পমূল্যের জমি কেনেননি (ফিরেই যখন যাবেন তখন খামোকা কলকাতায় জমি কিনে টাকা খরচ করে কী হবে— হোক না মাত্র ষোলো টাকায় পাঁচ কাঠা), সরকারি সাহায্য নেননি (ফিরেই যখন যাবেন তখন কদিনের জন্য সাহায্য নিয়ে হাত গন্ধ করবেন কেন?)।

ফলে অচিরেই তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিভা বসুর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। এর মধ্যে এত দুঃখকষ্টে তাঁর মায়ের নার্ভাস ব্রেকডাউনের মতো হল —তাঁকে নিয়ে এলেন দুশো-দুইতে।

প্রতিভা বসু লিখছেন :

> "আমার মায়ের অসুখ শেষ পর্যন্ত একটা মানসিক অসুখে পরিণত হল।... মানসিক বিকারটা এইভাবে শুরু হল, তিনি ঘুমোতে পারেন না, ঘুমুলেই দেখতে পান দাদার মৃতদেহ কারা যেন কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই চটকা ভেঙে উঠে কাঁদতে থাকেন।... শেষ পর্যন্ত মায়ের এই অবস্থাটা আর সারল না। একটা ছেড়ে আর একটা, একটা ছেড়ে আর একটা চলতেই লাগল। এমনিতে হয়তো বেশ ভালো আছেন, সুন্দর কথাবার্তা বলছেন, তারপরেই হঠাৎ কোনো একটা ভয়ংকর ভয়ে আঁতকে চিৎকার করে উঠছেন।...

আমি মাকে আমার কাছে নিয়ে এলাম।...

বুদ্ধদেব তখন বেশ রাত জেগে কোনো একটা জরুরি লেখা লিখছিলেন। বাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ঘরের সংখ্যা মাত্র দুটো ; একটাতে দিদিমা থাকেন এবং পার্টিশন দিয়ে খাবার ঘর তৈরি হয়েছে। আর অন্য ঘরে আমরা ঘুমোই। ঘরের ওপাশে আলাদা খাটে বুদ্ধদেবের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে, আর এ পাশে জোড়া খাটে আমি মা আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুয়েছি। বুদ্ধদেব আর আমাদের দুই বিছানাব মাঝখানে বুদ্ধদেবের লেখার টেবিল পাতা। মাত্রই চোখে একটু ঘুম জড়িয়ে এসেছিল, সহসা মা 'কে? কে?' করে চিৎকার করে উঠে বসলেন। আমিও উঠে বসলাম। লিখতে লিখতে বুদ্ধদেবও ফিরে তাকালেন। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে টেবিলে, ঘর অন্ধকার নয়, চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে কারোকেও দেখা গেল না, অথচ মা তখনও থরথর করে কাঁপছেন। একটু বাদেই সংবিৎ ফিরে এল। খুব লজ্জিত হয়ে বললেন, 'বুদ্ধদেব, আমার এখন বিন্দুতে সিন্ধু। ওই যে তুমি একটা পৃষ্ঠা শেষ করে আর একটা পৃষ্ঠা উল্টোলে আমি সেই শব্দ শুনেই ভয়ে আঁতকে উঠেছি। আমার কাছে সেই শব্দটাই প্রচণ্ড গর্জনের মতো মনে হল। তুমি আমাকে কোনো মনস্তত্ত্ববিদকে দেখাও, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

মায়েব মুখে একথা শুনে আমি কান্না সামলাতে পারলাম না। বুদ্ধদেব লেখা রেখে ঘরময় পায়চাবি করতে লাগলেন।..."

—*জীবনের জলছবি*, পৃ. ১৭১

এই সময় 'কবিতা'য় পরপর প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি : পৌষ ১৩৫৩-য় বেরোল 'মাইকেল', চৈত্র ১৩৫৩-এ 'রামায়ণ'। এই প্রবন্ধগুলি পরে তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। আশ্বিন ১৩৫২-র সম্পাদকীয় ঘোষণা অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছেন পত্রিকার চরিত্র বদল করবার— ভালো কবিতার অভাব পূরণ করবার যেন চেষ্টা করছেন ভালো প্রবন্ধ দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি একেবারেই একা—আর কেউ নেই যার কাছ থেকে তুলনীয় মানের প্রবন্ধ আশা করা যায়। ফলে তাঁকে একাই লিখে যেতে হচ্ছে, এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বসে, একের পর এক অসাধারণ সব প্রবন্ধ। আর এখানেই আমরা অনুভব করতে পারি 'কবিতা' পত্রিকা ও বুদ্ধদেব বসুর অন্যোন্য নির্ভরশীলতা : বুদ্ধদেব যেমন 'কবিতা'কে গড়ে তুলেছেন, 'কবিতা'ও তেমনি বুদ্ধদেবকে গড়ে তুলেছে— 'কবিতা'র জন্য প্রয়োজন না হলে, এসব প্রবন্ধ হয়তো লেখাই হত না কোনোদিন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

যক্ষারোগে সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু হল ৫ মে— মাত্র ২১ বছর বয়সে। সুকান্তর দুটি কবিতা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল— আশ্বিন ১৩৫০

সংখ্যায় 'অবৈধ', এবং আষাঢ় ১৩৫৩ সংখ্যায় 'ব্যর্থতা'। পরের সংখ্যা 'কবিতা'য় (আষাঢ় ১৩৫৪) সুকান্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখলেন :

"পাঁচ বছরে বোধহয় পাঁচ বারও সুকান্তকে চোখে দেখিনি আমি। বছরে দু-একবার চিঠি লিখতো সে— কিংবা 'কবিতা'র জন্য কবিতা পাঠাতো— ব্যক্তিগতভাবে এটুকুই ছিলো তার সঙ্গে আমার সংযোগ। কিন্তু ব্যক্তিগতর বাইবে অন্য যে-জগৎ আছে আমাদের, যেখানে সে তো সহযাত্রী, নিত্য সঙ্গী আমাদের। সুকান্তকে আমি ভালোবেসেছিলুম, যেমন ক'রে প্রৌঢ় কবি তরুণ কবিকে ভালোবাসে; দূর থেকে লক্ষ করেছি তাকে, সে একটি ভালো লাইন লিখলে উৎসাহ পেয়েছি নিজের কাজে। আর ভালো লাইন সে মাঝে-মাঝেই লিখেছে; ছন্দে ভুল নেই, হাতের লেখা সুন্দর, যা বলতে চায় স্পষ্ট ক'রেই বলে। এটুকু ছেলের পক্ষে এর প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য। মনে-মনে আমি তাকে মার্কা দিয়ে রেখেছিলুম জাত-কবিদের কেলাশে; উঁচু পর্দায় আশা বেঁধেছিলুম তাকে নিয়ে। কিন্তু আশা তো বিশ্বাসঘাতিকা? সুকান্তর অল্প কয়েকটি প্রাথমিক রচনা প'ড়েই বুঝেছিলুম যে সুভাষের সঙ্গে তার মিল নামের আদ্যক্ষরে শুধু নয়; কী প্রসঙ্গে, কী আঙ্গিকে, কী অঙ্গীকারে, 'পদাতিকে'র একান্ত অনুগামী সে। কিন্তু সুভাষ তো কাব্যের ক্ষেত্রে আর কিছু করলো না : এরও যদি তা-ই হয়?...

যক্ষ্মার খবরের অল্পদিন আগে সুকান্তর একটা পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম। নিজের দুটি লাইন তুলে দিয়ে জিগেস করেছে : ছন্দ ঠিক আছে কি? বন্ধুরা সংশয় প্রকাশ করেছে। আমি তাকে জানিয়েছিলুম যে ছন্দে তার দোষ হয়নি, আর সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলুম আদর্শবিশ্বাসীর গর্বপ্রসূত এই কথা : "রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছো তুমি; তোমার জন্য দুঃখ হয়।" সমগ্রভাবে সুকান্তর কবিতা সম্বন্ধে এটুকুই আমার বক্তব্য। তার কবিতা প'ড়ে মোটের উপর একথাই মনে হয় যে তার কিশোরহৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে-পদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে একটি কঠিন, সংকীর্ণ, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ। কবিতাগুলি যেন সেই মতবাদের চিত্রণ মাত্র; জোর গলায় চেঁচিয়ে বলা, কবিতা না-হ'য়ে খবরকাগজের প্যারাগ্রাফ হলেই যেন মানাতো। 'পদাতিক' লেখবার সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে-স্বাধীনতা ছিলো, যার জন্য একই মতবাদ সম্বন্ধে মুগ্ধতা সত্ত্বেও ঐ ক্ষীণ বইখানার কাব্যের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব হয়েছে; সুকান্ত ভট্টাচার্যে সে-স্বাধীনতার কিছুই তো বর্তালো না। কেন বর্তালো না, এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে? যুদ্ধকালীন উদ্‌ভ্রান্তির সুযোগ দেশের সব কটি পোলিটিক্যাল পার্টি সাহিত্যের ক্ষেতের এক-একটি ফ্রন্ট খুললেন, আর আমাদের নবীন লেখকেরা যৌবনের ত্যাগপ্রবণতায় অধীর হ'য়ে উঠলেন নিজেদের বিকিয়ে দিতে। 'পদাতিকে' যা ছিলো মুগ্ধতার আবেগ, সুকান্তর ক্ষেত্রে তা হ'য়ে উঠেছিলো সুচিন্তিত দাসত্ব।...

বস্তুত ধনিকের দ্বারা শ্রমিকের রক্তশোষণ সুকান্তর রীতিমতো একটা ম্যানিয়া

হয়ে উঠেছিলো, চিত্তের একটা অসুস্থতা; সর্বত্রই সে যেন বিভীষিকা দেখছে, আর তা থেকে পালাতে গিয়ে বারবার ডুব দিচ্ছে ভাবালুতার পাতালে। সূর্যকে সে বলছে— 'হে সূর্য, তুমি তো জানো আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব।' সে দেখছে, অসহায় সিঁড়িকে পা দিয়ে পিষে মারছে 'গর্বোদ্ধত অত্যাচারী', 'মৌন-মূক কলম'কে দিয়ে কলঙ্কময় দাসত্ব করিয়ে নিচ্ছে হৃদয়হীন লেখক; সে উত্তেজিত করছে সিগারেটকে 'হঠাৎ জ্বলে উঠে বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে' মারতে, 'যেমন ক'রে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছো এতকাল', সে কাঁদছে ডাকঘরের রানারের দুঃখে— 'পিঠেতে, টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া'। (ছুঁতে পারলে কি ভালো হ'তো?)

বালকের ভাবালুতা ব'লে এ সমস্ত উড়িয়ে দিতে পারতুম যদি না সুকান্তর সহজাত কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা থাকতো আমার। এর চেয়ে ভালো কবিতা তার আমি দেখেছিলাম, আর আভাস পেয়েছিলাম নেপথ্যবর্তী আরো বড়ো সম্ভাবনার। কিন্তু সম্প্রতি এ-ধরনের লেখাই বেশি বেরোচ্ছিলো তার কলম থেকে, তার কারণ হয়তো এই যে রাজনৈতিকের বিচারে এগুলোই ভালো কবিতা।. কোনো মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, শক্তিশালী কবিরও কী-রকম অপমৃত্যু ঘটে, তারই উদাহরণ সুকান্ত, কবির কায়িক মৃত্যু যত দুঃখের, তার মানসিক পক্ষাঘাত কি তার চেয়ে কম? স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ করেছিলো সুকান্ত, শেষ পর্যন্ত নিজের লুপ্তি দ্বারা রচনা ক'রে গেলো সমসাময়িক আর পরবর্তী নবীন লেখকদের জন্য সাবধানবাণী।. .

. যে-চিলকে সে ব্যঙ্গ করেছিলো, সে জানতো না সে নিজেই সেই চিল; লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্খলিত হ'য়ে পড়লো ফুটপাতের ভিড়ে, আর উড়তে পারলো না, উঠতেই পারলো না। কবি হবার জন্যই জন্মেছিলো সুকান্ত, কবি হ'তে পারার আগেই মরলো সে। দ্বিগুণ দুঃখ হয় তার জন্য।"

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'তিথিডোর' লিখছেন। কবিতা লিখছেন 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থের। নিজের ছোটোবেলা অবলম্বনে উপন্যাস লিখছেন 'অন্য কোনখানে'।

এ-বছর তাঁর কোনো বই বেরোল না।

১৯৪৮ ।। বয়স চল্লিশ

নিজের রচনা বিষয়ে অতৃপ্তি

বুদ্ধদেব বসুর কলমের গতি কমে আসছে ধীরে-ধীরে। এক সময়ে যাঁর বছরে উপন্যাসই ছ-টি বেরিয়েছে, এখন তাঁর বছরে একটিও বই বেরোয় না এমনও হয়। অথচ লেখাই তাঁর জীবিকা— লেখাকে জীবিকা করবেন বলেই চলে এসেছিলেন ঢাকা থেকে, লেখার উপর নির্ভর করে ছেড়ে দিয়েছিলেন অধ্যাপনার কাজ। নিরন্তর লেখেনও— সারা দিন, গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে কাগজের উপরই ঝুঁকে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু, লিখে অর্থোপার্জন করার চাইতে লেখাকে নিখুঁত করে তোলা তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি, ঐকাহিক সাফল্যের চেয়ে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষণীয় শাশ্বতীর পরশ। কীসে তাঁর সময় যায় তা নিয়ে লিখেছেন 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' গ্রন্থে :

> "'দ্রৌপদীর শাড়ি' প্রকাশের সময় আমাকে এক নতুন ভূত তাড়না করছিলো —আজ পর্যন্ত তার দখলদারি আমি ছাড়াতে পারিনি। নিজের লেখার পরিবর্তন ও পুনর্লিখন— তাই নিয়ে আমি অনেকটা সময় কাটিয়ে দিচ্ছি— নতুন কবিতা লেখার চাইতে সেটা আমার কম জরুরি ব'লে মনে হচ্ছে না। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' নামে যে-কবিতা 'বৈশাখী'তে প্রথম বেরিয়েছিলো তার সঙ্গে বইয়ের লেখাটার ছন্দের মিল থাকলেও ভাষার মিল প্রায় কিছুই ছিলো না— মূল বক্তব্য এক হ'লেও লাইনগুলো প্রায় প্রত্যেকটাই ছিলো নতুন। 'মায়াবী টেবিল' নামে পনেরো লাইনের কবিতাটাও অনেকবার কাটাকুটির পর দাঁড় করিয়েছিলাম। আমার মাথায় তখন খেলছে অর্ধ-মিল ও মধ্য-মিল; আমি ভাবছি ছড়ার ছন্দে তিন মাত্রার পর্ব কতদূর পর্যন্ত সংগত হ'তে পারে, প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে যতিপাতের আরো বৈচিত্র্য সম্ভব কিনা, কবিতার মধ্যে দীর্ঘ ও জটিল বাক্য কেমন ক'রে চালিয়ে দেয়া যায়। এর ফলাফল শুধু 'দ্রৌপদীর শাড়ি' দিয়ে বিচার করা চলবে না, তা ছড়িয়ে আছে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' থেকে আমার সর্বশেষ কবিতার বই 'স্বাগতবিদায়' পর্যন্ত। আসল কথাটা এই যে আমার সেই সময়কার চেষ্টা আর চিন্তা থেকে আমি অনেক শিখেছিলাম— শুধু কলাকৌশল বিষয়ে নয়, কবিতার অন্তরাত্মা বিষয়েও। ততদিনে আমার এটুকু অন্তত যোগ্যতা হয়েছে যে আমি ভাবতে শিখেছি, শিখে নিচ্ছি কেমন করে শিখে নিতে হয়।"
>
> *কবিতার শত্রু ও মিত্র* : 'কবিতা ও আমার জীবন'

অর্থাভাবে 'কবিতা' বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা

'কবিতা' পত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হল। এ বছরের শেষ সংখ্যার (আষাঢ় ১৩৫৫) সম্পাদকীয়ে প্রথম দেখতে পাচ্ছি আর্থিক দুশ্চিন্তার প্রকাশ— শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই যে 'কবিতা' বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন ইঙ্গিত। অনেক রকম সমস্যা, পাঁচবছর জোড়া বিশ্বযুদ্ধ, দেশ জুড়ে রাজনৈতিক টালমাটাল, সব পার হ'য়ে এসে এতদিনে 'কবিতা' পত্রিকা সত্যিকারের সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। এই সম্পাদকীয়ে বুদ্ধদেব লিখলেন :

"কবিতার তেরো বছর পুরলো। বাংলাদেশের পক্ষে, অমিশ্র সাহিত্যপত্রের পক্ষে, দীর্ঘায়ু বইকি। বেশি কিছু আশা নিয়ে আরম্ভ করিনি। 'আচ্ছা দেখি না'র বেশি স্পষ্টতা ছিলো না উদ্যোগে। কিন্তু 'কবিতা' বাড়লো, বন্ধু পেলো, লেখক, পাঠক, কিছু ক্রেতা, এমনকি কিছু বিজ্ঞাপনও। তৃতীয় আর চতুর্থ বছরে 'কবিতা' সচ্ছলতার মুখে দেখলো। আর যদিও সেই ক্ষণবসন্তের মুহূর্তেই পৃথিবী ভ'রে যুদ্ধের শীত নামলো, তবু এই প্রকাণ্ড লড়াইটাও 'কবিতা' কাটিয়ে দিলো কোনো রকমে। যুদ্ধ থামলো,... দেশ স্বাধীন হ'লো [দেশ স্বাধীন হবার এই একটিমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায় 'কবিতা'য়] আর তারপর, আস্তে-আস্তে অন্য-এক শীত নামলো আমাদের মনে, এই উপলব্ধির শীত যে দু-দুটো সুবৃহৎ শুভঘটনা সত্ত্বেও সময়টা খারাপ, যুদ্ধের চেয়েও খারাপ।...

দেশের দুঃসময়ে প্রথমে মরে তারা, যারা মনের খিদে মেটায়। 'কবিতা'র সংসারে অকুলোন ঘটতে-ঘটতে এখন অসম্ভবের কাছাকাছি এসেছে।... আরো একটু কথা এই যে সাংসারিক বিচারে গ্রন্থাদি যেহেতু 'বিলাস-পণ্য' তাই 'কবিতা'র গ্রাহক আর না-থেকে বছরে চার টাকা বাঁচাবার প্রলোভন বর্তমান অবস্থায় কারো-কারো পক্ষে স্বভাবতই অসংবরণীয়। হয়তো এটা উল্লেখযোগ্য যে গত তিন বছরে যে-সব গ্রাহক ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই 'বড়ো চাকুরে', আর নতুন যাঁরা হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই— ঠিকানা থেকে যতটা বোঝা যায়— কেরানি কিংবা ছাত্র, কিংবা কোনো গ্রন্থাগার, কিংবা অবাংলার অধিবাসী।

১৯৩৮-এর তুলনায় 'কবিতা'র দাম বেড়েছে আড়াইগুণের কিছু বেশি,[১] বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণের কিছু কম, আর খরচ বেড়েছে অন্তত চারগুণ। আয়-ব্যয়ের এরকম বৈষম্যে সকলেরই যা হয়, 'কবিতা'রও এখন তা-ই হয়েছে; এই সংকট আর বেশিদিন সহ্য করতে নিশ্চয়ই সে পারবে না। আর খুব বেশিদিন তার প্রয়োজনও বোধহয় নেই, এক হিশেবে কোনোকালেই ছিলো না, কেননা দেশের লোক-যে 'কবিতা'কে চায় না, তার প্রমাণ তো এই কথাগুলিতেই— যদি

১. 'কবিতা' পত্রিকার শেষবার দাম বেড়েছিল ১৯৪৬ সালে— আষাঢ় ১৯৫৩ সংখ্যার দাম ছিল বারো আনা, আশ্বিন ১৩৫৩ সংখ্যায় বেড়ে হল এক টাকা। তারপর শেষ সংখ্যা চৈত্র ১৩৬৭ পর্যন্ত (বিশেষ সংখ্যা বাদে) পনেরো বছরে আর দাম বাড়াননি বুদ্ধদেব, শেষ পর্যন্তই দাম ছিল এক টাকা।

চাইতো, এ-সব বলবার দরকারই হতো না— আর দেশ যা চায় না, তার-তো না-থাকাই উচিত? বৃহত্তর অর্থে যেটা দেশ, সেটা, বর্তমান সময়ে, পৃথিবীর কোনো অঞ্চলেই শুদ্ধ সাহিত্য আকাঙ্ক্ষা করে না, এই বড়ো কথাটা এখন ছেড়েই দিলাম; দৃষ্টি সংকীর্ণ ক'রে এনে এটুকু দেখতে পাই যে দেশের মধ্যে— হ্যাঁ দেশের মধ্যেই —কেউ-কেউ আছেন, 'কবিতা'র মতো কোনো পত্রিকা যাঁদের প্রয়োজনেরই অন্তর্গত। আপাতত তাঁদের সংখ্যা যত কম, আসলে তার বেশি ব'লে আমাদের বিশ্বাস;— সকলকে পৌঁছতে পারিনি আমরা, পারবোও না;— কিন্তু যাঁদেব পেয়েছি, তাঁদেব কাছে আজ এই অনুরোধ উপস্থিত করি, তাঁরা যেন অন্যদের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপনের মধ্যবর্তিতা করেন।... দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'কবিতা'র এখন যাঁবা গ্রাহক, তাঁদের সাহায্যেই আবো গ্রাহক পাওয়া সবচেয়ে বেশি সম্ভব, আর এই সাহায্য, চতুর্দশ বর্ষের আরম্ভ থেকে, তাঁরা যদি 'কবিতা'কে করেন, তাহ'লে আরো কিঞ্চিৎকাল তার অস্তিত্ব সম্ভব হতে পারে।"

শুধু প্রকাশযোগ্য রচনার গুণাগুণের ব্যাপারেই নয়, ছাপা-বাঁধাই-কাগজের ব্যাপারেও কখনো আপোষ করেননি বুদ্ধদেব; 'কবিতা' সব সময় ছাপা হয়েছে উৎকৃষ্ট কাগজে : পুরু, খশখশে, বিলিতি; দেখলেই-বোঝা-যায়-দামি এমন কাগজ ছাড়া 'কবিতা' ছাপতে বুদ্ধদেবের মন ওঠেনি কখনো, যত অনটনই হোক। প্রথম দিকে, অন্তত প্রথম পাঁচ-ছ বছর, কবিতার অংশ ছাপা হয়েছে পৃষ্ঠায় মাত্র ১৫-১৬-১৭ লাইন, উপরে-নিচে প্রভূত পরিমাণ শাদা জায়গা ছেড়ে : গদ্য ছাপা হয়েছে পৃষ্ঠায় ২৮-৩০ লাইন। 'কবিতা' শুধু পড়তেই ভালো নয়, দেখতেও ভালো হতে হবে, এই ছিল বুদ্ধদেবের সংকল্প। 'কবিতা' পত্রিকার মুদ্রণপারিপাট্য তো গল্পকথা হয়ে আছে। এমনকি, বিজ্ঞাপন— তাও যে তিনি কত যত্ন করে ছাপতেন তা পুরোনো 'কবিতা'র পাতা ওলটালে বোঝা যায়। আরো বোঝা যায়, যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, বিজ্ঞাপনের এমনকি কথাবস্তুও নিজে রচনা করে দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু ১৩৫৫ পৌষ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন পাওয়া গিয়েছিল মাত্র দেড় পৃষ্ঠার। সাধারণত পাওয়া যেত সাড়ে চার থেকে পাঁচ পৃষ্ঠা। এই দেড় পৃষ্ঠার আধপৃষ্ঠা দিয়েছিলেন রাজশেখর বসু, বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে। আর একপৃষ্ঠা ছিল বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপন। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর উষসী পাউডার (পাউডার নয় : 'অভিজাত প্রসাধন-রেণু'। পাউডারের বদলে 'প্রসাধন-রেণু'র ব্যবহার— রাজশেখর বসু ও বুদ্ধদেব বসুর যোগাযোগ ব্যতীত সম্ভব হত কিনা ভাববার বিষয়) বহুকাল ধরে 'কবিতা' পত্রিকাকে বিজ্ঞাপনের মদত দিয়ে এসেছে। এ ছাড়া যা বিজ্ঞাপন বেরোত, তার প্রায় সবই কবিতাভবনের বিভিন্ন প্রকাশনার বিজ্ঞাপন।

এলিয়টের প্রবন্ধ পড়ার প্রতিক্রিয়া

এ-বছব সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন টি. এস. এলিযট— তাঁর প্রবন্ধেব বই বেবোল, 'নোটস টুযর্ডস আ ডেফিনিশন অব কালচাব'। এই বই পড়ে বুদ্ধদেবেব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হযেছে একটি চিঠিতে, নবেশ গুহকে লেখা :

২২.১২.৪৮
কলকাতা

"এলিযটেব ধর্মবিষযক প্রবন্ধ প'ডে আমাব মন তর্কে ছটফট কবছে · কাল তোমাকে বলছিলাম। তাব মূল কথা না-মেনে পাবি না, কিন্তু সব কথা মানতে চাই না— এই বকম অবস্থাব মধ্যে আছি। ববীন্দ্রনাথেব 'ভাবতবর্ষীয সমাজে'ব কথা বাব-বাব মনে পডছিলো। সেটাও আবাব পডা উচিত, কিন্তু আমাব পডবাব সময এত কম, আব এ-সব পডাতে মনেব উপব এত চাপ পডে যে তখনকাব মতো নিজেব কাজে গোলমাল হযে যায। তবে এইটে ভেবে দেখছিলাম যে আমাদেব Liberal humanist মনে সে-যুগেব ববীন্দ্রনাথেব বা এ-যুগেব এলিযটেব সমাজকল্পনা প্রথমে একটা উল্টো ধাক্কা দেয, বলতে ইচ্ছে কবে 'reactionary'— কিন্তু তাব কোনো মানে হয না। আমি স্থিতি চাই, শৃঙ্খলা চাই, জীবনেব ধ্রুব আদর্শ চাই— আব এই চাওযাটাই মার্ক্সীয মতে 'reactionary' — এবং এই ধ্রুব আদর্শকে সম্পূর্ণ ন্যাযসংগতভাবে প্রযোগ কবতে গেলে যে-ছবি ফোটে, তাব মধ্যে আমাদেব অনেক প্রিয জিনিশেব স্থান হযতো হয না। যদি জীবনে সময থাকতো তা হ'লে এই জীবনতত্ত্বেব অগাধ সলিলে ডুব দিযে দুটো-একটা বত্ন হযতো নিজেব হাতে তুলতে পাবতাম। কিন্তু তা আব হ'লো কোথায, বেলা প'ডে এলো, আব আমাব মন ঠিক তত্ত্বদর্শীব নয, আব আমাদেব দেশ এমন নয যেখানে যোগ্য ব্যক্তিব কাছে জ্ঞান আহবণ কবতে পাবি। প্রত্যেক বিষযে প্রত্যেক মানুষকে অ-আ-ক-খ থেকে আবম্ভ ক'বে নিজেকেই সমস্তটা কবে নিতে হবে— নযতো কিছুই হ'লো না। এলিযট কথিত tradition-এব মূল্য এখানেই, আব এ জন্যই আমাদেব দেশে সংস্কৃতিব এই দুর্গতি। আব অতএব আমাব জীবন বিপ্রলাপেব মধ্যেই কাটলো।..."

—'কলকাতা' পত্রিকা, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা। পৃ ৭

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'তিথিডোর' উপন্যাস লিখছেন। মার্চে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হল 'দ্রৌপদীর শাড়ি'।

ওরিয়েন্ট লংম্যান থেকে প্রকাশিত হল তাঁর 'অ্যান একার অব গ্রীন গ্রাস' (An Acre of Green Grass)— বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ইংরেজি আলোচনাগ্রন্থ।

ভারতীয় প্রকাশনা সংস্থা হিশেবে এটি তাঁদের প্রথম বই। আদি বৃটিশ সংস্থাটির নাম ছিল লংম্যান গ্রীন; এই সময়ে এই সংস্থার ভারতীয় শাখাটির ভারতীয়করণ হয়ে সেটি একটি দেশীয় সংস্থায় পরিণত হল, নাম হল ওরিয়েন্ট লংম্যান। ৭ মে তাঁদের প্রথম বই বেরোল : অ্যান একার অব গ্রীন গ্রাস।

(তথ্যের উৎস : ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্থার পুরোনো কর্মীদের সাক্ষ্য)

১৯৪৯ ।। বয়স একচল্লিশ

'কবিতা' পত্রিকার আর্থিক সংকট

গত বছরের (আষাঢ় ১৩৫৫) শেষ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে প্রথম উল্লেখ দেখতে পেয়েছি 'কবিতা'র আর্থিক সংকটের। সে-সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে এবছর। 'কবিতা' আর্থিকভাবে নিজের পায়ে প্রায় কখনোই দাঁড়াতে পারেনি, প্রথম তিন-চার বছর ছাড়া। তা ছাড়া কোনোদিনই সে বিক্রয়লব্ধ অর্থ + গ্রাহকদের চাঁদা + বিজ্ঞাপন = উৎপাদন ব্যয় + বিতরণ ব্যয় + প্রশাসনিক ব্যয় : এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি। অর্থ উদ্বৃত্ত হওয়া দূরস্থান, চিরকালই তাকে ভর্তুকির উপর নির্ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়েছে, আর সে ভর্তুকি এসেছে তার স্রষ্টা ও সম্পাদকের ক্ষীণ ও অনিয়মিত সংসারখরচ থেকে নিয়মিত ওভারড্রাফট নিয়েই। প্রথম দিকে— রবীন্দ্রসংখ্যার (বৈশাখ ১৩৪৮) সম্পাদকীয় পড়ে বোঝা যায়— কিছু আর্থিক সাহায্য এসেছে শ্রীযুক্ত প্রভু গুহঠাকুরতার কাছ থেকে — কিন্তু তারপর থেকে বলতে গেলে সমস্ত ব্যয়ভারই বুদ্ধদেব তাঁর ক্ষীণস্কন্ধে বহন করেছেন। এই সময় তিনি অধ্যাপনা ছেড়েছেন, স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় লেখার আয় থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে সংসার। সন্তানরা বড়ো হচ্ছে, প্রতিভা বসুর বাবা-মা ভাই ও কাকারা পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে এসে অসহায়, তাঁদের ভারও অনেকটা বহন করছেন। এই সংখ্যায় গ্রাহকদের প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মর্মস্পর্শী নিবেদন প্রকাশিত হল (আষাঢ় ১৩৫৬) :

> "এই আষাঢ় সংখ্যায় 'কবিতা'র চতুর্দশ বর্ষ শেষ হ'লো। আগামী ১লা আশ্বিনের পূর্বে পঞ্চদশ বর্ষের চাঁদা (চার টাকা) কিংবা নিষেধাজ্ঞা দয়া ক'রে পাঠাবেন; অন্যথা আশ্বিন-সংখ্যা বাৎসরিক মুল্যের ভি.পি.তে পাঠানো হবে। ভি.পি. ফেরৎ না দিতে আপনারা যথাসাধ্য সচেষ্ট হলে বাধিত হবো, কেননা 'কবিতা' খুব কষ্টে চলছে।..."

এ-বিষয়ে আর একটিও কথা নেই। ওই একটি বাক্য বুদ্ধদেব কত নিরুপায় হয়ে লিখেছিলেন, তা আমরা শুধু অনুমান করে নিতে পারি।

'কবিতা' পত্রিকায় বিদেশী সাহিত্য

বিদেশী সাহিত্যের উল্লেখ সম্পর্কে 'কবিতা'র দৃষ্টিভঙ্গি কয়েক বছর ধরে

ক্রমশ বদলাচ্ছে। রবীন্দ্রসংখ্যার সম্পাদকীয়তে ঘোষণা ছিল : "শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী 'কবিতা'কে নানাদিক দিয়ে পুষ্ট করতে সর্বদাই উদ্যোগী; আগামী বছর থেকে 'কবিতা'য় সমসাময়িক বিদেশী কবিতার সমালোচনা মাঝে-মাঝে থাকবে, এ বিভাগের ভার অমিয়বাবুই নিয়েছেন।" কিন্তু এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়নি। এই বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ে একাদশ বছর থেকে।

এর আগে পর্যন্ত 'কবিতা'য় বিদেশী সাহিত্যের প্রসঙ্গ বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায়নি। দশম বর্ষে (১৯৪৪-৪৫) বিদেশী সাহিত্য বলতে আছে উ-ইয়াং সীউ-র একটি কবিতার অনুবাদ, এবং রোমা রোলাঁর মৃত্যু উপলক্ষে তাঁর সম্পর্কে কালিদাস নাগের একটি প্রবন্ধ। এই দশ বছরে ৪৬টি সংখ্যা বেরিয়েছে (ছ'টি বিশেষ অতিরিক্ত সংখ্যা সহ), তার মধ্যে ২৪টিতে রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে, প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনার আলোচনা আছে। প্রথম দশ বছরের 'কবিতা' পত্রিকাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— একথা বললে খুব অত্যুক্তি করা হবে না। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ বা বিদেশী সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা ছিল ক্বচিৎদৃষ্ট, এবং বহুব্যবহিত।

একাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে দেখতে পাচ্ছি, 'বিদেশী সাহিত্য' বলে একটি নতুন বিভাগ প্রবর্তিত হয়েছে। মস্ত বড়ো বড়ো— প্রায় এক ইঞ্চি হরফে 'বিদেশী সাহিত্য' কথাটি, তার নিচে পৃষ্ঠা দশেকের মধ্যে দুতিনজন বিদেশী লেখকের (সাধারণতই তাঁরা কবি) সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেয়া— এই ছিল বিভাগটির উদ্দেশ্য। এই সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধ আছে— প্রথমটির আলোচ্য হলেন গ্রিক কবি দেমেত্রিয়স কাপেতানাকিস, এবং দ্বিতীয়টির বিষয় এলিয়ট ও কিপলিঙের প্রতিতুলনা। পরের সংখ্যার এই বিভাগে পাচ্ছি পল ভালেরির মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁর বিষয়ে প্রবন্ধ; তার পরের সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৫২) রয়েছে ১৯৪৫ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়া লাটিন আমেরিকার মহিলা কবি গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের পরিচয়; শেষ সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৫৩) আছে এডোয়ার্ড টমসনের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা।

মোটের উপর এই নব-প্রবর্তিত বিভাগটির ভূমিকা, যতটা সাংবাদিক ততটা সাহিত্যিক নয়। হয়তো সে-কারণেই বুদ্ধদেবের পছন্দ হচ্ছিল না বিভাগটি। পরের বছরের প্রথম সংখ্যার (আশ্বিন ১৩৫৩) পরই বিভাগটি তুলে দেয়া হয়।

পুরো দ্বাদশ বর্ষে বিদেশী সাহিত্যের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। আসল পরিবর্তন এল ত্রয়োদশ বর্ষের (আশ্বিন ১৩৫৪-আষাঢ় ১৩৫৫) গোড়া থেকেই। এ-বছরের প্রথম সংখ্যাটি হল দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরের সংখ্যা। উপমহাদেশ কাঁপানো রাজনৈতিক ঘটনাটির কোনো উল্লেখ 'কবিতা'র কোথাও নেই— কিন্তু, কাকতালীয় কিনা জানি না— এই সংখ্যা থেকেই শুরু হল 'কবিতা'য় বিদেশী

সাহিত্য নিয়ে সত্যিকারের সদর্থক কাজ।

আশ্বিন ১৩৫৪ সংখ্যায় রিলকে-র পাঁচটি ছোটো কবিতা অনুবাদ করলেন বিষ্ণু দে, একটি দীর্ঘ কবিতা বুদ্ধদেব বসু। পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যায় লন্ডনে অনুষ্ঠিত কবিতার বইয়ের প্রদর্শনীর প্রতিবেদন, অপর্ণা চক্রবর্তীর। চৈত্র ১৩৫৪-এ বিষ্ণু দে অনূদিত রিলকে-র তিনটি কবিতা, ইংলন্ডের 'হরাইজন' সাহিত্যপত্রিকা সম্পর্কে নরেশ গুহর আলোচনা; গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে টুর্গেনিভ-এর 'গদ্যে কবিতা' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের আলোচনা— সেটিও উল্লেখযোগ্য। আষাঢ় ১৩৫৪-এ বিষ্ণু দে'ব সুদীর্ঘ ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী এলিয়ট অনুবাদ, বুদ্ধদেবের রিলকে-অনুবাদ। আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায় বুদ্ধদেবের করা ভালেরির কবিতার অনুবাদ।

পরের সংখ্যাদুটি এজরা পাউন্ডের দ্বারা আচ্ছন্ন। মানসিক রোগের হাসপাতালে বন্দী এজরা পাউন্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা কবেছেন অমিয় চক্রবর্তী— পাউন্ড সম্পর্কে তৎকালীন রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার আড়াল থেকে ঠারেঠোবে যতটুকু বর্ণনা করা যায়। পরের সংখ্যায় তারই জের টেনে ইটালি ও আমেরিকায় পাউন্ডের বন্দীদশার বর্ণনা দিয়েছেন বুদ্ধদেব— লিখেছেন তারই মধ্যে কেমন করে পিজান ক্যান্টোজ লিখেছেন, কনফুসিয়াস অনুবাদ করেছেন তার বর্ণনা। কবিতাভবন থেকে কনফুসিয়াস প্রকাশিত হল, পৃথিবীতে এই প্রথমবার, তাব বিজ্ঞাপনও রয়েছে এই সংখ্যায়। আশ্চর্য, এত বড়ো একটা ব্যাপার ঘটালেন বুদ্ধদেব বসু— যখন য়োরোপে-আমেরিকায় কোনো প্রকাশক সাহস করে এজরা পাউন্ডের বই ছাপছে না তখন তিনি কনফুসিয়াস ছাপলেন— কিন্তু আমাদের অবাক লাগে, 'কবিতা'য় এর কোনো বিবরণ নেই, বইটির কোনো আলোচনা নেই, কী করে কোন অবস্থায় এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটল তার কোনো উল্লেখ নেই কোথাও। মূল বইটিতে, কবিতাভবনের পক্ষ থেকে লেখা কোনো ভূমিকা পর্যন্ত নেই। শুধু তাই নয়। বইটিতে প্রকাশকের স্থানে মুদ্রিত রয়েছে :

published for
KAVITA BHAVAN
by
ORIENT LONGMANS LTD
17 Chittajanjan Avenue,Calcutta-13
Nicol Road, Ballard Estate, Bombay
36A Mount Road, Madras
Also available at kavitabhavan

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স-এর কলকাতা-বম্বাই-মাদ্রাজ তিনটি ঠিকানা আছে— কবিতাভবনের কোনো ঠিকানা নেই, কবিতাভবন কোন শহরে বা এমনকি কোন

দেশে অবস্থিত তারও কোনো নির্দেশ নেই। কেমন রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা। বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন নরেশ গুহ— তিনিও কিছু স্মরণ করতে পারলেন না। যার ফলে হয়েছে এই, এজরা পাউন্ডের গ্রন্থের অনুমোদিত তালিকায় প্রায় কোথাওই এ-বইটির কোনো উল্লেখ নেই।

এ ছাড়াও এই সংখ্যা দুটিতে এলিয়ট বিষয়েও দুটি লেখা ছিল। পৌষ ১৩৫৫ সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের, এবং পরের চৈত্র ১৩৫৫ সংখ্যায় অমলেন্দু বসুর। তবে এই চৈত্র ১৩৫৫ সংখ্যায় বিদেশী সাহিত্য বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অভিব্যঞ্জক যে ঘটনাটি ঘটল তা হল, এই সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব অনূদিত বোদলেয়ারের কবিতা। দুটি কবিতা ছিল—তার মধ্যে ছিল 'প্লীহা', এবং 'স্তোত্র' ('প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে/যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—')। এই পঙক্তিটি, বারো বছর পরে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের উৎসর্গপত্রে ব্যবহার করবেন।)

তিন বছর ধরে ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে 'কবিতা' পত্রিকার চারিত্রিক রূপান্তর সম্পূর্ণ হল। এই বছরের শেষ সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৫৬)-এ প্রকাশিত হল য়েট্‌স-এর অগ্রন্থিত কবিতা REPRISALS।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় তৃতীয় সম্পাদকীয় রচনার কাজ আরম্ভ করলেন।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন।

অমিয় চক্রবর্তীর যোগাযোগে, কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হল এজরা পাউন্ডের 'কনফুসিয়াস'।

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হল তিথিডোর— বুদ্ধদেব বসুর বৃহত্তম, এবং সম্ভবত জনপ্রিয়তম, উপন্যাস। তিন বছর ধরে লিখে শেষ করলেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ + ৭৭৬।

১৯৫০ ।। বয়স বেয়াল্লিশ

'কবিতা' পত্রিকার সমস্যা চলছেই

গতবছরের শেষ সংখ্যা 'কবিতা'য় গ্রাহকদের প্রতি নিবেদনে লিখেছিলেন, " 'কবিতা' খুব কষ্টে চলছে।" এ বছরের (পঞ্চদশ বর্ষ) প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করতে খুব দেরি হয়ে গেল, তাই সংখ্যাটিকে বাধ্য হয়ে আশ্বিন-পৌষ যুগ্ম সংখ্যা হিশেবে ঘোষণা করলেন। মুমূর্ষু ছোটো পত্রিকার ক্ষেত্রে যেটি খুব সাধারণ ব্যাপার, সেই 'যুগ্ম সংখ্যা' কিন্তু 'কবিতা'র ২৬ বছরের ১০৪ সংখ্যাব্যাপী আয়ুষ্কালে, এত আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েও, চারটি মাত্র বেরিয়েছে— এটি তার মধ্যে দ্বিতীয়। সম্পাদকীয়তে লেখা হল :

> " 'কবিতা' বন্ধ হ'তে-হ'তেও হ'লো না। সভাস্থল থেকে হঠাৎ অপসৃত হওয়া অশোভন, যাবার মুখে একটা নমস্কারেব নিযম আছে। শুধু এই নিয়মরক্ষাটুকুই আপাতত আমাদের সংকল্প, কেননা এবার আমরা কোনোরকমে হাজির হতে পারলেও বেশিদিন আর পাববো না, হয়তো আগামী বছরেই বিদায় নেবো।
>
> শীতেব শেষে আশ্বিন সংখ্যা প্রায় বেয়াদবি হ'য়ে পড়ে, তাই এ-সংখ্যার নাম দিলাম আশ্বিন-পৌষ। এর পরে চৈত্র সংখ্যা বেরোবে, বৈশাখে আর-একটি, অতএব আষাঢ়েই যথারীতি বছর পূরবে। তারপর কী হয় দেখা যাক।"

তারপর বছরের শেষ সংখ্যা (বষ ১৫ সংখ্যা ৪ : আষাঢ় ১৩৫৭) 'গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন'-এ লেখা হল :

> " 'কবিতা'র পনেরো বছর পূর্ণ হ'লো। এ-বছরের প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলাম যে হয়তো আর এক বছরের বেশি আমরা টিকতে পারবো না। তা থেকে কেউ কেউ ধরেই নিয়েছিলেন যে 'কবিতা' উঠে যাবে— কিংবা উঠেই গেছে। অন্য কেউ-কেউ 'কবিতা'র আয়ু বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদেরই চেষ্টার ফলে অন্যান্যবারের মতো এবারেও এই নিবেদন লিখতে পারলাম।
>
> পাঁজির প্রতিযোগিতায় হয়রান হয়েছি, এখন আপোশ করা ভালো। আশ্বিন টপকে পৌষ সংখ্যাতেই ষোড়শ বর্ষ শুরু হবে। এই পৌষ সংখ্যা— বিজ্ঞাপনে বিবরণ দেখবেন— মার্কিন সংখ্যা হয়ে পৌষ মাসেই বেরোবে।"

এই সম্পাদকীয়ের শেষ অনুচ্ছেদে আরো একটি সংকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়, কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত করা যায়নি :

> "কাব্যকলার প্রচারের আশায় এর পরে আমরা মাঝে মাঝে আবৃত্তিসভারও

আয়োজন করতে চাই, যেখানে আধুনিক কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করবেন। সম্ভবত আগামী শীত ঋতুতেই প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে, এবং আগামী সংখ্যায় এর বিবরণ দেখতে পাবেন।"

এইরকম কোনো সভা কখনো অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

রবীন্দ্র-পুরস্কারের নিয়মাবলি বিষয়ে মন্তব্য

সদ্য প্রবর্তিত 'রবীন্দ্র-পুরস্কারে'র নিয়মাবলি দেখে আশ্বিন-পৌষ ১৩৫৬ যুগ্মসংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় ক্ষুব্ধ মন্তব্য করলেন :

"সাহিত্যে রবীন্দ্র-পুরস্কারের নিয়মাবলি দেখে আমার একটা কথা মনে পড়লো। ১৯৩১ বা ৩২-এ কোনো-এক প্রকাশকের দোকানে একজন প্রবীণ নামজাদা সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার দেখা। তিনি আমাকে জিগেস কবলেন, 'তুমি এখন কী করছো?' বললাম, 'লিখছি'। 'তার মানে বেকার?'[১]

প্রবীণ সাহিত্যিকের এই কথাটি আমি কখনো ভুলিনি। বাংলাদেশে বই লেখাকে কাজ বলে না, আজও বলে না। সাহিত্যিক মানেই বেকার। বেকার মানেই ভদ্রলোক নয়। ভদ্রলোক যে নয় সে তো গণ্যমান্য হতেই পারে না। ববীন্দ্রনাথ গণ্যমান্য ছিলেন অন্যান্য কারণে, সাহিত্যিক বলে না। 'কথা ও কাহিনী ছাড়া রবিবাবুর কোনো বই পড়িনি।' যাঁর মুখে শুনেছিলাম, নাম বললে সবাই চিনবেন।

এই বেকারের দলকে আবার পুরস্কার। কালে-কালে কতই শুনবো! তা বাপু একটা প্রাইজ-ফ্রাইজ নেহাৎ দিতে হয় তো দাও, কিন্তু পৈতেটা দেখে নিয়ো। কিছু একটা ফোঁটা তিলক না থাকলে কী ক'রে বুঝবো যে একটা জংলিকেই ধরে আনলে না? অন্তত দু-জন মহামহোপাধ্যায়ের সুপারিশ যার পকেটে নেই তাকে যেন দোর থেকেই হাঁকিয়ে দেয়। আরে বাবা বকশিশ কি সোজা!

বকশিশ ব'লেই এসব কুশ্রী শর্ত গজাতে পেরেছে। সাহিত্যবোধ থাকলে বই দাখিল করবার কথাই হয়তো উঠতো না। বই দেশে কতই বেরোচ্ছে, তা থেকে বাছাই করাটাই বিচারকমণ্ডলীর কাজ।

সাহিত্য-পুরস্কারে সাহিত্য-বিষয়ক শর্ত শুধু থাকতে পারে। বলা যেতে পারে এটা কবিতার জন্য, কি উপন্যাসের, কি সাধারণভাবে কল্পনাপ্রবণ সাহিত্যের জন্য। সময়ের বা ভাষার সীমায় আবদ্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু এমন কোনো শর্ত হ'তে পারে না, যাতে উমেদারির দুর্গন্ধ।

দশজন সাহিত্যিক মিলে দৈনিকপত্রে এর যে-প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তারপরে আর একটি কথা বলার আছে। কোনো-কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র-পুরস্কার ভাণ্ডারে চাঁদা দিয়েছিলেন। যখন দেখা গেলো এই

---

১. ঘটনাটি সত্যিই ঘটেছিল, নামজাদা সাহিত্যিকটি ছিলেন অমল হোম এবং প্রকাশকের দোকানটি এম. সি. সরকার— পূর্ণতর বিবরণের জন্য দ্র. *আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু, ১ম সং, পৃ. ৫৬।

পুরস্কারের শর্ত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির পক্ষেও গ্লানিকর, তখন সেই চাঁদার টাকা তাঁরা ফেরৎ চাইলে কি অন্যায় হয়?"

'কবিতা' পত্রিকায় শঙ্খ ঘোষ

'কবিতা'য় শঙ্খ ঘোষের একমাত্র কবিতা 'পাথেয়' প্রকাশিত হল চৈত্র ১৩৫৬ সংখ্যায়— এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দের বিখ্যাত 'অন্ধকার' কবিতাটি ("গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার")। এই একটির পর শঙ্খ ঘোষ 'কবিতা'য় আর লেখেননি— কবিতা সংশোধন করা নিয়ে অভিমানের কারণে। সুবীর রায়চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন :

"... গরমের ছুটিতে খড়গপুরে আছি যখন, বন্ধুদের চিঠিতে খবর জানলাম 'কবিতা'য় আমাব লেখা বেবিয়েছে। অবিশ্বাস্য এই মর্যাদায় আপ্লুত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে উঠলাম, কলকাতায় এসেই দৌড়লাম পাতিরামে। শোভমান 'কবিতা'র হলুদ মলাটের ওপর অন্য সব কবির সঙ্গে আমারও নাম মুদ্রিত দেখে প্রায় মূর্ছিত হবার দশা— তাবপর ছাপা হরফে নিজের লেখাটিকে দেখতে গিয়েই চমক লাগল, এবং সমস্ত আহ্লাদ নিমেষে চুকে গেল। কেননা, লেখাটি পড়ে মনে হল যেন অন্য কাবো লেখা, আমার নয়। ছোট্ট সেই কবিতাটি এখনো আমার মনে আছে। ঠিক চল্লিশ বছর পরেও। ছিল :

এমনও-যে দিন ছিল না তা নয়
যখন তোমার চলনে দেখেছি
বিদ্যুদ্বেগী ছলনা।
এমনও গিয়েছে সময়, যখন
অভ্রংলিহ দম্ভ তোমার
ছড়িয়েছে বিশ্বময়।
জানি না এখনও সেই সব খেলা
তেমনি করো কি করো না
যত বসে ভাবি, শুধু মনে পড়ে
তোমার চোখের করুণা।

[বুদ্ধদেবের সংশোধনে, দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পঙ্ক্তি দাঁড়িয়েছিল :

"... যখন তোমার চলনে
কতই ঝরেছে ঐতিহাসিক ছলনা।
এখনো সময় ছিলো না তা নয়
যখন তোমার গর্ব
ভেবেই পাইনি কয়টা বিশ্বে ধরবে।"]

[শঙ্খ ঘোষ লিখছেন—] "তৃতীয় লাইনে একটি শব্দ আর পঞ্চম-ষষ্ঠ লাইন পুরোটাই পালটে দিয়ে বুদ্ধদেব 'কবিতা'য় ছেপেছিলেন অন্য 'পাথেয়', আর তাতে আমার অগাধ অপমানের বোধ হলো। হীরেনের কাছে [শঙ্খ ঘোষের তৎকালীন বন্ধু, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভ্রাতা] বুদ্ধদেব যখন শুনেছিলেন যে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি, তিনি নাকি আরো একবার বিস্মিত হন এবং বলেন— কবিতাটা কি এতে ভালোই হয়নি? উত্তরে, হীরেনকে আমি জানাই, হতে পারে ভালো, কিন্তু ওটা তো আমাব কথা নয়, আমার কবিতা নয়।

... এবং এই অভিমানে, 'কবিতা'য লিখিওনি আর কোনোদিন, বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখাও করিনি প্রায় বারো বছর।...

আজ অবশ্য বুঝতে পারি যে আমার অভিমানটা ছিল মূঢ়ের মতন, নতুন লেখকের লেখায় একটু আধটু কলম চালানোয় কোনো দোষ তো নেইই, বরং সচেতন বিবেকবান সম্পাদকের সেটা অবশ্য করণীয়। বুদ্ধদেব যে ওই কবিতাটিব ভালোই চেয়েছিলেন তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো তাড়াহুড়োয় (কেননা মার্চে দেওয়া কবিতাটি মে মাসেই বেরিয়ে গিয়েছিল) তরুণটিকে সামনে ডেকে আর বলতে পারেননি সংশোধনের প্রস্তাব, সেটুকু হলে কিছুই আর বলার থাকত না।

'কবিতা'য় যে আর লিখিনি, এ নিয়ে অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ হয়নি কখনো। কিন্তু আজও পর্যন্ত আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে নির্বোধের মতো বুদ্ধদেবের সান্নিধ্য থেকে অকারণে নিজেকে বঞ্চিত করেছি।"

—'কবিতা' ও সেযুগের লেখকসমাজ', সুবীর রায়চৌধুরী
দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৭

সম্ভবত এজরা পাউন্ডের প্রভাবে, 'কবিতা' পত্রিকায় প্রাচীন চীনা কবিতা থেকে প্রচুর অনুবাদ হচ্ছে, পরপর কয়েকটি সংখ্যা জুড়ে। এই সংখ্যাতেও রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর স্বকৃত অনুবাদ, এবং চীনা কবিতা বিষয়ে তাঁর আলোচনা।

'কবিতা'র মার্কিন সংখ্যা

ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল মার্কিন সংখ্যা, বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১। উনিশজন আমেরিকান কবির একটি করে কবিতা— তাঁদের মধ্যে আছেন ই. ই. কামিংস ও এজরা পাউন্ড; 'ওয়েস্টল্যান্ড' নিয়ে এলিয়ট ও পাউন্ডের তিনটি চিঠি; পাউন্ড, ওয়ালেস স্টিভেনস, কামিংস এবং উলিয়াম কার্লোস উলিয়মস-এর কয়েকটি কবিতার মূল ও বঙ্গানুবাদ পাশাপাশি মুদ্রিত— এই নিয়ে মার্কিন সংখ্যা। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বুদ্ধদেব লিখলেন :

"It is the editor's conviction that Indian intellectuals, so much at

home in English poetry, may find new nourishment in American. Hence this issue of Kavita, presenting a group of poems by older and younger contemporaries. Many of them are well-known in their country, some also outside, but conspicuously few in India... In these pages, we hope, our readers here, and our practising poets, would find something to enjoy, re-read, ponder over and profit by."

কবিতাভবনের আড্ডা

কবিতাভবনের অনাবিল সাহিত্যিক আড্ডার স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে আসছে। মোটামুটি এই সময় থেকে (বা হয়ত এর সামান্য আগে থেকে) সেই শেষ যুগের শুরু— বুদ্ধদেবের প্রথম আমেরিকা যাওয়ায় ১৯৫২ সালে তার সমাপ্তি। প্রতিভা বসু লিখেছেন :

"এই সময়টাতে বুদ্ধদেবের শারীরিক মানসিক আর্থিক কোনো অবস্থাই ভালো ছিল না।... পত্রিকা চালানো, কবিতাভবনের ধার শোধ, নিজের অসুস্থতা এবং আমার অসহায় পিত্রালয়ের ভাবনা সব মিলিয়ে দিন চলছিল খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। আমার পিতৃদত্ত অলংকারের শেষতম চিহ্ন একটি নেকলেস ব্যতীত আর কিছুই না থাকায় আমি সে বিষয়ে শূন্যের অঙ্কে। কিন্তু মরুভূমিতে জলের মতো হঠাৎই চারটি যুবক আমাদের জীবনে প্রবেশ করে তাদের নতুন জীবনের সুখে সেই অবস্থাটা এমন একটা অনাবিল ভালোবাসা ভালোলাগার আনন্দে ভরে দিল যে মনে হল তারা যেন ঈশ্বরপ্রেরিত দূত। এদের শ্রদ্ধা ভক্তি বন্ধুতা বুদ্ধদেবকে উজ্জীবিত করে তুলল। আমার নিজেরও মনে হল আমার জীবনে এরাই আমার এ বাড়িতে প্রথম নিজস্ব বন্ধু। যদিও বয়সে সকলেই অনেক ছোটো। কিন্তু বয়সটা যে কেবলমাত্র অঙ্কের অধীন ছাড়া আর কিছু নয় সে কথা তখন যেমন জেনেছিলাম, আজ পর্যন্ত তাই জানি। এই চারটি যুবকের সাথে আমার পরিচয় শুধু বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রীর পর্যায়েই আবদ্ধ ছিল না, ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও আলাদা মানুষ হিসেবে, আলাদা বন্ধুতার ডোরে বেঁধে ভালোবাসায় ভরে দিল। বিবাহিত জীবনে যা আমার একান্তই দুর্লভ ছিল। তাদের একজন নিরুপম চট্টোপাধ্যায়, একজন কবি অরুণ সরকার, একজন অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র আর একজন কবি নরেশ গুহ।"

—*জীবনের জলছবি*, ৩য় মু, পৃ. ১৮৮

এদের মধ্যে অরুণ সরকার ও নরেশ গুহ বুদ্ধদেবের রিপন কলেজের ছাত্র, অশোক মিত্র ঢাকার জীবন থেকে বুদ্ধদেব বসুর রচনার ভক্ত, আর নিরুপম এসেছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে। পরস্পরের দুতিন বছরের মধ্যে এঁরা কবিতাভবনের জীবনে প্রবেশ করেন, এবং কবিতাভবনের অঙ্গীভূত হয়ে যান।

"সিন্দুক নেই, স্বর্ণ আনিনি;
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য :
ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাবো কি পরশ যৎসামান্য?"

'কবিতা' পত্রিকায় এই কবিতা যিনি প্রতিভা বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই অরুণকুমার সরকার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"সে এক দিন ছিল! ঝাঁ ঝাঁ ঠিকদুপুরই হোক বা নিঝুম রাত বারোটা, যে-কোনো সময় দলবল নিয়ে কবিতাভবনে ঢুকে পড়া যেত। ঢুকলেই চা। গৃহকর্তা অবিশ্বাস্য রকমের চা-খোর।... সেই ঘোর চা-খোর ব্যক্তিটি ছিলেন মূর্তিমান কবিতার আবহাওয়া। সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুতে তাঁর রুচি নেই। যা কিছু সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন, তা অসার, অকিঞ্চিৎকর; যা কিছু সাহিত্য সৃষ্টির বাধাস্বরূপ, তা সর্বৈব পরিত্যাজ্য। তাই অধ্যাপনা ছেড়েছেন, ইতি দিয়েছেন সাংবাদিকতায়। জনপ্রিয় লেখক নন, তবু লেখার উপরেই তাঁর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। সারা দিন, দিনের পর দিন, ঘরের মধ্যেই কাটে। কাজের মধ্যে দুই— লেখা আর পড়া। জঙ্গী রাজনীতিকদের নাম পর্যন্ত জানেন না। বিষয়ী প্রৌঢ়-বৃদ্ধদেব দশ হাত এড়িয়ে চলেন। আর তাঁর সঙ্গী যত বাউণ্ডুলে সাহিত্যপাগল ছেলেছোকরা। তাদের সঙ্গে তাদের চেয়েও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। লাফিয়ে উঠে হাততালি দেন, ঘর ফাটিয়ে হাসেন। তাঁর আলোচনার বিষয় শুধু সাহিত্য এবং সামান্য সজাগ থাকলে বোঝা যায়, ঘুরে ফিরে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে আসা। বহির্বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জ তো নয়ই, কোনো হালউঠতি চিন্তাধারাও নয়— কবিতা, একমাত্র কবিতাই তাঁর কবিতা লেখার উপকরণ, তিনি নিজেই তাঁর গল্প-উপন্যাসের হাড়গোড়, মাসমজ্জা। স্বদেশী-বিদেশী পরিচিত-অপরিচিত কারুর রচনা ভালো লাগলে আর কথা নেই, বুদ্ধদেব বসু প্রশংসায় ফেটে পড়েন। তাঁর মুখে কোনোদিন, শিথিলতম মুহূর্তেও কেউ পরনিন্দা শোনেনি।

... আমি আর নরেশ— আমাদের না আছে টাকা না আছে ঘরে বউ, রাত বারোটার পর শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অচেনা পার্কে জারুল-কৃষ্ণচূড়ার ঘুম ভাঙাচ্ছি, তাড়া খাচ্ছি পাহারাওলার। শহরে অসহ্য বোধ হলে ট্যাঁকে কানাকড়ি না নিয়েই দূরে চলে গেছি। সুবর্ণরেখার বালিতে মুখ গুঁজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থেকেছি, পূর্ণিমার রাতে শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ে সারা রাত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, চাইবাসার পথে পথে চড়ুইয়ের মতো সর্বাঙ্গে ধুলো মেখেছি, কবিতা পড়েছি মোমের আলোয়, ঘর অন্ধকার করে শুনেছি রবীন্দ্রনাথের গান। অশোক মিত্র আর নিরুপম চট্টোপাধ্যায় আজ হয়ত লজ্জা পাবে, তারাও কতদিন লেকের পাড়ে বসে আমাদের সঙ্গে সারা বাত, সেই কাক ডাকা পর্যন্ত, কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করেছে। তারপর শেষ রাতের ঘাসফড়িং আলোয় হিজল গাছের ডাল ভেঙে, হরেক ফুলপাতা সংগ্রহ করে আমরা হাজির হয়েছি

কবিতাভবনে, এক কাপ চায়ের প্রত্যাশায়। প্রতিভা বসু আমাদের সত্যিই ভালোবাসতেন।"

"অনেক গভীর রাত্রে আড্ডা ভাঙে কবিতাভবনে।
ট্রাম-বাস বন্ধ। চাঁদ। হেঁটে ফিরি। আলোছায়া দোলে
সহসা শুনতে পাই : ভাবনা আমার পথ ভোলে।
সংশয়বিযুক্ত চিত্ত। তাঁর স্থান তর্কাতীতে, মনে।"

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ :

"যে পত্রিকাটি কৃষ্ণনগরে অনেকই পড়তেন এবং যা আমার পক্ষে সহজলভ্য ছিল, তাতে নিয়মিত বুদ্ধদেব-কুৎসা প্রকাশিত হত। এখন স্বীকার করতে ক্ষতি নেই, সেই পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকেই বুদ্ধদেব বসুর রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেখি তাঁর উপন্যাস মোটামুটিভাবে বাংলা লাইব্রেরিতে আছে, যদিও তাঁর অন্যান্য প্রকার রচনা এবং 'কবিতা' পত্রিকা একেবারেই পাওয়া অসম্ভব।

... সুতরাং কলেজ পালিয়ে মাঝে-মাঝে কলকাতায় আসা শুরু করতে হল। কলকাতা তখন এমনই অপরিচিত ছিল আমার কাছে যে ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ খুঁজে নিতে বেশ সময় লেগেছিল।...

ঠিকানায় পৌঁছে কোনো বইয়ের দোকান চোখে পড়ল না। নিচের দোকানের একটি লোক বলল যে দোতলায় লেখক সপরিবারে বাস করেন এবং বইও সেখানে কিনতে পাওয়া যায়।

প্রথম কয়েকবার বই কিনতে কোনো বিপত্তি হয়নি। একটি বাচ্চামতো মেয়ে দরজা খুলে কী চাই জিজ্ঞেস করত এবং বই এনে দাম মিটিয়ে নিত। পরে জেনেছিলাম সে বুদ্ধদেব বসুর কন্যা এবং ম্যানেজর; বোধহয় পাঁচটাকা মাইনেও পেত। কিছুদিন পর অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব একদিন বেরিয়ে এলেন, এবং যেহেতু আমার অসংখ্য চিঠিপত্রে তিনি তখনই বিব্রত, এবং আমার চেহারা ও হাবেভাবে মফস্বল শহরের ছাপ প্রকট, সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নিরুপম না?' এইভাবে ১৯৪৯ সালে এক ব্যক্তিগত সম্পর্কের আরম্ভ হল, যা পরে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর পরিবারের লোকেদের প্রতি, এবং যা আজও কলকাতা এলে আমাকে নাকতলায় ডাকে।...

বি. এ. পাশ করে কলকাতায় পড়তে এলাম। মেসে থাকতাম, আর উঞ্ছবৃত্তি করে খরচ চালাতাম। অপরিসীম দাক্ষিণ্যে বুদ্ধদেব বসু এবং প্রতিভা বসু সেই সময়ে কলকাতা শহরে আমার যাবার একটা জায়গা করে দিলেন। বুদ্ধদেব সর্বদাই বইয়ের আলোচনা করতেন; যে সব লেখকের, বিশেষ ক'রে বিদেশী সাহিত্যের, লেখা আমি পড়িনি তা পড়তে উৎসাহ দিতেন; সে বই নিজের থাকলে ধার দিতেন। কখনো কখনো মহৎ কোনো বই পড়িনি জানতে পারলে (যেমন

টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যান্ড পীস') ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। 'এক্ষুনি তুমি এই বইটা নিয়ে যাও; শনিবার আসার আগে পড়ে ফেলা চাই।' 'সে কী, তুমি বইটা পড়ো নি? কৃষ্ণনগরে বসে বসে কী বই পড়তে?'...

বুদ্ধদেব বসু আমাকে কী কী শিখিয়েছেন, প্রত্যক্ষে, বা তাঁর অজস্র লেখা দিয়ে, তাঁর আলোচনা অসমীচীন হবে, কেননা তার কোনোটাই আমি কাজে লাগাইনি; তাঁর সংসর্গে যে-ই এসেছে সে-ই কম বেশি বদলেছে, কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল লেখক তৈরি করা, কবি তৈরি করা। যখনই নতুন কেউ ভালো লিখতে শুরু করেছে, পরম উৎসাহে তিনি তার প্রশংসা করেছেন, সে দেখা করতে এলে বহু সময় তাকে দিয়েছেন। এরকম অনেককেই তখন কবিতাভবনে দেখেছি।...

কবিতাভবনের সকলের কাছ থেকেই আমি অবিরলভাবে পেয়ে এসেছি, যোগ করতে বসলে সংখ্যা শেষ হতে চায় না। আমার পক্ষে কিন্তু একসময় নেয়া একেবারেই সহজ কাজ ছিল না। সর্বদাই মনে হত লোকে বুঝি অনুকম্পাবশত দিচ্ছে; করুণা প্রকাশ করছে। কিন্তু এমন সহজ ছিল তাঁদের দেয়া, এমন প্রসন্ন, যে ক্রমে ক্রমে আমি তার মূল্য উপলব্ধি করতে শিখলাম। দেয়া আর নেয়া—এই দুই কাজের মধ্যে দিয়েই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং এই দুই কাজেই যে কারো কাছে কারো ঋণ বর্তায় না, এই পরম সত্য কবিতাভবনের সান্নিধ্যে না এলে আমি হয়তো কোনোদিন জানতে পারতাম না। না নিতে পারার মধ্যে এক দুঃখময় দীনতা আছে, না দিতে চাওয়ার মধ্যে আত্মার কার্পণ্য, এবং এই দুই অক্ষমতা যে মানুষকে শুষ্ক এবং অপ্রিয় করে তুলতে পারে সেকথা ব্যাখ্যা করে না বলে, নিজেদের ব্যবহার দ্বারা আমাকে শিখিয়েছেন কবিতাভবনের ব্যক্তিরা।..."

—'কবিতাভবন : স্মৃতি', নিরুপম চট্টোপাধ্যায়
৩০শে নভেম্বর কবিতাভবনবার্ষিকী/১, পৃ. ১৮৮

অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের স্মৃতিচারণ থেকে :

"একটা সময়ে সমর সেন-কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে অসম্ভব হিংসাবোধ ছিল আমার। অন্য কোনো কারণে নয়, আমরা যখন থেকে যেতে শুরু করেছি, তারও বছরদশেক আগে, 'কবিতা' পত্রিকা শুরু হবার পর্বে, যেহেতু তাঁরা 'কবিতাভবনে' আড্ডা জমিয়েছিলেন। সেই আড্ডার স্বর্ণযুগের সঙ্গে তাঁরা জড়িত, আমাদের কাছে যা কিংবদন্তির রূপ পেল। তাঁদের প্রায় সকলের সঙ্গেই পরে আলাদা আলাদা অথবা সম্মিলিত আড্ডা দিয়েছি, কিন্তু তা তো অন্যতর আড্ডা, 'কবিতাভবনে'র সবচেয়ে সুন্দর সময়ের রেশ তো তাতে ছিল না। সেই কিংবদন্তির মানুষগুলির প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার পরে সৌহার্দ্যসম্পর্ক হয়েছিল; হয়তো সেজন্যই আমার কাতরতার পরিমাণ অধিকতর। এই আমার চেনা মানুষগুলি, যাঁদের সঙ্গে সামাজিকতায় প্রতিদিন মিশছি, তাঁরা অথচ এক স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করে এসেছেন, যেখানে আমি নিজে কোনোদিন যেতে পারব না।

... আমরা যারা চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ঋতুতে 'কবিতাভবনে'র আড্ডার সঙ্গে যুক্ত হলাম, বরাবরই মনে হতো আমাদের, আমাদের চেয়ে এই এঁরা— সমর সেন-কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়রা অনেক বেশি ধীমান ছিলেন, অনেক বেশি তুখোড় ছিলেন। এবং সেই উজ্জ্বলতা তথা চাতুর্য 'কবিতাভবনে'র আড্ডার পরিবেশজনিত ব্যাপার। সেই আড্ডার জাদু তাঁদের ছুঁয়েছিল বলেই, আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলাম, এই মানুষগুলি স্তরান্তরে উন্নীত হয়ে গিয়েছিলেন, পরে-আমার-সঙ্গে-আলাপ-হওয়া এই মানুষগুলিই। কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই তাঁদের প্রতিভা নিয়ে অবশ্য সংশয়ের অবকাশ ছিল না, কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকা ঘিরে যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, তার অন্তঃস্থিত বিদ্যুতেব গুণে সেই প্রতিভা তুঙ্গতম শীর্ষে পৌঁচেছিল।

১৯৪৩ অথবা ১৯৪৪ সাল থেকে আস্তে-আস্তে একটু একটু করে, 'কবিতাভবনে'র ইতিহাসখ্যাত আড্ডা ভেঙে পড়তে শুরু করল। 'দক্ষিণ পথে মেলে যদি দক্ষিণা / ভেবে দেখো তবু সেই পথ ঠিক কিনা' এই কবিতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধবর্তী কোনো সময়ে, 'কবিতাভবন' প্রকাশিত বার্ষিকী 'বৈশাখী'র কোনো সংখ্যায় বেরিয়েছিল : আর কযেক বছর গড়িযে যাওয়ার পরে, ঐ চরিত্রের কোনো কবিতা কবিতাভবনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হবার কথা অকল্পনীয় হযে গেল। বাঙালি সমাজ, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, অনেক টালমাটাল অভিজ্ঞতাব মধ্য দিয়ে গিয়ে, শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে দীক্ষিত হল; অনেকে বলবেন, ইতিহাসের নিয়ম মেনেই হল।

... কবিতাভবনের তিবিশের দশকের শেষার্ধের আড্ডা, আমার কাছে অন্তত, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজসত্তাব পূর্ণিমায় পৌছবার প্রক্রিয়ার প্রতিভাস। কোথায় যেন একটু অস্পষ্টতা-অব্যক্ততা ছিল, আরো খানিকটা সময় পেলে সেই আড্ডা তার পরিপূর্ণতায় পৌছতে পারত : আরো খানিকটা সময় জুড়ে আদান প্রদান, ভাববিনিময়, আঘাত-প্রত্যাঘাত, আরো খানিক সময় জুড়ে সহনশীলতার অভ্যাস... এই সব কিছু থেকে বাঙালির সৃজনপ্রতিভা শাণিত থেকে শাণিততর প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হবার সুযোগ পেত।... এটা মস্ত ক্ষতি, যার জের এখনো আমরা টেনে চলছি। একান্নবর্তী সংসারের সম্পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করার আগেই আমরা পৃথক হয়ে গেছি।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন আমরা গিয়ে পৌঁছলাম, 'কবিতাভবনে'র ভাঙা হাট তখন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র একদা, নিশ্চয়ই সুরেশ্বর শর্মা অথবা স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের বকলমে, ছন্দ নিয়ে এক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যার এলোমেলো একটি-দুটি পঙ্ক্তি অনেকটা এরকম : 'হয়নি হতে যা পারিত, হল না ছিল যা অবধারিত; কেন বৃথা হনু প্রতারিত।' হয়তো অযৌক্তিক, কিন্তু চল্লিশের দশকের শেষার্ধের, অথবা পঞ্চাশের দশকের প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে, 'কবিতাভবনে' আমাদের নিজেদের আড্ডার উতরোল সময়ে, এই ছেঁড়া ছেঁড়া পঙ্ক্তিগুলি আমাকে বিপর্যস্ত করেছে। কীসের যেন অভাববোধ,

আবাহনের আগেই বিসর্জন ঘটে গেছে যেন; বুদ্ধদেব বসুর চরিত্রঔদার্য, তাঁর অনাবিল শিশুসুলভ সারল্য, সৃষ্টিকর্মে তাঁর সর্বত্যাগী অঙ্গীকার, তাঁর পরিবারস্থ সকলের সান্নিধ্যস্নিগ্ধতা, এই সমস্তকিছুর জন্য আমি প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতা বোধ করেছি, কিন্তু তাহলেও একটি বিশেষ দৈন্যের নিরানন্দও আমাকে অহরহ তাড়া করে ফিরেছে, আমরা যেন একটু দেরি কবে এসেছি। কে জানে, আমাদের এই চিন্তার পীড়াকে সমর সেনরা আমল দেবেন না, তাঁরা হয়তো বলবেন, তাঁদের আড্ডার ঋতুতে, তাঁরাও অনুরূপ এক অভাববোধের ভুক্তভোগী। কিন্তু... আমার আক্ষেপ তাতে কমবার নয়। সমর সেন— কামাক্ষীপ্রসাদের সম্বন্ধে উদ্রিক্ত ঈর্ষা আমাব কিছুতেই দমিত হবার নয়, দশ বছর হল কামাক্ষীপ্রসাদ গত হয়েছেন, তা হলেও না।”

—‘হল না, ছিল যা অবধারিত’, অশোক মিত্র
৩০শে নভেম্বর কবিতাভবনবর্ষিকী/১ : পৃ. ৭

কবিতাভবনের আবহাওয়া

তাঁর বড়ো হয়ে ওঠার কালে কেমন ছিল কবিতাভবনের আবহাওয়া তার বর্ণনা করেছেন বুদ্ধদেবের প্রথমা কন্যা মীনাক্ষী দত্ত :

“লোকের ভিড়ে আমাদের ২০২ সদাই উপচে পড়তো। পরীক্ষাব পড়া তৈবি করতে যেতে হ’তো সিঁড়িতে। কখনো বা রান্নাঘরে। ইশকুল, ইশকুলেব পড়া, পবীক্ষা এ-সবের উপর তেমন কোনো চাপ ছিলো না আমাদের। এসবের যে কোনো দাম আছে তা বুঝিনি ছেলেবেলায় [মীনাক্ষী ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৫০ সালে] ।...

অত লোক, অত আড্ডা, হৈ-চৈ-এর আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের বাড়ির সব কিছু চলতো কাঁটায়-কাঁটায়। বাবার ঘড়ি ধ’রে কাজ করার অভ্যেস। ... নটার মধ্যে প্রাতরাশ, দক্ষিণের বারান্দায় খাবার টেবিল। দেড়টায় দুপুরের খাওয়া। মাঝে অবশ্য বেশ কয়েকবার চা। সকালে খাবার পরেই বাবা বসতেন কাজে, মা যে কখন কীভাবে লিখতেন জানি না। বাবার কাজটারই আমরা মূল্য দিয়েছি চিরকাল, বাবার কাজ, বাবার প্রয়োজন, বাবার ইচ্ছে, বাবার ভালোলাগা — তার উপরে কিছু নেই।... লেখার সময় খুব কমই বিরক্ত করা হ’তো তাঁকে। তাই একসঙ্গে ব’সে খাওয়াটা ছিলো আমাদের সকলের জীবনের প্রধান আনন্দ।...

... অনেক সময় ভোররাতে ঘুম ভেঙে দেখেছি বাবা আলো নিভিয়ে শুতে আসছেন। লেখার সময় বাবা পায়ের দুই আঙুলের নখ বাজিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করতেন, যেটা আমার প্রিয় শব্দ, কানে বাজে। বাবাকে শুতে ঘুমোতে দেখিনি দিনের বেলায়, সাড়ে পাঁচটায় চা দেয়া হ’তো, তার আগে টেবিল থেকে উঠে দশ-পনেরো মিনিটের জন্য শুতেন হয়তো। বাবাকে খালি গায়ে দেখিনি কখনো।

রোজ সন্ধ্যায় স্নান করে পাট ভেঙে আদ্দির পাঞ্জাবি আর ঢিলে পাজামা পরতেন, পরিষ্কার রুমাল থাকতো পকেটে, পায়ে থাকতো টুকটুকে লাল বিদ্যাসাগরী চটি।...

আমি জীবনে একবার এক মাসের জন্য বাবার কাছে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন আমার বয়েস বারো। তখন অবধি আমি কী পড়ছি, কোথায় পড়ছি দেখার অবকাশ বাবার হয়নি। ছেলেবেলায় মা-ই দেখতেন ওসব... আমি আর রুমি বাড়িতে পড়তাম কবি নরেশ গুহর কাছে... বানান, ব্যাকরণ, অঙ্ক ইত্যাদি জঘন্য বিষয়গুলো কিছু শিখিনি, গোখেলে গিয়ে ইংরিজি পরীক্ষায় ফেল করলাম — গ্রামার কিছুই পারিনি, কাকে বলে পারফেক্ট টেন্‌স, আর কাকে বলে ইমপারফেক্ট তা কে জানে। তাছাড়া চিঠি লিখতে dear বানান deer লিখেছিলাম, বাবা সারা পথ আমাকে কী বকাবকিই না করলেন... যাই হোক, তারপর এক মাস পড়ালেন আমাকে, শেষের দিকে— রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র থেকেও ইংরিজি অনুবাদ করতে পারতাম, এর পরই বাবার সেক্রেটারির পদ পেলাম— মাসিক দুটাকা মাইনেতে। কাজ কিন্তু ছিলো প্রচুর, 'কবিতা' পত্রিকার কাজ, বাবার পাণ্ডুলিপিও কপি করতাম। 'তিথিডোর' পুরোটা কপি করেছিলাম। এক মাস বাদে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হলাম ডায়োসেশনে।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

একটি মাত্র বই বেরোল এ-বছর— নিজের ছোটোবেলা অবলম্বনে রচিত উপন্যাস 'অন্য কোনখানে'। ভূমিকার শেষ লাইন : "বইটি ছোটোদের উপন্যাস, কিন্তু লেখকের ইচ্ছা বড়োরাও পড়েন।" এই বইয়ের সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার ছেলেবেলা'র। দুটি বই পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লে বুদ্ধদেবের শৈশবরহস্যের অনেকগুলো সূত্র কৌতূহলী পাঠককে ধরা দেবে।

বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন কনিষ্ঠা কন্যাকে। উৎসর্গপত্রের চার পঙ্‌ক্তির ছোট্ট ছড়াটির মধ্যে দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবনকে দেখবার ভঙ্গি :

"ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছো ব'লে
রুমি, তোমার এত দুঃখ কেন?
বুড়ো হওয়া যেমন-তেমন হোক,
বড়ো হওয়াই সবার ভালো, জেনো।"

১৯৫১ ।। বয়স তেতাল্লিশ

স্টেটসম্যান পত্রিকার কাজে ইস্তফা

নরেশ গুহকে লেখা চিঠি :

চাইবাসা

১৯ অক্টোবর ১৯৫১

"... সম্প্রতি আমি স্থির করেছি যে স্টেটসম্যানেব সম্পাদকীয় লেখার কাজ ছেড়ে দেবো। ওতে এই দুই বছরে আমার ভিতবেব দিকের প্রভূত লোকশান হয়েছে —তার মেরামতেও কম দিন লাগবে না। অথচ ছেড়ে দিলে সাংসারিক দিকে আপাতত ক্ষতির আশঙ্কা খুব।... তাছাড়া ইংবেজি ভাষাটার উপবেও আমার একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা হয়েছে— আমি নিশ্চয় জানি স্টেটসম্যানের কর্মই তাব কারণ, এবং এও জানি যে ইংবিজি ভাষাকে ভালোবাসাব জন্যই ও-সব ছাডতে হবে। সাংবাদিকতা সাহিত্যেব শত্রু। সাবধান!

আবো একটি কথা আমি ভেবেছি। আমি বাডিতে বসে বি. এ. পরীক্ষার্থী দুটি তিনটি ছাত্রছাত্রী পডাতে পাবি। তুমি তোমার কলেজে এবং বন্ধুদেব সাহায্যে অন্যত্র এ-বিষয়ে খোঁজ কবিযো।... যদি আমি সাহিত্যে না ফিরতে পাবি তাহ'লে আমাব সুখ শান্তি স্বাস্থ্য কিছুই হবে না— তার জন্য যে-কোনো উপায় ববেণ্য।"

—'কলকাতা পত্রিকা', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা :
ডিসেম্বর ৫৮-জানুয়াবি ৬৯

রোজ আপিশেও যেতে হত না; সপ্তাহে একটি সম্পাদকীয়— বাড়িতে বসে লিখে, পাঠিয়ে দিলেই মিটে যেত। সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে, বরং ছাত্র পড়াতেও রাজি আছেন তিনি— তবু, যে-কাজে তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষতি হচ্ছে সে-কাজ তিনি কোনো মূল্যেই করতে প্রস্তুত নন।

'কবিতা' পত্রিকায় বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হল ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০। কবিতার পরের সংখ্যাটি ছিল বিশেষ মার্কিন সংখ্যা— সেটিকে টপকে, পরবর্তী চৈত্র ১৩৫৭ সংখ্যায় বিভূতিভূষণের উপর শোকপ্রস্তাব লিখলেন বুদ্ধদেব বসু।

"বাংলার আধুনিক লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন

অজাতশত্রু। তাঁর সমসাময়িক অনেকের বিষয়েই মতভেদ ঘটছে— কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুরন্ত মতভেদ— কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রতিকূল পাঠকের অস্তিত্ব কখনো শোনা যায়নি। তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশমাত্রই সারা দেশের চিত্তহরণ তিনি করেছিলেন। সে-সময়ে এমন কেউ ছিলেন না— সাধারণ পাঠক কিংবা বিদ্বজ্জন, বিদ্রোহী তরুণ কিংবা প্রবীণ সুনীতিকাতর আচার্য— 'পথের পাঁচালী'র প্রশংসায় যিনি পঞ্চমুখ নন, তৎকালীন নবাগতের মধ্যে এই একজনের অভ্যর্থনা ছিলো সর্বত্র অবারিত। সর্বসম্মতিক্রমে কোনো সদগ্রন্থের এমন আশু সমাদর বিরল।

আধুনিক বাংলা গদ্যের, এবং কথাসাহিত্যের দুটি প্রধান ধারা লক্ষ্যণীয়। একটির উৎস বলা যেতে পারে বঙ্কিম-শরৎ, অন্যটির— যদিও রবীন্দ্রনাথ পূর্বযুগে বঙ্কিমের এবং শরৎচন্দ্র বহুলত রবীন্দ্রনাথের অধমর্ণ— অন্যটির উৎস রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী। এই বিচারে সমসাময়িক অনেকেরই গোত্রনির্ণয় সম্ভব, কিন্তু বিভূতিভূষণ এর বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। রবিচক্রে তিনি ধরা দেননি, আবার পল্লীজীবনের রূপকার হয়েও কদাচ তিনি শরৎপন্থী নন, এবং তার সমসাময়িক কোনো পল্লীকথকের সঙ্গেও কোনো সাদৃশ্য তাঁর ধরা পড়ে না। সমাজসংস্কারে তার অনীহা, স্বদেশপ্রেমের ভাবালুতাও তাকে আবিল করেনি। তাঁর রচনার স্রোত অবাধ সমতলে ধীর লয়ে প্রবহমান, সেখানে কোনো ঘটনাই অসাধারণ কিংবা চমকপ্রদ নয়, আবার কিছুই অস্বাভাবিক নয়, কোনোটাই তুচ্ছ নয়, এমনও কিছু নেই যা অচিরেই পুরোনো হয়ে যাবে।

বাংলার অমিশ্র ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনিই বোধহয় একমাত্র যিনি প্রকৃতিচেতন, প্রকৃতিপ্রেমিক। প্রকৃতিপ্রেমে সমসাময়িক ক্ষেত্রে শুধু জীবনানন্দ দাশই তার তুলনীয়,— এবং এই কারণেই, বাস্তবের অপরিসর গণ্ডি সত্ত্বেও, তার রচনায় আমরা আন্তরিক ব্যাপ্তি অনুভব করি, স্থানকালের সীমা-পেরোনো কোনো বৃহতের উপস্থিতিতে মন আমাদের মুক্তি পায়। শুধু অরণ্যপর্বে নয়, তাঁর রচনার সর্বত্রই এই লক্ষণ বিরাজমান ব'লে তাঁর কাহিনীর চরিত্র এবং ঘটনাবলি চিরন্তনের পটভূমি থেকে চ্যুত হয় না।"

'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত

মূলত আর্থিক অসদ্ভাবের ফলেই, 'কবিতা'র প্রকাশ খুব অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। বুদ্ধদেব প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন অবস্থাটা সামাল দেবার। সেই চেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে :

" 'কবিতা'র এই আশ্বিন সংখ্যা চৈত্র মাসে বেরোলো। চৈত্র সংখ্যার আর সময় হবে না, এর পরেই আষাঢ় সংখ্যা প্রকাশিত হবে— আশা করছি যথা সময়েই। এই আষাঢ় সংখ্যাই সপ্তদশ বছরের প্রথম সংখ্যা, এবং এর পর থেকে পত্রিকা প্রকাশ যাতে নিয়মিত হয়, সে-উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হয়েই আমরা নতুন বছর আরম্ভ করছি। এই সংকল্পসাধনের জন্য আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকদের

সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি। গ্রাহকদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই তাঁরা যেন ভি-পি-র অপেক্ষায় না-থেকে মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠিয়ে দেন। যাঁরা স্টলে পত্রিকা কেনেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানাই গ্রাহক হ'তে, এবং 'কবিতা'র অনুরাগী পাঠক যেখানে যাঁবা আছেন তাঁদের সকলের কাছে আমার নিবেদন এই যে তাঁরা যেন বন্ধুমহলে দু-একজন ক'রে গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সাহিত্য-পত্রিকার ঘোর দুর্দিন এখন; ইংলণ্ডে 'হরাইজন' চললো না, একমাত্র কবিতা-পত্রিকা 'পোইট্রি লন্ডন'ও সেদিন বন্ধ হ'লো। ইংরেজির মতো প্রবল ভাষায় যখন এই দশা, তখন — ভাবতে আনন্দই হয়— যে বাংলাভাষায় সাহিত্যপত্রের ধারাটি এখনো বন্ধ হয়নি। অন্তত, 'কবিতা'র মতো পত্রিকা যে ষোলো বছর ধ'রে চলতে পারলো, একে বাঙালির দুর্মর সাহিত্যপ্রীতিরই প্রমাণ ছাড়া আর কী বলা যায়। এই প্রীতির উপব নির্ভর করেই আমরা নতুন বছরের যাত্রারম্ভ করলাম।"

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

দ্রুতপরম্পরায় কয়েকটি উপন্যাস লিখে উঠলেন, দ্রুতপরম্পরায় ছেপে বেরিয়ে গেল। বৈশাখ ১৩৫৮ তে বেরোল 'মনের মতো মেয়ে', জুলাইতে 'নির্জন স্বাক্ষর'। 'অদর্শনা' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ বেরোল 'তুমি কি সুন্দর' নাম নিয়ে। ছোটোদের উপন্যাস বেরোল 'তাসের প্রাসাদ'।

১৯৫২ ।। বয়স চুয়াল্লিশ

প্রথম একা বাড়ির বাইরে

বছরের মাঝামাঝি নাগাদ পুরোনো আমাশয় বোগের প্রাক্-চিকিৎসা পরীক্ষাদির জন্য কয়েকদিন স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন-এ গিয়ে থাকার প্রয়োজন হল— পরামর্শ দিয়েছিলেন পুরোনো বন্ধু হুমায়ুন কবির, তিনি তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। প্রতিভা বসু লিখেছেন :

> "হুমায়ুন কবিরের পরামর্শেই ট্রপিকালে গিয়ে একটি কক্ষে থেকে সমস্ত কিছু চেক আপের জন্য ভর্তি হলেন। নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও থাকা বুদ্ধদেবের সেই প্রথম। যাবাব আগেব দিন রাত্রিবেলা আমি তাঁর সুটকেস গুছিয়ে দিয়ে বললাম, ঘর থেকে যদি কোথাও বেবোও তবে যাবার আগে সুটকেসটাকে চাবি দিযে যেও। এ কথায় বুদ্ধদেবের হতচকিত অবস্থা। চাবি দিতে হবে? সে কী? চাবি আবার কেমন করে লাগাবো? তারপব ঘন্টাদুই ধ্বস্তাধ্বস্তির পবেও চাবি লাগাতে শিখতে পারলেন না তিনি। ঘর্মক্ষরণই সার হল।
>
> তিন দিন পরে পালিয়ে এসে হাজির। বিশ্রী লাগে থাকতে সুতরাং পরীক্ষা নিরীক্ষা কিছুই হল না।"
>
> —*জীবনের জলছবি*। পৃ. ১৮৯

এই সময়ে বুদ্ধদেবের জীবনের নিদারুণ অর্থসংকটের কালে, যে একজন বান্ধব তাঁকে সত্যি সত্যি সহৃদয়তার সঙ্গে সাহায্য করেছেন, তিনি হুমায়ুন কবির। বুদ্ধদেব সেকথা সকৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায় (দ্র. ১৯৩৬ : পি. ই. এন. ক্লাবের ভোজসভার বর্ণনা)। অধ্যাপনা তো আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, গত বছর ছেড়েছেন 'স্টেটসম্যানে'র সম্পাদকীয় লেখার কর্মও। বই তাঁর কোনোকালেই খুব বেশি বিক্রি হয় না। কবিতাভবন প্রকাশনা করেও, ধারই বেড়েছে শুধু। গত বছর নরেশ গুহকে লেখা চিঠিতে দেখেছি, বাড়িতে বসে ছাত্র পড়িয়ে কিছু রোজগার করা যায় কিনা এই জল্পনা করছেন। এই অবস্থা বুদ্ধদেব তাঁকে জানানো মাত্র কবির তাঁকে "নিশ্বাস ফেলার সময় ক'রে দিলেন", য়ুনেস্কোর একটি প্রকল্পের সঙ্গে তাঁকে ছ-মাসের জন্য যুক্ত করে।

প্রকল্পটি ছিল 'সেমিনার অন অ্যাডাল্ট এডুকেশন'। বয়স্কদের যাঁরা শিক্ষক হবেন তাঁদের শিক্ষাদান করতে হবে— শিক্ষাদানের পদ্ধতি স্থির করতে হবে।

তিন মাস দিল্লিতে, তারপর তিন মাস মহিশূরে। শীতকালে বুদ্ধদেব দিল্লি চলে গেলেন। কলকাতায় তখন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন চলছে— প্রতিভা বসুর পরিচলনায় রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটি সেখানে মঞ্চস্থ হবার কথা। নাটক হয়ে যাবার পর প্রতিভা বসুও সন্তানদের নিয়ে দিল্লি চলে গেলেন।

> "নাটকটি হয়ে যাবার পরে আমরা দিল্লি গেলাম। সেখানে বঙ্গভবনে আমাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।... লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আমাদের সেইখানেই প্রথম আলাপ হয়। সন্তোষ ঘোষ বোধহয় তখন সেখানে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে ছিলেন, 'কিনু গোয়ালার গলি' বইটি লিখে খুব নাম করেছেন। আরও দুজনেব সঙ্গে আমার নতুন আলাপ হল, তার একজন অধ্যাপক রবি দাশগুপ্ত, আর একজন স্টেটসম্যানের অমলেন্দু দাশগুপ্ত।... বুদ্ধদেব আড্ডা ছাড়া থাকতে পারতেন না, এঁদের সবাইকে নিয়ে শীতকালে ভালো আড্ডাই জমত। তখন রবি সেনও ছিলেন সেখানে। হুমায়ুন কবির তো আছেনই। আরও একজন ছিলেন, শান্তিনিকেতনের অনিল চন্দ। তিনি তখন সেখানে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদিন সস্ত্রীক অধ্যাপক অমলেন্দু বসুও এসে গেলেন। তিনটে মাস নির্মল জলস্রোতেব মতো কেটে গেল।
>
> —তদেব, পৃ. ১৯৫

এই সময় নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি থেকে—

বঙ্গভবন, নিউ দিল্লী

২৫.১.৫৩

> "... দিল্লীতে এসে অবধি সম্পূর্ণ অলস জীবন যাপন করছি। বোদলেয়াবেব আলস্য এ নয়, 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র রবীন্দ্রনাথেরও না, যখন মানুষ কোনোবকম 'কাজ' না-ক'রে ভিতরে-ভিতবে প্রাণের আবেগে স্পন্দিত হ'তে থাকে— এ যদি সেই আলস্য হ'তো তাহ'লে তোমরাও ঝুড়ি-ঝুড়ি চিঠি পেতে, আমার খাতাও ভ'রে উঠতো,[১] এবং আমার জীবনের আনন্দের অবধি থাকতো না। কিন্তু সেই আনন্দের যখন অবসান হয়, তখনই মানুষ সুখে থাকার চেষ্টা করে। নিজের সম্বন্ধে বরাবর আমার এই ধারণা যে আমি মজুর প্রকৃতির মানুষ— কোনো কিছু না-ক'রে থাকতে পারি না, কুঁড়েমি করার প্রতিভা আমার নেই। কিন্তু দিল্লিতে দেখছি বিনা কাজে, অথচ বাঁশি না-বাজিয়ে, দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছে : সকালে চা-রুটি-ডিম খেয়ে তথাকথিত কর্মস্থলে যাই, তথাকথিত কাজ সেরে দুপুরবেলা ফিরে আসি, খেয়েদেয়ে হয় পুরানা কিল্লা লাল কিল্লা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো, নয়তো বাইরে রোদ্দুরে অথবা ঘরের মধ্যে তাপযন্ত্রের ধারে ব'সে-ব'সে আনমনাভাবে

১. এই সময় দীর্ঘ দিন কবিতা লিখতে পারছিলেন না, সেই বেদনা তির্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে এখানে। এই সময়ের কিছু পর থেকে 'যে আঁধার আলোর অধিক' গ্রন্থের কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন— বন্ধ্যাত্ব কেটে যায়।

বইয়েব পাতা ওল্টানো— এ ছাড়া নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কেনাকাটা ইত্যাদিতে দিনেব পব দিন মসৃণভাবে গড়িযে চলেছে— দেখতে-দেখতে জানুযাবি মাস প্রায় শেষ হ'যে এলো। অথচ কুঁড়েমি কবাব প্রতিভা যে আমাব নেই, এ-কথাটা এখনো সত্য থেকে যাচ্ছে, এই অবস্থাব মধ্যে ভিতবে-ভিতবে একটা সূক্ষ্ম কিন্তু ভুলতে-না-পাবা অতৃপ্তি খোঁচা দিচ্ছে মাঝে-মাঝে— সেটা যখন থেমে যাবে তখনই একেবাবে নিশ্চিন্ত হ'তে পাববো।...”

—'কলকাতা পত্রিকা'। বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা। ডিসে. '৬৮-জানু. '৬৯

তিনমাস দিল্লিতে কাটিযে মহিশূবে গেলেন এপ্রিলে। প্রতিভা বসু লিখেছেন :

“... তাবপবে তিন মাস মাইসোব। ছেলেমেযেদেব তখন গ্রীষ্মেব ছুটি ছিল। বুদ্ধদেব যাবাব পবে অবশ্য আমাকে এই ছুটিটাব জন্য কিছুদিন আটকে থাকতে হযেছিল কলকাতায, কিন্তু খুব বেশিদিন নয। মাইসোবেব মতো একটি সুন্দব শহব জগতে দুর্লভ।... বঙ্গভবনেও আমবা যথেষ্ট আবামে ছিলাম। বয বেযাবা বাঁধুনি সবই ছিল, তথাপি মাইসোবেব মতো আবামেব সঙ্গে প্রতিযোগিতায বঙ্গভবন অনেক পিছনে। .. বাজবাড়িব গাড়ি এসেছে নিতে। ড্রাইভাব বিশিষ্ট পোশাকে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে দবজা খুলে দিযে নমস্কাব জানালো। বাজা না হযেও বাজাব ভাব দিযে ছেলেমেযে নিযে আমবা গাড়িতে উঠে গদিতে ডুবে গেলাম। গাড়ি আমাদেব নিযে মস্ত বড় গেট দিযে কৃষ্ণচূড়াব আগুন ঘেবা বিশাল একটা কম্পাউন্ডে ঢুকল। সেই কম্পাউন্ডেব মধ্যে দেখলাম সুন্দব সুন্দব সব একতলা বাংলো দূবে দূবে অবস্থিত। আমাদেব নিযে গাড়িটি সেই বকমই একটি বাংলোতে এসে থামল। শোনা গেল এখানকাব সব বাংলোই মিনিস্টার্স কোযার্টাব। আমাদেব যে বাংলোতে এনে নামালো সেটি চীফ মিনিস্টাবেব জন্য হযেছে। বাড়িটি বৃহৎ। কক্ষের সংখ্যা কতগুলো ছিল মনে নেই। আমবা খানচাবেকেব বেশি ব্যবহাব কবতাম না।”

—*জীবনেব জলছবি*। পৃ. ১৯৫

সাত বছবের পুত্রকে লেখা একটি চিঠি :

ট্রেনে—
১১ নভেম্বব ১৯৫২

পাপপা,

ট্যাক্সিতে আসতে-আসতে মনে পড়লো যে খুব জরুরি দুটো একটা বই নিযে আসা হয়নি। বেজায় মন-খাবাপ হ'য়ে গেলো। তোমার কাকা আমার জন্য যে-খাবার অর্ডাব দিয়েছিলেন, জোর ক'রেই তা খেয়ে নিয়ে একদম ভালো ছেলের মতো আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। সেবার কিনা গরম জামা আনিনি, তাই খুব শীত ছিলো, আর এবাব লেপের তলায় বেশ গরমই লাগলো রাত্তিবে, পাখা চালাতে হ'লো। আজ সকালবেলায় মোগলসরাই ছাড়িয়েও শীতের পাত্তা নেই। বাইরে ঝকঝকে রোদ—আর কলকাতায় কি কালকেই মতোই মেঘলা, আর কনকনে হাওয়া? ঐ মেঘলা দিনগুলো, যা-ই বলো, ভালোই লাগে আমার।

আমি এখন রেস্তোরাঁ কারে ব'সে চা খাচ্ছি, আর তোমাকে চিঠি লিখছি।

গাড়ি বেজায় দুলছে, সেইজন্যে হাতের লেখার এই ছিরি! সাড়ে-আটটা বাজলো, তোমার দিদি বোধহয় এতক্ষণে সারা বাড়ি উথালপাথাল ক'রে কলেজের জন্য তৈরি হচ্ছে, ছোড়দি মাস্টার মশাইর টাস্ক নিয়ে আমার টেবিলটা দখল ক'রে আছে, আর তুমি তোমার মা-র ডেস্কোটি পেতে ট্রানশ্লেশন করছো—করছো তো? রোজ এক পাতা ক'রে ক'রে রেখো—আমি ফিরে গিয়ে দেখবো। আর খানিক পরেই তোমরা ব্যাডমিণ্টন খেলতে উঠোনে চ'লে যাবে, আর তোমরা যতক্ষণে ভাত-টাত খেয়ে উঠবে, আর তোমার মা পান মুখে দিয়ে বই হাতে নিয়ে শোবেন, আমার গাড়ি ততক্ষণে পৌছে গেছে কানপুর—আর আমি মনে-মনে ভাবছি যে মাত্র দেড়খানা বই নিয়ে এতটা সময় কাটবে কেমন ক'রে—হায, হায়, মহাভাবতটা যদি আনতুম।

তোমার বাবা

'আরো কবিতা পড়ুন' আন্দোলন : 'কবিতা' পত্রিকার প্রতিক্রিয়া

অরুণ সরকার প্রমুখ কিছু তরুণ কবি এই সময় 'আরো কবিতা পড়ুন' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। আন্দোলন মানে আর কিছু নয়; আপিশ ছুটির মুখে ধর্মতলার মোড় বা ওইজাতীয় কোনো ভিড়াকীর্ণ অকাব্যিক জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন মিলে 'আরো কবিতা পড়ুন' জাতীয় আওয়াজ তুলে, কিছু লোকজন নিজেদের চারিপাশে আকষ্ট করে এনে তারপর কবিতা পড়ে শোনানো। প্রত্যাশিতভাবেই, বেশির ভাগ কাগজে এঁদের নিয়ে নানারূপ ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশিত হল। আশ্বিন ১৩৫৯ সংখ্যা 'কবিতা'য় এঁদের সম্পর্কে লেখা হল :

"কবিতা নিয়ে সম্প্রতি যে-অভিনব আন্দোলন চলেছে সেটি আলোচনার অযোগ্য নয়। শনিবারের বিকেলে, আপিশ-ছুটির ভিড়ের মধ্যে, কলকাতার ফুটপাতে হঠাৎ রোল উঠলো, 'কবিতা পড়ুন! আরো কবিতা পড়ুন! কবিতা না-পড়লে বাঙালি বাঁচবে না!' আর অমনি ভিড় জ'মে উঠলো চারদিকে, আর একদল যুবক কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাতে লাগলেন— যদি-বা তাতে হঠাৎ কারো মনের কোনো বন্ধ জানালা খুলে যায়। এই রকম দুটি পথ-চলতি সভার আমরা খবর পেয়েছি এ-পর্যন্ত, একটি এসপ্ল্যানেডে, অন্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, এবং ভবিষ্যতে শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও এর পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা আছে ব'লে শুনেছি। এ নিয়ে কাগজে-কাগজে কিছু ঠাট্টা বেরিয়েছে— সংবাদপত্রাদির কাছে তা ছাড়া কিছু আশা করাই যায় না; আর যাঁরা কবিতা ভালোবাসেন তাঁরা কেউ-কেউ আপত্তি করেছেন এই ব'লে যে এতে কবিতার জাত নামিয়ে দেয়া হ'লো। আমি জানি না কবিতার জাত কিসে যায়, ফুটপাতে নেমে এলে, না কি দোতলা তেতলা স্কুল কলেজে ক্লাশ-পড়ানো পাশ-করানো যন্ত্রের ছিবড়ে হ'য়ে বেরিয়ে এলে; অন্তত, দেশের মধ্যে যখন তরুণ রক্তের উৎসাহ অধিকাংশই ধাবিত হচ্ছে সিনেমা এবং

'লারেলাপ্পা'-প্রমুখ শুঁড়িখানার উপযোগী সংগীতের দিকে, তখন একদল যুবকের এই কাব্যোন্মাদনার খবরে উৎফুল্ল হবো না এত বড়ো আভিজাত্যবিলাসী আমি নই। তা ছাড়া তাই বা কী ক'রে বলা যায়; কবিতা নামক একটা পদার্থের যে অস্তিত্ব আছে সে-বিষয়ে যদি প্রকৃতিস্থ এবং পদস্থ ভদ্রলোকেরা যৎকিঞ্চিৎ সচেতন হ'য়ে ওঠেন, তাই বা মন্দ লাভ কী।..."

কবিতা বিষয়ক নতুন পত্রিকার খবর

"ইতিমধ্যে কবিতার পত্রিকা, বা সংকলনও নতুন বেরিয়েছে। একটি নয়, দুটি নয়, পরপর একেবারে তিনটি। 'শতভিষা', 'কবিতাপত্র', তারপর 'সব শেষের কবিতা'। (এদিকে 'একক' কিছুদিন বন্ধ থাকার পরে আবার বেরোচ্ছে ব'লে শোনা গেলো।) নতুন পত্রিকা বা পুস্তিকা তিনটি আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু পাতা উল্টিয়ে অনেক নতুন নাম চোখে পড়লো, কাব্যের ক্ষেত্রে উদ্যমীদের সংখ্যা মনে হচ্ছে দ্রুত বিবর্ধমান। ভালোই; এঁদের মধ্যে ক-জন বয়ঃসন্ধির ফাঁড়া কেটে গেলে আর কবিতা লিখবেন জানি না, কিন্তু আশা করা যায় এঁরা সকলেই কবিতার অনুরাগী থাকবেন — বিষয়টাকে ভালোবাসতে শেখারও একটা উপায় হাতে-কলমে কিছু চর্চা করা। অর্থাৎ, বাংলা কবিতার পাঠকসংখ্যা যে বাড়ছে তার একটি নিশ্চিত প্রমাণ এতে পাওয়া গেলো। 'সব শেষের কবিতা' নামটি খুব কু-নির্বাচিত হয়েছে— কবিতার কি কোনো শেষ আছে? আর 'কবিতাপত্র' নামটিতে আপত্তি করি অন্য কারণে, 'কবিতা' আর 'কবিতাপত্রে' তফাৎ খুব স্পষ্ট নয় ব'লে। ঐ নামের পরিবর্তন প্রয়োজন।..."

—তদেব

'কবিতা' পত্রিকার নিজের খবর

"১৩৫৯-এর আশ্বিনে 'কবিতা'র অষ্টাদশ বছর আরম্ভ হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু আরম্ভ হলো সপ্তদশ বছর। কিছুদিন ধরে অনিয়মিত প্রকাশের পর শেষরক্ষা করা হ'লো একটা বছর টপকে গিয়ে, পুরোনো গ্রাহকেরা এই ত্রুটি মার্জনা করবেন। আপাতত এইটেই সুখের কথা যে আশ্বিনেই আবার বছর শুরু করা গেলো, এবং এরপর থেকে নিয়মিত প্রকাশে আর বাধাও হবে না আশা করছি।"

—তদেব

'কবিতা' পত্রিকার বিজ্ঞাপন

'কবিতা' পত্রিকার শুধু কবিতা নয়, শুধু প্রবন্ধ বা পুস্তক-সমালোচনা অথবা সম্পাদকীয় মন্তব্য নয়— বিজ্ঞাপনের ভাষার উপরেও বুদ্ধদেব বসু তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। মনে হয়, অনেক সময় বিজ্ঞাপনের কপিও নিজেই লিখে দিতেন তিনি।

নিচের এই বিজ্ঞাপনের কপিটির গদ্য বুদ্ধদেবীয় সৌরভে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে একে বুদ্ধদেব ছাড়া অন্য কারো রচনা বলে মনে করা কঠিন :

"ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সংগতি রেখে সুর-সংযোজনা ভারতীয় সংগীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ-বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় সংগীতেব এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধ'রে শিল্পী রাগরাগিণীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে। দিনরজনীর বিচিত্র পরিবেশে সুরসৃষ্টির আবেদনটি এই রূপায়ণে মূর্ত হ'য়ে আছে।

চা

সংগীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রসগ্রহণে দিনক্ষণের বাধানিষেধ নেই। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, সঙ্গ দিয়েছে, দিয়েছে নব-নব প্রেরণা।"

—বিজ্ঞাপন। কবিতা, পৌষ ১৩৫৯

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। পূর্বরেলের এই বিজ্ঞাপনটি এক সময় বেশ কয়েক সংখ্যা ধ'রে কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। এর শুধু গদ্যশৈলী নয়, কোনো-কোনো বানান-পর্যন্ত লাক্ষণিকভাবে বুদ্ধদেবীয়, বলার ভঙ্গিটিও তাঁর ছোটোদের গল্প মনে করিয়ে দেয় :

শ্রীমান লেটলতিফ

আমাদের সেই শ্রীমান লেটলতিফ না? উস্কো-খুস্কো চুল— কাপড়চোপড বেসামাল অবস্থায় একেবারে ঝড়ের মতো শেষ মুহূর্তে স্টেশনে এসে হাজির! টিকিট-ঘরের জানলায় হুমড়ি খেয়ে টিকিটটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে ট্রেন ধরবার জন্য কিরকম পড়ি-মরি ছুট দিয়েছে দেখো। ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে। হাতের সামনে যে জানলাটা পেলো তাই গলিয়েই ঢুকে পড়লো বেচারী! জামার অর্ধেক তো উড়েই গেলো! আর যাদের পা মাড়িয়ে মালপত্র লণ্ডভণ্ড ক'রে শ্রীমান ট্রেন ধরলেন তাদের গালাগাল বিদায় বাণী হিসাবে কেমন লাগলো তা শ্রীমানই বলতে পারবেন। সময় হাতে রেখে স্টেশনে এলে তো এমন দুরবস্থা হোত না।

—বিজ্ঞাপন, কবিতা। চৈত্র ১৩৬৪

১৯৫৩।। বয়স পঁয়তাল্লিশ

শান্তিনিকেতনে : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শান্তিনিকেতনে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে, বসন্তোৎসবকে উপলক্ষ করে আয়োজিত হল একটি সাহিত্যমেলা— সেখানে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি স্মরণীয় সাক্ষাৎকার সংঘটিত হল। এর প্রায় দশ বছর আগে থেকে, আদর্শগত কারণে সুভাষ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, 'কবিতা' পত্রিকায় লেখেন না, কবিতাভবনে যান না। বুদ্ধদেব তাঁর উপর ক্ষুণ্ণ হতেই পারতেন। কিন্তু এতকাল পরে দুজনের প্রথম সাক্ষাৎকার কেমন হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী শঙ্খ ঘোষ :

"...স্বাধীনতার পরের পাঁচ বছরে কী লেখা হল এ-বাংলা ও-বাংলায়, তারই একটা হিশেব নেবার কথা ছিল সে-মেলায় ;... কবিতা নিয়ে কথা হবে আজ। বলবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো অসমবয়সী কবিরা।... কিন্তু না... জানা গেল যে বুদ্ধদেব আজ বলবেন না কিছু। কাল অনেক রাত্রে এসে পৌঁচেছেন উনি, শরীর মন ধ্বস্ত, উনি কেবল হাজির থাকবেন সভায় : মঞ্চ থেকেও ঘোষণা হল দুঃখজনক এই তথ্যের। তাকিয়ে দেখছি বুদ্ধদেবকে, ধূসর একটি চাদর জড়িয়ে শিশুসরল মুখে বসে আছেন, চুল থেকে শুরু করে সাজপোশাকের সবটাই একটু অবিন্যস্ত, শুনছেন তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা।

পাঁচ বছরের কবিতার বৃত্তান্ত বলছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সে ছিল খুব সরাসরি শিবির ভাগের যুগ, বামপন্থী আর অবামপন্থী রচনার দুই স্পষ্ট দল, এ-দলের কাছে ও-দল প্রায় অস্পৃশ্য।... সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায় এল কেবল নতুন-পুরোনো সেই কবিদের কথা, দেশ আর সমাজের বাস্তবকে যাঁরা সরাসরি ধরতে চান তাঁদের লেখায়, কবিতা যাঁদের কাছে ব্যক্তিগত আবেগের উৎসারণ মাত্র নয়।...

প্রবন্ধ পড়া শেষ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নেমে আসছেন মঞ্চ থেকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে, চোখের সামনে ঘটল একটা ঐতিহাসিক বিস্ফোরণ। লাফ দিয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব, ভুলে গেলেন যে সভাপতি আছেন একজন, ভুলে গেলেন যে অল্প আগেই তিনি জানিয়েছিলেন আজ বলবেন না কিছু।...মুখের চেহারা তাঁর পালটে গেছে তখন। একই সঙ্গে ব্যথা আর ক্রোধে ভরা এক স্বরে বলতে লাগলেন তিনি : সুভাষ যা বলে গেলেন, এই যদি হয় সত্যি সত্যি পাঁচ বছরের বাংলা

কবিতাব ছবি, তবে তাব নিতান্তই দুর্দশা ঘটেছে বলতে হবে। কবিতা এক গাঢতব বোধেব জগৎ, ভাত-ভাত কবে সরল চিৎকাব কবলেই সেটা কবিতা হয না —উত্তেজিত গলায সেকথা বোঝাতে চাইলেন তিনি।

...সুভাষ মুখোপাধ্যায নেমে আসছেন মঞ্চ থেকে নিচে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁব কানে পৌছয বুদ্ধদেবেব স্বব, একটু চমকে তিনি পিছন ফিবে তাকান, আব ওইখানেই দাঁড়িযে থাকেন 'ন যযৌ ন তস্থৌ'-এব এক আধুনিক উদাহবণ হযে, বিনীত ছাত্রেব মতো শমিত মুখে শুনে যান সব অভিযোগ। আব, কথা সাঙ্গ কবে চকিতে তাঁব দিকে তাকিযে বুদ্ধদেব যখন বলেন 'সুভাষ, পবে দেখা কোবো আমাব সঙ্গে, কথা আছে আবো,' স্মিত সম্মতি জানান অভিযুক্ত কবি। তখনো জানতাম, এখনো জানি, 'আবো কোনো কথা'য এঁদেব মতসাম্য ঘটবাব বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মতেব ভিন্নতা তীব্রস্ববে জানিযে দিলেও যে ব্যক্তিগত সম্পর্কেব সৌন্দর্য থেকে ভ্রষ্ট হয না মানুষ, তাব এই ছবিটি হযে বইল সাহিত্য মেলাব এক বডো প্রাপ্তি, এবই তো নাম মিলন। সভাব পবে এক বিকশায চলেছেন দুজন কথা বলতে বলতে, এই পর্যন্ত এসে থেমে যায সেদিনকাব স্মৃতি।"

—*এখন সব অলীক*। ১ম সং, পৃ ২৬

প্রথম বিদেশযাত্রা

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগাবে বুদ্ধদেব বসুর কিছু কাগজপত্র রক্ষিত আছে। এর মধ্যে আছে ক্ষুদ্র একটি ইংরেজি আত্মজীবনীর অংশ, এবং আমেবিকা-বাসকালে রচিত একটি জীবনীপঞ্জি— কর্মজগতের পবিভাষায যাব নাম বাযোডাটা। নিজেব অপটু হাতে টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ আকারের পাঁচ ছ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিটি বুদ্ধদেব বিষয়ে অতীব প্রয়োজনীয় দলিল— নানা সংবাদ, এবং নিজেব বিষয়ে নানা মন্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি এখানে পাওয়া যায, ঠিক তুলনীয় কিছু আর কোথাও লেখেননি তিনি। এখানেই দেখতে পাচ্ছি তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন ফুলব্রাইট সংস্থার সম্মান দক্ষিণা নিয়ে ("on a Fulbright award") — তাঁর কর্ম ছিলো পিটসবার্গের পেনসিলভানিয়া কলেজ ফর উইমেন-এ এক বছর (দুটি সেমেস্টার) ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো। আত্মজীবনীতে অন্যত্র লিখেছেন, এই কর্মের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু হুমায়ুন কবির — তিনি তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী (দ্র. 'আমার যৌবন' ১ম সং, পৃ. ১০৯)।

যাত্রা করবেন ২ সেপ্টেম্বর। কিন্তু অনেক সময় গেল ব্যবস্থাপনায়। মহিশূর থেকে ফিরে দিল্লি যেতে হল আবার। এর মধ্যে 'কবিতা' পত্রিকার কথাও ভাবতে হচ্ছে। পত্রিকার দায়িত্ব দিয়ে যাবেন নরেশ গুহকে— কিন্তু যতটা পারেন কাজ এগিয়ে রাখছেন নিজেই। দিল্লি থেকে বিষ্ণু দে-কে লিখছেন :

Banga Bhawan 3 Hailly Road
New Delhi June 10, '53

...এর পরের চৈত্র সংখ্যার জন্য আপনার একটি ছোটো লিরিক জাতীয় মৌলিক রচনা কি দিতে পারেন? সম্প্রতি 'কবিতা'য় অনুবাদ রচনার পরিমাণ কিছু বেশি হ'য়ে যাচ্ছে, আপনার নতুন লেখায় বৈচিত্র্যের সুর লাগবে ব'লেই এই অনুরোধ। লেখাটি আমাকে দিল্লির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে সুখী হবো, চৈত্র সংখ্যা ছাপা হবার সময় আমি কলকাতায় থাকতে পারবো না, সেইজন্য একটু আগে থেকেই উদ্যোগ করা প্রয়োজন।

আশা করি আপনার সপরিবার কুশল। প্রীতি।

বুদ্ধদেব বসু

'কবিতা'র দ্বিভাষিক সংখ্যা

এই বছরের শেষ সংখ্যা 'কবিতা' (আষাঢ় ১৩৬০) প্রকাশিত হল দ্বিভাষিক সংখ্যা হিশেবে। চোদ্দজন বাঙালি (তার মধ্যে একজন পূর্বপাকিস্তানের) কবি ও একজন ইংরেজ কবির মূল কবিতা— তা ছাড়া বারোজন বাঙালি কবির কবিতার ইংরেজি অনুবাদ : আরো ছিল দুটি মুণ্ডা কবিতা ও চারটি সাঁওতাল গানের অনুবাদ। এই নিয়ে উপস্থিত হল দ্বিভাষিক সংখ্যা। সম্পাদকীয়তে লেখা হল :

"In the following pages we present a group of translations from some of the notable Bengali poetry of the present times. The selections are not comprehensive or adequate—that would require the scope of an anthology rather than a magazine— but they do represent the main trends and the more important 'influences' operating on the younger generation of poets. We hope this supplement will serve our non-Bengali readers within and outside India as an introducion to modern Bengali poetry..."

EDITOR

—কবিতা দ্বিভাষিক সংখ্যা। আষাঢ় ১৩৬০

তারপর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল 'কবিতা' পত্রিকার ইতিহাসে। দ্বিভাষিক সংখ্যা আষাঢ় ১৩৬০ নিঃশেষ হয়ে গেল (সাধারণত 'কবিতা' পত্রিকা ৩০০ কপি ছাপানো হত, নরেশ গুহ জানিয়েছেন।) আশ্বিন ১৩৬০ সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল :

'কবিতা'র পুনর্মুদ্রণ

আষাঢ় ১৩৬০

Bilingual Number

কিছু বেশি পরিমাণে ছাপানো সত্ত্বেও প্রকাশমাত্রই কবিতার গত সংখ্যাটি সম্পূর্ণ

নিঃশেষিত হয়েছে। কাজেই যাঁদের ইচ্ছে ছিল তাঁদের মধ্যে অনেকেই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারেননি। বিদেশ থেকেও যত কপির অর্ডার এসেছিল তার একাংশ মাত্র পাঠানো সম্ভব হয়েছে। নতুন বাংলা কবিতা ছাড়াও এ-সংখ্যায় অতিরিক্ত ছিল বিশিষ্ট বাঙালি কবিদের থেকে ইংরেজি অনুবাদ। অনেকেই সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রণের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। যাঁরা পূর্বে সংগ্রহ করতে পারেননি, কিংবা নতুন করে ছাপানো হ'লে যাঁরা সংগ্রহ করবেন তাঁরা দয়া ক'রে অবিলম্বে চিঠি লিখে আমাদের জানালে সংখ্যাটি আমরা পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে পারি।

কবিতাভবন

এই সংখ্যাতেই (আষাঢ় ১৩৬০) প্রথম প্রকাশিত হল তরুণ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা, 'প্রেমের কবিতা' ("আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে...")। সাত বছরে সুনীলের মোট ন'টি কবিতা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিভাষিক সংখ্যাতেই (আষাঢ় ১৩৬০) বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল, সম্পাদক বিদেশে যাচ্ছেন :

"এই প্রসঙ্গে নিবেদন করি যে আমাকে এক বছরের জন্য বিদেশে যেতে হচ্ছে। আমার অনুপস্থিতি-কালে 'কবিতা'র পরিচালনায় নিযুক্ত থাকবেন শ্রীনরেশ গুহ ও প্রতিভা বসু। আমিও দূর থেকে যথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করে চলবো। ...'কবিতা'র লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও অন্যান্য বন্ধুরা এই পত্রিকাটির উপর যথাপূর্ব স্নেহদৃষ্টি রাখলে আমি নিজেকে বাধিত বোধ করবো এবং কবিতার মধ্যে নিরন্তর উপস্থিত থাকতে আমারও প্রয়াসে কোনো ত্রুটি হবে না।

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদক, 'কবিতা'
কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯

বিদেশে যাবার সময় সংসারের অবস্থা

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ :

"এই সময়টাতে বুদ্ধদেবের শারীরিক মানসিক আর্থিক কোনো অবস্থাই ভালো ছিল না। স্টেট্স্‌ম্যানের কাজটাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। পত্রিকা চালানো, কবিতাভবনের ধার শোধ, নিজের অসুস্থতা এবং আমার অসহায় পিত্রালয়ের ভাবনা সবটা মিলিয়ে দিন চলছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আমার পিতৃদত্ত অলংকাবের শেষতম চিহ্ন একটি নেকলেস ব্যতীত আর কিছুই না থাকায় আমিও সে-বিষয়ে শূন্যের অঙ্কে।

এই বছরের শেষেই তাঁর প্রথম আমেরিকা যাত্রা। এটাও হুমায়ুন কবিরের জন্যই। বুদ্ধদেবের অবস্থাটা তিনি জানতেন। প্রথমটায় বুদ্ধদেব একেবারেই রাজি হচ্ছিলেন না। তার অবশ্য অনেকগুলো কারণও ছিল। তিনটি সন্তান এবং

মৃত্যুপথযাত্রী দিদিমাকে দিয়ে আমাকে কেমন করে ওরকম নিষ্কপর্দক অবস্থায় ফেলে যাবেন? তখন সৌরেনবাবুর আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ চলছিল। কল্যাণীতে কী সব কাজ নিয়ে থাকছিলেন তিনি। আমিই সমানে সাহস দিয়ে রাজি করালাম। বললাম, 'আমি তো স্থানে স্থিতিতেই আছি, আমার জন্য ভাবছ কেন? আমি দেখো ঠিক চালিয়ে নেব। মাত্রই তো একটা মাস, তারপর তুমি মাইনে পেলেই তো আমাকে টাকা পাঠিয়ে দিতে পারবে। একটা মাস আমি কাটাতে পারব না? এরকম সুযোগ ছাড়া কি তোমার উচিত হবে?"

—*জীবনের জলছবি*, ৩য় মু। পৃ. ১৮৮

বুদ্ধদেব যাত্রা করেন সেপ্টেম্বরে। দিল্লির রবীন্দ্রনাথ সেনকে চিঠিতে জানাচ্ছেন (২৬/৮/৫৩) :

"আমি কলকাতা থেকে যাত্রা করছি ২রা সেপ্টেম্বর। লন্ডন, ন্যুইয়র্ক, ওয়াশিংটনে খেয়ে থেকে দশ তারিখ আমার কর্মস্থল পিটসবার্গে পৌঁছবো। সেখানে ভালো লাগবে, এরকম আশা ক'রেই যাত্রা করছি— এখন দেখা যাক।"

—'প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব : কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ভাবনা',
রবীন্দ্রনাথ সেন। ৩০শে নভেম্বর কবিতাভবনবার্ষিকী/২,পৃ. ৬৯

"যাবাব সমযে সত্যিই তিনি আমাকে ঈশ্বরেব হাতে রেখে গিয়েছিলেন। ... বুদ্ধদেবের দিদিমা উত্থানশক্তিরহিত, যাবতীয় কর্মই তাঁর বিছানায় শুযে। পুত্র আট বছবে পা দিলে স্কুলে ভর্তি করা একান্ত প্রয়োজন, পিত্রালয়ের অবস্থা চরম শোচনীয়, বুদ্ধদেবের নিজের দিকে আত্মীয় বলতে পিতা বর্তমান থাকলেও পিতৃদত্ত স্নেহ মমতা ভালোবাসা তো অতি দূরের ঘটনা, ভালো করে পরিচয়ও ছিল না, এই অবস্থায় আমি কী সাহসে তাঁকে যেতে প্ররোচিত করেছিলাম সে কথা ভাবলে আজ আমি নিজেই বিস্ময়ে হতবাক হই। 'কবিতা' পত্রিকার ভারটি তিনি নরেশ গুহর হাতেই দিয়ে গিয়েছিলেন, ধারের ভারটি আমার। কবিতাভবনের অতি যত্নে ছাপানো বইগুলি অতি অনাদৃতভাবে বাড়ির অর্ধেক জুড়ে পড়ে আছে। দপ্তরি প্রত্যেক মাসের মতো বুদ্ধদেব যে মাসে চলে গেলেন সেই মাসেও এসে যখন দাঁড়াল আমার কাছে, বুকটা টিপটিপ করতে লাগল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বই বাঁধাইয়ের জন্য আর কত বাকি আছে তোমার?' দপ্তরি অম্লানবদনে বলল, 'হিসেব তো করিনি বৌদি (তখনো 'বৌদি' ডাক শোনার বয়েস শেষ হযে যায়নি) তবে বাকি অনেক টাকাই আছে। আমি শুনেছি বাবু বিলেত গেছেন কিন্তু আমার সংসার তো এই সব টাকাতেই চলে! কিছু না দিলে তো না খেয়ে মরব।'

আমি বললাম, 'বাবু তোমাকে যে মাসে যা দেন তা তিনি সই করে দেন না?'

'তা দেন।'

'তবে এক কাজ করো। সেই সই করা খাতাটা নিয়ে এসো, আমি দেখে হিসেব করে টাকা দেব।'

'সে নাহয় আনব একদিন। আজ অন্তত দশটা টাকা দিন।'

দশ টাকার মূল্য যে তখন আমার কাছে কতখানি ছিল সে শুধু আমিই জানি। বুদ্ধদেব যেদিন চলে গেলেন আমার হাতে মাত্র চব্বিশটি নগদ টাকা ছিল। বদান্যতায় চারদিকে প্রশস্ত হস্ত সৌরেনবাবু বোধহয় তখন চব্বিশ পয়সারও মালিক ছিলেন না। তবে কল্যাণীতে একটা বেশ বড়সড় রকমের কাজ হাতে পেয়েছেন সেটাই আশা। দশটা টাকার জন্য দপ্তরি যতই জুলুম করুক আমার দেবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং সে-ও যেমন টাকার জন্য জুলুম করতে লাগল, আমিও বুদ্ধদেব এ পর্যন্ত কত টাকা তার কাজের জন্য দিয়েছেন সেই হিসেবটা এনে দেখাবার জন্য ততটাই জুলুম কবতে লাগলুম। শেষে অত্যন্ত রাগতভাবে দপ্তরি বলল, 'আমি খাতা নিযে কালই আসব. হিসেব করে সমস্ত টাকা আমাকে কালই দিতে হবে।' আমি তাতেই রাজি। অন্তত আজকের দিনটা তো কাটুক।

দপ্তরি কিন্তু পরের দিন এল না, তার পরের দিনও এল না, তাব পবের দিনও না।...

তখন যে লোকটি আমার কাছে কাজ করত তার নাম ছিল কালীচরণ, আবো একটি ছেলে ছিল তার নাম গজে, জাতিতে সে নেপালি।... এই গজেই একদিন চলে গেল দপ্তরিব বাড়িতে, তার বাবুর সইওলা খাতাশুদ্ধ ধরে আনল তাকে। দেখা গেল বুদ্ধদেবকে ঠকিযে ভূত করেছে সে। তাঁর কাছে কোনো ধার তো নেইই, বরং অনেক বেশি নিয়েছে। গজের নেপালি রক্ত গরম হয়ে উঠল, এই মারে কি সেই মারে। সোনা লক্ষ্মী বলে ঠাণ্ডা করে আমি দপ্তরিকে বললাম, 'যা বেশি নিয়েছ তা আর ফেরৎ দিতে হবে না, বরং তুমি আমার বই বাঁধাইটা শিখিয়ে দাও।'

তাই দিল। বই বাঁধাই শিখে আমার খুব সুবিধে হয়ে গেল। পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যাওয়া কবিতাভবন প্রকাশিত অনেক বইই আমি আমার কোনো চেনা দোকান থেকে অনেক টুকরো টুকরো, যা তারা ফেলেই দেয় শেষ পর্যন্ত, সেই সব সিল্কেব কাপড় কিনে এনে সব কটা খুলে যাওয়া বই নতুন করে বাঁধিয়ে ফেললাম ঐ সিল্ক দিয়ে, উপরে যামিনী রায়ের ছাপা ছবি কেটে লাগিয়ে দিলাম, দেখতে খুব জমকালো হল। একদম নতুনের মতো হয়ে গেল। গজে গিয়ে যেসব বই দোকানে চার পাঁচ কপি করে দিয়ে এল বিক্রির জন্য। আবার তাগাদায়ও যেতে লাগল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মিমি আমার এই সকল কাজের সঙ্গী হয়ে কলেজ ফেরত সে-ও বিখ্যাত পাতিরামের দোকানে গিয়ে বই দিত, টাকা আনত। আস্তে আস্তে বইগুলো প্রায় বিক্রিই হয়ে গেল। বুদ্ধদেব কত চিন্তা নিয়ে গেছেন টাকার জন্য, তাঁকে লিখে জানালাম, আমাদের কোনো অভাব নেই। আর এদিকে সৌরেনবাবু প্রায়ই আসেন কল্যাণী থেকে, আমাদের দেখতে। তাঁর শূন্য হাতে আমি দশ পাঁচ টাকা গুঁজেও দিই সেই বই বিক্রির টাকা থেকে। দেখতে দেখতে এক মাস কেটে এল। বুদ্ধদেব একদিন অন্তর একদিন চিঠি লেখেন, নিশ্চিন্ত থাকি। চিঠির মধ্যে অবশ্য কোনো ভালোলাগার সুর থাকে না। বাড়ি ছেড়ে আসা বিষয়ে প্রায় বালকদের মতোই তিনি কাতর।

এক মাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ মোটাসোটা একটি চেক সংসার খরচের জন্য এসে পৌঁছল আমার কাছে। চিঠিতে লিখলেন, 'এই টাকাতে সম্পূর্ণ তোমার একলার অধিকার আছে বলে ভেবো না, এই টাকা সৌরেনবাবুরও। তাঁর যা দরকার সেটা যেন তিনি পান এখান থেকে।"

—*জীবনেব জলছবি*, ৩য় মু/পৃ. ১৮৮

আমেরিকায়

বুদ্ধদেবের যাত্রাপথ ছিল দিল্লি-রোম-লন্ডন-প্রেস্টউইক (গ্লাসগো)-শ্যানন (আয়র্লন্ড)-গ্যান্ডার (নিউফাউন্ডল্যান্ড)-বস্টন-ন্যুয়র্ক। এখান থেকে ট্রেনে ওয়াশিংটন হয়ে পিটসবার্গ, তাঁর কর্মক্ষেত্র। এই ভ্রমণ, এবং সে-উপলক্ষে নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথনের অসামান্য বর্ণনা আছে তাঁর দেশান্তর গ্রন্থে। সেখান থেকে, পিটসবার্গে পৌঁছবার বর্ণনা :

"সাঁকোর উপব দিয়ে যখন ট্যাক্সি চলেছে, কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে ঘোলাটে-লাল সূর্য উঠলো। অনেক পথ পেবিয়ে, অনেকবার ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকে ট্যাক্সি আমাকে নিয়ে এলো সেই মহিলা-কলেজে, যেটা বতমানে আমার বাসস্থল এবং কর্মস্থল। কোথায় আমাকে উঠতে হবে তা জানি না ; এখানে একমাত্র যাঁকে চিনি তাঁর বাড়িতেই উপস্থিত হ'তে হলো। তিনিই কলেজের কর্ণধার, মার্কিনি ভাষায় প্রেসিডেন্ট। তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে তাঁরই গাড়িতে আমার জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থলে পৌঁছলাম। তেতলায় ঘর। আমার হাতল-ছেঁড়া সুটকেসটা কেমন ক'রে তেতলায় পৌঁছলো তার একটু বিবরণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলা বাহুল্য, আমাকেই যদি সেটা তুলতে হ'তো, তাহ'লে ঐ প্রয়োজনীয় বস্তুটার সঙ্গে ওখানেই বিচ্ছেদ ঘ'টে যেতো আমার ; সেই দুর্ঘটনা এড়ানো গেলো প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সৌজন্যে। তিনিই সেটাকে ঘাড়ের উপর তুলে এক দমে তেতলায় নিয়ে এলেন—মৌখিকতম ভদ্রতা ক'রেও কোনোরকম প্রতিবাদের আভাসমাত্র প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো না আমার পক্ষে।...

এবার তাহ'লে গুছিয়ে বসতে হয়। বাক্স খুলে কাপড় বের করলাম, তালতলার চটি, বই, লেখার কাগজ। টেবিলটি একটু সরিয়ে নিলাম জানলার দিকে, দেরাজে দু-একটা জিনিশ রেখে ঘরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা গেলো। আর তারপর হঠাৎ যেন আর-কিছুই করবার থাকলো না। ব'সে-ব'সে সময় কেটে গেলো, সূর্য হেলে পড়লো পশ্চিমে, একটি হালকা, নরম গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়লো আকাশে, আর সেই আকারের গায়ে কঠিন হয়ে ফুটে রইলো পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁটে, কালো স্কাইস্ক্রেপারটা, যেন কোনো দৈত্যের তর্জনীর অপ্রতিহত সংকেত। সেই দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম যে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই সূর্য কলকাতার আকাশে দেখা দেবে।"

—*দেশান্তর*, ১ম সং। পৃ. ৭৫

পিটসবার্গ ভালো লাগেনি বুদ্ধদেবের। নরেশ গুহকে চিঠিতে লিখেছেন :

"পিটসবার্গ বড্ড মন-খারাপ করা জায়গা। শহরের জৌলুষ নেই, গ্রামের রমণীয়তাও নেই। ন্যুইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে হ'লে আমার প্রবাস আরো সার্থক হতো। কলেজেব মধ্যে সাহিত্যের হাওয়া তেমনভাবে বয় না। শুধু একজন দক্ষিণ-মার্কিনিব দেখা পেযেছি, তিনি 'তাগোব'কে 'অ্যাদোব' কবেন, খুব ভালো লাগলো মানুষটিকে।"

পিটসবার্গ, ১৯.৯.৫৩

—'কলকাতা পত্রিকা', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা। ডিসে '৬৮-জানু '৬৯, পৃ. ১৫

পিটসবার্গে এসে পৌঁছবার পথে দেখা করতে গিযেছিলেন এজবা পাউন্ডেব সঙ্গে, ওয়াশিংটনে। অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল সেজন্য, ঠিক সেই সময়ে একজন বিদেশীর সঙ্গে পাউন্ডেব দেখা হওয়া রাজনৈতিক কাবণে সহজসাধ্য ছিল না। অনেক পত্রবিনিময় করতে হয়েছিল দেশে থাকতে পাউন্ডের স্ত্রীর সঙ্গে। বুদ্ধদেব তখন প্রবলভাবে পাউন্ড ভক্ত, সদ্য প্রকাশ করেছেন তাঁর কনফুসিয়াস— কিন্তু দেখা করে হতাশ হতে হযেছিল। চিঠিতে লিখছেন :

পেনসিলভানিযা কলেজ ফব উইমেন
পিটসবার্গ / ১৯.৯.৫৩

"...ওযাশিংটনে পাউন্ডেব সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু খুব বেশি সুখী হ'তে পাবিনি। আমাব ধাবণা ছিলো, পাউন্ড বোগা ছিপছিপে মানুষ— তা তো নয, প্রকাণ্ড জোযান, জাহাজেব কাপ্তেনেব মতো দেখতে। যদিও গবম ছিলো, তিনটে-চাবটে উলেব জামা প'বে বোদ্দুবে ব'সে ছিলেন, এবং ঘন-ঘন দ্রুতবেগে চকোলেট ইত্যাদি খাচ্ছিলেন। কথাবার্তায নতুন কিছু পেলাম না— আব সমসামযিক যে-কোনো লেখকেব উল্লেখেই নিন্দা বা বিদ্রূপ কবছিলেন— এটা আমাব ভালো লাগলো না।..."

—তদেব, পৃ. ১৫

'কবিতা' পত্রিকার ভার দিয়ে এসেছেন সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সহকারী নরেশ গুহর হাতে— কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'য়ে নয়। প্রকাশিতব্য সমস্ত লেখা তাঁকে ডাকে পাঠানো হত, ওখানে ব'সে শেষ নির্বাচন তিনি নিজে ক'রে দিতেন। পরবর্তী পত্রাংশটি দুটি কারণে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, বিদেশে থেকেও কীভাবে বুদ্ধদেব 'কবিতা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ এটি ; দ্বিতীয়ত, যা আরো গুরুত্বপূর্ণ, এর ভিতর দিয়ে গ্রন্থ সমালোচনা বিষয়ে বুদ্ধদেবের নীতি স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যে, কোনো বই প্রাথমিকভাবে ভালো লাগলে তবেই তা সমালোচনার যোগ্য, নচেৎ নয় :

পিটসবার্গ
২০ নভেম্বর ১৯৫৩

"প্রথমে লিখি এলিয়ট অনুবাদের কোনো নির্মম সমালোচনা আমরা 'কবিতা'য় ছাপাতে পারবো না। কোনো-একটা লেখা ভালো হয়নি, সে-কথা বলা এমন কিছু প্রয়োজনীয় মনে করি না...। অতএব... কে বোলো কাব্য বিষয়ে সাধারণভাবে তাঁর কোনো আলোচনা পেলে খুশি হবো— এলিযট অনুবাদেব বিভিয়ু নয়।..."

—তদেব, পৃ. ১৫

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

এ বছর কোনো নতুন বই বেরোল না বুদ্ধদেবের, নতুন কোনো বড়ো লেখায় হাত দিতেও পারেননি। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকলনগ্রন্থ এ বছর প্রকাশিত হল। ফেব্রুযারিতে নাভানা থেকে বেবোল ইন্দ্র দুগারের প্রচ্ছদে শোভিত 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'। দে'জ থেকে পাঁচ খণ্ডে তাঁব কাব্যসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড ১৯৮০, শেষ বা পঞ্চম খণ্ড ১৯৯৪) প্রকাশিত হবাব আগে পর্যন্ত এ-বইটিই ছিল বুদ্ধদেব বসুর কাব্যকৃতিব প্রতিনিধি।

পারিবারিক বন্ধু সৌরেন সেনকে লিখেছেন এই সময় :

পিটসবার্গ
১৮ অক্টোবর ১৯৫৩
রাত্রি

সৌরেনবাবু

আজ এখানকার একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে গিয়েছিলুম, সেখানে একটি বাঙালি ছাত্র আমাকে বললে, 'জানেন, আজ বিজয়া।' জানতুম না, শুনে মনটা যেন বিষাদে ভ'রে গেলো। এ-ক'দিন বাড়িতে লোকজনের যাওয়া-আসা বেড়ে যাবে—আত্মীয়, বন্ধু, তরুণ কবি—শেষ পর্যন্ত যতীনবাবু শোভনা দেবীও একদিন আসবেন। আজ এই দূরে ব'সে আমি সকলকেই ভালোবাসছি। এই শহরে আমার মনোমতো কোনো সঙ্গ খুঁজে পাইনি—পাবোও না। এরা বক্তৃতা শোনে, শিক্ষিত হয়, পৃথিবীর উপকার করে, ক্লাবে গিয়ে খুচরো খুচরো মিষ্টি কথার বিনিময় করে, ঘড়ি ধ'রে গান গায় এবং গান শোনে, কর্তব্যপরায়ণভাবে নাচে। এরা মানে মার্কিনরা শুধু নয়, আমাদের দেশেও এ-রকম একটা নির্জীব সমাজ আছে, কিন্তু সেখানে তো আমি আমার সঙ্গীদের বেছে নিতে পারি। এই 'আবহাওয়া'র জন্যেই একদিন আমি অনিশ্চয়তার মধ্যে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চ'লে এসেছিলাম। কিনতু আজ আমার হাত-পা বাঁধা, 'না' বলবার ক্ষমতা আমার নেই। জীবিকার

জন্য পৃথিবীর যেখানে হোক আমাকে যেতে হবে। যাবো, এখনো কিছু সময় আছে, এখনো কিছু টানা-হেঁচড়া সইবে, কিন্তু একদিন যেন স্বদেশেই আমার জন্য এক মুখো অন্ন সঞ্চিত থাকে, বাংলাদেশের কোনো-এক কোণে আপন মনে নিভৃতে থাকতে পারি যেন, যে-কোনো লোককে বলতে পারি—'অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমি পারবো না।'

এই কথাটা লিখতে-লিখতে টালিগঞ্জের দিকে বাগানওলা ছোটো একতলা বাড়ির ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেই আমরা যতীনবাবুর বাগানে গিয়েছিলুম—কী আশ্চর্য জ্যোছনা ছিলো সেই রাত্রে। এখানকার জ্যোছনায় জৌলুষ নেই, তাব কাবণ বোধহয় কলকারখানার বাহুল্য, আকাশ যেন সর্বদাই ঝাপশা থাকে—অথচ ধোঁয়া আছে ব'লেও মনে হয় না। পথে আলো কম। কলকাতার নিন্দে করি, কিন্তু আমাদের বাথরুমের ভেজা মেঝেতে এক-এক রাত্রে হিরের ফোঁটার মতো জ্যোছনা দেখেছি। অনেক আনন্দ পেয়েছি জীবনে, অনেক উৎসবের রাত্রি কাটিয়েছি। বাকি জীবন বঞ্চিত থাকলেও নালিশ করবো না। তাছাড়া বাইরে থেকে সদাসর্বদাই অন্যেরা আমাকে আনন্দ জুগিয়ে যাবে, এটাই বা আশা করবো কেন। নিজে-নিজে আনন্দিত হবার শক্তি যদি আমার ক'মে গিয়ে থাকে তাহ'লে আমার শাস্তি পাওয়াই উচিত।

আমেরিকার বেদনাটা কোথায় তা বোঝার জন্য আমেরিকায় আসতে হয় না, এদের বইপত্র পড়লেই বোঝা যায়। তবে চোখে দেখলে বইয়ের সঙ্গে ছবিগুলোকে কিছুটা বেশি মিলিয়ে নেয়া যায়, এই পর্যন্ত। একজন মার্কিন লেখকের একটা বই পড়ছি—সমস্তটা আমেরিকার নিন্দে, আমেরিকার সবই খারাপ, ইওরোপের সবই ভালো। অবশ্য ও-রকম বলতে হ'লে জাত-মার্কিন হওয়া দরকার। অন্যদের পক্ষে বিদেশের যেটা সাধনার দিক, বেদনার দিক, সেইটেই স্পষ্ট ক'রে দেখা কর্তব্য—নয়তো আর ক্যাথারিন মেয়ো দোষ করেছিলো কী। একটা কথা বেশ বোঝা যায়—এদের জীবন বড্ড বেশি সংঘবদ্ধ, যূথবদ্ধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবকাশ ক্রমশ ক'মে আসছে—সকলেই এক রকম খায়, এক রকম পরে, থাকে, বলে, চিন্তা করে—কিংবা করে না। ভেবে দেখুন, এই পিটসবার্গ শহরের সমস্ত মানুষ রোজ-রোজ কাঁটায়-কাঁটায় ছ-টার সময় ডিনার খাচ্ছে! এদিকে ঐশ্বর্য যত বাড়ছে, ততই শূন্য হ'য়ে আসছে জীবন—গাড়ি, টেলিফোনে, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, কাপড় কাচার বাসন মাজার ঘর ঝাঁট দেবার কল সবই আছে কিন্তু কিছু নেই, কিছু নেই! এই জন্য খুন জখম আত্মহত্যা উম্মাদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এক-একটা বড়ো ছুটির দিনে দেশ ভ'রে হাজার-হাজার লোক মোটর-দুর্ঘটনায় মরে—সাবধানী লোক সেদিন বাড়ি থেকে বেরোয় না। কিন্তু এগুলো সবই আমেরিকা সম্পর্কে মামুলি কথা—পৃথিবীতে কারোরই অজানা নেই।

আমি জানতে চাই কোথায় এই বিশাল দেশের হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে, কোথায় জেগে আছে এদের প্রাণ, প্রতিবাদ, মনুষ্যত্ব। ন্যুইয়র্ক, শিকাগো এবং ক্যালিফর্নিয়া অঞ্চলে সাহিত্যিক সমাজে মেলামেশা করতে পারলে ছবিটা আরো পরিষ্কার হবে। শুধু পিটসবার্গের এই ছোটো গণ্ডি দিয়ে বিচার করা ধানবাদ দেখে ভারতবর্ষ বিচার করার মতোই। হয়তো দেশে ফেরার আগে অন্য কোনো আনন্দময় পরিচয় পেতে পারবো, এই আশা নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছি।

স্টেটসম্যানটা পাঠাবাব জন্য বার-বার লিখছি, ভাবিনি আমার এই কথাটা এ-রকম ভাবে উপেক্ষিত হবে। 'মনের ময়ূর' ফিল্ম বিষয়েও আপনারা নিরুত্তর। দেশেব, কলকাতার এবং সকলের সব রকমের খবরের জন্য আমার মন তৃষিত হ'যে থাকে, আপনাবা মাঝে-মাঝে কযেক ফোঁটা বারিবর্ষণ করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বুদ্ধদেব

১৯৫৪ ।। বয়স ছেচল্লিশ

দেশে ফেরা

পিটসবার্গ ছাড়লেন ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে। ছ'মাস ছিলেন এখানে। ভালো লাগেনি পিটসবার্গ— নরেশ গুহকে চিঠিতে লিখছেন, "ঐ মহিলা-কলেজের সংকীর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ছ-ছটা মাস যেন অর্থহীন বুদ্ধুদের মতো মিলিয়ে গেছে।...[— কলকাতা পত্রিকা, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, পৃ. ১৬] শিকাগো ও ন্যুইয়র্কে তিন মাস কাটিয়ে কিন্তু খুব ভালো লাগল। পূর্বোক্ত চিঠিতে নরেশ গুহকে লিখছেন :

> "এতদিনে আমেবিকাকে সত্যি-সত্যি দেখতে পাচ্ছি, পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীব স্পন্দন বিশাল প্রবল সংগীতেব মতো বেজে উঠছে। সমুদ্রে নাইতে নামলে যেমন হয তেমনি ঢেউযেব পর ঢেউ অভিজ্ঞতা ব'যে যাচ্ছে আমাব উপব দিযে—আপাতত শুধু অনুভব কবছি, তার বেশি সময নেই—কিন্তু এগুলো পবিপাক ক'বে সাহিত্যেব রক্ত মাংসে পরিণত করা সময সাপেক্ষ, তার জন্য দীর্ঘ অবসর চাই—দেশে ফিবে গিয়েও সে-অবসব আবাব পাবো কিনা কে জানে।..."

এবারের আমেরিকা ভ্রমণে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু লাভ হল তাঁব— ট্রপিক অব ক্যানসার, ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ন ইত্যাদি পৃথিবী-ভরে-বিতর্কিত গ্রন্থের লেখক হেনরি মিলারের সঙ্গে। মিলারের লেখা বেশ কিছু চিঠি রক্ষিত আছে তাঁদের পারিবারিক সংগ্রহে। মিলারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বুদ্ধদেব, পশ্চিম আমেরিকার সেই জনহীন ও টিলাসংকুল অঞ্চলে, যার নাম বিগ সূর। কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন মিলার পরিবারের সঙ্গে। চিঠি পড়ে বোঝা যায়, হেনরি মিলার তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন :

> "I must tell you that of all the letters I receive in English, yours are the most fluid, spontaneous, natural and sensitive. What an accomplishment for one not born to the language! But if one is a poet, he is poet in all tongues, is it not so?..."
>
> (৬/১০/৫৪ তারিখে লেখা পত্রাংশ)

চিঠিগুলিতে দেখা যায়, মিলার তাঁর সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছেন। জানতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। তাঁর সাহিত্যকৃতির পরিমাণ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছেন। তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, তাঁর

'গে নেক' (১৯২৭ সালে মার্কিন শিশুসাহিত্যের 'নিউবেরী' পুরস্কার পেয়েছিল) উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করছেন।

দেশে ফিরে এসে দেখলেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের কর্মমুখর সময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। প্রতিভা বসু জানিয়েছেন, এ-সময় দেশে ফেরবার খুব ইচ্ছে ছিল না বুদ্ধদেবের—আমেরিকাতে অন্য কোনো শিক্ষাসম্পৃক্ত কর্মের সন্ধান করছিলেন তিনি। পূর্বোল্লিখিত শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বায়োডাটাটি এই সময়েই রচনা করেন— কর্মসন্ধান ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য এটির থাকতে পারে না। কৌতূহলী পাঠকের জন্য এই দলিলটি এখানে পুর্নমুদ্রিত করা হল। লক্ষণীয়, এখানেও তাঁর রবীন্দ্রভক্তি কীরকম প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে—বায়োডাটার শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে তা দ্রষ্টব্য।

BUDDHADEVA BOSE
(B. 1908)

Education & Employment	.	Dacca Collegiate School, Dacca University. M.A. in English, 1931. Lecturer in English, Ripon College (now Surendranath College), Calcutta, 1934-45.
Works	:	Author of over 80 titles in Bengali, Including verse and prose, fiction, travel and belles-lettres, literary criticism, and books for children. One English book, AN ACRE OF GREEN GRASS, A Review of Modern Bengali Literature, published by Orient Longmans, Calcutta & Longmans Greene, London. Has recently edited *Adhunik Bangla Kavita*, an anthology of modern Bengali poetry.
Translations	:	(into Bengali) From the fairy-tales of Hans Andersen and Oscar Wilde (published in book form), and poems of Baudelaire, Rilke, Hoelderlin, Pound, Cummings, Wallace Stevens, William Carlos Williams (published mainly in *Kavita)* (into English) From his own poems and stories, some of which have appeared in American magazines and anthologies, such as POETRY (Chicago), THE KENYON REVIEW, THE PACIFIC SPECTATOR, the Indian supplement to the ATLANTIC MONTHLY, the PARTISAN REVIEW and Scribners A LITTLE TREASURY OF WORLD POETRY.

Editing	: Edited PRAGATI, a literary monthly, 1927-29, BAISHAKHI, an annual, (1941-46), also one issue of an annual for children. Founded in 1935 and is still editing KAVITA (Poetry), a Bengali quarterly of poetry and criticism. A bilingual American issue of KAVITA (December, 1950) contained original English poems by contemporary American poets and some Bengali translations from them. The second bilingual issue (June, 1953) contained English translations from modern Bengali poets.
Other Activities	Has broadcast in Bengali and English, contributed to numerous English magazines and miscellanies in India and abroad, and, for three years, non-political editorials to THE STATESMAN, Calcutta & New Delhi. Has done some publishing and produced plays written by himself with a cast consisting of his friends and family members. Was member of a committee for the promotion of juvenile literature in India, sponsored by the Ministry of Education, Govt. of India, and delegate to an international cultural conference held in Bombay in March, 1951. Served as an adviser to an Unesco seminar for Adult Education in India, Delhi and Mysore, 1952-53. Is at present in the United States on a Fulbright award, with an one-year assignment as visiting professor of English literature at Pennsylvania College for Women, Pittsburgh.
Marital Status	Married : 2 daughters, 1 son.
Club	The International P.E.N.
Recreation	Reading & Conversation
Favourite Authors	Very difficult to mention; everyone knows how certain authors get hold of one at certain periods of one's life. Has lately lived much with Baudelaire, Rilke, Yeats, and Thomas Mann among prose-writers. Is not very experienced in American literature, outside Eliot and Pound, but has been deeply impressed by certain poems of Frost, Stevens, Cummings and Macleish and is trying to know more of these and other American poets. Admires many of his contemporary Bengali writers, and has Tagore as a permanent factor, Tagore being one of those writers who grows in one as one grows in experience and whom it is impossible to outgrow.

এই সময়ে একদিন কবিতাভবনে সাক্ষাৎ করতে এলেন হুমায়ুন কবির। বুদ্ধদেবের খবর জানতে চাইলেন। বুদ্ধদেব আমেরিকাতেই আপাতত কিছুদিন থেকে যেতে চান শুনে ব্যস্ত হয়ে প্রতিভা বসুকে বললেন, উনি যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন, বললেন, দেশে অত্যন্ত জরুরি কাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রতিভা বসুর চিঠিতে সেকথা জেনে বুদ্ধদেব ফিরে এলেন। অল্পদিন পরই আহ্বান এল ত্রিগুণা সেনের কাছ থেকে— যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তার আর্টস ফ্যাকাল্টি গড়ে তোলার কাজে তিনি বুদ্ধদেবের সাহায্য চান।

বুদ্ধদেব সম্মত হলেন। তারপর ডুবে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক পর্বের অজস্র কাজের মধ্যে। কী কী বিভাগ হবে তা স্থির করা, পাঠক্রম নির্দিষ্ট করা, অধ্যাপক নির্বাচন করা—প্রতিভা বসু জানিয়েছেন, সে-সময়ে বুদ্ধদেব একা হাতে ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই সব প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কাজ পরিচালনা করেছেন। দুটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি হল— 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' ও 'তুলনামূলক সাহিত্য'। ত্রিগুণা সেন নাকি বুদ্ধদেবকে প্রথমে ইংরেজি বিভাগের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তখন— বিশেষত, সদ্য সদ্য আমেরিকার সাহিত্যপাঠন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে দেশে ফিরে— চিরচেনা ইংরেজি সাহিত্য আর পড়াতে চাইলেন না। তিনি প্রতিপ্রস্তাব দিলেন তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের। তখন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডি. এম. সেন ছিলেন ডি. পি. আই। তাঁকে বুঝিয়ে, তাঁর প্রত্যয় উৎপাদন করে পাঁচ বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এই দুটি নতুন বিভাগের অনুমোদন সংগৃহীত হল।

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'

মার্চ মাসে প্রকাশিত হল বইটি। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে এই গ্রন্থের আরো চারটি সংস্করণ বেরিয়েছে— ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬৩ এবং ১৯৭৩। বুদ্ধদেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ এই সংকলনগ্রন্থ; এর এই পাঁচটি সংস্করণের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম, বিকাশ, এবং এই কুড়ি বছরে (১৯৫৩-১৯৭৩) তার ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস। আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ করতে হলে এই গ্রন্থ দিয়েই আরম্ভ করা উচিত বলে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এর খ্যাতি। প্রতি সংস্করণে ক্লান্তিহীনভাবে কবিতা ও কবির তালিকায় গ্রহণ বর্জন করেছেন বুদ্ধদেব— প্রত্যেক সংস্করণে বদলে গেছে তরুণতম কবির নাম।

এটি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেরিয়েছিল ১৯৪০ সালে (দ্র)। নানা কারণে সে-বই বুদ্ধদেবের মনের মতো হয়নি।

নিজের সম্পাদিত সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখলেন :

"সেবারে সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন দুজন রসজ্ঞ সমালোচক ; তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও মেলবার মতো জায়গা প্রশস্ত ছিলো ব'লে বইখানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। এবারে সম্পাদনা করতে হ'লো আমাকে। কোনো পাঠক দুটি সংস্করণের তুলনা ক'রে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন পূর্ববর্তী সম্পাদকদের সঙ্গে কোথায় আমার রুচির প্রভেদ।[১]

... পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা আধুনিকতার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ স্থির ক'রে নিয়েছিলেন ; সামাজিক বিষয়, বিতর্ক, ব্যঙ্গ, মননধর্মিতা, নূতনতর ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখতা, এই রকম কয়েকটি চিহ্নের সাহায্যে এঁরা যাচাই এবং বাছাই করেছিলেন। বাংলা কবিতায় এই লক্ষণগুলো সদ্য দেখা দিয়েছে সেই সময়ে, তখনকার মতো ঐ দিকেই বিশেষভাবে ঝোঁক পড়া অস্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু এর ফলে অন্য দিকে অসম্পূর্ণতা ঘটে গেলো, গীতধর্মিতার স্থান হ'লো সংকুচিত ; চিত্রকল্পপ্রধান কবিতা, আবেগপ্রবণ কবিতা উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে আধুনিক বাংলা কবিতা এই দুই দিকেই সক্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য ; আর আমার সৌভাগ্য এই যে উভয় ক্ষেত্রেই আমার আনন্দ অবারিত।... এইজন্য আমার পক্ষে উভয় দিকের সমতা রক্ষা করা শক্ত হয়নি ; কোথাও-কোথাও কবিতার নির্বাচনে এত বেশি অদলবদল করতে হয়েছে যে অংশত এটিকে নতুন বই বলা যায়।"

পরের প্রজন্মের কবিদের সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর রুচি বিষয়ে এই বইতে একটি ঔৎসুক্যজনক তথ্য লক্ষ করা যায়। তিরিশের দশকের জাতক কবিদের মধ্যে, ১৯৬৩ সালের সংস্করণে স্থান পেয়েছিলেন শুধুমাত্র আলোক সরকার ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও বিনয় মজুমদারকে পরের সংস্করণ (১৯৭৩) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর আশ্বিন ১৩৬১-র কবিতায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করলেন বুদ্ধদেব বসু। এসব লেখা গ্রন্থভুক্ত হয়নি কখনো। কিন্তু পড়ে বোঝা যায়, যাঁরা বড়ো কবি ছিলেন না, তাঁদের প্রতিও তাঁর অভিনিবেশ কত তীক্ষ্ণ, এবং তাঁর মূল্যায়ন কত অভ্রান্ত ছিল :

১. উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে প্রথম সংস্করণে জীবনানন্দের মাত্র চারটি কবিতা স্থান পেয়েছিল, পাঁচ পৃষ্ঠার পরিসরে ; আর বুদ্ধদেবের জীবিতকালের শেষ সংস্করণে (১৯৭৩) জীবনানন্দের কবিতার সংখ্যা উনিশ, পৃষ্ঠার পরিমাণ বাইশ। পৃষ্ঠাসংখ্যাও অবশ্য বেড়ে ১৯০ থেকে ২৮৯ হয়েছে, তেমনি কবির সংখ্যাও অনেক বেড়েছে— প্রথম সংস্করণে কবির সংখ্যা ছিল ৩৫, এই সংস্করণে ৬৭।

"যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এসেও কবিতার জাত যায় না। 'মরীচিকা'য় তিনি যে-তিন মাত্রার ছন্দকে অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে বন্ধুর ভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সেই ছন্দেরই একটি নির্দিষ্ট, সুপরিমিত প্রকরণ নিয়ে গ'ড়ে উঠলো অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র কবিতাবলী।

আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি আলো-জ্বলা, রেশ-তোলা পঙ্‌ক্তি ('রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা')— বিরল বলেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি। দ্বিতীয়, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন। যেমন রবীন্দ্রনাথের অবিরল অতীন্দ্রিয়তার পরে মোহিতলালের নির্ভয় দেহাত্মবাদে আমরা উৎসাহ পেয়েছিলাম, তেমনি, অন্য দিকে থেকে যেন একটা নিশ্বাস-ফেলা নিষ্কৃতি ছিলো যতীন্দ্রনাথের সরল, বৈঠকী দুঃখবাদে। সৃষ্টির আনন্দময় অভিনন্দনে আবাল্য অভ্যস্ত আমরা সেই প্রথম শুনলুম ব্যঙ্গোক্তি, সংশয়, নেতিবাদ।... সমসাময়িক বাংলা কাব্যের উপরে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে, রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে নয়; এতেও বোঝা যায় তাঁর দুঃখবাদ বা নেতিবাদের প্রধান গুণ ছিলো অনুপ্রেরণার শক্তি নয়, শ্রান্তিহারক রমণীয়তা।... আজকের দিনের পাঠকের পক্ষে তাঁর কাব্য শুধু ঐতিহাসিক কারণে ঔৎসুক্যজনক নয়, সেখানে উপভোগের জন্যও বিভিন্ন উপাদান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।"

হেমচন্দ্র বাগচী

শুধু কবিতা এবং তৎসংক্রান্ত গদ্যরচনা প্রকাশ করাই নয়, কবিদের সম্পর্কে সামাজিক দায়িত্বও পালন করবার চেষ্টা করেছে 'কবিতা' পত্রিকা— তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে। এই আশ্বিন ১৩৬১-র 'কবিতা'য় নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল :

"কবি হেমচন্দ্র বাগচী আজ বহুকাল যাবৎ মানসিক পীড়ায় অসুস্থ আছেন। তাঁর সাহায্যকল্পে কবিতাভবনের উদ্যোগে ও প্রতিভা বসুর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ১৩ জুন ১৯৫৪ তারিখে অভিনীত হয়েছিলো। এই অভিনয়লব্ধ আটশত টাকা কবিকে পাঠানো হয়েছে। এর দ্বারা তাঁর চিকিৎসা বা স্বাচ্ছন্দ্য যদি যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হয় তাহলে 'কবিতা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই তৃপ্তিকর হবে। আজকের দিনের পাঠকের হয়তো ঠিক স্মরণে নেই যে হেমচন্দ্র 'কল্লোল'-কালীন কবিদের অন্যতম, এবং যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন, তাঁর রচনা 'কবিতা'য় নিয়মিত প্রকাশিত হতো।"

এই নাটক মঞ্চস্থ করার স্মৃতিচারণ করেছেন প্রতিভা বসু :

"বুদ্ধদেব যখন মাইসোর থেকে ফেরার ছ'মাসের মধ্যেই প্রথমবার আমেরিকা চলে গেলেন, তার কিছু দিন পর নরেশ [গুহ] এসে বলল, কৃষ্ণনগর থেকে হেম বাগচির স্ত্রী বা পুত্র তাকে একটা চিঠি লিখেছেন, হেম বাগচির মস্তিষ্কের অবস্থা খুব ভালো নয়, ভারসাম্যহীনতায় ভুগছেন তিনি। ডাক্তার বলেছেন শক থেরাপি দিতে হবে। কিন্তু তার জন্য যতটা অর্থবল থাকা দরকার তা তাদের নেই। হেমচন্দ্র বুদ্ধদেবের বন্ধুও বটে, কবিতাভবনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল, সেখান থেকে যদি কিছু অর্থসাহায্য পাওয়া যায় তাহলে হয়তো মানুষটি আবার তাঁর পূর্বজীবনে ফিরে আসতে পাবেন।... আমি বললাম, ঠিক আছে, অন্তত চিকিৎসার খরচটা আমি তুলে দেব। কী করে দেব সেটা তখন আমি ভেবে পাইনি। পরে দলবল নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকটি করিয়েছিলাম।... মাসখানেকের মধ্যেই নিউ এম্পায়ারে করা হল সেটি।

নাটকের টিকিট ছাপিয়ে কিছুটা পুশ সেল করতে হয়েছিল আমাকে। আমি কোনো বিখ্যাত পার্টি নই যে গেট সেলেই লোক উপচে পড়বে। আর তখন সেরকম দিনও ছিল না। এই সময় আমার সত্যেনদার [পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন বসু] কথাটা মনে পড়ল।...

সত্যেনদাই আমার প্রথম দর্শকের টিকিটটা কিনলেন। তারপর আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মিমিকে আর অজিত দত্তর মেজ ছেলে শঙ্কুকে আমি একটা চিঠি দিয়ে জীবনানন্দ দাশের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ওরা এসে বলল, 'উনি নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আমাদের দেখে কী করবেন, কী বলবেন তাই যেন ভেবে পাচ্ছেন না এমনি তাঁর ভাব।' আমার চিঠিটা পড়ে তৎক্ষণাৎ অনেকগুলো টিকিট কিনে ফেললেন।"

—*জীবনের জলছবি*। ৩য় সু, পৃ. ১৯৯

বুদ্ধদেব দেশে ফিরে এলেন বছরের শেষ দিকে। তিনি ফেরবার দু-তিনমাস আগে তাঁর দিদিমার মৃত্যু হয়েছে। সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে প্রতিভা বসুকেই, কবিতাভবনের সুহৃদবর্গের সাহায্যে—

"নিরুপমের বুদ্ধিতেই হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িকে খবর দিয়েছিলাম। তারাও এসে গেল।... আমার হাতে একদম টাকা ছিল না। এখান থেকে ওখান থেকে এই ব্যাগ সেই ব্যাগ ঘেঁটে আলমারির দেরাজ ঘেঁটে অনেক খুচরো পাওয়া গেল। টাকার অঙ্কে তা নেহাৎ মন্দ হল না। আরও যা কিছু সামান্য নগদ ছিল সব মিলিয়ে একটা পুঁটলি বেঁধে নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। সবাই বলছিল শ্মশানেও অনেক ঝামেলা হয়, অনেক টাকাও লাগে। কিছুই জানি না এসব ব্যাপারে। তবু কপাল ঠুকে যাচ্ছিলাম।

সৌরেনবাবু ব্যাকুলভাবে বললেন, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে? সব শুনে বললেন, 'উঠে আসুন গাড়িতে।'

...প্রকৃতির কী পরিহাস! যাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, শেষ পর্যন্ত তাকে ছাড়াও যেমন চলত না, মুখাগ্নিটাও তার হাতেই নিতে হল।... যাই হোক, আমার পুঁটুলি গজের হাতে পুঁটুলি হয়েই থাকল, যা করবার সব সৌবেনবাবুই করলেন।

—তদেব, পৃ. ২০৭

জীবনানন্দের মৃত্যু

১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হলেন জীবনানন্দ। ২২ অক্টোবর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হল।

'কবিতা'র আশ্বিন ১৩৬১ সংখ্যা এই সময় প্রেসে ছিল। শেষ পৃষ্ঠায় একটি সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি যোগ করে দেয়া হল :

"কবিতার বর্তমান সংখ্যা যখন ছাপা হচ্ছে, তখন জীবনানন্দ দাশের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলো। এর পববর্তী পৌষ সংখ্যাটি আমরা সম্পূর্ণভাবে জীবনানন্দের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবো, তাই এ-সংখ্যায় তাঁর বিষয়ে কোনো আলোচনা প্রকাশিত হ'লো না। তাঁর কাব্যের ও ব্যক্তিত্বের নানাবিধ আলোচনা নিয়ে আগামী সংখ্যাটি যাতে শীঘ্র প্রকাশিত হ'তে পারে, আমরা সে-জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা কবছি।"

যথাকালে পৌষ ১৩৬১ সংখ্যা 'কবিতা' জীবনানন্দ-সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হল। প্রথমেই জীবনানন্দর একটি চিঠি : ৩০.১০.৪৩ তারিখে সিগনেট প্রেসকে লেখা— যেখানে, সিগনেট আয়োজিত কবি সুকুমার রায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে স্মৃতিসভার খবর দেরিতে পাওয়ায়, ইচ্ছে থাকলেও যেতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন জীবনানন্দ।

তারপর জীবনানন্দর সেই অধুনা বিখ্যাত আলোকচিত্রটি— সম্ভবত এই প্রথম এটি ছাপা হল। ছবির নিচে জীবনানন্দের স্বাক্ষরটি মুদ্রিত। জীবনানন্দের স্মরণে দুটি কবিতা, জীবনানন্দর দুটি অগ্রন্থিত কবিতা, 'কবিতার কথা'র অংশ ; একটি পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র ; জীবনীপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি ; 'কবিতা'য় প্রকাশিত জীবনানন্দর কবিতার তালিকা।

প্রবন্ধের সংখ্যা আট— তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে বুদ্ধদেবের 'জীবনানন্দ দাশ'— যে-প্রবন্ধে জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মন্তব্যগুলি, আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে লেখকদের দ্বারা ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে হয়ে বর্তমানে ঈষৎ মলিন হয়ে এসেছে। এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদ থেকে— এরকম সংহতভাবে জীবনানন্দের মূল্যায়ন বুদ্ধদেবও বেশি করেননি—আর কেন জানি না, এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃতও হয়নি খুব একটা :

"বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত বলে মনে হয় ;

সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে— তিনি যে রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের দ্বারা কখনো সংক্রামিত হয়েছিলেন বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হতে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো উজ্জ্বল ; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি —প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো— একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমসাময়িক ও পববর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনাও যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পবিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে ; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেইসব নাবালকদের হাতে— যারা আজ প্রথমবার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলোক-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয় যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধি'র মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তরে'র কবিতা রচনা শেষ হল— 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র সনেট রচনা আরম্ভ হল। চারবছরে ৫৪টি কবিতা লিখবেন। হ্যেল্ডার্লিনের অনুবাদ আরম্ভ করলেন। ছোট গল্প লিখছেন—পরে এগুলি সংকলিত হবে 'একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু' গ্রন্থে।

প্রতিভা বসুর সহযোগে রচিত উপন্যাস, 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', এবং সাহিত্য সমালোচনার বই 'সাহিত্যচর্চা'— দুটিই বেরোল বৈশাখ মাসে।

'শীতরাত্রির প্রার্থনা' কবিতার জন্মকথা

"সেই প্রথম দেশান্তরে এসেছি। আছি পিট্‌সবার্গে, আমার পক্ষে নির্বান্ধব ও নিরানন্দ এক নগর। কথা বলার লোক কেউ নেই, আমার উপর কাজের চাপও হালকা, এদিকে হিম এবং ধবল হ'য়ে ডিসেম্বর মাস নামলো।... কিছু ক্লাশ পড়িয়ে, কিছু ঘুরে বেড়িয়ে, কিছু ঘরে ব'সে দিনের বেলাটা যা-হোক একরকম কেটে যায়, কিন্তু সূর্যদেব অদৃশ্য হবার সঙ্গে-সঙ্গেই এক শত্রু আমাকে আক্রমণ করে। বাড়িটার তাপযন্ত্র এত দুর্বল যে তেতলা পর্যন্ত ছিটেফোঁটার বেশি উষ্ণতা পৌছতে পারে না— এদিকে আমি স্বদেশেও শীতকাতুরে, প্রতিটি রাত্রি আমার পক্ষে যন্ত্রণা। এই

অদ্ভুত দেশে সন্ধে ছ-টাতেই নৈশ ভোজনে ব'সে যেতে হয়, রাত্রি তাই দীর্ঘতর হ'য়ে ওঠে।... আমি ভুলতে পারি না যে আমি একজন বাইরের লোক, মনে হয় যেন ভুল জায়গায় চ'লে এসেছি— আর যখন, ভোজনের পালা সাঙ্গ, আমি উঠে আসতে থাকি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আবার আমার হিমাক্ত আস্তানায়, তখন থেকে আমার চিন্তা : এই ঠাণ্ডা লম্বা, রক্ত-জমানো রাত্তিরটাকে কেমন ক'রে কাটাবো? বার বার চা খেয়ে, বার-বার গরম জলের ব্যাগ নিয়ে, হাতে হাত ঘ'ষে, পাইচারি ক'রে, আমি কোনোমতে সচল রাখি নিজেকে, দিগ্বিদিকে চিঠি লিখে-লিখে অনেকগুলো ঘণ্টা পার করে দিই। কিন্তু কোনো-এক সময়ে শুয়ে না-প'ড়ে উপায় থাকে না, আর বিছানায় গা ঠেকোনোমাত্র মনে হয় বরফ জলের চৌবাচ্চায় ঝাঁপ দিয়েছি। তিনটে কম্বলের তলায় শীত আমাকে চাবুক মেরে-মেরে জাগিয়ে রাখে —টোমাস মান্-এর য়োসেফ-কাহিনীও সেই কষ্ট ভোলাতে পারে না—আমার কানে আসে নেকড়ের চিৎকার, ডাইনির হুল্লোড়, উত্তরমেরুর বাতাসের দল যেন জগৎটাকে কুটিকুটি ক'বে ছিঁড়ে ফেলছে। আর এমনি একটি রাত্রে, আমার নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ ও নির্যাতনকারী শীতের মধ্য থেকে, অতর্কিতে একটি 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' বেরিয়ে এসেছিলো : আমার জীবনের শেষ কবিতা যেটা আমি 'তোড়ে' লিখেছিলাম, অথবা যেটা বলতে গেলে প্রায় নিজেকে দিয়েই নিজেকে লিখিয়ে নিযেছিলো।"

কবিতার শত্রু ও মিত্র : কবিতা ও আমার জীবন

'যে আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতা রচনা আরম্ভ

"এই 'বরফ-ভাঙা' আরম্ভ থেকে তক্ষুনি অন্য কবিতা জন্মালো না, কিন্তু অন্তত আমার আত্মবিশ্বাস কথঞ্চিৎ ফিরে এলো, আর— বলতে ভালো লাগছে— দেশে ফিরে যাবার আগেই এই 'প্রার্থনা'র সম্মতিসূচক উত্তর আমি যেন শুনতে পেলাম।...

চলেছি এক সুবৃহৎ অর্ণবপোতে[১] আটলাণ্টিক পেরিয়ে। আমার পক্ষে অকল্পনীয় সব বিলাসিতা... পান ভোজন আমোদপ্রমোদের বৃত্তে বাঁধা এক আয়োজিত ও কৃত্রিম জীবনযাত্রা— এ-সবের মধ্যে আমি আবার নিজেকে নিঃসঙ্গ ব'লে অনুভব করলাম, পিটসবার্গের মতো তিক্তভাবে যদিও নয়।... আমার ভাগ্যে আমি একলা একটি ক্যাবিন পেয়েছি, চেষ্টা ক'রে জুটিয়ে নিয়েছি ভোজনশালার এক কোণে একটি একলা টেবিল ; আমার সময় কাটে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, জাহাজের এক তলা থেকে অন্য তলায় ও এক মহল থেকে অন্য মহলে ঘোরাঘুরি ক'রে, নানা ধরনের কাগজে-এনভেলাপে সমৃদ্ধ ও জনবিরল চিঠি লেখার ঘরটি আমার একটি প্রিয় স্থান।... অনেকের মধ্যে তালগোল-পাকানো আমোদপ্রমোদে স্বভাবতই রুচি নেই আমার, তাছাড়া অন্য একটি কারণেও আমি

১ জাহাজটি ছিল অতিবিখ্যাত 'কুইন মেরি'।

লোকসঙ্গ থেকে বিবিক্ত রাখছি নিজেকে—আমার মনের মধ্যে এক অস্পষ্ট সঞ্চরণ আমি শুনতে পাচ্ছি; আমি তাকে পথ ছেড়ে দিতে তাই, কোনো অবান্তর মেলামেশায় বিক্ষিপ্ত হ'তে চাই না। ধীরে-ধীরে একটি সামুদ্রিক কবিতা লিখলাম জাহাজে ব'সে [২], লণ্ডনের হোটেলে এসে আরো একটি, কয়েক সপ্তাহ পরে বম্বাইগামী ইটালিয়ান জাহাজে আরো দুটি লেখা হয়ে গেলো। কলকাতায় ফিরে বুঝলাম এ পথে-পথে লেখা কবিতা চারটি "শীতরাত্রির প্রার্থনা"'র মতো আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়—এরা একটা নতুন আরম্ভ, আরো কবিতা আমার উপর দাবি জানাচ্ছে।

...আমার নিজের কাছে এই কথাটা এখন স্পষ্ট যে আমার পুরনো ধবণে ফিরে যাওয়া আর চলবে না; আমি যার জন্য হাৎড়ে ফিবছি তা নতুন একটা স্টাইল, আমাব হ'য়ে-উঠতে-থাকা কবিতাগুলির পক্ষে সেটাই খুব জরুবিভাবে দরকাব। আমাকে ছেড়ে দিতে হবে সরলতার পথ; বলতে হবে উক্তিব বদলে চিত্রকল্প দিয়ে, ঘোষণার বদলে ছবির সাহায্যে; যা বলতে চাচ্ছি তার বদলে অন্য কিছু বলতে হবে হয়তো, আসল কথাটা লুকোনো থাকবে অথচ থাকবে না। আর এর জন্য চাই এমন ভাষা যা নির্ভার অথচ অগভীর নয়, যা গম্ভীব সংস্কৃতেব পাশে ছিপছিপে কথ্য বুলিকে মানিয়ে নিতে পারে, ভালোমানুষেব মতো চেহারা নিয়েও যা অভিনয়নিপুণ।...

আমি আরম্ভ করলাম খুব সতর্কভাবে, যেন পা টিপে টিপে চলছি। রচনা করি মনে-মনে— পাকাপোক্ত কযেকটা লাইন মনের মধ্যে তৈরি না-হওয়া পর্যন্ত খাতাব গাযে আঁচড় কাটি না— কেননা আমার প্রতিজ্ঞা এই যে চাক্ষুষ কাটাকুটি যে ক'রে হোক ঠেকিয়ে রাখবো। লিখছি বেশির ভাগ ছোটো কবিতা, তাই এই মানসরচনার কৌশল খাটানো সম্ভব হচ্ছে; আর প্রাথমিক কয়েকটি পদক্ষেপেব পরে আমি আশ্রয় পেলাম সনেটের রূপকল্পে, তার নিয়মের মধ্যে ধবা দিয়ে নিজেকে অনেকটা নিরাপদ ব'লে মনে হ'লো। সেই সনাতন চোদ্দো লাইন, স্তবকের বিভাগ, পর্যায়বদ্ধ মিলের শৃঙ্খল; সেই পরিসরের ক্ষীণতা যা বাহুল্যকে নিষিদ্ধ করে দেয়; সেই অনমনীয় শাসন যা স্বাধীনতাকে চেষ্টার দ্বারা অর্জনীয় ক'রে তোলে।... কখনো একটা মিল খুঁজে-খুঁজেই সারাটা বেলা কেটে যায়, কখনো বা শেষ লাইনটা তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ে। আমার এই প্রয়াস চললো তিন বছব ধ'রে, থেমে-থেমে, কিন্তু ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্যুত না হ'য়ে— একটি কবিতার টানে আরেকটি কবিতা বেরিয়ে আসতে লাগলো।...

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর জন্মকথা নিয়ে এত কথা বললাম এইজন্যে যে এটা আমার জীবনের এক সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্য দিয়ে একটি সংকট আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম, এবং এর দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতা আমার পরবর্তী সব কাব্যরচনায় কাজে লেগেছে— সেগুলি আকারে-প্রকারে যতই না ভিন্ন হোক।"

কবিতার শত্রু ও মিত্র : কবিতা ও আমার জীবন

২ 'সমুদ্রের প্রতি : জাহাজ থেকে'। 'যে আঁধার আলোর অধিক'

মানসতায় পরিবর্তন

শুধু কবিতায় নয়, এই সময় তাঁর অন্তর্জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তাঁর গদ্যেও তার ছাপ খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রথমত, কমে এল রচনার গতি ও পরিমাণ। ১৯৩০ থেকে ১৯৭৪— এই ৪৪ বছর যদি তাঁর গ্রন্থকার—জীবন বলে ধরা যায় ('মর্মবাণী' বেরিয়েছিল ১৯২৪ সালে, কিন্তু নিজের করা গ্রন্থপঞ্জিতে তিনি আরম্ভ করেছেন 'সাড়া' উপন্যাস থেকে, যার প্রকাশকাল ১৯৩০), তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম পনেরো বছরে, গ্রন্থকার-জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময়ে, ৭৮টি, অর্থাৎ অর্ধেক বই বেরিয়ে গেছে। ১৯৪৬-৬০ : পরের পনেরো বছরে বেরিয়েছে তার অর্ধেক ৩৮টি বই; ১৯৬১-৭৪ : শেষ চোদ্দো বছরে ৩৯টি, মৃত্যুর পর একটি।

কোন সময়ে কোন ধরনের প্রকাশমাধ্যমের দ্বারা তিনি অধিকৃত হয়েছিলেন, তার বিশ্লেষণেও অনেক কৌতূহলজনক তথ্য ধরা পড়ে। কবিতায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততার কাল 'মর্মবাণী' থেকে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত বিস্তৃত— অর্থাৎ ১৯২৪ থেকে ১৯৫৩ ("শীতের প্রার্থনা..." ১৯৫৫-তে বেরোলেও, কবিতাগুলি লেখা শেষ হয়ে গেছে দু'বছর আগেই), এই তিরিশ বছর। বারোটি কবিতার বই বেরিয়েছে এই তিরিশ বছবে, আর ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৩— এই কুড়ি কি একুশ বছরে বেরিয়েছে মাত্র পাঁচটি বই। তার পরিবর্তে, দেখতে পাচ্ছি, বাড়ছে কবিতার অনুবাদ। ১৯৫৭ সালে প্রথম কবিতার অনুবাদ বেরোল, 'কালিদাসের মেঘদূত'। ১৯৬০-এ জিভাগোর কবিতা (এটি অবশ্য পৃথক বই হয়নি, 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসের সঙ্গেই সংলগ্ন থেকেছে), ১৯৬১-এ 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা', ১৯৬৭-তে হ্যেল্ডার্লিনের অনুবাদ, রিলকে-র অনুবাদ ১৯৭০ সালে। তেরো বছরে পাঁচটি অনূদিত কাব্যগ্রন্থ।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই একই ধরন আমবা লক্ষ করি। 'সাড়া' থেকে 'রুকমি' পর্যন্ত মোট ৪৩টি উপন্যাসের মধ্যে, ১৯৪৪ সালের মধ্যে বেরিয়ে গেছে ২৫টি উপন্যাস— এক তৃতীয়াংশ কালের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি। পরবর্তী পনেরো বছরে এগারোটি, শেষ বারো বছরে সাতটি। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ —'দুই ঢেউ এক নদী' থেকে 'পাতাল থেকে আলাপ' পর্যন্ত— সাত বছরে একটিও উপন্যাস লেখেননি। পরেরগুলোও লিখতেন না, যদি না-লিখে পারতেন— শেষদিকের চিঠিপত্রে দেখতে পাচ্ছি উপন্যাস লিখতে আর ইচ্ছে করছে না, কিন্তু যেহেতু পুজোসংখ্যার সম্পাদকেরা উপন্যাসই দাবি করেন, এবং উপন্যাসেই সবচেয়ে বেশি টাকা পাওয়া যায়, তাই না লিখেও পারছেন না—

"'প্রসাদ'-এর জন্য একটা উপন্যাসের অর্ধেক লিখে আর এগোতে পারছি না —এদিকে সময় নেই। 'উল্টোরথ' 'সিনেমাজগৎ' নাছোড়।... তাব ওপর টাকা।

আসলে আমার মন থেকে উপন্যাস জিনিশটাই চ'লে গিয়েছে— যেন ভুলেই গিয়েছি কী ক'রে উপন্যাস লিখতে হয়।..." (৬/৭/৭২)

—'বুদ্ধদেব বসুর চিঠি কনিষ্ঠা কন্যাকে'। দেশ

সেই বুদ্ধদেব বসু— এক বছরে যাঁর পাঁচটি উপন্যাসও বেরিয়েছে!

ছোটোদের বইও তাই। সংকলন বাদে মোট ছাব্বিশটি ছোটোদের বই আছে তাঁর। তার মধ্যে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে ১৮টি। তারপর পাঁচ বছর কোনো ছোটোদের বই বেরোয়নি, ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত চোদ্দো বছরে বেরিয়েছে আটটি বই।

অন্যদিকে, নাটকবচনার পরিমাণ শেষদিকেই বেশি। নাটকে বুদ্ধদেবের উৎসাহ গোড়া থেকেই— ১৯২৭ সালে লিখেছিলেন 'একটি মেয়ের জন্য', যা অভিনীত হয়েছিল জগন্নাথ হলে, 'শুধুমাত্র চুম্বনদৃশ্য' বাদ দিয়ে। তারপরও তাঁর দুয়েকটি নাটক কলেজে-যুনিভার্সিটিতে অভিনীত হয়েছে। ১৯৩১-এ যখন পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে এলেন তখন সঙ্গে এনেছিলেন 'রাবণ' নাটক —আশা ছিল এই নাটকই তাঁর দারিদ্র্য ঘোচাবে। কিন্তু দারিদ্র্য তো ঘুচলই না, শ্যামবাজারি চক্রে পড়ে পাণ্ডুলিপি শুদ্ধ উধাও হয়ে গেল। তারপর ১৯৩৬ সালে 'অনুবাধা', ১৯৪৪ সালে 'মায়া-মালঞ্চ'— মাঝে-মাঝেই নাটক লেখবার চেষ্টা করেছেন, লিখেছেন। মঞ্চসফল অভিনয়ও হয়েছে— যার থেকে বোঝা যায় নাটকে তাঁর জীবনব্যাপী উন্মুখতা।

১৯৬৬ সালে লিখে উঠলেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। সারা জীবনের নাটক লেখার ঝোঁক সহসা মুক্তি পেল যেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩— আট বছরে লিখে উঠলেন ন-টি নাটক— গদ্যনাটক কাব্যনাটক মিলিয়ে।

প্রবন্ধের বই তাঁর প্রথম বেরোয় 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'— ১৯৩৫ সালের কথা সেটা। কিন্তু সাহিত্যিক প্রবন্ধ তিনি যদিও 'প্রগতির' যুগ থেকেই লিখছেন, এই বই বা এর পরের বই 'উত্তর তিরিশ'ও সাহিত্যিক প্রবন্ধের সংকলন নয়। 'কালের পুতুল' (১৯৪৬) থেকে শুরু হল সাহিত্যিক প্রবন্ধের সংকলন— ১৯৭৪-এ 'মহাভারতের কথা' পর্যন্ত বেরোল ন-টি গ্রন্থ। তার মধ্যে দুটি ইংরেজিতে লেখা— চারটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে।

কবিতা ও কাহিনিরচনা কমছে— বাড়ছে কবিতার অনুবাদ, প্রবন্ধ ও নাটক —এই হল তাঁর স্বাভাবিক পরিবর্তনের গতি। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে যে চারিত্রিক পরিবর্তন তাঁর রচনার মধ্যে এসেছিল, তার ফলশ্রুতি হিশেবেই ধীরে ধীরে তাঁর মানসত্তারও এই পরিবর্তন ঘটেছে। স্বতঃস্ফূর্ততার ঝোঁক কমে এল ক্রমশ— বাড়তে লাগল আবেগকে মেধার দ্বারা জারিত করে প্রকাশ করার ঝোঁক।

১৯৫৫ ।। বয়স সাতচল্লিশ

শিক্ষাজগতের ঔৎসুক্য

দশ বছর আগে বুদ্ধদেব যখন নিঃশব্দে রিপন কলেজ থেকে পদত্যাগ করে পশ্চিমবাংলার শিক্ষাজগৎ থেকে অবসৃত হয়েছিলেন, তখন তাঁর এই স্বেচ্ছানির্বাসন কেউ কোথাও লক্ষও করেনি। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই শিক্ষাজগৎ তাঁকে ফিরে পেতে উৎসুক। প্রতিভা বসু লিখেছেন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য সত্যেন বসু এই সময় জানতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বিশ্বভারতীর ইংরেজিবিভাগের দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন কিনা :

"[সত্যেন বসু] ফিরে এসে বললেন, 'বুদ্ধদেব কী করছে রে আজকাল?"

আমি বললাম, 'চিরকাল যা করেন।'

'লেখা?'

'আর কী?'

'চাকরি করতে রাজি আছে—জানিস কিছু?'

সহসা এই প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেলাম। আমাকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার বললেন, 'ভাবছিলুম আমাদের ইংরেজি বিভাগটা ওর হাতে দেওয়া যায় কিনা। কত টাকা হলে তোদের চলবে রে?'

এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে শোভন ছিল না। বললাম, 'সেটা যিনি কাজ করবেন তাঁকেই জিজ্ঞেস করলে ভালো হয় না?'

'তা তো ঠিক।' সত্যেনদা মাথা নাড়লেন, 'তবু দিদি, তুমিই তো তার হর্ত্তা কর্ত্তা, তোমার মত না হলে কি কিছু করতে পারবে?'

আমি বললাম, 'আপনি ডাকলে তিনি আসবেন না সেটা কি সম্ভব?'

'এঁরা তো বলছেন, একবার নাকি ডাকা হয়েছিল সে আসেনি।'

এ কথাটা সত্যি নয়। আমি বললাম 'ডাকা হলে আমি নিশ্চয়ই জানতাম। যদ্দূর মনে হয় এমন কোনো প্রস্তাব তিনি এখান থেকে পাননি।'

একটু চিন্তান্বিতভাবে সত্যেনদা বললেন, 'এঁরা তো তাই বলছেন। আসলে এখানকার অনেক কিছুই একটু নড়বড়ে, তাই মনে হচ্ছিল কিছু যোগ্য লোক এলে এটা দাঁড়িয়ে যাবে।..."

—*জীবনের জলছবি*, ৩য় মু। পৃ. ২১২

এই প্রস্তাব বুদ্ধদেবের কাছে তখন আর সম্ভবত গ্রহণযোগ্য ছিল না। প্রতিভা বসুর মৌখিক সাক্ষ্যে জানা যায়, এ-সময় তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে

তোলার কাজে, ত্রিগুণা সেনের সহকর্মী হিশেবে, যৎপরোনাস্তি নিমজ্জিত হয়ে আছেন— যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে দিতে তাঁর আগামী বছরের মাঝামাঝি পেরিয়ে যাবে।

'কবিতা' পত্রিকার কুড়ি বছর

আশ্বিন ১৩৬২ সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকা কুড়ি বছরে পা দিল। দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখলেন বুদ্ধদেব।

" 'কবিতা'র কুড়ি বছর আরম্ভ হ'লো। হওয়া উচিত ছিলো একুশ বছব; কিন্তু —পুরোনো পাঠকদের মনে থাকতে পারে— ১৩৫৭ ও ৫৮তে পত্রিকাব প্রকাশ এতই অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হযে উঠেছিলো যে সমযেব সঙ্গে পাল্লা দিতে গিযে কাগজে-কলমে পুবো একটা বছর আমরা ছেড়ে দিযেছিলাম। তা কুড়ি হোক বা একুশ হোক, কোনো কবিতা-পত্রিকাব পক্ষে আমবা বড়ো দীর্ঘকাল টিঁকে আছি, এ-কথা মানতেই হয। হযতো অসংগতবকম দীর্ঘকাল। পাঁচ, সাত, দশ বছবের উজ্জ্বল জীবনেব পবে আমবা যদি অবসিত হতুম, সেইটাই যেন স্বাভাবিক হ'তো, সাহিত্যেব উত্তম ঐতিহ্যেব অনুগামী। ক্লান্তি নামেনি তা নয, অন্ধকাব প্রহব আমবা জেনেছি; কিন্তু সেই মুমূর্ষুতা অতিক্রম কবাব প্রেবণা কখনো হাবিযে যাযনি, তা যেন এই পত্রিকাবই প্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিলো; তাবই আদেশ পালন কবে চলেছি আমরা।

... 'কবিতা' বেব কবাব সময়, বা পববর্তী কালে, আমাদেব সামনে কোনো স্পষ্ট আদর্শ ছিলো, এ কথা বললে অতিবঞ্জন হবে। যেটা ছিলো, সেটা মনেব একটা ইচ্ছে মাত্র, খুব বড়ো কোনো ইচ্ছেও নয;— কবিতার জন্য পবিচ্ছন্ন আব নিভৃত একটু স্থান করে দেবো, যাতে তাকে ক্রমশপ্রকাশ্য উপন্যাসেব পদপ্রান্তে বসতে না হয, কুণ্ঠিত হ'যে থাকতে না হয় বঙ-বেরঙের পসবার মধ্যে... যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় সধর্মীর সঙ্গে সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে— এইটুকু মাত্র ইচ্ছে করেছিলাম।... আমরা কবিতা নামক বিষযটাকে জব্বরি ব'লে মনে করি; মনে করি, ওতে সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার অত্যন্ত কিছু আসে যায়— যদিও সেটা কেমন ক'বে ঘ'টে থাকে, 'পুনশ্চ', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'চোরাবালি' নামক কাব্যগ্রন্থ লেখা না হ'লে— যাকে আমরা 'দেশ' ব'লে থাকি সেই দৈনিকপত্র-পরিবেশিত জনগণের কোথায কোন ক্ষতি হ'তো, সেটা বুঝিয়ে দেবাব স্পর্ধা আমরা রাখি না।... এই পত্রিকার প্রথম থেকেই, কবিতার এই আদিমূল্য আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, এবং সেই সঙ্গে, আলোচনা এবং উদাহরণ দ্বারা, এটাও স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছি যে পদ্যের আকারে মিলিয়ে লেখা রচনামাত্রকেই কবিতা বলে না।

আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিলো কবিতার পত্রিকা-রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা— এমনকি,

কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদেব লক্ষ্য ঠিক এই বকম ছিলো না : সমসাময়িক সৎকাব্যেব সমগ্র ধাবাটিকে আমবা এব মধ্যে সংহৃত কবতে চেয়েছিলাম।

... আজকেব দিনে যাঁবা পঞ্চাশ-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত, এবং যাঁবা কুড়িব কিনাবায কম্পমান— তাদেব, এবং তাঁদেব মধ্যবর্তী সকলেবই জন্য আমাদেব আমন্ত্রণ অবাবিত বেখেছি। আনন্দেব সঙ্গে স্বীকাব কবি কযেকজন তরুণ কবিব যাথার্থ্য —হযতো তাঁবাও আক্ষবিক অর্থে আব তরুণ নন, কিন্তু কনিষ্ঠবাও ইতিমধ্যে তাঁদেব কাব্যচর্চাব কিছু প্রমাণ দিযেছেন। বাংলাদেশে কবিতাব প্রচাব, মনে হয, বিবর্ধমান ; এই বিষযটিতে প্রকাশকদেব মধ্যে যে-সদ্যগর্ভিণীব অরুচি ছিলো তাও এখন অবসিত বললে ভুল হয না। তাব একটা বড়ো প্রমাণ এই যে গত দু-তিন বছবেব মধ্যে তরুণ কবিদেব অন্তত পঁচিশখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হ'তে পেবেছে, তাব অনেকগুলো আবাব একেবাবে প্রথম বই। ”

ববীন্দ্র-স্মৃতি পুবস্কাব বিষযে

এই সংখ্যাবই 'সাময়িক প্রসঙ্গ' অংশে তীব্র সমালোচনা কবলেন সদ্য-প্রবর্তিত সবকাবি ববীন্দ্রপুবস্কাব প্রদানেব পদ্ধতি নিযে :

“ববীন্দ্র-স্মৃতি পুবস্কাব বিষযে পশ্চিমবঙ্গ সবকাব যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কবেছেন, সাহিত্য এবং সাহিত্যিকেব পক্ষে তাব চাইতে অপমানজনক কোনো দলিল আমাদেব চোখে পড়েনি। লেখকদেব এব জন্য 'প্রার্থী' হতে হবে : পাবলিক সার্ভিস কমিশনে চাকুবিব আবেদনপত্রেব মতো জীবনীপঞ্জী লিখে দিতে হবে (জন্মেব তাবিখ, বিদ্যালযাদিব নাম সুদ্ধ)— শুধু তা-ই নয, দু-জন 'সুপবিচিত বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিকে'ব সুপাবিশপত্র সঙ্গে না-থাকলে সেই 'আবেদন' বিবেচিত হবে না'। বাবো কপি পুস্তকও প্রেবিতব্য। বলা বাহুল্য 'পুবস্কাব' আব 'আবেদন' পবস্পব-বিবোধী শব্দ : যাকে পুবস্কাব বলা হচ্ছে তাব মধ্যে কোনো গুণপনা বা সৎকর্মেব জন্য সম্মাননাব ভাবটাই প্রধান, সেই সম্মান যথাস্থানে অর্পণ কবাতেই দাতাব গৌবব, এবং তা যদি সম্পূর্ণরূপে অযাচিত না হয, যদি প্রাপক তাব জন্য কখনো একটি কড়ে আঙুলও নাড়েন— তাহলেই সমস্ত জিনিশটা এক দিকে হযে ওঠে ভিক্ষাবৃত্তি, অন্য দিকে ঔদ্ধত্য। লেখকেব জীবনী-তথ্য, এমনকি তিনি জীবিত না মৃত, এইসব প্রশ্নই অবান্তব : শুধু পূর্ব-বৎসবেব মধ্যে প্রকাশিত পুস্তক হওযা চাই, এই শর্তটিও নিতান্ত অর্থহীন। আব তাছাড়া একটি পুস্তকই বা হ'তে হবে কেন? কোনো-কোনো ক্ষেত্রে লেখকেব সমগ্র বচনাকেই অভিনন্দন জানাবাব প্রযোজন ঘটতে পাবে— তা থেকে একটি গ্রন্থকে বিচ্ছিন্ন কবতে গেলে মূল্যবোধ বিনষ্ট হয। এই বকম ছিদ্রবহুল বিজ্ঞপ্তি যে প্রকাশিত হ'তে পাবলো, আব তা নিযে কোনো আন্দোলনও হ'লো না এতেই বোঝা যায আমবা এখনো সভ্য জগতেব বহুদূববর্তী কোনো মরুভূমিতে বাস করছি। অন্তত সাহিত্যিকেবা এব

নিঃশব্দ এবং ফলপ্রসূ প্রতিবাদ জানাতে পারেন অসহযোগ পন্থা অবলম্বন ক'রে : কিন্তু হয়তো এতদিনে বহু আবেদনপত্র যথোচিত সুপারিশ এবং বারো কপি ক'রে পুস্তক-সমেত যথাস্থানে পৌঁছে গেছে... ।"

তরুণ কবিদের রচনার সংশোধন

তরুণ কবিরা যেসব রচনা 'কবিতা'য় পাঠাতেন, বুদ্ধদেব অনেক সময়ই সেগুলি ছাপার আগে সংশোধন করতেন। রচনা নিয়ে পত্রালাপ করতেন তরুণ কবিদের সঙ্গে। এই চিঠিগুলো থেকে বোঝা যায় কীরকম যত্ন নিয়ে তাদের রচনা পড়তেন বুদ্ধদেব। সেইরকম দুটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত হল। প্রথমটি বর্তমান বাংলাদেশের কবি শামসুর রাহমানকে লেখা।

৩ মে, ১৯৫৫

কল্যাণীয়েষু,

তোমাব কাছে অপরাধী আছি : দুটো চিঠির জবাব দেয়া হয়নি। কিন্তু নিরুত্তরতা মানেই নিঃসাড়তা নয়।

এবাবে যে-দুটি কবিতা পাঠিয়েছো তা পড়ে একটা কথা আমাব মনে হ'লো। কিছুদিন ধ'বে তুমি অনববত তিন বা তিন-দুই পাঁচ মাত্রাব ছন্দে কবিতা লিখে আসছো। এই ছন্দ ছোটো লিরিকের উপযোগী, কিন্তু কোনো গম্ভীর ভাবেব বড়ো কবিতাব পক্ষে নয়। এর মধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে (অন্তত তোমাব লেখায়) : সেটাও, শেষ পর্যন্ত, হানিকব। প্রবহমানতা এর স্বধর্ম নয়, তাব ফলে বাক্যবন্ধ বেঁকে-চুরে যায়, সিনট্যাক্স এলিয়ে পড়ে। তুমি কিছুদিন পযারে লেখো না? বা স্বরবৃত্তে? স্বববৃত্তের চালও হাল্কা, যেখানে কবিতার সংগঠনের প্রয়োজন কবে সেখানে বাংলা ভাষায় পয়ার ছাড়া উপায় নেই। তোমাব বলবার কথাও একঘেয়ে হয়ে আসছে, বিভিন্ন কবিতাকে আলাদাভাবে সব সময় চেনা যাচ্ছে না। অথচ রচনা হিশেবে প্রায় প্রত্যেকটিই ভালো। কিন্তু শুধু 'ভালো লেখা'য় তৃপ্ত থেকো না : কবিতা লিখতে চেষ্টা করো।...

বুবসু

[*বুদ্ধদেব বসু*। ভূঁইয়া ইকবাল। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১৬৪]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'বিবৃতি' ('উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে...') 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল আষাঢ় ১৩৬৩ সংখ্যায়। এই কবিতাটি বুদ্ধদেব বারংবার ফেরৎ পাঠিয়েছেন, সুনীল তাঁর পরামর্শমতো সংশোধন করে পাঠিয়েছেন। এই পত্রালাপের স্মৃতিচারণ করেছেন সুনীল :

"... 'কবিতা' পত্রিকায় আমার পাঠানো প্রথম কবিতাই ছাপা হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়

কবিতা, 'উনিশে বিধবা মেয়ে'— বুদ্ধদেব বসু আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, কবিতাটি তাঁর পছন্দ হয়েছে কিন্তু কিছু-কিছু পরিবর্তন করা দরকার। আমি পরিবর্তন করে পাঠালুম। তিনি আবার ফেরৎ পাঠিয়ে বদলাতে বললেন —আমি আবার পাঠালুম, পনেরো লাইনের কবিতা তিরিশ লাইন হয়ে গেল। এইভাবে বুদ্ধদেব বসু দূর থেকে আমার শিক্ষকের কাজ করেছেন।"

—'কবিতার সুখদুঃখ'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯

কীভাবে শেখাতেন বুদ্ধদেব বসু, কবিতা লিখতে শেখানো সম্ভব কিনা, এসব প্রশ্নের উত্তরের কিছু ইসারা পাওয়া যাবে বুদ্ধদেবের সুনীল-উল্লিখিত চিঠিদুটির একটি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করলে :

"তোমার তিনটি কবিতার মধ্যে দুটি আমার বিশেষ ভালো লাগলো, তাই কয়েকটা সংশোধনের জন্য লিখছি।

বিধবার গল্পটায় গল্পাংশ আর একটু থাকা দরকার, অর্থাৎ ঘটনার গুপ্ত নায়ক, কবিতার 'আমি'— সে যে শুধু অবিবেকী নয়, ভীরু, কাপুরুষ, সাধারণ অর্থে দুর্জন- – তার বর্ণনা করে একটা নতুন স্তবক দরকার। বীরসিংহের সিংহশিশুর অনুগ্রহে সে তো বিয়ে করতে পারতো, বাঁচাতে পারতো মেয়েটাকে। সে যে তা ইচ্ছে করেই করলো না, সেই কথাটা বিনা উচ্ছ্বাসে কেজো এবং উদাস ধরনে বলা চাই, ইংরেজিতে যাকে বলে Laconic। তাহলেই শেষ চার লাইন উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

রচনাতেও ত্রুটি আছে। প্রথম স্তবকে স্তনের উল্লেখের পরে দ্বিতীয় স্তবকে তা আর চলতে পারে না। 'যদিও আচার, অন্ন'— মানে, নিয়ম-নিষ্ঠা, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না, বদলাতে হবে। 'সুপবিত্রে'র 'সু' নেহাৎই অক্ষর ভরাবার জন্য এসেছে। দ্বিতীয় স্তবকটি সম্পূর্ণ নতুন ক'রে লেখা দরকার।..

... এইভাবে দুটি কবিতার পরিমার্জনা ক'রে শীঘ্র পাঠালে আষাঢ় সংখ্যাতেই ছাপা হ'তে পারে।..."

—*'কবিতা পত্রিকা . সূচিগত ইতিহাস।'* প্রভাতকুমার দাস। ১ম সং, পৃ. ৭১

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'বারোমাসের ছড়া'র কবিতাগুলি লেখা শুরু হয়েছিল ১৯২৯-এ, 'মৌচাক' সম্পাদক সুধীর সরকারের তাগিদে। সেই তাঁর প্রথম ছোটোদের রচনা। এ বছর তার শেষতমটি রচিত হল।

ফেব্রুয়ারিতে বেরোল কবিতার বই, 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'। ছোটোগল্পের সংগ্রহ বেরোল তিনটি—বৈশাখে 'চার দৃশ্য' ও স্বনির্বাচিত গল্প', নভেম্বরে 'একটি কি দুটি পাখি'। মে-তে বেরোল 'ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প'। এই মে মাসেই আরো বেরোল, তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার বই,

'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য'। এই বই রচনার ইতিহাসের উল্লেখ পাই গ্রন্থের ভূমিকায় :

"এই বইটার জন্মবৃত্তান্ত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রকাশের সঙ্গে জড়িত। 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড হাতে পেয়ে, অন্য অনেকের মতো, আমিও খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম ; এমনকি, নিজের সাধ্যের সীমা বিচার না-ক'রেই, হাত দিয়েছিলাম তার সমালোচনায়। আশা ছিলো, 'কবিতা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এক-একটি খণ্ডের সমালোচনা লিখে যাবো। এই ভাবে নতুন ক'রে ববীন্দ্রনাথ পড়াও হবে, আর তাঁর বিষয়ে আমার বহুদিনের সঞ্চিত এবং অনবরত পরিবর্তমান ভাবনাগুলিকেও, অন্তত নিজের কাছে, স্পষ্ট ক'রে তুলতে পারবো। কিন্তু আলোচ্য বিষযের পবিমাণের কাছে আমার সংকল্পের পরাভব ঘটতে দেবি হ'লো না। নিজের অবসরের সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার আয়তনগত বৈষম্য লক্ষ ক'রে, কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার পর আমি আলোচনার জন্য শুধু কথাসাহিত্যকে বেছে নিলাম। কবিতা ও অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে কথাসাহিত্যের প্রতি এই পক্ষপাত আকস্মিকভাবে ঘটেনি ; একাধিক কারণ ছিলো তার। প্রথমত, আমার মনে হ'লো, রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনায় কাহিনীর আলোচনায় আমাব পক্ষে অপঘাতেব আশঙ্কা কম, কেননা তাঁর কবিতা বিষযে আমি তখন পর্যন্ত (হয়তো এখন পর্যন্ত) মনস্থির করতে পারিনি, কিংবা সেই বিরাট বিষয়ের সমকক্ষ হ'তে আমার দেরি আছে। দ্বিতীয়ত, আমি অনুভব করেছি (এখনো করি) যে এই কথাসাহিত্য বাঙালি পাঠকের কাছে যথাযোগ্য সম্মান পায়নি।... এইজন্য তখনকার মতো, কথাসাহিত্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হ'লো।

'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের সমালোচনা 'কবিতা'য় ছাপা হয় ১৩৪৬-এর পৌষ সংখ্যায়, শেষ প্রবন্ধ, 'চার অধ্যায়' ১৩৫০-এর কার্তিকে।... এই ছোটো বইটি, এর অন্তত দ্বিগুণ পরিমাণ রচনা থেকে, ছেঁকে তুলতে হ'লো।

সেই সময় 'কবিতা'য় যাঁরা আমার প্রবন্ধগুলি লক্ষ করেছিলেন, তাঁদের জানানো দরকার যে এই গ্রন্থটি আক্ষরিকভাবে সেখান থেকে উদ্ধৃত হয়নি। সে-সব রচনা প্রাথমিক খশড়ার মতো ব্যবহৃত হয়েছে ; অনেক অংশ বর্জিত, এবং অন্যান্য, যুক্ত হ'য়ে অনেক স্থলে পূর্বের কাঠামো ছাড়া বিশেষ কিছু বজায় থাকেনি। বক্তব্যের দিক থেকেও অনেক পরিবর্তন ও পরিশোধন না-ক'রে উপায় ছিলো না। আর বক্তব্যে যেখানে বদল ঘটলো না সেখানেও ভাষার পরিমার্জনা এবং উদাহরণের বৈচিত্র্যসাধনের ফলে, রচনাটা নতুন হয়ে উঠলো।"

১৯৫৬ ।। বয়স আটচল্লিশ

'কবিতা' পত্রিকায় বোদলেয়ার

পৌষ ১৩৬২ সংখ্যায় রিভিয়ু বেরোল 'নিউ ডাইরেকশন্‌সে'র 'দি ফ্লাওয়ার্স অব ঈভ্‌ল' গ্রন্থের এবং তৎসহ, তেরোটি কবিতার অনুবাদ। বোদলেয়ারের বুদ্ধদেব কৃত অনুবাদ এর আগেও বেরোয়নি তা নয়, 'বোদলেয়ার অবলম্বনে' নাম দিয়েও বেশ কয়েকটি সংখ্যায় কবিতা বেরিয়েছে। নিষ্ঠভাবে ক্লেদজ কুসুমগুলির বঙ্গীকরণ এই সংখ্যা থেকেই আরম্ভ হল। এই অনুবাদগুচ্ছের এই সংখ্যায় নাম দেওয়া হয়েছে 'ফ্ল্যুর দ্যু মাল থেকে : শার্ল বোদলেয়ার'— পরবর্তী কালে এর আগে 'ল্য' যোগ হবে। এই অনুবাদ শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হবে দুই সংখ্যায় ছড়ানো সেই আশ্চর্য প্রবন্ধে, যার নাম 'শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা' — তার এখনো চার বছর দেরি।

রিভিয়ুর ক্ষুদ্র পরিসরে বুদ্ধদেব অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন ইংরেজিতে 'ল্য ফ্ল্যুর দ্যু মাল'-এর অনুবাদচর্চার, এবং বর্ণনা করেছেন কেন অনুবাদকদের কাছে বোদলেয়ারের আকর্ষণ ক্লান্তিহীন। পাঠক লক্ষ করবেন, নিচের এই ক-টি বাক্যে বিধৃত হয়ে আছে শুধু বোদলেয়ার নয়, সাধারণভাবে কবিতা অনুবাদেরই কয়েকটি মূল সূত্র :

> "অনুবাদকের পক্ষে তাঁর আকর্ষণের কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে একটি স্পর্শসহ সংবাদের উপস্থিতি ; জিনিশটাকে যেন ধরা ছোঁয়া যায়, বিষয়টা প্রায় কাহিনীর মতো উল্লেখসাপেক্ষ, এবং যে-সব চিত্রকল্পের দ্বারা তা প্রকাশিত হয় সেগুলো সব সভ্য ভাষাতেই তুল্যমূল্য। অর্থাৎ তাঁর কবিতার অভিজ্ঞতা শুধু শব্দবিন্যাস বা ধ্বনির মায়াজালের উপর নির্ভর করে না, এবং তাঁর চিন্তার ভাষাই ছবি ব'লে ভাষান্তরে অভিপ্রায়বিকৃতির আশঙ্কা খুব ক'মে যায়। নির্বস্তুক শব্দগুলোর এক-এক ভাষায়—এক-এক রকম ইঙ্গিত ; কিন্তু সামান্য বিশেষ্য শব্দের অবিকল অনুবাদ সম্ভব ; 'bird', 'oiseau' এবং 'পাখি' অব্যর্থভাবে একই জিনিশকে বোঝাচ্ছে ; কিন্তু 'espirit' কথাটাকে বাংলায় (বা ইংরেজিতে) বোঝাতে হ'লে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হ'তে পারে। বোদলেয়ারের কবিতার প্রধান নির্ভর মূর্ত বা দৃশ্য শব্দ ; তাই সক্ষম অনুবাদের মধ্যে তিনি বহুলাংশেই প্রবেশ ক'রে থাকেন।"

‘কবিতা’ পত্রিকায় রাজনীতি!

রাজনীতি নামক একটা ব্যাপারের যে অস্তিত্ব আছে, ‘কবিতা’ পত্রিকায় তা বোঝা গেছে শুধু তখনই, যখন রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব এলাকায়— ভাষার সীমানায়। এই সময়ে, বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব যখন উঠল, তখন এইরকম একটি উপলক্ষ ঘটেছিল। চৈত্র ১৩৬২ সংখ্যায় ‘ভাষা ও রাষ্ট্র’ প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখলেন :

> “আমি রাজনৈতিক নই, কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নই, আরাম-কেদারায় বসেও রাজনীতির চর্চা আমি করি না। এবং আমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই। এই পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো-একটি অংশে দৈবাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি ব’লেই তার মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ‘সকল দেশের সেবা সে যে আমাব জন্মভূমি’— এই হৃদযাবেগে আমার মন কখনো সাড়া দেয় না।
>
> আমি লেখক ; বাঙালি লেখক না-হ’লেও বাংলা ভাষার লেখক। কাজের কথা, বুদ্ধির কথা, এমনকি হয়তো মনের কথাও কখনো-কখনো অন্য ভাষায় বলতে পারি, কিন্তু প্রাণের কথা বাংলায় ছাড়া বলতে পারি না। এবং এই প্রাণ, বা অচেতন মন, তার কম্পনগুলিকে ভাষায় মূর্ত ক’রে তোলাই আমার নিরন্তর প্রয়াস। তাব ফলে আমি একটি অদৃশ্য সূত্রে যুক্ত হ’য়ে আছি সেই কয়েক কোটি মানুষের সঙ্গে, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাঙালির এবং বাংলা দেশের সঙ্গে এই ভাষাই আমার প্রধান বন্ধন। এমন কি হয়তো একমাত্র।...
>
> ইংরেজ আমলে যা ছিলো vernacular, স্বাধীন ভারতে তার নূতন নাম হয়েছে ‘regional’ বা ‘আঞ্চলিক’ ভাষা। এই বিশেষণের অর্থ কী, তা ভেবে পাওয়া শক্ত, কেননা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই আঞ্চলিক, কোনো-কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সচল— ইংরেজি, এবং অংশত ফরাশি ছাড়া, আর কোনো ভাষাকেই জাগতিক বলা যায় না। ইতালিয়ান, নরোয়েজিয়ান বা জাপানি ভাষার প্রচার খুব বেশি নয়, কিন্তু কেউ তাদের ‘আঞ্চলিক’ ব’লে উল্লেখ করে না, এক সভ্য দেশের ভাষা রূপেই তারা স্বীকৃত ও সম্মানিত। বাংলা, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার স্বাভাবিক মর্যাদাও সেই রকম, কিন্তু এই নূতন নামকরণে তাদের আভিজাত্যই শুধু উপেক্ষিত হয়নি, সত্যেরও অপলাপ ঘটেছে। ভারতের কোনো একটি ভাষাও যদি ‘আঞ্চলিক’ হয় তাহ’লে প্রত্যেক ভাষাই তা-ই ; সারা ভারত স্বাভাবিকভাবে কোনো-একটি ভাষাও বলে না, এবং এই ভাষাগুলি যাদের মাতৃভাষা তাদের সংখ্যা কোনো-এক ক্ষেত্রেও অন্যদের তুলনায় অত্যধিক নয়। অথচ, ‘আঞ্চলিক’ বললেই অধিকার সংকুচিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, শুধু ভারতের রঙ্গমঞ্চে নয়, এমনকি সেই ভাষার আপন সীমানারই মধ্যে। পাছে এই আশঙ্কা রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়, সে-কথা ভেবেই বাঙালির মন আজ বিক্ষুব্ধ। বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বিষয়ে প্রথম কথা হ’লো এই : তাহ’লে বাংলা ভাষার অবস্থা কী হবে?...

... এসব ক্ষেত্রে বাষ্ট্রপবিচালনাব সুবিধেব কথাটা বড়ো ক'বে ভাবলে চলবে না ; কেননা বাষ্ট্র একটা যন্ত্র হ'লেও তাব অন্তর্গত প্রজাসমূহ যন্ত্র নয়— তাবা মানুষ .. তাবা শুধু খেযে-প'বে বাঁচতে চায না, শুধু কম দামে মাল কিনে, বেশি দামে বেচতে চায না, চায প্রকাশিত হ'তে, আনন্দিত হ'তে, দুঃখ পেতে, ত্যাগ কবতে। তাদেব যে শুধু খিদে পায আব খিদে মিটলেই ঘুম পায তা নয, তাবা চিন্তা কবে, অনুভব কবে, সংগ্রাম কবে ; আদর্শ আছে তাদেব, সেই আদর্শ উপলব্ধি কবাব চেষ্টাও আছে। তাব সেই আন্তবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটলে তাব ক্ষতিপূবণ অন্য কিছুতেই হতে পাবে না।"

'কবিতা'য শক্তি চট্টোপাধ্যায

শক্তি চট্টোপাধ্যাযেব কবিতা প্রথম প্রকাশিত হল 'কবিতা'য— চৈত্র ১৩৬২ সংখ্যায। কবিতাব নাম 'যম'। শক্তি যদিও কবিতা লিখছেন অনেকদিন থেকেই, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁব পবিচয প্রধানত গদ্য লেখক বলেই। 'কবিতা' পত্রিকায় এই 'যম' কবিতা প্রকাশিত হওযাকেই শক্তি নিজে তাঁব কবিজীবনেব আবম্ভ বলে মনে কবতেন। এ-বিষযে স্মৃতিচাবণে তিনি লিখেছেন :

". ঐ ধবণেব আড্ডাতেই বোধ কবি উত্তেজিত হযে, পদ্য লিখবো মনে-মনে এবকম স্থিব কবে ফেলি। তখন তরুণ বচনাব অগ্নি, মানেই 'কৃত্তিবাস'। অন্যদিকে শ্রীবুদ্ধদেব বসুব 'কবিতা' পত্রিকা। সঞ্জযবাবুব 'পূর্বাশা' টিম টিম কবে জ্বলছে। বাত্তিববেলা বাডি ফিবে হিসেব মিলিযে একটা সনেট খাডা কবি। পবেব দিন সুনীলেব বাসায যাই। লেখাটা অতি সাধাবণ 'যম', ওব কাছ থেকে 'কবিতা'ব ঠিকানা নিযে বুদ্ধদেবকে পাঠাই। উনি চিঠি দেন, সামান্য সংশোধন কবে ছাপবেন। হাতে স্বর্গ পাই—কিংবা, মনেব মধ্যে কী যেন এক অবাস্তব হাওযা বাডতে থাকে। প্রায দৌডে সুনীলেব কাছে গিযে চিঠিটা দেখাই এবং দু-তিনটি টানা গদ্যে লেখা, 'সুবর্ণবেখাব জন্ম' আব 'জবাসন্ধ'। 'সুবর্ণবেখা' 'কৃত্তিবাসে'ব জন্য বেখে দিলে পবেব ডাকেই 'জবাসন্ধ' বুদ্ধদেবেব কাছে পাঠাই। পদ্য লেখাব আকস্মিক জন্ম, প্রকৃতপক্ষে সেই দিনই।"

—'এইসব পদ্য', শক্তি চট্টোপাধ্যায। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯

অধুনা-বিখ্যাত 'জবাসন্ধ' কবিতাটি বেরোয় 'কবিতা'ব পৌষ ১৩৬৩ সংখ্যায়— এটি তাঁব প্রথম বই 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্যে'ব (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬১) তৃতীয় কবিতা। 'যম' কিন্তু তাঁর কোনো নিজস্ব গ্রন্থে স্থান পায়নি। এটি দেখতে পাওয়া যাবে সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'প্রতিক্ষণ'-প্রকাশিত 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থে।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠী বলে পরিচিত এবং তাদের সমসাময়িক কবিদের কয়েকজনের প্রথম লেখা 'কবিতা'য় বেরোনোর ইতিহাস :

চৈত্র ১৩৫৬ । শঙ্খ ঘোষ : 'পাথেয়'
আশ্বিন ১৩৫৮ । আনন্দ বাগচী : 'দুটি কবিতা'
পৌষ ১৩৫৯ । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : 'নামখোদাই'
আশ্বিন ১৩৬৩ । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : 'বোধি'
চৈত্র ১৩৬২ । শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
(নমিতা মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে) : 'মধুর বিস্মৃতি'।
আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৪ । সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত : 'তিন শূন্য'
চৈত্র ১৩৬৪ । মণিভূষণ ভট্টাচার্য : 'স্থিতি'
পৌষ ১৩৬৫ । তারাপদ রায় : 'দুটি অপ্রাকৃত কবিতা'
আশ্বিন ১৩৬৬ । দিব্যেন্দু পালিত : 'দয়িতার প্রার্থনা'।

পরের প্রজন্মের দুজন বিশিষ্ট কবির রচনা 'কবিতা'য় কখনো প্রকাশিত হয়নি– উৎপল কুমার বসু ও বিনয় মজুমদার। উৎপলের কবিতা নাকি বুদ্ধদেব বসু 'বুঝতে পারতেন না'। আর বিনয় মজুমদার সম্ভবত 'কবিতা'য় কখনো 'কবিতা' পাঠাননি।

জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ :

"একটা সময়ে আমাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা মিমির বিবাহ নিয়ে বাড়িতে কিছুটা গোলমাল চলছিল।.... মিমির বাবা তখনো দেশে ফেরেননি। আমাকে মিমি তার আগেই একদিন তার এই নির্বাচনের কথাটা জানাল।... [পাত্রের] বয়েস মাত্র উনিশ, আর্থিক সংগতিতে অতিমাত্রায় ক্লিষ্ট, স্বাস্থ্য নামক কোনো বস্তু তখনো তার দেহকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি।... সুতরাং এই প্রস্তাবকে শান্ত মনে মেনে নিতে আমার অসুবিধে হল। শেষ পর্যন্ত এইটুকুই বলতে পারলাম, 'তোমার বাবা আসুন, তারপর দেখা যাক তিনি কী বলেন। অবশ্য ধীরেসুস্থে একথাটাও বললাম– ছেলেটি তো সবে বি.এ. পাশ করল, বিয়ে করতে হলে একটা চাকরি অন্তত দরকার। তা ছাড়া তোর চেয়ে এক বছরের ছোটো, কে ওর বাবা তিনি কোথায় থাকেন কী করেন তাও তো জানি না, এরকম ক্ষেত্রে– মিমি বলল, 'ওসব নিয়ে তুমি ভেবো না'।

... ওর বাবা ফিরে এসে সব শুনে একেবারে আগুন। সেই আগুন নেবাতে আমার অনেক জল খরচ হল। অনেকবার বলতে হল এসব বিষয়ে বিরোধ বাধিয়ে কোনো লাভ হবে না। মিমি আমার সঙ্গে বন্ধুর মতোই এসব কথা বলেছে, তুমিও দয়া করে চ্যাঁচামেচিটা বন্ধ রেখে তোমার যা বক্তব্য তাও বলো, মিমিও তার বক্তব্যটা বলুক।

কাকস্য পরিবেদনা। এসব শোনার পাত্রই সে নয়।... দুই ঘরে দুই পিতা-কন্যাকে শান্ত রাখতে রাখতে আমার মানসিক পরিশ্রমের কোনো সীমা ছিল না। *মিমি যেন তার বাবার উপর রাগ না করে, মিমির বাবা যেন কন্যার প্রতি বিরূপ*

না হন ঐটুকু বাড়ির এই দৌত্যগিরি করতে করতে আমার অবস্থা শোচনীয়। আমি যথাসম্ভব শীঘ্র একটা বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললাম। [বিয়ে হয়েছিল ২৭মে ১৯৫৬]। এবং ঠিক করে ফেলার পরেই সকলের আগেই যা মনকে বিমর্ষ করে ফেলল তার নাম টাকা। বিয়ে দিতে হলে নিশ্চয়ই কিছু টাকার প্রয়োজন। সেই টাকার কথাটা তুলতেই বুদ্ধদেব লেখার টেবিলে বসে পা নাড়াতে-নাড়াতে আমার দিকে চোখ না তুলেই বললেন, 'টাকা! টাকা লাগবে কেন? রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে বাসভাড়া দিয়ে দিও চলে যাবে।'

বোঝা গেল এই ব্যক্তির সঙ্গে কোনো পরামর্শের মধ্যে যাওয়া বৃথা। পূর্বে যেমন সিকি জমাতাম পরবর্তী কালে সিকি ছেড়ে আধুলি জমানো ধরেছিলাম। ... সেদিন গিয়ে খুললাম। গুণতে সময় লেগেছিল, কেননা সেখানে এক হাজার টাকার আধুলি ছিল। আমি আর দেরি করলাম না, তৎক্ষণাৎ সোনার দোকান লক্ষ্মী ব্রাদার্সে চলে গেলাম। তখন সোনার ভরি ছিল আশি টাকা করে।

... আর কী আশ্চর্য, ঈশ্বর বোধহয় সে সময়ে কোনো কারণে আমার উপর প্রীত ছিলেন। হঠাৎ এক সিনেমার প্রোডিউসারকে পাঠিয়ে দিলেন. তিনি বেশ ভালো টাকায় আমার উপন্যাস 'বিবাহিতা স্ত্রী' বইটি কিনে নিলেন। ব্যস, এখন আর আমাকে পায় কে? এই টাকাটাকে আমি আমার টাকা মনে করলাম না। আমি মনে করলাম মিমির জন্যই ঈশ্বর এটা আমাকে পাঠিয়েছেন।...

... হঠাৎ মিমির বাবা উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন, 'এত করছ, আর এদিকে নিমন্ত্রণপত্রটাই লিখছো না। এসো, কী লিখতে চাও বলো।' তারপর কী চিন্তা! কী রকম কাগজ হবে, কেমন তার খাম হবে, চিঠিটা হাতের লেখার ব্লক করা হবে না ছাপা হবে।... বুদ্ধদেবের উৎসাহ দেখে আমার মনের গুরুভার অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। এবং আমি এজন্য সৌরেনবাবুকেই ধন্যবাদ দিলাম।

... বিরামবাবুর ['নাভানা'র বিরাম মুখোপাধ্যায়] হাতের লেখাই ব্লক করা হল। এবং সেই হাতের লেখায় ব্লক করা চিঠিটা যে কী সুন্দর হল! নিচে পিতামাতা দুজনেরই নাম দেওয়া হল। আমার মনে হয় না ১৯৫৬ সালে আমাদের কন্যার বিবাহের পূর্বে অন্য কোনো বঙ্গসন্তানের বিবাহের চিঠিতে মাতার নাম লিখে তাঁকেও এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। কবিতাভবনের অনেক আধুনিকতার সঙ্গে এটাও যুক্ত করা চলে।...

... বিবাহের আগের দিন বুদ্ধদেব এসে মিমির মাথার কাছে যে ইজিচেয়ারটা রাখা ছিল সেটায় বসে মিমির মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'কীরে, তা হলে তুই সত্যি চলে যাবি এখান থেকে?' বলতে বলতেই গলা ধরে এল। আর মিমি উঠে বসে 'বাবা গো' বলে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। রুমিও উঠে বসল, পাপ্পাও উঠে বসল। তারপরে সংসারের পাঁচটি প্রাণী একাত্ম হয়ে একই বেদনায় চোখের জলে রাত ভারি করে ফেললাম। মিমির বাবা এত কাঁদলেন যে সমস্ত কিছুতেই নিস্পৃহ হয়ে থাকা মানুষটির হৃদয় যে কন্যার বিরহ আশঙ্কায় এত সজল হয়ে আছে কল্পনাও করিনি।..."

—*জীবনের জলছবি*, ৩য় সু। পৃ. ২০৩

মীনাক্ষী দত্তের স্মৃতিচারণ

"আমার বিয়ের সময় প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন বাবা। আমি তো তাতে বিস্ময়ে হতবাক, আবার একটু ফ্ল্যাটার্ডও। বাবাকে কোনোদিনই মধ্যবিত্ত বাবা-র রোলে ভাবতে পারিনি, তাই আমি কাকে বিয়ে করছি বা করছি না, তাতে তাঁর অতটা এসে যাবে, ভাবাই যায় না। তারপর আপত্তির কারণগুলিও যুক্তিহীন : পাত্রের বয়স কম (১৯), সে বেকার। সে সময়ে কী ঝগড়াই না বাবার সঙ্গে করেছি। পরে অবশ্য জ্যোতির [জ্যোতির্ময় দত্ত : মীনাক্ষীর স্বামী] মা-বাবাকে দেখে বাবা মত পাল্টান।... অবশ্য রাজি হয়েও রেহাই নেই। কেন যেন বলতে শুরু করলেন হিন্দু বিয়ে করতে হবে। বাবা নাস্তিক, হিন্দু আচারনিষ্ঠার ঘোরতর বিরোধী, প্রায়ই বলতেন মধুসূদন দত্তর সময়ে জন্মালে আমিও খৃস্টান হতে বাধ্য হতাম। নিজে প্রেম করে বিয়ে করেছেন এবং হিন্দুমতে বিয়ে করতে ছিলেন নারাজ। জ্যোতির আর আমার সে কী মোহভঙ্গ। তখন মা-ই ছিলেন আমার আর বাবার মধ্যে সেতু। বাবাকে আমার পক্ষে এবং আমাকে বাবার পক্ষে এমন সব যুক্তি দিয়ে কুপোকাত কবতেন যা কোনো ডিপ্লোম্যাট কোনোদিন পারবেন না। ... বিযে হয়েছিলো টালিগঞ্জ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে (২ নম্বর) কাকা— অর্থাৎ সৌরেন সেনেব তত্ত্বাবধানে। সানাই ছাড়া আর কোনো হিন্দু রীতি পালিত হয়নি। রাজেশ্বরী তিনটি গান গেয়েছিলেন সই হবার পর। যামিনী রায় ছিলেন পুরোহিতেব মতো উপস্থিত।...

বিয়ের পরেই কিন্তু বাবার আর জ্যোতির ঝগড়া মিটে গেল। বস্তুত জ্যোতির সঙ্গে বাবার বন্ধুতা প্রায় প্রেমের মতোই ছিল গভীর যা প্রায়শই আমার ঈর্ষার কারণ হত।...

—'আমাদের ২০২ মীনাক্ষী দত্ত। কবিতাভবন বার্ষিকী ১ম সংখ্যা ১৯৮৭

'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগ

বছরের মাঝামাঝি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে —নবপ্রতিষ্ঠিত 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান অধ্যাপক হিশেবে। ছ'জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এম. এ. প্রথম বর্ষের পাঠক্রম আরম্ভ হল। আর যেসব অধ্যাপক প্রথম থেকে যোগ দিলেন, তাঁরা হলেন ফাদার ফালোঁ, ফাদার আঁতোয়ান, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ড. রোডেরিক মার্শাল, এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। নরেশ গুহ যোগ দেন অল্প কিছুদিন পরে।

সুধীন্দ্রনাথের অধ্যাপক হওয়া নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল, কারণ তিনি এম. এ. পাশ ছিলেন না ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রথম যুগে আইনকানুনের খুব একটা বাঁধাবাঁধি ছিল না। তা ছাড়া বুদ্ধদেব বসুর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনই প্রভাব ছিল যার ফলে আইনকানুনকে পাশ কাটিয়েও অনেক কাজ তিনি করিয়ে

নিতে পারতেন।

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'যাদবপুর জর্নাল অব কম্প্যারেটিভ লিটরেচার'এর প্রথম সংখ্যায় (১৯৬১) 'অ্যাবাউট আওয়ার কন্ট্রিবিউটার্স' অংশে সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

Sudhindranath Datta (1901-1960), poet, essayist and self-styled nihilist, became a teacher of Comparative Literature almost by accident; that he had never thought of being a teacher is proved by the fact that he spurned to take the degree officially necessary for an academic career... When Buddhadeva Bose asked him to join the newly formed department in 1956, Sudhindranath Datta accepted the offer not in a spirit of obliging a close friend and a fellow poet but with genuine eagerness. He had reached a stage in both his social and poetic life when a renewal of contacts with the new generation of poets and intellectuals had become essential for him. And the Comparative Literature Depatment of Jadavpur University, under Buddhadeva Bose's professorship, had become the ideal place for such a spiritual liaison.

Sudhindranath was, of course, even more necessary to the department than the department was to him. Till the day of his death (June 25), he was a tremendous source of inspiration to his pupils; the example of his life and the meaning of his words acted like a radiating substance on the minds of those young intellectuals who crowded around him and set up a chain-reaction which, it can be safely predicted, will continue far into the future ..."

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

দুটি উপন্যাস লিখে উঠলেন এ-বছর— 'শেষ পাণ্ডুলিপি' ও 'নীলাঞ্জনের খাতা'।

ফেব্রুয়ারিতে বেরোল 'বারোমাসের ছড়া', আশ্বিনে 'রান্না থেকে কান্না', ছোটোদের গল্পসংগ্রহ। অক্টোবরে 'শেষ পাণ্ডুলিপি'। 'সুখী রাজপুত্র' ও 'স্বার্থপর দৈত্য'— অস্কার ওয়াইল্ডের দুটি গল্পের অনুবাদও বই হয়ে বেরোল।

১৯৫৭ ।। বয়স ঊনপঞ্চাশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬) পর 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে শোকপ্রস্তাব লিখলেন বুদ্ধদেব।

অনেক কবি ও লেখকের মৃত্যুর পর 'কবিতা'য় তাঁদের শোকপ্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে, 'কবিতা'র নিয়মিত বিভাগগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এই বিভাগটির একটি বিশেষত্ব আমরা গোড়া থেকেই লক্ষ করি। সাধারণত এই ধরনের রচনার কাছে যেসব প্রত্যাশা আমাদের থাকে, এই রচনাগুলি সেসব প্রত্যাশা পূরণ করে না ; এতে থাকে না মৃতব্যক্তিব জীবনীর চুম্বক, অথবা তাঁর গ্রন্থতালিকা (একমাত্র ব্যতিক্রম জীবনানন্দ, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটি রচনামাত্র নয়, একটি আস্ত সংখ্যা তাঁর স্মৃতিতে নিবেদন করা হয়েছিল) ; এমনকি তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণও থাকে না। তার বদলে যা থাকে, তা হল তাঁর একটি অভ্রান্ত, নিখুঁত, সাহিত্যিক মূল্যায়ন।

সাধারণতই এই রচনাটি বুদ্ধদেব বসু নিজে লিখতেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে যা লিখেছিলেন তার শেষাংশটি এখানে উদ্ধার করা হল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিশ্বাস, যা তাঁর জীবৎকালেই বহু বাদানুবাদের জন্ম দিয়েছে, তার উল্লেখমাত্র এই রচনায় অনুপস্থিত ; অথচ তাঁর সম্পর্কে সারকথাগুলি যেরকম অভ্রান্তভাবে এখানে উচ্চারিত হয়েছে, আজ পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক রচনাদিতে তার তুলনা বিরল।

> "... দৈবাৎ, এবং অল্পের জন্য, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখক তিনি [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] হননি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্থান সেখানেই চিহ্নিত ছিলো, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও 'যুবনাশ্বে'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট। প্রভেদ এই, তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিলো না, কেননা যার জন্য 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ সে-জমি ততদিনে জেতা হ'য়ে গেছে, এবং, একই কারণে, মণীন্দ্রলাল ও গোকুলচন্দ্রের স্কুলেও তাঁকে কখনো হাত পাকাতে হয়নি। তিরিশেব দশকে যাঁরা তাঁর প্রথম রচনাবলি পড়েছেন, তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি যে সদ্যমৃত 'কল্লোলে'র সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ক ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।...
>
> ... তাঁর পূর্বরচনা কবিতার গুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখান থেকে প্রথমে বাস্তববাদে, তারপর প্রকৃতিবাদে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রথম উপন্যাসের

শিবোনামাতেই কবিতা আছে ; 'দিবাবাত্রিব কাব্য' শুধু নামত কাব্য নয়, সাবত তাকে একটি দীর্ঘ গদ্য-কবিতা বললে অত্যুক্তি হয না। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব সবচেযে কম 'পাকা লেখা', সব চেযে কম স্পষ্ট, কিন্তু সেইজন্যেই তাতে বাব-বাব দিগন্ত দেখা যায, যেন আশ্চর্যেব আভাস দেয থেকে-থেকে। 'পদ্মানদীব মাঝি'তে, এমনকি 'পুতুলনাচেব ইতিকথা'য— তাদেব নিখুঁত বাস্তবসদৃশতা সত্ত্বেও —এই অলৌকিকেব উদ্ভাস আমবা অনুভব কবতে পাবি, বর্ণিত মানুষেবা যেন অন্য কিছুব প্রতিনিধি, এই অনুভবেব ফলে তাবা নতুন একটি আযতন পায —যেটা তথ্যগত নয, ভাবগত। পববর্তী, এবং এক দিক থেকে আবো পবাক্রান্ত বচনায, এই ভাবাযতনেব বদলে দেখা দিলো কঠোবতম বস্তুনিষ্ঠা, এবং এক মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা, যা পাঠকেব কোনো দুর্বলতাকেই দযা কবে না, ভয কবে না সমাজেব নিম্নতম পাঁক থেকে বাস্তবেব ছবি উদ্ধাব ক'বে আনতে। আস্তে-আস্তে এক দিগন্তহীন চতুষ্কোণ প্রদেশ তিনি দখল ক'বে নিলেন মানুষেব নিশ্বাসে ঘন ও তপ্ত সেই দেশ, উদ্ভাবনে উর্বব, জীবনসংগ্রামে আবক্তিম— যেখানে চোব, ভিখিবি, কুষ্ঠবোগী, কেবানি এবং কেবানীব বৌ জীবন ও প্রজননেব মূল সূত্রে অবিবাম ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই প্রদেশেব বাস্তবতা অনস্বীকার্য, এবং বাস্তবতাই এব প্রধান গুণ। অর্থাৎ এব মধ্যে অস্বভাবী মানুষ বা ঘটনাব অভাব নেই ; হত্যা, আত্মহত্যা, স্নাযবিক বিকাব, মানসিক ব্যাধি, লোভ এবং ক্ষুধাজনিত মত্ততা— এই সব ঘুবে ফিবে দেখা দেয, এমনকি অপ্রাকৃতও যে কখনো স্থান পায না তা নয, কিন্তু এই উপাদানসমূহ কোনো অন্তবালবর্তী অর্থেব দ্বাবা বঞ্জিত হয না, আমাদেব দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব পটভূমিকাতেই যথাযোগ্য বিন্যাস পায। একটি গল্প মনে পডছে যাব নাম 'বিবেক' ; তাতে এক দাবিদ্র্যক্লিষ্ট পুরুষ মুমূর্ষু স্ত্রীকে বাঁচাবাব চেষ্টায প্রথমে এক ধনী বন্ধুব ঘডি, পবে তাব নিজেবই মতো এক দবিদ্রেব টাকা চুবি কবলে ; তাবপব, তাব স্ত্রীব বাঁচাব আশা নেই, বডো ডাক্তাবেব এই বায শুনে সন্তপ্তচিত্তে ধনীব ঘডি ফিবিযে দিলে, কিন্তু গবিব বন্ধুব প্রাপ্য বিষযে নীবব ও নিষ্ক্রিয বইলো। মানুষেব বিবেক সুদ্ধ ধনীব পক্ষপাতী, এই ব্যঙ্গই এখানে অভিপ্রেত ; এবং অনুরূপ আবো অনেক উদাহবণ অনেক পাঠকই মনে আনতে পাববেন। বোঝা যায, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায তাঁব সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধেব দ্বাবা আক্রান্ত হতে দেননি ; তাঁব জগতে এমন কোনো স্তব নেই যেখানে 'ধনী-নির্ধন', 'উচ্চ-নীচ', 'সুস্থ-রুগ্ন' প্রভৃতি সমাজস্বীকৃত বিপবীতগুলো কোনো ভাবগত আদর্শেব চাপে ভেঙে পড়ে। সেইজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব অস্বভাবীবাও ছাযামূর্তিব মতো হানা দেয না, বক্তে মাংসে সীমিত হ'যে থাকে ; তাঁব শ্রেষ্ঠ বচনায ঘটনাবিন্যাসও সর্বদাই যথাযথ মনে হয। মধ্য-বিশ-শতকেব বাংলা-দেশেব সামাজিক বিশৃঙ্খলাব ঘনিষ্ঠ রূপকাব তিনি : যে-সমযে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীব একটা অংশ নিচে নেমে এলো, এবং তথাকথিত দীন শ্রেণীব একটা অংশ প্রবল হয়ে উঠলো, সেই অধ্যায়ের বিবিধ লক্ষণ ভাবীকালেব জন্য মূর্ত হ'যে বইলো তাঁর রচনায়। বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায তিনি অদ্বিতীয ;

বঙ্কিমের মতো, অথবা কোনো-কোনো উত্তরপুরুষের লেখকের মতো, তাঁকে কখনো স্থানে অথবা কালে দূরে স'রে যেতে হয়নি ; উপন্যাসের আসর সাজাতে হয়নি অতীতের কোনো নিরাপদ অধ্যায়ে, অথবা কৌতূহলোদ্দীপক বৈদেশিক পরিবেশে : বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন, এবং তার যে-অংশটিকে শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, তা সাক্ষর ও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।"

—'কবিতা', পৌষ ১৩৬৩

কবিতার অনুবাদ

আরো একটি কারণে 'কবিতা'র এই সংখ্যাটি স্মরণীয়। এই সংখ্যায় বুদ্ধদেব-অনূদিত তিনজন কবির রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কালিদাসের মেঘদূত : উত্তরমেঘ, শ্লোক ৬৪ থেকে ১১৬ ; জর্মান কবি ফ্রীডরিখ্ হ্যেল্ডারলিনের ৩ পর্বে বিভক্ত দীর্ঘ কবিতা, 'দিওতিমার জন্য মেনন-এর বিলাপ' ; এবং ফরাশি কবি শার্ল বোদলেয়ার-এর 'ল্য ফ্লর দ্যু মাল' কাব্যগ্রন্থ থেকে ন-টি কবিতা। 'মেঘদূতে'র ভূমিকার প্রথম অংশটিও প্রকাশিত হল এখানে—'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' নামে।

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ কবিতা

নিজে সৃষ্টিশীল লেখক হয়ে, নিজের কালের অন্যতম প্রধান কবি হয়ে, যে পরিমাণ সময় অনুবাদে ব্যয় করেছেন বুদ্ধদেব তার তুলনা শুধু বাংলায় কেন, বিশ্বসাহিত্যেই সম্ভবত বিরল। একমাত্র উদাহরণ হিশেবে যাঁকে আমাদের মনে পড়ে তিনি বরিস পাস্টেরনাক। রাষ্ট্রের সঙ্গে আদর্শগত বিবাদ হওয়ায় তিনি দশ বছর নিজে কোনো কবিতা লেখেননি, শেক্সপিয়ারের অনুবাদ করে কাটিয়েছেন। বুদ্ধদেব যে পাস্টেরনাকের অনুরাগী ছিলেন তার একটা কারণ হয়তো পাস্টেরনাকের অনুবাদপ্রীতি। কিন্তু তিনিও নিজেকে অনুবাদে নিযুক্ত করেছিলেন বাধ্য হয়ে, বুদ্ধদেব বসুর মতো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নয়।

অনুবাদে কেন এত সময় দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব? অনুবাদ কবিতা বিষয়ে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধার করে দিলে হয়তো অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটি স্পষ্ট হবে :

"কবিতার অনুবাদ সম্ভব কি সম্ভব নয়, এই মস্ত বড়ো অর্থহীন তর্কটা টপকে পার হ'য়ে আমি একেবারেই বলতে চাই যে কবিতার অনুবাদও একটি সপ্রাণ, সংক্রামক, মূল্যবান সাহিত্যকর্ম, এবং কখনো-কখনো— অনুবাদক আপন ভাষায় কবি হ'লে-

– তা সৃষ্টিকর্মেরও মর্যাদা পায়। আমরা যারা রুশ, জর্মান, লাতিন, গ্রীক, চৈনিক প্রভৃতি ভাষা জানি না, আমরা সে-সব ভাষার কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে পারি দুটি-তিনটি অনুবাদ মিলিয়ে পড়লে ; জানতে পাই কবির মন, কী তিনি বলতে চেয়েছেন, হয়তো তাঁর ভঙ্গিরও খানিকটা , মূলের অনেক রমণীয়তা নিশ্চয়ই বাদ পড়ে, কিন্তু– যদি সে-কবি শুধু শব্দের বেসাতি না-ক'রে কিছু ব'লেও গিয়ে থাকেন– মোটের ওপর এমন কোনো দামি জিনিশ পাওয়াই যায়, যা আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যে নেই, আর যার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সেই সাহিত্যের ঋদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ”

—'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত'। 'কবিতা' আষাঢ় ১৩৬১

"ভালো অনুবাদও দৈবাধীন, কোনো একরকম প্রেরণার মুখাপেক্ষী, কিন্তু অনুবাদে চিন্তার অংশটা অন্যে জুগিয়ে দেয় ব'লে, কবি তাকে প্রায় একটা প্রকরণগত সমস্যায় পরিণত করতে পারেন, অনেক বেশি নির্ভর করতে পারেন ভাষা, ছন্দ-মিল ইত্যাদিতে তার পরিশ্রমী দক্ষতার উপর। যখন স্বকীয় ভাবে বলার কথা খুজে পাওয়া যায় না (এমন সময় সব কবিরই আসে), তখন পুরনো কথার পুনরাবৃত্তির বদলে অনুবাদকর্মই শ্লাঘনীয় , তাতে চর্চার এবং ব্যায়ামের সুযোগ মেলে, 'হাত' ঠিক থাকে, লেখক একটা নিয়মের অধীন হ'য়ে অপচয় থেকে রক্ষা পান, এবং এই সচেষ্টতার ফলে হয়তো কবিতার প্রকৃতি বিষয়ে একটু তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি, কলাকৌশলে আরো নিশ্চিত একটু নৈপুণ্য তার আয়ত্তে আসে– সে-উপার্জন তিনি সুদে খাটাতে পারেন পরবর্তী স্বকীয় রচনায়।"

—তদেব।

কবিতা-মেলা

২৭, ২৮ ও ২৯ বৈশাখ ১৩৬৪, জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী ভবনে অনুষ্ঠিত হল কবিতামেলা। এই মেলার আহ্বায়ক ছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় ও মুরারি সাহা। বাংলা কবিতার জগতে একটি বিশেষ ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছিল এই কবিতা-মেলা— ১৯৫৪ সালে সেনেট হলে অনুষ্ঠিত 'কবিসম্মেলনে'র কথা বাদ দিলে, দীর্ঘকালের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতির জগতে এর সঙ্গে তুলনীয় কোনো ঘটনা ঘটেনি। কবিতা-পত্রিকায় এই মেলার প্রতিবেদনে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত লিখেছেন :

" কবিতা-মেলার পক্ষ থেকে শনিবার, আটাশে বৈশাখ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হ'লো, আমার মতো অনেকের কাছেই এই ঘটনা অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিলো। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই সংবর্ধনার পৌরোহিত্য-সূত্রে তাঁর স্বকীয় ভাবঋদ্ধ ভঙ্গিতে এই দুই কবিকে অভিনন্দন জানালেন— বাংলা কবিতার বিবর্তন ও উন্নতির পক্ষে 'কবিতা'

ও 'পূর্বাশা'র বিশেষত 'কবিতা'র, অবদান যে কতখানি, সে-সম্বন্ধেও তিনি শ্রোতাদের সচেতনতা দাবি করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত ধীরে-ধীরে সেদিন যে-কটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তার বক্তব্য লেখকের রচনাসূত্রে আমাদের পরিচিত হলেও, কবিতা-মেলার ঐ আলোক-উদ্ভাসিত মঞ্চে, যাঁরা কবিতা পড়তে ভালোবাসেন একমাত্র তাঁদেরই উপস্থিতির পরিবেশে অত্যন্ত তাৎপর্যময় হয়েছিলো। আমরা যারা কবিতা লিখি বা লিখতে চাই, মনে বল পেয়েছিলাম, মনে আছে।...

সমস্ত য়োরোপের মধ্যে, একমাত্র পারীতেই এ-ধরনের কবিতা-মেলার রেওয়াজ আছে। অবশ্য আমরা যতটা ভেবে থাকি, ততটা উল্লেখযোগ্যভাবে নয়। বিদেশে, টিকিট কেটে, মৃত বা জীবিত কবিদের কবিতা শুনতে যান কেউ কেউ। সব টিকিট কদাচিৎ বিক্রি হয় বলে শুনেছি। সুতরাং, কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই কবিতা-মেলা— নানাভাবে অভিনন্দন ও আলোচনার যোগ্য। ..."

—'কবিতা' : আষাঢ় ১৩৬৪

সরকারি ভাষা-কমিশনের বিবৃতির প্রতিবাদ

২৬১ পৃষ্ঠাব্যাপী বিশাল বিবৃতিতে সরকারি ভাষা কমিশন, ভূরিপরিমাণ যুক্তি ও বাগবিন্যাস সহযোগে এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

এর প্রতিবাদে, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৪ সংখ্যা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হল বুদ্ধদেবের বিখ্যাত প্রবন্ধ— 'ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব'। শিরোনামের তলায় বন্ধনীর মধ্যে পরিষ্কার লিখে দেয়া হল— 'সরকারি ভাষা-কমিশনের বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ'।

জোর করে হিন্দিকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উপর চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে একটি ধ্রুপদী প্রতিবাদ হিশেবে এই রচনাটি দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে তিনি দেখালেন, ভাষা-কমিশনের বিবৃতির মুখবন্ধে উপনিষদ থেকে যে রচনাটি উদ্ধার করা হয়েছে সেটিই যুক্তিসহ নয়। তারপর বিবৃতির শেষ পরিচ্ছেদটি উদ্ধৃত করে দেখালেন :

"... ভাষা কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ভাষা বলতে বোঝেন একটি যন্ত্র বা বাহন, একটি আধার বা উপায়মাত্র, যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন ক'রে থাকি। এবং আমি এই মুহূর্তেই ব'লে নিতে চাই যে ভাষা বিষয়ে এই ধারণা সারত ভুল, মূলত মিথ্যা, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিবাদী।

ভাষা যে-অর্থে উপায়মাত্র— 'means of communication' সে-অর্থে ইতর প্রাণীরও ভাষা আছে। ...চিমটিও একপ্রকার বার্তা—'communication', চিমটি ভোগীর 'উঃ' শব্দও তাই। ভাষা বাদ দিয়ে যদি এতদূর পর্যন্ত বিনিময় করা যায়,

আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন না-ঘটে, এবং সামাজিক জীবনও সম্ভব হয়, তাহ'লে মানুষের ভাষার প্রয়োজন হ'লো কেন?

... চিমটি, চুম্বন বা হ্রেষাধ্বনির তুলনায় ভাষা অনেক ব্যাপকতর অর্থে বার্তাবহ ;... 'আমার খিদে পেয়েছে' বা 'আমি তোমাকে কামনা (বা ঘৃণা) করি এরকম কথা ভঙ্গির দ্বারা বলা গেলেও 'কংগ্রেসকে ভোট দিন', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' বা 'একনায়কত্বের অবসান চাই' বলতে হ'লে ভাষা ভিন্ন চলে না।... এবং এ-সব কথা বাংলায় যত ভালোভাবে বলা যায়, ক্যানাড়া, মারাঠি, হিন্দি বা উড়িয়াতেও ততটাই— উনিশ-বিশের বেশি তফাৎ এখানে হ'তে পারে না। যে-বস্তু একটা 'উপায়মাত্র, সারবস্তু নয়', যার 'নিজস্ব মূল্য কিছুই নেই', তা হিন্দি হোক বা ইংরেজি হোক বা রাশিয়ান হোক, তাতে কী-ই বা এসে যাচ্ছে। অতএব-– এই হ'লো ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের পরামর্শ— আসুন আমরা সর্বভারতে সবাই মিলে হিন্দিকে গ্রহণ করি, তাতে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে এবং সারা দেশে সর্বপ্রকার কাজ চালাবার পক্ষে সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি।"

তারপর তিনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন কোথায় ভাষার আসল প্রয়োজনীয়তা, মাতৃভাষা কেন মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান অবলম্বন—

"আইন, শিক্ষা শাসন, প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মান জানাবার পর আমবা যখন সাহিত্যের আহ্বান শুনতে পাই, তখনই ভাষা বিষয়ে অন্য একটি ধারণায় আমাদের অন্তস্থল উদ্ভাসিত হ'তে থাকে। এই একটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে আমরা উপলব্ধি কবি যে ভাষা কোনো উপায়মাত্র নয়, ভাষাই উৎস ; চিন্তা থেকে ভাষা নির্গত হয় না, ভাষাই চিন্তাকে জন্ম দেয়।"

বুদ্ধদেব বসু রাজনীতি করতেন না, দাবি করতেন যে তিনি রাজনীতি বোঝেন না। কিন্তু হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করবার এই রাজনৈতিক পদক্ষেপের প্রভূত প্রতিবাদ করে, শেষ পর্যন্ত তিনি একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ; এটি লিখিত হবার অর্ধশতাব্দী পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কী অমোঘভাবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে :

"যদি জাতীয়তাবাদের ফুটন্ত কটাহে ভারতবাসীরা তাঁদের প্রাণরস পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হন, তাহলে দুটিব মধ্যে একটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। এক হ'তে পারে— বাঙালি, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি অভিজ্ঞান ভুলে গিয়ে আমরা সকলেই ভারতীয় নামক এক অর্ধকাল্পনিক ধারণার মধ্যে নিবিষ্ট হবো ; কিংবা, যেহেতু তামিল, মারাঠি, বাঙালি প্রভৃতি অভিজ্ঞান এক-একটি সপ্রাণ পদার্থ, যার পিছনে আছে বহুযুগের বিশেষ-বিশেষ সাধনার ধারা, সেইজন্য এমন সম্ভাবনাও প্রবল যে কিছুদিন পরে, আপন-আপন ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননা ও অবক্ষয় লক্ষ ক'রে, অহিন্দিভাষী সমগ্র ভারতে বিচ্ছেদপ্রবণ বিদ্রোহ জেগে উঠবে।"

১৯৫৮ ।। বয়স পঞ্চাশ

তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে অধ্যাপনা

যাদবপুরে পড়াচ্ছেন ; তাঁর সময়ের একটি বড়ো অংশ অধিকার করে নিচ্ছে তু.সা-র পঠন, পাঠন, পাঠক্রম তৈরি, প্রশ্নপত্র তৈরি, খাতা দেখা, টিউটরিয়েল নেয়া এবং এই সংক্রান্ত আর যত ক্রিয়াকর্ম। এ-বছর তু.সা-র প্রথম বছরের ছাত্ররা এম.এ পাশ করলেন। এঁরা প্রায় সকলেই পরবর্তী জীবনে যোগ দিয়েছিলেন তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনাকর্মে— অমিয় দেব, নবনীতা দেবসেন, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত— সকলেই সাফল্যের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রি সংগ্রহ করে এনেছিলেন কোনো-না-কোনো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং তার চেয়েও যা অনেক বড়ো কথা— এঁদের প্রায় সকলেই স্বাধীন সাহিত্যসৃষ্টির কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক

ছাত্রদের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর সম্পর্ক কেমন ছিল, সে-সম্পর্কে তাঁর ছাত্র, পরবর্তীকালের প্রথিতযশা লেখক দিব্যেন্দু পালিত লিখেছেন :

> "শিক্ষক হিসেবে বুদ্ধদেব যে শুধু স্নেহশীল বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন তা নয়। বরং পড়াশুনোর ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাঁকে মনে হত অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর ; সামান্য অবহেলায় হয়ে পড়তেন অসন্তুষ্ট। মনে আছে তাঁর কাছে প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসের অভিজ্ঞতা। আমরা জন চার-পাঁচ যারা তাঁর ক্লাসে ছিলাম, প্রত্যেকের খাতাই কলমের আঁচড়ে হয়ে গেছে ছিন্ন ভিন্ন ; গম্ভীর মুখ লক্ষ করেই বুঝলাম, ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। তার পরেই মুখ খুললেন। 'তোমরা সাহিত্যের ছাত্র অথচ সামান্যতম ভাষাজ্ঞান হয়নি এখনো। এটা খুবই লজ্জাব কথা।' বলে হঠাৎ তাকালেন আমার দিকে। 'দিব্যেন্দু, তোমাকেও বাদ দিতে চাই না। তুমি ইতিমধ্যেই গ্রন্থকার হয়েছ, কিন্তু গদ্য লিখেছ ক্লাস সিক্সের ছাত্রের মতো। তোমার জানা উচিত ব্যাকরণসম্মত হওয়াই ভাষার একমাত্র গুণ নয়—'
>
> —'দেশ'। ২৩ চৈত্র ১৩৮০

ছাত্রজীবনে দিব্যেন্দু এক জটিল চক্ষুরোগের শিকার হয়েছিলেন। সেই সময়ে বুদ্ধদেব তাঁকে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন তার কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ

কবেছেন দিব্যেন্দু পালিত। তিনি লিখেছেন :

"থাকি একা, খাই পাইস হোটেলে, আর্থিক সম্বল বলতে ন্যূনতম— কেন যেন মনে হচ্ছিল ডান চোখেব এই সামান্য জ্যোতিও হাবিযে যাবে কিছুক্ষণেব মধ্যে। সাবা বাত হাঁটুতে মুখ গুঁজে অপেক্ষা কবতে লাগলাম সেই ভযংকব মুহূর্তটিব জন্য।.."

লোকমুখে খবব শুনে বুদ্ধদেব বসু লিখে পাঠালেন দিব্যেন্দুকে :

" শুনলাম তুমি চোখ নিযে কষ্ট পাচ্ছো। কী হযেছে জানি না। এই চিঠি পেযেই ১ নং ইন্দ্র বায বোডে ডক্টব অতুলানন্দ দাশগুপ্তেব (আনন্দকিশোব মুন্সী) কাছে যাবে , তাঁকে আমি ব'লে বেখেছি ফোনে— প্রযোজনে তিনি তোমাকে ডক্টব অমল সেনেব কাছে নিযে যাবেন। তোমাব চিকিৎসাব ব্যাপাবে প্রযোজনীয সমস্ত ব্যবস্থা তিনি কববেন। খবচেব ব্যাপাবে কোনো সংকোচ কোবো না— সে-দাযিত্ব আমাব। আশা কবি আমাব নির্দেশ অমান্য কববে না। ডক্টব দাশগুপ্তেব কাছেই জানতে পাববো তুমি কেমন আছো।."

সাহিত্যবোধ অর্জনেব জন্যে একদা তাঁব ছাত্র হতে চেযেছিলাম। বুদ্ধদেব দিযে গেছেন তাবও অনেক বেশি ; এবং সবটাই নিজেকে অনুচ্চাবিত বেখে।"

—তদেব।

এই প্রসঙ্গে নিজেব ছাত্রজীবনেব একটি ঘটনাব কথা বললে আশা কবি আত্মপ্রচাবেব অপবাধ হবে না। আমি যখন হস্টেলে থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম.এ পড়ি, আমাব বাবা-মা থাকতেন বর্মায। বাবা আমাকে মাসে মাসে যে টাকা পাঠাতেন তাই থেকে আমাব হস্টেলেব খবচ, বিশ্ববিদ্যালযেব বেতন ইত্যাদি মিটিযে দেবাব কথা ; হস্টেলেব খবচ বাকি বাখা যেত না বলে সেটা মাসে মাসে দিযে দিতাম, কিন্তু তাগাদা ছিল না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন আব দেয়া হয়ে উঠত না— অন্য দিকে টাকাটা খরচ হযে যেত। আঠারো বছর বযসে কলকাতা শহবে টাকা আবো কত যে জরুরি কাজে লাগে!

অ্যাডমিট কার্ড দেবাব সময় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। অরবিন্দ বিল্ডিং থেকে চিঠি দিয়ে জানানো হল আমার প্রবাসী বাবা-মাকে, আমাকে এবং বিভাগীয় প্রধান বুদ্ধদেব বসুকে।

চিঠি পেযে বুদ্ধদেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে প্রথমে খুব খানিকটা বকাবকি করলেন। তাবপব চিন্তিতভাবে চুলেব মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, 'এতগুলো টাকা (২৪০ টাকাব মতো বকেয়া পাওনার দাবি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের, যতদূর মনে পড়ে)— কী করি এখন বলো তো? আমার নিজের কাছে তো এখন এত টাকা নেই, তোমার বাবার টাকা আসতে আসতে লাস্ট ডেট পার হয়ে যাবে — কী যে মুশকিলে ফ্যালো না আমাকে— ছেলেমানুষির সীমা কোথায় বুঝতে

পারো না সেটা, এম.এ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছো?..."

বর্মা থেকে বাবার টাকা এসে পৌঁছতে দেরি হল— নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে টাকাটা জমা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেবই। সে-বছর যদি টাকাটা জমা দেয়া না যেত তাহলে কোনোদিনই আমার এম.এ পাশ করা হত কিনা সন্দেহ। কারণ পরের বছর বর্মা জাতীয়করণ হল, অন্যান্য ভারতীয়দের মতো আমার বাবারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সীল করে দেয়া হল, চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে উদ্বাস্তু হয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় দেশে এসে পৌঁছলেন, আমাকে বেরোতে হল জীবিকার সন্ধানে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কবিতা

আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৪ সংখ্যা 'কবিতা'য় বুদ্ধদেব নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাব্যগ্রন্থ 'নিরিবিলি'র আলোচনা করলেন।

> "শ্রীনবেন্দ্রনাথ মিত্রের পাঠকসংখ্যা আজ বিপুল, কিন্তু এ-বইখানা প'ড়ে (বা দেখে) আজকের দিনের কম পাঠকেরই সন্দেহ হবে যে এর প্রণেতা ও তাঁদেব প্রিয় কথাশিল্পী একই ব্যক্তি।... নরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে গল্পের পাশাপাশি কবিতাও লিখতেন ; আমি কয়েকবার 'কবিতা'য় তাঁর রচনাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম [১] ; কবি হিশেবে পরিণতির সম্ভাবনা, সেকালের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের তুলনায, তাঁর মধ্যে কম ছিলো বলা যায় না। কিন্তু, দেশে-বিদেশে বহু লেখকেরই যেমন ঘ'টে থাকে, যুগের ও জীবিকার পক্ষে অধিক উপযোগী গদ্যশিল্পই কালক্রমে তাঁর সমগ্র শক্তিকে গ্রাস ক'রে নিলে। রচনাগুলির বিষয়ে মন্তব্য করতে সংকোচ বোধ করছি। এদের মধ্য দিয়ে যে কবি-মন উঁকি দিচ্ছে তার বলিষ্ঠ ও পবিণত প্রকাশ তাঁর কথাসাহিত্যে দেখেছি আমরা। তাঁর সেই সংশয়হীন সার্থকতাব পাশে এই বইটি তাঁর তারুণ্যের একটি স্মারক ও সাক্ষী হয়ে বইলো। আমাকে একবার চাইবাসায এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি কি এখনো কবিতা লেখেন?' 'এখনো'— মানে, যৌবন গত হবার পরেও? উত্তরচল্লিশেও আমার এই ছেলেমানুষির অবসান ঘটেনি জেনে আমার প্রশ্নকর্তার মুখে করুণা ও অবজ্ঞা মেশানো হাসি ফুটেছিলো। উনিশ শতকী ইংরেজ গদ্য লেখক পীককও বলেছিলেন যে বুড়ো বয়সে ঝুমঝুমি নিয়ে খেলা করা যেমন হাস্যকর, সভ্যতার অগ্রসর যুগে মানুষের পক্ষে কাব্যচর্চাও তেমনি। কিন্তু সেই ছেলেমানুষির মাধুর্য ও তার অবসানের শোচনীয়তা বিষয়ে আলোচ্য লেখকেরই একটি চতুর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করি :

১. *পৌষ ১৩৪৪ থেকে আষাঢ় ১৩৪৭ সংখ্যার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পাঁচটি কবিতা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।*

যৌবন

পাপড়ি-মেলা শ্বেতপদ্ম
ভোরের রোদ লাগা
চায়ের পেয়ালা।
তামাটে পানীয়
কবোষ্ণ রূপালি ধোঁয়া ওঠে।

ঠোঁটে
এক একবার ছুঁই
আর চেয়ে চেয়ে দেখি
কী করে ফুরোয়।
এক একবার থামি
আর চেয়ে চেয়ে দেখি
কী করে জুড়োয়।

এইরকম চাতুরি আরো অনেকগুলি রচনায় প্রকাশ পেয়েছে, কোনো-কোনোটি জাপানি কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়।"

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হল 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের। বইটি বেরোল মার্চে।

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হল অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা সহ 'কালিদাসের মেঘদূত'। 'মেঘদূতে'র 'অনুবাদকের বক্তব্য' অংশে লিখলেন :

" 'মেঘদূত'-অনুবাদে আমি কিছুটা আকস্মিকভাবে হাত দিয়েছিলাম ; এর জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছিলো না, বা মনে-মনে এর পরিকল্পনাও করিনি। এক অচিরস্থায়ী অসুস্থতায় সময়যাপনের উপায়রূপে এর আরম্ভ : তারপর, অন্য নানা ব্যাপারের ফাঁকে-ফাঁকে, প্রায় এক বছর ধ'রে, এটিকে আমার সাধ্যানুযায়ী সানুষঙ্গ সম্পূর্ণতা দিয়েছিলাম।..."

অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা

বুদ্ধদেব প্রায় অর্ধেক জীবন ভ'রে ক্লান্তিহীনভাবে অনুবাদ করে গেছেন - –তাঁর বোদলেয়ারের অনুবাদ, রিলকের অনুবাদ, হ্যেল্ডার্লিনের অনুবাদ, পাস্টেরনাক-এর অনুবাদ, কালিদাসের অনুবাদ— বাংলা অনুবাদসাহিত্যে এই কীর্তিগুলি ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। সাহিত্যপাঠের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করলেন— বিশ্বসাহিত্য বা তুলনামূলক সাহিত্য— তাও

প্রতিষ্ঠিত অনুবাদের উপরই। কালিদাসের মেঘদূত গ্রন্থে 'অনুবাদকের বক্তব্য' অংশে তিনি অনুবাদের প্রয়োজন ও সার্থকতা নিয়ে যে-আলোচনা করলেন, তার থেকে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় :

> "দেশ-কালের দূরত্বমোচনের কয়েকটি উপায় আমাদের জানা আছে : তার মধ্যে অনুবাদ এক দিক থেকে সবচেয়ে কার্যকরী। লেখক ও তাঁর ভাষা যখন প্রাচীন, তখন তাঁকে সমকালীন জীবনের মধ্যে সংকলিত করার কাজটি অনুবাদকেব ব'লে স্বীকার্য— পণ্ডিত বা পুরাবিদের নয়। অনুবাদই সেই ঘটক, যার প্ররোচনায় আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন সাহিত্য একটা বৃহদায়তন স্থাবর সম্পত্তি নয়, যুগে যগে তা বাণিজ্যের যোগ্য ব'লেই আমরা তাকে 'ক্লাসিক' নাম দিয়েছি, এবং আমাদের আজকের দিনের সম্পূর্ণ ভিন্ন পবিবেশেও তার সংলগ্নতা হারিয়ে যায়নি। অর্থাৎ অনুবাদ সেই প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যেব অংশ ক'রে তোলে। আব সেইজন্যেই যুগে যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন ঘটে।... প্রতি যুগ ভাষার যে-বিশেষ ভঙ্গিকে জন্ম দেয়, তার সঙ্গে মিলনের দ্বারাই পুরাতনের পুনরুজ্জীবন ঘটে থাকে।... পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনামাত্রই অনুবাদের মুখাপেক্ষী। যাঁরা ব'লে থাকেন যে অনুবাদ রচনা ও পাঠ করা সময়ের অপব্যয় মাত্র, তাঁদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে শেক্সপিয়র ও কীটস অনুবাদে ভিন্ন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য জানেননি, এবং ভাবতীয় মানসে যে-দুটি গ্রন্থ সবচেয়ে প্রতিপত্তিশীল, সেই মহাভারত ও রামায়ণে সর্বভারতে বহু শতক ধ'রে অনুবাদে বা অনুলিখনে প্রচারিত হচ্ছে। ইংরেজি ভাষার যে-বাইবেল পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত গ্রন্থ, সেটি অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ, কিন্তু তার পাঠকদের মধ্যে ক-জনের তা মনে পড়ে, বা মনে পড়লেও কী এসে যায়?... অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে মূল পড়া সম্ভব হয় না ব'লে অনুবাদের প্রয়োজন আছে, শুধু এটুকু বললে ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বেশি সরল করা হয় ; এক-এক সময়ে এক-একটি অনুবাদ বা অনুবাদগুচ্ছ এক-এক দেশের বা মহাদেশের সাহিত্যের ধারা বদলে দিয়েছে, এবং যাঁরা মূলের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ প'ড়ে লাভবান হ'তে পারেন —কেননা ভালো অনুবাদ শুধু মূল রচনার প্রতিনিধিত্ব করে না, তার যুগের ও অনুবাদকের ব্যক্তিত্বেরও স্বাদ দেয়।"

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকাসমূহ

'মেঘদূত' থেকে আরম্ভ করে রিলকের কবিতা পর্যন্ত সবকটি অনুবাদগ্রন্থের একটি অত্যন্ত মূল্যবান অংশ হল তার বুদ্ধদেবকৃত ভূমিকা। ভূমিকার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে অনূদিত কবির বিশেষত্ব, বাংলায় তাঁর অনুবাদের সার্থকতা, তাঁর নিজের দেশকালের সঙ্গে তার সংলগ্নতা, বাঙালি পাঠকের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা। মেঘদূতের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয় সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা

আবহমান বাংলা সাহিত্য থেকে স্মরণে আনা কঠিন; বিশ্বসাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে, সম্ভবত এই প্রথম, 'হিন্দু-নামাঙ্কিত এক তুষারীভূত মনোভাব' থেকে তাকে মুক্ত করে এনে পৃথিবীর খোলা হাওয়ায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা মানেই, আমরা ধরে নিয়েছিলাম, প্রাচীন ভারতের অস্পষ্ট ইতিহাসের গোলকধাঁধা, অথবা হিম ও স্থবির হিন্দুদর্শনের অনচ্ছ মীমাংসা, কিংবা ব্যাকরণের জটিল ও আপাত অর্থহীন বিভ্রান্তির দুর্বিষহ বিচার। বুদ্ধদেবের এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে তিনি সেই ইতিহাস দর্শন বা ব্যাকরণের উল্লেখমাত্র না করে মেঘদূতকে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত, তার বিচার করেছেন বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলি ছাড়া এর সঙ্গে তুলনীয় বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও কিছু স্মরণে আনা সহজ নয়।

অন্য ভূমিকা-তিনটিতে— বোদলেয়ার, হ্যেল্ডারলিন ও রিলকে— বুদ্ধদেবের ভূমিকা প্রধানত শিক্ষকের; এই কবিরা বাংলাদেশে তাদৃশ পরিচিত নন, অন্তত ছিলেন না। কাজেই বুদ্ধদেবকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, নিজের ভাষাব সাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে তাঁদের স্থান, তাঁদের বক্তব্যের বিশেষত্ব। বাংলা কবিতার আবহমান ধারার সঙ্গে কোথায় তাঁদের বিরোধ এবং কোথায় তাঁদের সাদৃশ্য, তাঁদের রচনা পাঠ করলে বাঙালি কবিতাপ্রেমিক কোন-কোন ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন— এই সবই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন বুদ্ধদেব। রচনাগুলি এমনই সুসম্পূর্ণ যে শুধু সেগুলি পাঠ করলেই বোদলেয়ার বা রিলকে বিষয়ে লাভ করা যায় এক অন্তর্দৃষ্টি— পাঠক যদি বিশেষজ্ঞ হতে না চান তাহলে এটুকু পড়ে নিলেই তাঁর ঐ কবির কবিতায় প্রবেশের নির্বাধ অধিকার জন্মাবে।

১৯৫৯।। বয়স একান্ন

অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পাস্টেরনাক বিতর্ক

'কবিতা'ব পৌষ ১৩৬৫ সংখ্যায় প্রকাশিত অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি পড়ে মনে হয়— প্রথম দিকে তিনি পাস্টেরনাক সম্পর্কে সহানুভূতিশীলই ছিলেন। বস্টন থেকে তিনি বুদ্ধদেবকে পাস্টেরনাকের বই উপহাব পাঠাচ্ছেন :

"... সামান্য উপহাবস্বরূপ আপনাকে কিছু সদ্যপ্রকাশিত বা অধুনা মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠিয়েছি। আপনি গ্রহণ করবেন। সঙ্গে রইল পাস্টেবনাক-এব 'আত্মজীবনী' সংবলিত ক্ষুদ্র রচনাসংগ্রহ।

পাস্টেবনাক-এব গদ্যসংকলনে পেলাম উৎকৃষ্ট শিল্পেব নিদর্শন। হযতো বইটা আপনি পূর্বেই পড়েছেন।..."

নোবেল পুরস্কার পাবার ব্যাপারে পাস্টেরনাককে নিয়ে পৃথিবী ভরে যে বিতর্ক উঠল, তার সম্পর্কে বললেন :

"এত মহান শক্তিশালী রচনা [ডক্টর জিভাগো] যে-কোনো যুগেই আন্দোলন তুলত। কিন্তু এই অর্ধ-পোলিটিকাল নোবেল প্রাইজের যুগে (যেখানে জেনাবেল মার্শাল শান্তিব বকশিশ পান, মহাত্মা গান্ধীর নাম পর্যন্ত ওঠে না) পাস্টেবনাক বিপর্যস্ত হলেন উভয় পক্ষের মল্লদের হাতে। ঠাণ্ডা লডাইযে রুশেরা তাঁর নামকে টেনেছে বারুদভরা বাক্যের মিথ্যায়। কোনো পক্ষেরই জিৎ হবে না ঐ বইয়ের জোবে।...

বইখানি আদ্যোপান্ত ভালো করে পড়ে দেখেছি। যথাযথ আলোচনা পত্রে অসাধ্য, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় কোনো আধুনিক বইয়ের প্রতিক্রিয়া হৃদয়ে এত আঘাত, এত অনির্বচনীয় ধন্যতা, এত নৈরাশ্য এবং ক্ষোভ একই সঙ্গে জাগিয়ে তুলবে ভাবিনি— শুধু সেইটুকু বলতে চাই।"

এমনকি, বইটি পড়ে প্রাথমিকভাবে তাঁর ধারণা হয়েছিল :

"আমার ধারণা বইখানির বিশ্বজোড়া ফল মোটেব উপব সোভিয়েটেব সপক্ষেই মর্যাদা বাড়াবে, যদিও ঠিক বলতে পারি না।"

এবং শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে নয়, উপন্যাসটির শিল্পমূল্য, পাস্টেরনাকের কবিতার কাব্যমূল্য সম্পর্কে তিনি পুরোমাত্রায় অবহিত ও সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর এই চিঠিটির শেষ দুটি অনুচ্ছেদ থেকে :

" স্তব্ধ হ'যে যাই যখন লাবিসাব কথা ভাবি। জিভাগোব জীবনেব উচ্চ শিখবে-শিখবে যে-আগুন আলো হ'যে উঠল, নত হ্যে উন্নত হ্যে তাকে পাঠকেব নমস্কাব জানাই। অন্য কোনো চিঠিতে হ্যতো সেই চিবন্তন দীপ্তিব পবিচয ক্ষেত্রে নামব, যেখানে পাস্টেবনাক-এব বচনা মৃত্যুহীন। জিভাগোব মৃত্যুব অপ্রত্যাশিত পবমুহূর্তে সেই অমবতা দেখতে পাই। লাবিসাব কযেকটি কথায শিল্পেব মন্ত্রোচ্চাবণ হল, জীবনে যাব শেষ নেই। যেখানে পাস্টেবনাক আমাদেব নিযে দাঁডালেন শিল্প সেই অঙ্গনেব চতুর্দিকে, তাব তলে, তাব উর্ধ্বে।

পাস্টেবনাক-এব কাব্যেব প্রসঙ্গ তুলব না বলেছিলাম, যদিও ইংবিজি তর্জমাব বন্ধ কাচেব জানালা দিযে যা দেখেছি তাতেও মুগ্ধ হ্যেছি। জালি-কাজ-কবা ছাযাব আলোয, কাচেব ছাঁকনিতে উদ্ধৃত কতটুকু কী দেখেছি তা যাচাই কববাব সাহস নেই। কিন্তু পাস্টেবনাক আসলে কবি। যদিও তাব গল্পে চবিত্রসৃষ্টি, ঘটনাব আবহবচনাব শক্তি অসামান্য, শেষ পর্যন্ত গদ্যে যেখানে তিনি কবিব যথার্থ অবসব পেযেছেন সেই সব মুহূর্তেই তিনি জযী। তাব জযলাভ সেখানে সকলেব সঙ্গে এক হ'যে, হোক তা মানুষ, বা সংসাব, বা পৃথিবীব অন্য কোনো দান। "

এই চিঠিব তাবিখ ১৮ ডিসেম্বব ১৯৫৮। পবেব চিঠিটি মুদ্রিত হল আষাঢ ১৩৬৬ এব 'কবিতা'য, তাবিখ, ৯ এপ্রিল ১৯৫৯। দেখা যাচ্ছে, এই চাব-পাঁচ মাস সমযেব মধ্যে পাস্টেবনাক সম্পর্কে তাঁব দৃষ্টিভঙ্গিব একেবাবে বৈপ্লবিক পবিবর্তন হ্যেছে। মতেব পবিবর্তন হ্তে পাবে না তা নয— কিন্তু এত কম সমযেব মধ্যে মতেব এমন দ্রুত পবিবর্তন কেমন যেন অস্বস্তিকব লাগে।

"পাস্টেবনাক-এব মতো কবিব কাছ থেকেও বাশিযাব, অর্থাৎ তাঁব গভীব-জানা সামাজিক জীবনেব, আবেকটু প্রশস্ত দৃষ্টিসম্মত পবিচয পাবো আশা কবেছিলাম। তাব জাযগায পেলাম অতি আশ্চর্য গভীব বচনা যা কখনো হঠাৎ ভেঙে গেছে শিল্পীব আত্মজীবনেব বিরুদ্ধতায, শিল্পেব প্রসাদগুণেব অভাবে। সব মিলে কোথায যেন অসংগতি আছে। অত আশ্চর্য বচনাও পাঠকেব মনে প্রশ্ন তোলে লেখকেব শৈল্পিক বিচাব সম্বন্ধে।

স্নাযবিক আক্রোশেব অতি প্রকাশ বাধা হ্যে উঠল— দুর্যোগেব তলে তলে নবযুগসৃষ্টিব সত্যকে জিভাগো দেখতে পেল না। সাংঘাতিক ঐ আত্মবন্দীদশাব ক্রিযা পাঠককে আহত কবে যখন জিভাগো একেবাবে নিছক গুণ্ডাব হাতে জেনেশুনে প্রাণতুল্য লাবিসাকে তুলে দিল। বাত্রে ঘবে বসে ভডকা খেলে কী হবে, ঐ মানবত্বহীন অবস্থায লেখা কবিতাব দৌডও তথৈবচ। বোঝা যায বীতিমতো শিল্পবিরুদ্ধতা, চাবিত্রিক ভগ্নবিলাসিতা লেখককে এবং তাঁব বচনাকে বাবে বাবে প্রতিহত কবেছে। নতুন গডে-ওঠা তাঁব দেশে অন্য যে-সব বিষম দুর্বিচাব ও অন্যায থাকুক না কেন, তাঁব সমসাময়িক এবং পববর্তীকালে সাম্প্রতিক লেখক, কবি, চিত্রী ঐ বই প'ডে কেন যথার্থ আঘাত পেযেছে তা বোঝা যায়।

... পুঃ আপনাদেব প্রতিবাদী কোনো পত্রের সঙ্গে এই চিঠি ছাপালে সুখী হব। যতদিক থেকে আজকের সাহিত্য এবং সমাজসমস্যার বিশ্বজোড়া আলোচনা হয় ততই ভালো।"

অমিয় চক্রবর্তী

এই চিঠির সঙ্গে ছাপা হল 'কবিতা' পত্রিকার বারোপৃষ্ঠাব্যাপী বুদ্ধদেবের উত্তর। সেই উত্তরটির আগে, 'আমাদের কবিতাভবন' থেকে উদ্ধার করি অমিয় চক্রবর্তী বিষয়ে তাঁর স্মৃতিচারণ, যা থেকে ধারণায় আনা যাবে দুই কবির ব্যক্তিগত সম্পর্ক :

"তিবিশ-দশকের শেষের দিকে প্রবিষ্ট হলেন আমাদের বিদগ্ধসমাজে এক নতুন ব্যক্তিত্ব, আব আমার জীবনে নতুন এক বন্ধু ও কর্মসহচর— যাঁব সাহায্যে, কবিতাভবনের অনেক চেষ্টা সার্থক অথবা সার্থকতব হয়েছিলো।... 'পবিচয়ে' তাঁব 'ঝোড়ো হাওয়া আব পোড়ো বাড়িটা'র কবিতা প'ড়ে আমরা চমকে উঠেছিলাম। ... শান্তিনিকেতন থেকে অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড থেকে লাহোর,— এই বঙ্কিম রেখা পরিক্রম ক'রে তিনি যখন কলকাতায় অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর খাতায় ছিলো কবিতার খশড়া একমুঠো বা দু'চার মুঠো, মাথার মধ্যে আরো কবিতার ভাবপুঞ্জ। ... আরো একবার তিনি আমাদের আঘাত দিলেন 'চেতন স্যাকবা'[১] লিখে— 'কবিতা'য় সেটাই তাঁর প্রথম কবিতা, আর তার পর থেকে, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের মতোই, তিনি আছেন প্রতিটি সংখ্যায় উপস্থিত— তাঁর বিলম্বিত পুষ্পল ঋতুর সুন্দর উপঢৌকন নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর খ্যাতি বিকীর্ণ হ'লো সারা দেশে, আর আমিও ততদিনে তাঁর ধরণধারণে অভ্যস্ত, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসতে শিখলাম।

আশ্চর্য একটি মানুষ, অমিয় চক্রবর্তী; তাঁর ক্ষীণ এবং অনতিদীর্ঘ দেহে উদ্যম যেমন অফুরন্ত তেমনি তাঁর মনের চাঞ্চল্য শেষহীন; কত যে বিচিত্র বিষয়ে ধাবমান তাঁর কৌতূহল, কত যে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায় ও কর্মধারার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত, তাঁর পরিচিত ও অধিগম্যের তালিকায় কত-যে বৃহৎ-খ্যাতিমান অন্তর্ভূত আছেন— আমি তার আভাসমাত্র পাই তাঁর কথাবার্তায়, ঠিক ধারণা করতে পারি না। তিনি আসেন সাধারণত সন্ধে পেরিয়ে একটু বেশি রাত্রে— ছাঁটা চুলে পরিষ্কার সিঁথি, তাঁর অঙ্গে নিখুঁত বিলেতি বেশবাস বা গ্রীষ্মে কখনো পাজামা-পাঞ্জাবির উপর লম্বমান মান্দ্রাজি উড়ুনি— ঘরে ঢুকতে-ঢুকতেই কথা শুরু ক'রে দেন। সর্বদাই কোনো নতুন খবর শুনি তাঁর মুখে, প্রাপ্ত হই কোনো নতুন উদ্দীপনা —কখনো মধ্যরাত পর্যন্ত অবিরল তাঁর আলাপন চলে। সুগঠিত সুসম্পূর্ণ বাক্যে কথা বলেন তিনি, একটি বিশেষ ধরনের পরিশীলিত উচ্চারণে; মুখে, দেহে, ভঙ্গি

১. 'চেতন স্যাকরা' বেরিয়েছিল 'কবিতা'র কার্তিক ১৩৪৬ সংখ্যায়।

তাঁর অল্প, তাঁর কণ্ঠেও কখনো উচ্চহাসি ফোটে না— শুধু মাঝে-মাঝে চোখে ভেসে ওঠে কৌতুক, বা সরু গোঁফের ফাঁকে ঈষৎ আমোদ ছড়িয়ে পড়ে। চা তিনি গ্রহণ করেন কিন্তু পেয়ালা শেষ করেন না— তাঁর স্বল্পাহারিতা তখনই প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে ; শোনা যায় দু'চামচে ভাত আর আধখানা ডিমসেদ্ধই তাঁর তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট ; কিন্তু পরিপূরক স্বরূপ, বর্ণাড শ-র নাটকে বর্ণিত সৈনিকের মতো, তিনি সর্বদা পকেটে রাখেন চকোলেট— যা চলাফেরার পথে অলক্ষ্যে অন্তঃস্থ করা যায়— হয়তো তা-ই থেকে আহরণ করেন তাঁর নিশিদিনব্যাপী ক্লান্তিহীন কর্মক্ষমতা। আমি দেখেছি তাঁকে পঁচিশ বছর ধ'রে স্বদেশে এবং বিদেশে, বহুবার আহার করেছি তাঁর সঙ্গে— পৃথিবীর যাবতীয় ভোজ্যের মধ্যে লক্ষ করেছি শুধু মিষ্টান্নের প্রতি তাঁর অনুরাগ ; গান্ধীজী ও মেদিনীপুর বন্যা, ইংলণ্ড ও জর্মানি ও রাশিয়ার যুদ্ধনীতি, সংবাদপত্রে অপ্রকাশ্য সব রহস্য-কথা— এমনি চলতে-চলতে তাঁর আলাপের স্রোত হঠাৎ কখনো বাঁক নেয় সাহিত্যে, আমি আরো সহজে নিশ্বাস নিই— কখনো-কখনো তাঁর মূল্যায়ন আমার মনে হয় ঈষৎ প্যুরিটানিক, আমার কোনো-কোনো প্রিয় লেখক বিষয়ে তিনি যেন সন্ত্রস্ত বা উদাসীন ;— কিন্তু কী এসে যায় তুচ্ছ মতভেদে, যখন তিনি এত ভালো কবিতা লিখছেন?"

সুবীর রায়চৌধুরী যখন 'দেশ' পত্রিকায় 'কবিতা' পত্রিকা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, ('কবিতা' ও সেযুগের লেখকসমাজ : দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৭) তিনি উপরিউক্ত শেষ বাক্যটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলেন। বাস্তবিক, 'কবিতা'য় যে-কোনো লোকের কবিতা বা গদ্য ছাপা হ'তে হলে, সেই বিশেষ রচনাটি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁর মতামত সম্পর্কে এটাই ছিল কবিতা পত্রিকার নীতি, যে-কোনো মানুষ বিষয়েও বুদ্ধদেব বসুর মনোভঙ্গির মেরুদণ্ড। পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে, এবং নিজের জীবনেও, এই নীতি যতদূর সম্ভব মেনে চলবার চেষ্টা করতেন বুদ্ধদেব। তার জন্য মাঝে-মাঝেই তাঁকে বৌদ্ধিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে— অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে এই পাস্টেরনাক বিতর্ক তার অন্যতম উদাহরণ।

প্রথম পাঠের সময় থেকেই, আমরা দেখেছি, পাস্টেরনাকের কবিতাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন বুদ্ধদেব। তাছাড়াও, মানুষ হিশেবে, কবি হিশেবে পাস্টেরনাকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার আরো একটি কারণ, অনুমান করি, কবিতা-অনুবাদে পাস্টেরনাকের প্রবণতা ও আগ্রহ। আমরা জানি যে ১৯৩৪ সাল থেকে, সোভিয়েট লেখকদের 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' নামক তিক্ত বটিকাটি গলাধঃকরণ করাবার চেষ্টায়, এবং সমস্ত লেখকের মধ্যে ভাবগত ও সোভিয়েট আদর্শগত ঐক্যস্থাপনের প্রয়াসে, কমিউনিস্ট নেতারা লেখকদের উপর প্রবল রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। পাস্টেরনাক এই সময়ে দীর্ঘ ন'বছর কোনো স্বরচিত রচনা প্রকাশ করেননি ; এই সময় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন মূলত শেক্সপিয়ার

থেকে অনুবাদে, এবং এই সময়ে করা তাঁর 'হ্যামলেট', 'অ্যান্টনি ও ক্লিয়পেট্রা', 'রোমিও এবং জুলিয়েট', 'ওথেলো', 'রাজা লিয়ার' ও 'চতুর্থ হেনরি'— শেক্সপিয়ারের এই নাটকগুলির রুশ অনুবাদ, রুশ অনুবাদসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

অনুবাদকর্মের প্রতি বুদ্ধদেবের অনুরাগের কথা তাঁর পাঠকদের অজানা নেই। এবং রাজনৈতিক সংকট যখন পাস্টেরনাককে বাধ্য করল কবিতা না-লিখতে, তখন তিনি নিজের আবেগকে মুক্তি দিলেন, দীর্ঘ এক দশক ধরে, শেক্সপিয়ার-অনুবাদের মধ্য দিয়ে— এই ঘটনা যদি বুদ্ধদেবকে ব্যক্তি-পাস্টেরনাকের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই আমাদের। আলোচ্য পত্রটির মধ্যে সেকথার উল্লেখও করেছেন তিনি :

"... স্বাধীনভাবে সাহিত্যরচনায় প্রতিহত হ'য়ে যিনি বিনীতভাবে অনুবাদকর্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে কি অভিমানী বলা যায়? বরং এক অবিকল ও অবিচল কবিচরিত্র কি উদ্ভাসিত হচ্ছে না তাঁর মধ্যে, আমরা কি আভাস পাচ্ছি না সেই নিস্তাপ হীরক-দ্যুতির, বাইরে ঝড় উঠলেও যা বিস্রস্ত হ'তে শেখেনি?..."

এইবার এই সুদীর্ঘ পত্র থেকে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধৃত করি, যা থেকে বোঝা যাবে, কেন বুদ্ধদেব, মতান্তর থেকে মনান্তরের ঝুঁকি নিয়েও, দীর্ঘকালের বান্ধব অমিয় চক্রবর্তীর মনীষা ও কবিপ্রতিভার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই, বেছে নিয়েছিলেন এই প্রতিবাদের বিকল্প। আসলে পাস্টেরনাককে সমর্থন করার মধ্য দিয়ে নিজেরই ভাবমূর্তিকে সমর্থন করছেন তিনি :

১০মে ১৯৫৯

"প্রিয়বরেষু,

এই 'প্রতিবাদ' লিখবো না ভেবেছিলাম। আপনার ও আমার মধ্যে, কিছুদিন ধ'রে, যে-ব্যবধান ধীরে-ধীরে গ'ড়ে উঠছে, যা আমরা দু-জনেই মাঝে-মাঝে অনুভব করছি কিন্তু কেউই এ-যাবৎ প্রকাশ করিনি, তাকে নিঃশব্দে এড়িয়ে যাওয়া আমার অভিপ্রায় ছিলো।... কিন্তু আপনি আপনার পত্রখানা 'কবিতা'য় প্রকাশ করার ইচ্ছে জানিয়েছেন, এবং আপনার আদেশ আমার পক্ষে অবশ্যমান্য। কিন্তু— আর সেটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা আমার পক্ষে— ওটি প্রকাশ করতে হ'লে আমাকেও কিছু বলতে হয়, আর আমি কিছু বলতে গেলেই আপনার সঙ্গে আমার ব্যবধান সোচ্চার হ'য়ে পড়বে।

... আপনার কবিতার প্রতি দুর্বার আমার অনুরাগ, অথচ আমি জানি যে আপনার আর আমার পথ প্রথম থেকেই ভিন্ন হ'য়ে গেছে ; আপনি যোগ দিয়েছেন মিছিলে আর আমি স্বভাবতই বিবরবাসী ;... আমাকে এখন যা বলতে হচ্ছে তা নতুন কথা নয়, বুদ্ধিমান পাঠকের মনে তা অনেক আগেই প্রতিভাত হ'য়ে থাকবে : সে-কথা এই যে সাহিত্য বলতে আপনি যা বোঝেন আমি ঠিক তা বুঝি

না, ধর্ম বলতে আপনি যা বোঝেন আমি ঠিক তা বুঝি না, এবং সাহিত্য ব্যাপাবে বাজনীতিকে আপনি যে-আসন দিযে থাকেন আমি তা দিতে প্রস্তুত নই।

এই স্বীকাবোক্তিব পব তর্কেব অবকাশ কোথায? জিভাগোব প্রতি যে-সব বিশেষণ আপনি নিন্দাব অর্থে প্রযোগ কবেছেন— 'আত্মকেন্দ্রিক', 'চৈতন্যসাধক', 'আত্মবিভক্ত', 'জটিল'— আমি সেইগুলোই প্রশংসাব অর্থে ব্যবহাব কববো।

.আপনি, আমি লক্ষ্য কবছি, দুটি পত্রেব কোনোখানেই ডস্টযেভস্কিব নাম কবেননি, যদিও টলস্টয, টুর্গেনিভ ও চেখহেবব উল্লেখ একাধিকবাব ঘটেছে। এই বর্জনকে আপনাব অভিপ্রেত ব'লে ধ'বে নিচ্ছি, তা না-নিলে আপনাব মনীষিতাকে অসম্মান কবা হবে। বাশিযা বলতেই আমাব যাঁকে মনে পড়ে আপনি রুশ সাহিত্যেব আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁকে এড়িযে চলেন, এই তথ্যটিতেই আপনাব ও আমাব ব্যবধানেব মূলতত্ত্বটি লুকোনো আছে। জিভাগোব 'সাংঘাতিক আত্মবন্দী দশা' আপনাকে আহত কবে যখন সে 'একেবাবে নিছক গুণ্ডাব হাতে জেনে-শুনে প্রাণতুল্য লাবিসাকে তুলে দিল', কিন্তু আমাব কাছে এই ঘটনা শুধু বোধগম্য নয, ইঙ্গিতময, কেননা এ থেকে আমাব মনে প'ড়ে যায আবো ভযংকব এক ঘটনা, 'দি ইডিযট' উপন্যাসে নাযিকাব হত্যাকাণ্ড, যাব সম্ভাবনা প্রথম থেকে জেনেও, এবং চবিত্রেব আশ্চর্য সাধুতা সত্ত্বেও, প্রিন্স মিশকিন যা নিবাবণ কবতে পাবেননি।

.. *পাস্টেবনাক তাঁব জীবৎকালেব রুশীয ঘটনাবলিকে যেভাবে নিজেব মনে* অনুভব ও উপলব্ধি কবেছেন, 'জিভাগো' উপন্যাসে ও জিভাগোব কবিতাগুচ্ছে তা-ই তাঁব লেখনীকে চালিযে নিযেছে, ভাষাকে দিযেছে প্রাণ এবং ঘটনাকে বিশ্বস্ততা। সেই বিশেষ দৃষ্টি তাঁব পক্ষে নিতান্ত সত্য , আপনাকে বা আমাকে খুশি কববাব জন্য সেই দৃষ্টিকে বিকৃত বা ব্যাহত কবলেই তিনি নিন্দনীয হতেন। এই একই কথা সব লেখকেব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; কেননা সাহিত্য কখনো নিবপেক্ষ সত্যেব বাহন হবাব দাবি কবে না।... সত্য ব'লে *অনুভব কবানোই* কবিব কাজ, তাব বেশি সাহিত্যে আব সত্য নেই। বিপ্লবেব প্রতি পাস্টেবনাক সুবিচাব কবেছেন কি কবেননি, এই প্রশ্নটাই আমাব অবাস্তব ব'লে মনে হয ; তিনি অন্য কোনো দেশেব লেখক হ'লে এই প্রশ্ন উঠতো কিনা সন্দেহ।.. ফ্লোবেযব, তাব 'সেন্টিমেন্টাল এডুকেশন' উপন্যাসে, ১৮৪৮-এব প্যাবিস-বিপ্লবকে হিম বিদ্রূপে বিদ্ধ কবেন, ববীন্দ্রনাথেব 'ঘবে বাইবে' ও 'চাব অধ্যায' বাংলাব স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদকে বেদনাময ভর্ৎসনা জানায, কিন্তু সেজন্য ফ্লোবেযব বা ববীন্দ্রনাথকে দেশদ্রোহী আখ্যা শুনতে হয না। পাস্টেবনাককে তাঁর স্বদেশীযদেব কাছে তা শুনতে হ'লো, তাব কাবণ বর্তমান রুশ সাহিত্যেব এমন একটি অবস্থা, যা আমাদেব কাছে অতিশয় অদ্ভুত ব'লে মনে হয়। 'আসল কথাটা এই যে কোনো-কোনো বিষয়ে আমবা লেখকেবা সকলেই একমত', প্রধান সোহ্বিযেট লেখক আলেক্সি সুবকহ্ব-এব এই ঘোষণাটিতে আমবা দেখতে পাই এক মর্মঘাতী স্বীকাবোক্তি, যা তিনি উচ্চাবণ করেছিলেন ভাবতেও আমাদেব অবাক লাগে। সব লেখকেবা

একমত?... যেখানে লেখকেরা সকলেই 'একমত', সেখানে থাকতে পারে শুধু কোটি-কোটি ছাপার অক্ষর, কিন্তু সাহিত্য সেখানে জন্মাতে পারে না।... আমরা কী ক'রে ব্যথিত না-হ'য়ে পারি পাস্টেরনাকের উপর তাঁর স্বদেশীয়দের আক্রমণে, যাব আসল কারণ এই যে তিনি 'সকলের সঙ্গে একমত' হ্‌তে পারেননি?...

...'পাস্টেরনাক আসলে কবি।... গদ্যেও যেখানে তিনি কবির যথার্থ অবসর পেয়েছেন সেই সব মুহূর্তেই তিনি জয়ী।' আপনার প্রথম চিঠির এই কথাগুলিতে আমার মন পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছিলো।... কিন্তু এখন আমি ভেবে পাচ্ছি না কেমন ক'রে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে, সেই কবিতার বিষয়েও আপনাব মন বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠলো। 'রাত্রে ঘবে ব'সে ভডকা খেলে কী হবে, ঐ মানবত্বহীন অবস্থায় লেখা কবিতার দৌড়ও তথৈবচ'—এই কথাটির আমি কী অর্থ কববো, এর ভাব ও ভাষাকে কেমন ক'রে আপনার প্রতিভা ও চরিত্রেব সঙ্গে মিলিয়ে নেবো, তাব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। 'ভডকা খাবার জন্যেই কবিতা খাবাপ হয়েছে', 'ভডকা খাওয়া সত্ত্বেও কবিতা খারাপ হয়েছে'— এই দুটো প্রস্তাবই সমান অর্থহীন ; কেননা জল ও বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ ছাড়া অন্য কিছু যাঁরা পান কবেন না এবং যাঁরা তীব্র সুরায় আসক্ত, এই উভয় শ্রেণীর মানুষই ভালো এবং খারাপ কবিতা রচনা করেছেন ও ক'বে থাকেন, কখনো বা একই মানুষ উভয় প্রকার ; আমি যতদূব জানি, কবিব পানীয-সংক্রান্ত অভ্যাসের সঙ্গে তাঁর কবিতার দোষগুণেব কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ নেই। এবং জিভাগোর কবিতাও 'তথৈবচ', অর্থাৎ 'মানবত্বহীন', এ-কথা বলতেই বা কী বোঝায়? ধ'রে নেয়া যাক জিভাগো 'অমানুষ', অর্থাৎ 'লোক ভালো নয়' ; কিন্তু লোক ভালো না-হ'লে ভালো কবিতা লেখা যায না, এমন কোনো প্রমাণ কি আমরা পেয়েছি? আপনি শেলির উল্লেখ কবেছেন, কিন্তু শেলির অবিবেচনায তাঁর প্রথম স্ত্রীকে জলে ডুবে মরতে হয়েছিলো ; আপনি গ্যেটের উল্লেখ কবেছেন, যে-গ্যেটে সজ্ঞানে দগ্ধ করেছিলেন বহু নাবীর জীবনযৌবন, এবং বহুকাল পর্যন্ত, রক্ষিতাকে পত্নীব মর্যাদা দেননি। যে-সব জীবনী স্কুলেব ছেলেদের পড়ানো যায় তা সাহিত্যিকদের মধ্যে নাই-বা আমরা সন্ধান করলাম ; আপাতত শুধু এটুকু দেখা যাক— আর সেটাই বোধহয় বেশি জরুবি — কবিতা তাঁরা কে কেমন লিখেছেন। আর সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে যেমন গ্যেটেকে নড়ানো যাবে না, এবং শেলিকেও মানতেই হবে, তেমনি পাস্টেরনাক বা জিভাগো নামক কবির রচনাও অপ্রতিরোধ্য, তর্কাতীত ও তুমুল।..."

এর পর, 'কবিতা' পত্রিকার অবশিষ্ট আয়ুষ্কালে, অমিয় চক্রবর্তীর লেখা 'কবিতা'য় আর প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য, বন্ধুবিচ্ছেদ হয়নি তাঁদের। ৫ মার্চ ১৯৬১-তে নিয়ুইয়র্ক থেকে জামাতা জ্যোতির্ময় দত্তকে লিখছেন, "কাল অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সারা দুপুর কাটানো গেলো, সন্ধে বেলা তিনি আমাদের 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার' দেখাতে নিয়ে গেলেন।..." (কবিতা, চৈত্র ১৩৬৭)।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

এই একই সংখ্যা 'কবিতা'য, শিশিবকুমাব ভাদুড়ীব মৃত্যুব (৩০ জুন ১৯৫৯) পব তাঁব বিষযে শোকবচনা প্রকাশিত হল। শিশিরকুমাব সেই বিবল মানুষদেব একজন, যিনি সাহিত্যিক না-হওযা সত্ত্বেও যাঁব বিষযে 'কবিতা'য শোকবচনা প্রকাশিত হয। লেখক বুদ্ধদেব বসু :

"তিবিশ বছব, পঁযত্রিশ বছব আগে আমবা 'কল্লোলেব' দল এই কলকাতায দাপাদাপি ক'বে বেড়াচ্ছিলাম। ছাপাব অক্ষবে সবেমাত্র বেবিযেছি আমবা— কেউ কেউ কলেজেব ছাত্র, কেউ বা অবজ্ঞাভবে কলেজ থেকে ফেবাব, কেউ ভ্রাম্যমাণ, কেউ বিবাহিত। সাবাক্ষণ আমবা উৎসাহে উদ্বেল হ'যে আছি, সেই উৎসাহেব বিষযগুলি বিচিত্র, পবিবর্তনশীল, অসংখ্য এবং অনেক সমযই ঐকাহিক। তবু তাবই মধ্যে কযেকটি স্থাযী বিষয ছিলো না তা নয · যোবোপীয মহাদেশে এমন কযেকজন সাহিত্যিককে আমবা আবিষ্কাব কবেছি যাঁদেব বচনাব অনববত পশ্চাদ্ধাবনে আমবা প্রতিশ্রুত, এবং মাতৃভাষায যাঁবা নতুন লিখছেন তাঁদেব দিকেও বিবামহীন আমাদেব মনোযোগ। ঠিক সাহিত্য নয অথচ সাহিত্যেব সংলগ্ন, এমন কোনো-কোনো বিষযেও আমবা উচ্ছ্বসিত ছিলুম : যেমন নজরুল ইসলামেব কণ্ঠসংগীত ও শিশিবকুমাব ভাদুড়ীব অভিনয।

..তাব অভিনযপ্রতিভা এমন স্পষ্ট, প্রোজ্জ্বল ও তর্কাতীত যে তাকে অভিনন্দন জানাবাব জন্য অচিন্ত্যকুমাবকে কবিতা লিখতে হ'লো`। তাঁব কণ্ঠেব 'সীতা' ডাক শুনে পুলকবেদনায আপ্লুত হ'লো কলকাতা।

তাকে কেন্দ্র ক'বে আব যাঁবা বিকশিত হলেন : যোগেশচন্দ্র চৌধুবী, শৈলেন চৌধুবী, মনোবঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী কঙ্কাবতী— এই সব মৃত মানুষেব নাম, আজকেব তরুণদেব কাছে যাব কোনো অর্থ নেই আব, সেই সব নাম কৃতজ্ঞ বেদনায স্মবণ কবা আমাদেবই কর্তব্য, আমবা যাবা সেই সমযে তরুণ ছিলাম।...

ইতিহাসবচনায এখনও অভ্যস্ত হইনি আমবা ; শিশিবকুমাবেব নটজীবনেব কতটুকু চিহ্ন আজ খুঁজে পাওযা যাবে জানি না। সমকালীন তথ্য, আলোচনা, ছবি, পত্রিকাদিব কর্তিকা— সব একত্র পাওযা গেলে তাঁব কীর্তিশালা পুনবায নির্মিত হ'তে পাবে ; আমাদেব উত্তবপুরুষেব অজানা থাকে না প্রথম বিশ শতকেব বাঙালি জীবনে শিশিবকুমাবেব অবদান কত বিপুল। কিন্তু আমাদেব দেশে সে-বকম সম্ভাবনা ক্ষীণ ব'লেই ধ'বে নিচ্ছি ; আজকেব দিনে যাবা বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় তাঁদেবই স্মৃতিতে তিনি জীবিত থাকবেন যতদিন-না কালপ্রবাহে তাঁবাও একে-একে মিলিযে

১. 'শিশিবকুমাব ভাদুড়ী' শিবোনামে এই কবিতাটি বেবিয়েছিল দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায, ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। প্রথম পঙক্তি ছিল · 'দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে : সীতা সীতা সীতা .." কবিতাটি এই সংখ্যা 'কবিতা'য় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

যান। তাই আজই, এই মুহূর্তেই, আমবা এই কথা লিখে রাখতে চাই যে আমাদেব কাছে তিনি ছিলেন প্রিয়তমদের অন্যতম, যে-আনন্দ তাঁব কাছে পেযেছি তা রত্নেব মতো আমাদের মনে গ্রথিত হ'য়ে আছে, এবং তা আছে ব'লেই, আমবা ঈর্ষা কবি না আমাদের সন্তানদের, যারা বাংলা বঙ্গমঞ্চ থেকে নতুনতব সম্পদ আহরণ কবছে ব'লে শুনতে পাই।"

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'বিপন্ন বিস্ময়' উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন, বই হয়ে বেরোবে দশ বছর পর। নায়কের চরিত্রে তাঁব বোহেমিয়ান ছাত্র দীপক মজুমদারের ছায়া আছে বলে শোনা যায়।

অক্টোবরে বেরোল 'শোণপাংশু' উপন্যাস।

চৈত্র ১৩৬৫ ও আষাঢ় ১৩৬৬ : দুই সংখ্যা জুড়ে 'কবিতা'য় প্রকাশিত হল তাঁব বোদলেয়ার অনুবাদ-গ্রন্থেব ভূমিকা : 'শার্ল বোদলেয়াব : তাঁর কবিতা'। নরেশ গুহ— তাঁর রিপন কলেজের ছাত্র, বর্তমানে যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে তাঁর সহকর্মী ও 'কবিতা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক— ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে বিদেশে গেলেন। ফলে চৈত্র ১৩৬৫ সংখ্যা থেকে দেখতে পাচ্ছি, সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক হিশেবে একা বুদ্ধদেব বসুরই নাম।

১৯৬০ ।। বয়স বাহান্ন

'কবিতা'র শততম সংখ্যা

পৌষ ১৩৬৬, জানুয়ারি ১৯৬০ : বর্ষ ২৪-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি 'কবিতা'র শততম সংখ্যা হিশেবে প্রকাশিত হল। এটির নাম দেয়া হল আন্তর্জাতিক সংখ্যা (International Number)। সতেরোজন বাঙালি কবি ও ছ'জন অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবির কবিতার ইংরেজি অনুবাদ, ইংরেজিভাষী কবিদের সংখ্যা চোদ্দ : এই নিয়ে মোট ৬৯টি কবিতার সংকলন। পঁচিশ বছর আগে, সাতাশ বছরের বুদ্ধদেব ও উনিশ বছরের সমর সেন যখন প্রথম সংখ্যাটি পূর্বাশা প্রেস থেকে বিনামূল্যে ছাপিয়ে, ভবানীপুরের গলির বাড়িতে নিয়ে এসে একটি নবজাত মানবশিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনেছিলেন, সেদিন এই সংখ্যাটি তাঁদের কল্পনায় ছিল না।

বুদ্ধদেব বসু রচিত EDITOR'S NOTE থেকে :

"In this number of Kavita we have drawn upon ten languages, seven nations and all the six decades of our troubled century... but we do not claim to be 'representative' in any sense of the word... Our choice was determined by the languages known to the editor and his collaborators and the material we already possessed or were able to hunt up. Our aim was to introduce our contemporary poetry to foreigners and that of other nations to Indians, but let us make it clear that the linguistic distribution in this issue follows no definite plan.

To this there is one exception, however. The greatest number of poets and poems are in Bengali, and we intended it should be so. After all, or rather above all, Kavita is a magazine of Bengali verse... It seemed to us both natural and right that we should try to make this issue a little anthology of modern Bengali Poetry as well as a meeting-ground of nations. But here again we do not claim to be comprehensive or adequate... We could choose only those which we found it possible to translate — and also worthwhile. The reader should be told that in our translations we have tried to maintain the forms of the originals, although rhyme had to be left out here and there...."

রবীন্দ্র-উন্মত্ততার বীজ

'দেশ', ৬ শ্রাবণ ১৩৬৮ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর রচনা থেকে :

"গত বৎসর [অর্থাৎ এ-বছর, ১৯৬০] অল ইণ্ডিয়া রেডিও একটি ইংরেজি বক্তৃতা পর্যায়ের আয়োজন করেন, তার শিরোনামা 'Western Influence on Bengali Literature'। এই পর্যায়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হ'য়ে, আমি নিবন্ধটি রচনা করি ; বেতারের পরিভাষায় তার শিরোনামা ছিলো— 'Western Influence on Bengali Literature : Rabindranath'। কলকাতা বেতাব কেন্দ্রে এটি সম্প্রচারিত হয় ১৯৬০ সালের ৯ মার্চ তারিখে, পড়তে হয়েছিলো অবশ্য আমাকেই। একই বছরের ৩ জুলাই তারিখের 'আকাশবাণী'তে (পূর্ব নাম, 'The Indian Listener') লেখাটি প্রথম ছাপা হয়, কিন্তু মূল রচনার প্রথম অনুচ্ছেদ ও শেষ অনুচ্ছেদের অর্ধাংশ 'আকাশবাণী' বর্জন কবেন— কেন,তা আমাব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিছুদিন পরে পুরো লেখাটি ছাপা হ'লো প্যারিসের 'Two Cities' নামক ইঙ্গ-ফবাশি পত্রিকার হেমন্ত সংখ্যায় (১৯৬০), এবং প্রায় একই সময়ে, কিছুটা বন্ধুদের পরামর্শে এবং কিছুটা সম্পাদকের অনুরোধ এড়াতে না-পেবে, লেখাটার একটা বাংলা প্রকরণ আমি দাঁড় করালাম ; 'ববীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী' নামে পূজা-বাষিকী 'অভিসারে' তার স্থান হ'লো। বাংলা লেখাটাকে প্রকরণ বলছি এইজন্যই যে তা ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ নয় ; ইংরেজিতে যা আছে তার সমস্তটাই ঐ প্রবন্ধে দিয়েছি, কিন্তু বাংলাব সবগুলি অংশ ইংরেজিতে নেই ; অর্থাৎ বাংলায় এমন কিছু বাক্য ও মন্তব্য যোগ করেছি যা আমার ধারণায় আমার বক্তব্যকে আরো সবল করে।..."

আগামী বছর এই লেখাটিকে উপলক্ষ করে প্রবল গণ-উন্মত্ততা আরম্ভ হবে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হল— ঘুমের মধ্যে, ২৪ জুন শেষ রাত্রে (অর্থাৎ ২৫ জুন)।

"তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৩১ সালে, কিন্তু আমাদের ভিন্নগামী জীবনের ধারা অনেকবার মোড নিয়ে-নিয়ে কিছুটা সমান্তরভাবে প্রবাহিত হ'তে লাগলো ধরা যাক দশ-বারো বছর আগে থেকে। ক্রমে আমরা আরো বেশি সমীপবর্তী হয়েছিলাম, সম্প্রতি প্রায় ঘনিষ্ঠ। নানা সূত্রে যত বেশি দেখা হয়েছে, তত বেশি তাঁকে ভালোবেসেছি আমি ; আমার সেই অনুরাগে যেমন তিলমাত্র মোহ ছিলো না, তেমনি ছিলো না তিলতম সংশয়ের অবকাশ। ভাগ্যদোষে অনেক বন্ধু হারিয়ে কোনো-এক অজ্ঞাত পুণ্যফলে আমি বন্ধু পেয়েছিলাম সুধীন্দ্রনাথকে ; অবশেষে এমন হয়েছিলো যে আমার সমবয়সী বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সঙ্গে আমার স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো অবাধ, আলাপ অপর্যাপ্ত, মানস-

বিনিমষ ফলপ্রসূ ; আমাব তুলনায অনেক বেশি জ্ঞানী তিনি, তাঁব আগ্রহেব পবিধি অনেক বেশি বিস্তীর্ণ ; তবু যে আমি তাঁব পাশে দাঁড়াতে পেবেছিলাম তাব কাবণ সাহিত্যপ্রেমে আমাদেব সমকক্ষতা।... সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধাবে কবি ও বিদ্বান, স্রষ্টা ও মনস্বী। যেমন তিনি স্বাধীন বচনায শক্তিশালী, তেমনি পঠনপাঠন অনুশীলনে তিনি তৃপ্তিহীন। বিশ্বেব সাহিত্য তিনি জানতেন, এবং সৃষ্টি ক্রিযাব গোপনতম সমস্যাগুলি তাঁব অন্তঃস্থ ছিলো। আব এইজন্যেই তাঁব প্রতি আমাব আকর্ষণ ছিলো দুর্বাব ; যে-কথা শুধু দুজন লেখকেব মধ্যেই সম্ভবপব, তেমন কথা বলাব জন্য তাঁকে আমি অনন্য ব'লে জেনেছিলাম।... যা আমাব নিজেব মধ্যে নেই, অথচ যা আমাব পক্ষে নিতান্ত প্রযোজনীয, তাবই প্রতিমূর্তি যেন সুধীন্দ্রনাথ।...

সাহিত্যে বহুকাল ধ'বে তিনি আমাব সহযাত্রী। আমাব বচনা ও সম্পাদনাকর্মে তাঁব সহযোগ ও পবামর্শ যে কত মূল্যবান ছিলো, তাব আংশিক স্বীকৃতি অন্যত্র আমি কবেছি, যদিও সব কথা কোনোদিনই হযতো বলা যাবে না। সাহিত্যব্যাপাবে আমাব কোনো প্রস্তাবে আমি কখনো তাঁকে 'না' বলতে শুনিনি, এবং অনুবোধবক্ষায তাঁব তৎপবতা, যত্ন ও অধ্যবসায আমাকে বাব-বাব মুগ্ধ কবেছে। অবশেষে অন্য একটি বিষযেও আমাব অনুবোধ তিনি উপেক্ষা কবলেন না ; যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযেব তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা কবতে বাজি হলেন, তাঁব বন্ধুপ্রীতি ও আমাব সৌভাগ্যেব প্রসাদে সেখানেও তাঁকে সহযোগীরূপে লাভ কবলাম। যাঁবা ববাবস্ট্যাম্প-চিহ্নিত দলিলপত্র দ্বাবা সমস্ত-কিছু বিচাব কবেন, তাঁদেব মুখে এই সংযোগেব ঔচিত্য বিষযে সংশয শোনা গেলো। 'হ'তে পাবেন ভালো কবি, কিন্তু অধ্যাপনা পাববেন কি?' এব আগে সুধীন্দ্রনাথেব কোনো বৈদ্যালযিক সংস্রব ঘটেনি ; কলকাতাব কোনো সবোবব অথবা ইংলণ্ডেব কোনো তটিনীব তীববাসিনী ছিলেন না তাঁব সবস্বতী ; তিনি না কবেছিলেন এম. এ পাশ, না লিখেছিলেন ছাত্রব্যবহার্য কোনো গ্রন্থ। আমার অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না যে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে, এবং সেই সঙ্গে আবহমান পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁব মতো বিস্তীর্ণ ও যত্নলব্ধ জ্ঞান ভাবতভূমিতে বিবল ও বিস্ময়কব, আব এও আমি জানতাম যে তিনি, তাঁব কবিচিত্তের উপলব্ধিব বলে ও মনোমুগ্ধকব বাচনভঙ্গিব দ্বাবা, যে-ভাবে সেই জ্ঞানকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পাববেন তা অত্যন্ত শ্লাঘনীয। এই অধ্যাপনার কাজ তিনি পূর্ণমনস্ক চিত্তে গ্রহণ কবেছিলেন, এতে আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি, এব জন্য সোৎসাহ পরিশ্রম ক'রে একটি অব্যক্ত তৃপ্তি ছিলো তাঁর, বিদ্যালয়েব সীমিত সময়ের মধ্যে যা সম্ভব হ'তো না, ছাত্রদের বাড়িতে ডেকে এনে তা পূবণ ক'বে দিতেন। আব—যদিও এই সংযোগ অনবচ্ছিন্ন হ'তে পারেনি— শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে কতখানি পেয়েছিলো, কী গভীর ছিলো তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি ও ভালোবাসা, তা তাঁব মৃত্যুব দিনে অনেকেই হয়তো প্রত্যক্ষ কবেছেন।...

আমার বয়স পঞ্চাশ পার হ'য়ে গেলো, গত তিরিশ বছর ধ'রে বাংলা ভাষার

কবিতার বিবর্তনে লিপ্ত আছি। স্বকীয় বচনার চেষ্টাতেই আমার তৃপ্তি ছিলো না; আমি অবিরাম যুদ্ধ করেছি আধুনিকতার শত্রুপক্ষের সঙ্গে, আমার সমকালীন কবিদেব গুণকীর্তনে আমি ক্লান্তিহীন ছিলাম। আজ যখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েছে, যখন আজকের দিনের তরুণের দল আমার প্রিয় কবিদের আমারই কাছে প্রিয়তর ক'রে তুলছেন, তখন আমার নিজেকে মনে হচ্ছে অবসন্ন, আজ এতদিন পরে আমি বিশ্রাম প্রার্থনা করছি, আকাঙ্ক্ষা কবছি স্তব্ধতাব অবসর, যাতে নিজেব প্রতি অবশিষ্ট দু-একটা কর্তব্য অবশেষে নিঃশব্দে সম্পাদনা কবতে পারি। মৃত্যু মৃতকে মহিমান্বিত ক'রে তোলে তা সত্য— কিন্তু নিষ্ঠুর, কী নিষ্ঠুব সেই নিষেধ, যার দ্বারা জীবিতকে তার পবম রহস্য থেকে সে অমোঘভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। আমি জানি বাংলাদেশেব আসন্ন বৎসরগুলিতে সুধীন্দ্রনাথ ধীরে-ধীরে অমবতাব পথে অগ্রসব হবেন এবং তাব দ্বাবা আমিও চবিতার্থ হবো; কিন্তু আমাদের এই মহামূল্য মর্ত্য জীবনে তাঁকে যে হাবিয়েছি সে-কথাও ভুলতে পারি না। আমাদেব সংহতির শেষ সূত্র ছিন্ন হ'লো, চলাব পথে সঙ্গী আব নেই, আমি ক্লান্ত, অপবাহ্নে একলা ব'সে আছি।"

—"সুধীন্দ্রনাথ দত্ত", বুদ্ধদেব বসু।

সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা : ববীন্দ্রনাথ ৩য় মু পৃ. ৬৯ ৭৬।

"... আমরা সকলে মিলে মুগ্ধ ছিলাম বাবাব প্রিযতম এবং শেষতম বন্ধুকে নিযে — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। মৃত্যুর বছর দশেক আগে থেকে তাঁব সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছিলো।... সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন অ্যাবিস্টোক্র্যাট।... যথেষ্ট ধন ও তাব সঙ্গে রুচি থাকলে ফলটা যে কত উপভোগ্য ও সুন্দর হ'তে পারে তা ৬ নম্বব রাসেল স্ট্রিটে গেলে বোঝা যেত। সুধীন্দ্রনাথের ছিল ২২টি যামিনী বায, ছ' হাজাব বই এবং ভেবমুথ ও বাকার্ডি-সমৃদ্ধ বাব...। তিনি ছিলেন একাধারে বুদ্ধিজীবী ও বিষয়ী। তাঁর মধ্যে কী ব্যালান্সড্ প্রকাশই না ছিলো মনের ও ধনেব।

১৯৬০ সালের জুন মাসে একদিন সুধীন্দ্র এলেন বিকেলে। ...দিলাম চা আর 'সুইট ইণ্ডিয়া' থেকে কেনা রসগোল্লা আর চাটনি দেয়া শিঙারা। বাবা তো এসব দেখলে আঁতকে উঠতেন, তাই বেশ ভয়ে-ভয়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু সুধীন্দ্র বেশ তৃপ্তি কবেই খেলেন। অন্য সময়ে তাঁকে হুইস্কির সঙ্গে মা'র দেয়া রসগোল্লা খেতে দেখেছি। আমাদের একটা চেয়ার ছিল যার নাম উনি দিয়েছিলেন 'পিকাসো চেয়ার'। তাতে বসার অসুবিধে নিয়ে নানান মন্তব্য হল। জীবনের সব কিছুই তাঁর কাছে ছিল উপাদেয় ও তৃপ্তিকর, তিনি ছিলেন বুদ্ধির, শিক্ষার, রূপের এক মূর্তিমান উৎসব, হুইস্কির সঙ্গে যেমন রসগোল্লা, তেমনি প্রুস্ত-এর সঙ্গে প্রতিভা বসুর উপন্যাসের তিনি ছিলেন অনুরাগী। বাবাকে প্রায়ই শোনাতেন, 'যা-ই বলুন, her dialogue is much better than yours. আমাদের বাড়িতে বালক পাপ্পাকেই তাঁর শুধু sane মনে হত— হাসতে-হাসতে আঙুল নাড়িয়ে বলতেন, 'It's a madhouse'।

সেদিন বিকেলে লিফটের সামনে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘ, ঋজু,

স্বাস্থ্যেব প্রতিমূর্তি। মনে হল কী সুন্দব তিনি। বলেছিলাম মুখ ফুটে। সেদিন বলেছিলেন, একটা নতুন বেস্তরাঁ আবিষ্কার করেছেন, দুর্দান্ত রান্না, নাম 'অ্যাম্বার' — 'চলো', তোমাদেব নিযে যাবো।' জুনেব শেষে কোনো এক শনিবাব অ্যাম্বাব যাব আমবা— এবকম ঠিক হল।

চব্বিশে জুন ভোব চাবটেতে রুমি এসে আমাদেব ফ্ল্যাটেব দবজা ধাক্কালো। খুলতেই ঝাঁপিযে পডল আমাব উপব। নিচে গাড়িতে মা-বাবা বসেছিলেন, বাসেল স্ট্রিটেব ফ্ল্যাটে সুধীন্দ্রনাথেব শোবাব ঘবে ঢোকাব মুখে ড্রেসিংরুম। সেখানে হ্যাঙ্গাবে ঝুলছে ব-সিল্কেব নতুন কোট যা প'বে এসে তিনি খুব গর্ব কবেছিলেন একদিন।"

আমাদেব ২০২ . মীনাক্ষী দত্ত।

—কবিতাভবনবার্ষিকী, ৩০ নভেম্বব, ১৯৮৭। পৃ. ২২৬-৭।

"যে বছব যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয স্থাপিত হল [১৯৫৬] এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে অধ্যাপক কবে নিযে এলেন বুদ্ধদেব, রাজেশ্বরী একেবাবে আনন্দে আত্মহাবা। আব সেই সমযটাতেই আমাদেব বন্ধুত্ব গাঢ হবাব সুযোগ পেল। শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রতা সৌজন্য কৌলীন্য সব বিষয়েই সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম শ্রেণীব মানুষ হিসেবে গণ্য কবা যায।... সুধীন্দ্রনাথেব মতো বিদগ্ধ ব্যক্তি সর্বত্রই বিবল। বাজেশ্ববীব মতোও অমন সুন্দবী, সবল, সর্বগুণসম্পন্না মেযেও অবিবল নয। সাহিত্য ও সাহিত্যপাঠ ছেড়ে তাব স্বামী যতই ঈঙ্গ-বঙ্গ সমাজে মেলামেশা করুন না কেন, বাজেশ্ববী ঠিক অনুভব কবেছিল একজন বাঙালি লেখকেব পক্ষে সেই পবিবেশ সর্বতোভাবে সহায নয। সমকক্ষ সমধর্মী সমকর্মী স্বভাষী মানুষেব সঙ্গ না পেলে তাব স্বামীব প্রতিভা অচিবেই নিষ্প্রভ হবে। সুধীন দত্ত নিজেও খুব সুখী হযেছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদেব মধ্যে একেবাবে মিশিয়ে দিযেছিলেন নিজেকে। পডাতে যে তাঁব কত ভালো লাগত, ছাত্র-ছাত্রীদেব যে কত ভালোবাসতেন সে কথা তাঁব ছাত্র-ছাত্রীবা জানত।"

—*জীবনেব জলছবি।* পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

সুধীন্দ্রনাথেব মৃত্যুদিনে আমার একটি নিজস্ব স্মৃতি আছে কবিতাভবন ও বুদ্ধদেব বসুর— এই উপলক্ষে সেটি বিবৃত কবি। শ্মশান থেকে ফিরে আমরা ছাত্ররা কেউ কেউ গিয়েছিলাম কবিতাভবনে। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে; কবিতাভবনেব চেহারা বিশৃঙ্খল : সিঁড়িতে বসে ফোঁপাচ্ছে কেউ কেউ, বুদ্ধদেব উদ্ভ্রান্তের মতো এঘর-ওঘর করছেন। একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তারপরই ফিরে এসে সোফায় বসছেন, একটু পরই উঠে গিয়ে বসছেন লেখার টেবিলে।

পরদিন ছিল বি.এ. পরীক্ষার শেষদিন, যাদবপুরে। কনিষ্ঠা কন্যা রুমির পরীক্ষার বছর সেটা। কিন্তু রুমি বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে হু হু করে। একবার এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। বুদ্ধদেব কন্যার

মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে হঠাৎ অনাবশ্যক উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, "রুমি, আয় তোকে পড়াই। কাল তোর পরীক্ষা— নিয়ে আয়, কী পড়তে চাস নিয়ে আয়।"

তারপর কী হল আর মনে নেই। কিন্তু এখনো কানে লেগে আছে, সেই বিশৃঙ্খলা, উত্তাল শোক ও চারিদিকে বিভ্রান্তির মধ্যে, বুদ্ধদেবের আত্মস্থ হবার চেষ্টা, অনাবশ্যক উচ্চস্বরে সেই বলে ওঠা— "রুমি, আয় তোকে পড়াই—"

আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭ যুগ্ম সংখ্যাটি 'কবিতা'র সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি-সংখ্যা হিশেবে প্রকাশিত হল। 'কবিতা' পত্রিকার শেষ বিশেষ সংখ্যা এটি।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

ফেব্রুয়ারিতে বই হয়ে বেরোল 'নীলাঞ্জনের খাতা' উপন্যাস। আষাঢ়ে বেরোল 'পারিবারিক' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ— 'দুই ঢেউ, এক নদী'। জুলাইতে বেরোল ছোটোগল্পের সংগ্রহ 'একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু'। সেপ্টেম্বরে তাঁর সম্পাদনায় 'ডক্টর জিভাগো'র বঙ্গানুবাদ। কবিতা অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু, উপন্যাসের প্রথমাংশের অনুবাদ মীনাক্ষী দত্ত, দ্বিতীয়াংশ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহালয়া ১৩৬৭-এ বেরোল ছোটোদের জন্য অনুবাদ, 'হ্যামেলিনের বাঁশিওলা'।

১৯৬১ ।। বয়স তিপ্পান্ন

পৃথিবী পরিভ্রমণ

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল অনেকগুলি —জাপান থেকে, হনুলুলু থেকে, আমেরিকা থেকে, য়োরোপ থেকে। জানুয়ারির গোড়ায় কলকাতা ছাড়লেন বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু। রেঙ্গুন, হংকং হয়ে জাপানে পৌঁছলেন। এখানে দশদিনে 'গোটা ছয়েক' বক্তৃতা করতে হল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। সেখান থেকে হনলুলু হয়ে নিউইয়র্ক পৌঁছলেন। এখানে পরিচিত হলেন বহুশ্রুত 'বীটনিক'দের সঙ্গে।

" 'Beat,' 'Beatitude' : এই দুটি শব্দেব যমকে এঁদের নামকরণ ; বীটবংশ বলতে চান যে তাঁরা সমাজের কাছে স্বেচ্ছায় হেরে গেছেন, এবং তাঁরা পুণ্যের পিয়াসী। এক সাংবাদিক একবার বিদ্রূপ ক'রে এঁদের যে-আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই 'beatnik' ও এখন মার্কিনী শব্দকোষের অন্তর্ভূত।"

—*দেশান্তর*, বুদ্ধদেব বসু। ১ম সং, পৃ. ২৩৮

বীটদের অন্যতম প্রধান কবি এ্যালেন গীনসবার্গের সঙ্গে পরিচয় হল— কয়েক বছর পর যিনি কলকাতার তরুণ কবিদেরও বন্ধু হবেন।

অ্যালেন গিন্‌সবার্গ

জামাতা জ্যোতির্ময় দত্তকে লেখা চিঠি (১৯.৩.৬১) :

"আজ সন্ধ্যায় ডরথি নর্ম্যানের পার্টিতে অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। প্রথমে উল্লেখ্য অ্যালান গিন্‌সবার্গ। তোমার মুখে যার নাম শুনেছি, কিন্তু যার লেখা আমি কিছুই পড়িনি। সম্ভ্রান্ত ককটেল-পার্টিতে একটা গলা-খোলা লাল শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছে (স্পষ্টতই আমাব কবিতা পড়েনি) ; ভারি সুশ্রী দেখতে, আমি দেখামাত্র ভালোবেসে ফেলেছি, ছেলেটিকে দেখে তোমার কথা বড্ড মনে পড়ছিলো। বললে— আমেরিকার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে চলেছে : কেরুয়াক, গিনসবার্গ, আরো কে-কে! সুসভ্য ভারতীয়দের বিস্মৃত সোমরসে দীক্ষাদান এদের মহান ব্রত। আমি বললুম 'সোম' বোধহয় ফরাশি বা ইতালিয় ওয়াইনের মতো নিরীহ দ্রাক্ষারস মাত্র ছিলো, কিন্তু হাক্সলি এদের মগজে যে-ভূত ঢুকিয়েছেন তা তাড়ানো আমার মতো ওঝার কর্ম নয়। এরা বিবিধ নেশার

চর্চা করে থাকে— গাঁজা, সিদ্ধি, চরস ইত্যাদি, তুরীয় অবস্থায় কবিতা লেখে, সামাজিক রীতিনীতিকে পদদলিত করে— অথচ এই সমস্ত অতি পুরোনো অতি মলিন অতি ব্যবহৃত মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও গিন্‌সবার্গকে আমি অস্বীকার করতে পারলুম না, আমার মনে হ'লো লোকটা সত্যি কিছু খুঁজছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর-দশজনের মতো নয় সে, ভিতরে এক ফোঁটা আগুন জ্বলছে। আমি আবেগের বশে কাল রাত্রে তাকে যেতে ব'লে দিয়েছি, একজন বন্ধু নিয়ে আসবে বলেছে— কী অবস্থায় আসবে, আস্ত দল নিয়েই চড়াও হবে কিনা— এ-সব ভেবে এখন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছি— কিন্তু ছেলেটির চেহারা স্মরণ ক'রে অনুতপ্ত হ'তে পারছি না।"

—'কবিতা' পত্রিকা, চৈত্র ১৩৬৭

প্রতিভা বসু লিখেছেন :

"বীটদেব বিষয়ে, বিশেষত এই গীনজবার্গ নামের কবিটি বিষয়ে এত নানারকম উম্মাদনার কাহিনী শোনা ছিল যে দেখবার আগে একটু আশঙ্কাই ছিল আমার। দেখার পরে নিরুদ্বেগ হওয়া গেল। গীনজবার্গের শিষ্টাচারের কোনো অভাব ছিল না, তা ব্যতীত তার মুখমণ্ডল রাশীকৃত দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে আবৃত ছিল না, উপরন্তু পাতলা চুলকে বারে বারেই চিরুনি বার করে আঁচড়ে আঁচড়ে ঠিক রাখছিল। শুনেছিলাম এরা পিতামাতাকে ঘৃণা করা কর্তব্য বলে বোধ করে, কিন্তু গীনজবার্গের Kaddish নামক বইটির কবিতা তার মৃত মায়ের স্মরণেই শোকোচ্ছ্বাস। Kaddish শব্দটির অর্থ শোকার্তের প্রার্থনা।...

রাত বারোটা বাজালো যেতে যেতে। যাবার সময় আবার বলল, 'পায়ে হেঁটে হলেও আমি জানি এই যাত্রাই আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে। তোমাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আমার সেখানেই হবে। হতেই হবে।...'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজেকে আমাদের মধ্যে সে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়ে চলে গেল যে কয়েক দিন পর্যন্ত আমরা অনেকবার তার কথা বলাবলি করেছি। ... তার সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আমাদের কলকাতাতেই হয়েছিল। ততদিনে বস্তুতই সে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধু। ছেলেমেয়েদের আপনজন। পাজামা পাঞ্জাবিতে দীক্ষিত হয়েছে, ধুতি পরার রিহার্সেলও চলছে। কাঁটাচামচ ছেড়ে ডাল ভাত খাচ্ছে হাত দিয়ে। দেখা হতেই একটা প্রণাম ঠুকে দিল বুদ্ধদেবকে।

'এ কী!' বুদ্ধদেব তো সসংকোচে তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে হাত ধরলেন।

গীনজবার্গ বিজয়ের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী রকম? বলেছিলাম না?'

—*স্মৃতি সততই সুখের*, ১ম সং, পৃ ২০৫

বিদেশে বুদ্ধদেবেব ববীন্দ্রনাথ বিষযক মন্তব্য নিযে কলকাতায গণ-উম্মত্ততা

গত বছব ৯ মার্চ বুদ্ধদেব কলকাতাব অল ইণ্ডিযা বেডিযোতে যে বক্তৃতা কবেছিলেন, সেটিব পূর্ণাঙ্গ বযান প্রকাশিত হযেছিল প্যাবিসেব 'টু সিটিজ' নামক ইঙ্গফবাশি পত্রিকাব হেমন্ত (১৯৬০) সংখ্যায। এখানে তাব নাম ছিল Western Influence on Rabindranath এবং প্রবন্ধটি আবম্ভ হযেছিল এইভাবে

> Rabindranath's works are European Literature written in the Bengali language, and they are the first of their kind ' This remark, made by a Bengali poet of today, is of course an exaggeration but it is exaggeration of this sort that reveal the truth in a flash and make us cogitate on its implication "

এই বাক্যটিকে উপলক্ষ কবে কলকাতায বিবাট ঝড উঠল বুদ্ধদেবেব বিরুদ্ধে

> "ছ মাস পবে ফিবে এসে দেখি, আমাকে নিযে ছাপাব অক্ষবে তাণ্ডব চলছে। এই উত্তেজনাব লক্ষ্য বা উপলক্ষ আমাব একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, এবং সেই প্রবন্ধেব সঙ্গে এই অপোচ্ছ্বাসেব প্রায কোনো সম্বন্ধই নেই। অধিকতব কৌতুকেব বিষয এই যে, সে লেখাটা ষোলো মাস আগে বেডিওতে সম্প্রচাবিত হয, এবং যাব ভাগ্যে দশ মাসেব মধ্যে ইংবেজিতে ও বাংলায, দেশে ও বিদেশে, খণ্ডিত, পূর্ণ ও পবিবর্ধিতরূপে পাঁচ বাব প্রকাশলাভ ঘটে তাকে নিযে অকস্মাৎ এক উত্তেজনা পঙ্কিল হ'যে উঠলো।"

—দেশ, ৬ শ্রাবণ ১৩৬৮

সবচেযে তীব্র আক্রমণ হল যুগান্তব পত্রিকায—প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছিলেন যুগান্তবের তৎকালীন বার্তা-সম্পাদক, কবি কৃষ্ণ ধব— 'কবিতা' পত্রিকায অবশ্য তাঁব কোনো লেখা কখনো প্রকাশিত হযনি।

'শনিবাবেব চিঠি' ইত্যাদি পত্রিকাও ছেডে কথা বলল না। এমনকি, কুৎসাব উদগাব তুললেন বুদ্ধদেবেব বন্ধুস্থানীয় মানুষবাও। বিষ্ণু দে ও চঞ্চলকুমাব চট্টোপাধ্যায় যুগান্তবে চিঠি লিখলেন (১০ জুলাই ১৯৬১):

> "বুদ্ধদেব সম্প্রতি বোদলেযাব ব্যাঁবো প্রভৃতি কবিদেব লেখা পডতে শুরু কবেছেন— ভালো কথা, কিন্তু অস্থানে-কুস্থানে এই নবীন উৎসাহেব জ্ঞানেব প্রযোগ বিশেষ কবিয়া ফবাসী দেশে বা আমেবিকায ববীন্দ্রনাথকে হেয প্রতিপন্ন কবিবাব জন্য প্রযোগে আমবা মর্মাহত।"

চিঠিব নিচে স্বাক্ষবকাবীদেব নামগুলি চোখে দেখেও আমাদেব বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে কবে না। এই গুরুচণ্ডালী ভাষা ও রুচিবিকারেব সঙ্গে কোনোমতেই মেলানো যায় না তাঁদেব মনীষিতাকে। আমাদেব মনে পডে যায় বিষ্ণু দে-কে কবি হিশেবে

প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য 'প্রগতি' পত্রিকায় বুদ্ধদেবের প্রয়াসের কথা— তাঁর প্রথম কবিতার বই বুদ্ধদেবের উৎসাহে তাঁরই প্রকাশনাসংস্থা 'গ্রন্থকারমণ্ডলী' থেকে প্রকাশিত হবার কথা। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই কবিতাভবন থেকে বেরোবার ইতিহাস।

এই ব্যাপার নিয়ে কলকাতা শহরের ডামাডোল যে কী-পরিমাণ বিপুল ও বীভৎস আকার ধারণ করেছিল, তার বর্ণনা আছে প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথায় :

"বুদ্ধদেব বসু নাকি প্যারিসে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে এমন যা-তা লিখে কাগজ পড়ছিলেন যে ছাত্ররা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর হাত থেকে সেই লিখিত পেপার নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে অপমান করেছে। বাড়ি পৌঁছে ছেলেমেয়েদেব এবং জামাতার মুখে এ কথা শুনে বুদ্ধদেব 'হাউ সিলি' বলে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'কী উর্বর মস্তিষ্ক। এর চেয়ে হাস্যকর কথা বোধহয় জীবনে শুনিনি।' বুদ্ধদেব হাসলেন বটে কিন্তু সেই হাসিতে পুত্রকন্যারা সহজভাবে যোগ দিতে পারল না। কেননা জল তখন অনেক দূর গড়িয়েছে। অবস্থা এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছে যে হাসবার বা বোকামি বলে উড়িয়ে দেবার মতো অবস্থা নয়।... বুদ্ধদেব বসু নামের একটি জীবকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে তারা, বাকি শুধু রক্তমাংসের আসামীটিকে হাতেনাতে ধরতে পারলেই ফাঁসির মঞ্চে তুলে দেওয়া।...

অবশ্য এদের কাছে বুদ্ধদেব বসু সর্বদাই একটি অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী ছিলেন। সেই অপরাধ হচ্ছে কোনো না কোনো দলে মিশে এর গায়ে ওর গায়ে কাদা ছিটোতে না পারা,... আমার মনে আপন কর্মনিষ্ঠায় নিযুক্ত থাকা।... সেই পাষণ্ডটিকে যখন একবার ধরা গেছে আর কি ছাড়া যায়?... নিত্যনতুন গুজব ছড়িয়ে, নিত্য নতুন গজিয়ে ওঠা কাগজওয়ালারাও তাদের বিক্রি দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়িয়ে ফেলল। মিথ্যা রটনার সাহায্যে লোকজনদের মস্তিষ্ক সাফ করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে এল সত্যি সত্যি একটা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়াও কিছু বিচিত্র ছিল না। আমাদের ফ্ল্যাটের চিরকাল অনর্গল দরজাটি দেখলাম আমাব পুত্রকন্যারা সভয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে রাখতে অভ্যাস করেছে। যদি অন্যান্য সকলের মতো বুদ্ধদেবের বেরুবার স্বভাব থাকত, গৃহেই নিজেকে আবদ্ধ করে না, রাখার স্বভাব হত, তা হলে কোনো একদিন নিশ্চয়ই আর তাঁর ঘরে ফেরা হত না।

এই মিথ্যা খবরটি প্রথম যুগান্তর পত্রিকাই রটিয়েছিল। যদিও তখনো পর্যন্ত বক্তৃতা দেবার জন্য বুদ্ধদেব প্যারিসে যাননি।... যেদিন সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেবের বক্তৃতা হল, হাত থেকে কাগজ টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলার কোনো প্রশ্ন ছিল না, কারণ তিনি কাগজ পড়েননি, এমনিই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

... যখন এই সব ডামাডোলের মধ্যে আমরা ফিরে এসেছি, তখন একদিন এম. সি. সরকারের স্বত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকার বুদ্ধদেবের সম্মানে তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন।

জ্ঞানীগুণী অনেককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। ঈর্ষাব উৎকট প্রকাশেব এটাই হযতো তিনি সমুচিত জবাব বলে ধবে নিযেছিলেন। আমন্ত্রিতদেব মধ্যে দেখা গেল যুগান্তবেব বার্তাসম্পাদকটি আছেন।..

.. একদিন সুধীবচন্দ্র সবকাব অসহ্য বোধ কবে চলে এলেন বাডিতে। বললেন, 'এব তো একটা প্রতিকাব কবা দবকাব।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'আমি কী প্রতিকাব কবতে পাবি বলুন।'

'মামলা। আপনি মানহানিব মামলা করুন।'

এখানেও সেই একই জবাব, 'আপনি তো জানেন আমাব ধনবল বলতেও যেমন কিছু নেই, তেমনি জনবলও নেই।'

তিনি উত্তেজিত হযে বললেন, 'জনবল আপনাব নিশ্চযই আছে। আব টাকাপযসাব কথা যদি বলেন, তাব দায আমাব। আপনি মামলা করুন।'

বুদ্ধদেব কৃতজ্ঞচিত্তে মেনে নিযেছিলেন সেই কথা। বুদ্ধদেবেব শত্রুব অভাব আমি অন্তত কোনোদিন দেখিনি কিন্তু এই ধবণেব গুণগ্রাহী মিত্র যদি মানুষেব একজনও থাকে শত শত্রুও সেই তুলনায নগণ্য। মামলা ব্যাপাবটা যে কত বিশ্রী তাব ভিতব দিযে না গেলে কখনোই জানা যেত না। সত্যি বলতে তখনকাব দিনগুলো যেন আমাদেব ঐ বকম একটা আনন্দোচ্ছল সহজ স্বাভাবিক বাডিব পক্ষে অনন্ত নবক হযে উঠল। আগে যা শুনতাম তা কানে শুনতাম, এবপব পযসা খবচ কবে সেই নিন্দা চোখে দেখাব জন্য সব কাগজ কিনে আনতে হত। মামলা কবতে হলে কোন কাগজ কী ছাপাচ্ছে তাব খুঁটিনাটি সবই সংগ্রহ কবতে হয। দেখা গেল শ্রবণেব চাইতে দর্শনেব যন্ত্রণা অনেক বেশি কর্কশ। বাধ্যতামূলক এই গোযেন্দাগিবিব ফলে আমাদেব সকলেব জীবন থেকে আলো, আহাব নিদ্রা সব চলে গেল। বাশীকৃত কাগজে চোখ বুলিযে মনে হল শুধু শকুনি গৃধিনীব মতো পোকা-কিলবিল নর্দমাব পচা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে জেগে ওঠা, আব ঘুমিযে পডা। এই সমযে একদিন অতি অসমযে অত্যন্ত ব্যস্ত-ব্যাকুলভাবে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এসে হাজিব। আমাব দিকে তাকিযে প্রায তিবস্কাবেব ভঙ্গিতে বললেন, 'আমাব ধাবণা ছিল তুই আব পাঁচজনেব চাইতে স্বতন্ত্র, তোব মাথায কিছু বুদ্ধি দিযেই ঈশ্বব তোকে ভবধামে পাঠিযেছেন, এখন দেখছি সেটা ভুল।'

... বললেন, 'শোনো বুদ্ধ, ঝগডা কখনো একা হয না। চ্যাচাচ্ছে, চ্যাচাতে দাও আপনিই থেমে যাবে। তুমি অধীব হলে চলবে কেন? এই চিৎকাব তো তুমি নতুন শুনছ না, তবু অভ্যেস হল না?'

আমি অবাক হযে বললাম, 'আপনি এত সব খবব কী কবে জানলেন? বিশেষত এই মামলাব খবব? এ খববটা তো এঁবা গোপনই বাখতে চেযেছিলেন।' সত্যেনদা এতক্ষণে আবাম কবে বসলেন। তাঁব সাবল্যেব প্রতীক অবিশ্রান্ত হাসিমুখ এতক্ষণে কিছুটা শান্ত হল। বললেন, 'বোকা মেযেটা শোন, যাবা ঈর্ষায কষ্ট পেযেছে, তুই কি ভাবিস তাবাই সব? বাজনীতিওযালাবাও তো ওত পেতে বসেছিল। আমাব কাছে আজ দলেব প্রতিভূটি স্বাক্ষব নিতে এসেছিল।

প্রতিভূটির সব বক্তব্যই নিঃশব্দে শুনেছি। বুঝতে পারলাম কাগজওয়ালারা আভাসে ইঙ্গিতে মামলার খবর পেয়েছে তাই ইতিমধ্যেই জাল গোটাতে শুরু করেছে। পেশাগত কোনো কোনো বন্ধুও হাত ঝেড়ে মুখ ধুয়ে চুপচাপ সরে পড়েছে এই ঝামেলা থেকে। কিন্তু ভিন্নমত বিদ্বেষী রাজনৈতিক বন্ধুরা কি এমন সুযোগ অমনিই ছেড়ে দেবে? বললেন, মামলায় হারজিত নিয়ে তো তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই,... এই পুঁজিবাদী লেখকটাকে একবার তার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের জামাতা সমেত কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অপমানের চূড়ান্ত করা কাকে বলে সেটাই দেখিয়ে দিতে চায়।... শোনো বুদ্ধ, আমি বলছি তুমি এর মধ্যে যেও না। এদের অশালীন ব্যবহার কত দূর যেতে পারে তা তোমার ধারণায় নেই। এদের সঙ্গে যুদ্ধে নামা তোমার কাজ নয়। তুমি তোমার নিষ্ঠা নিয়ে যা আছ তাই থাক।' বুদ্ধদেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আমরাও বাঁচলাম। জানানো হলো সুধীর সরকারকে। শুনে তিনি হাসিমুখে বললেন, 'এ যে আপনার কর্ম নয় তা জানি। কিন্তু দেখছেন তো আভাসে ইঙ্গিতে জেনে ফেলেই কেমন রাতারাতি সুর পালটেছে কাগজগুলো? লড়লে আমরা ঠিক জিতে যেতাম।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'কী হবে জিতে? আমার শত্রু কি তাতে একজনও কমে যাবে? মৃত্যু পর্যন্ত এই আমার নিয়তি।'

সুধীর সরকার বললেন, 'তা হলে চুপচাপ থাকা যাক কয়েকদিন, রি-অ্যাকশানটা দেখা যাক। মামলা তো হাতে রইলই তৈরি।'

রি-অ্যাকশানটা অবশ্য খুবই ভালো হয়েছিল। কোনো অঞ্চল থেকেই আর টুঁ-শব্দটি শোনা যাচ্ছিল না। এই প্রসঙ্গে সাগরময় ঘোষের ও অরুণ সরকারের কিছু অবদান ছিল। প্রায় জোর করেই বুদ্ধদেবকে রাজি করিয়ে হামবুর্গে যে বক্তৃতাটা লিখে পড়েছিলেন, এত কথিত সেই ইংরিজি বক্তৃতার বাংলা অনুবাদটা দেশ পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন।"

—*জীবনের জলছবি,* ৩য় মু, পৃ. ২৩১

'দেশ' পত্রিকার এই লেখাটি পাওয়া যাবে তাঁর 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী' নামে। এখানে, 'টু সিটিজ' পত্রিকার ওই প্রথম বাক্যটিকে আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন বুদ্ধদেব :

'রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় প্রথম য়োরোপীয় সাহিত্য লেখেন।' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তিতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু এই অতিরঞ্জন ঠিক সেই ধরনের যা বিদ্যুতের মতো সত্যকে উদ্ভাসিত ক'রে আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে।"

যে মন্তব্যটি ঘিরে এত তুফান, সেটি আদতেই তাঁর রচনা নয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ; ইংরেজি বাক্যটিতে উদ্ধৃতিচিহ্ন থাকা সত্ত্বেও সেটিকে উপেক্ষা করে বাক্যটির

কদর্থ দাঁড় করানো হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ নামক বাঙালির ঠাকুরের কল্পিত অবমাননা হিশেবে অপব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল।

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার উত্তাল ও পঙ্কিল সেই বাদানুবাদের ইতিহাস একটু বিশদ ভাবেই বর্ণনা করা হল। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রবিদ্বেষের অভিযোগ উঠেছে প্রধানত দুটি উৎস থেকে। প্রথমত শনিবারের চিঠি, এবং দ্বিতীয়ত যুগান্তর-অমৃতবাজার গোষ্ঠী। তবে এ-দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টি পেশিশক্তিতে স্বভাবতই অনেক বেশি প্রবল— আর কোনো কাবণে নয়, দৈনিক পত্রিকা বলেই।

বুদ্ধদেব বসুর বিষয়ে দুটি মত এখনো বেশ প্রবলভাবেই প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা তাঁব রচনাবলি ও মানসতার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা বলেন, বুদ্ধদেবের প্রধান দোষ রবীন্দ্রভক্তির আতিশয্য। অন্যেবা বলেন, তাঁর প্রধান দোষ রবীন্দ্রবিদ্বেষের আতিশয্য। আর কোনো লেখক সম্পর্কে এই রকম পরস্পরবিরোধী অভিযোগ শোনা যায় না। রবীন্দ্রবিদ্বেষের অভিযোগ সারা জীবন তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। ছোটোখাটো দুয়েকটি ঘটনা, নানা লেখার সমালোচনা ও লেখা বিষয়ে বক্রোক্তি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করার কাজটা ধৈর্যসহকারে বছরের পর বছর ধরে করে আসছিল শনিবারের চিঠি, সেই 'কল্লোলে'র সময় থেকে ; কিন্তু ব্যাপারটা জটিল ও গুরুতর চেহারা নিল ১৯৩৮ সালে, যখন নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বুদ্ধদেব তাঁর লিখিত ইংরেজি ভাষণে বললেন, " .. The age that had produced Tagore was long over..." আর অমৃতবাজার এই বক্তৃতার প্রতিবেদনে শিরোনাম লেখে, বুদ্ধদেবকে উদ্ধৃত করে, "The age of Rabindranath is over." স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ভুল বুঝেছিলেন। এত দ্রুত তাঁর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে তথ্য যাচাইয়ের জন্যও তিনি অপেক্ষা করেননি। বুদ্ধদেব যদিও সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে, সংবাদপত্রের কর্তিকা এবং নিজের মন্তব্যের নকল তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ততদিনে 'বিচিত্রা'য় বেরিয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের 'সময়হারা' কবিতা, এবং তাকে উপলক্ষ করে শনিবারের চিঠি ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাঠে। অপপ্রচারের ধাক্কায় এই যে রবীন্দ্রবিদ্বেষী বলে নিন্দা রটল তাঁর, এই নিন্দা আজীবন তাঁর অঙ্গের ভূষণ হয়ে রইল।

বই পড়ে মস্তিষ্কের ব্যায়াম করার চেয়ে জনরব শুনে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি অভ্যস্ত ও উৎসাহী ; ফলেই, 'সাহিত্যচর্চা' থেকে 'কবি রবীন্দ্রনাথ' পর্যন্ত গ্রন্থসমূহে রবীন্দ্রনাথ আলোচনার যে মান বুদ্ধদেব প্রতিষ্ঠা করলেন, তা অধিগম্য হল শুধুমাত্র কতিপয় বিদগ্ধ পাঠকের।

'কবিতা' পত্রিকার শেষ সংখ্যা

বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩, ক্রমিক সংখ্যা ১০৪, কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হল চৈত্র ১৩৬৭, এবছরের বসন্তকালে। কেউ জানত না এটিই 'কবিতা'র শেষ সংখ্যা হবে, বুদ্ধদেব নিজেও জানতেন না। এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক থেকে জামাতা জ্যোতির্ময় দত্তকে লেখা তাঁর চিঠি— ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি লিখছেন :

> "...জনবব শুনছি আমাব অনুপস্থিতিব সুযোগ নিয়ে তুমি আমাব বিষযে প্রবন্ধ লিখে 'কবিতা'য় ছাপাবাব মৎলব আঁটছো—খববদাব, কখনো না, আমি যতদিন সম্পাদক আছি 'কবিতা'য আমার বিষয়ে আলাদা কোনো প্রবন্ধ বেবোবে না— বড়ো জোর বুক-বিভিয়ু পর্যন্ত মার্জনীয।..."

এ থেকে মনে হয় না পত্রিকা বন্ধ করে দেবার কোনো আশু পরিকল্পনা তাঁর ছিল। বরং মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত আবু সয়ীদ আইয়ুবকে লেখা ১ নভেম্বর ১৯৬১-র চিঠি থেকে বোঝা যায় যে আরো অন্তত একটি সংখ্যা বার করবার ইচ্ছে ছিল তাঁর :

> "একটা খবব জানানো হযনি : 'কবিতা'ব আব একটা সংখ্যা বেবোবে, তাবপব বন্ধ ক'বে দেবো।"

—"বুদ্ধদেব বসু : 'প্রগতি' থেকে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'"
সুবীব বায়চৌধুবী। কলকাতা ২০০০, নববর্ষ ১৩৯১

আর একটি সংখ্যা বেরোলে ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হত। তা ছাড়া অন্যান্য সংখ্যার মতো এই সংখ্যাতেও গ্রাহক হবার নিয়মাবলি, ঠিকানা বদল হলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানাবার অনুরোধ, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে গেলে কী কবতে হবে ইত্যাদি অনুজ্ঞা সংবলিত বিজ্ঞপ্তিটিও বেরিয়েছিল।

'অন্যমনে' নামক একটি ছোটো পত্রিকার ১৩৭৬ শরৎকালীন সংখ্যায় বুদ্ধদেব একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেখানে ব্যক্ত কবেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ ক'রে দেবার অন্তর্নিহিত কারণ।

> "অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম 'কবিতা' বন্ধ ক'রে দেবো। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাসের বন্ধন কাটাতে পারছিলাম না। তারপর কয়েক বছর আগে অনেকটা স্বল্প ব্যবধানে আমাকে দু-দুবাব বিদেশে যেতে হ'লো এবং সেই সমযেই 'কবিতা' এত অনিয়মিত হযে পড়ল যে, আমি ফিবে আসার পর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পাবলাম না। পারলাম না বললে ঠিক হয় না, ইচ্ছে করলে পারতাম। আসলে ইচ্ছেটাই মন থেকে স'রে গিযেছিলো। তার কারণ কিছুদিন ধ'রেই আমার মনে হচ্ছিল যে, বছরে চারটি সংখ্যা ভরাবার মতোও চলনসই রকমের ভালো কবিতা ও সমালোচনা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারে আসল কারণ বোধহয় এই যে আমি নিজেই পত্রিকা পরিচালনায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম ; নিজের জন্য, নিজের

লেখাব জন্য আবও বেশি সময চাচ্ছিলাম। পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনেব কাজ। যৌবন পেবিযে এসে তা না কবাই উচিত।"...

বাস্তবিক, 'কবিতা' পত্রিকা যে বন্ধ হযে গেল তা 'কবিতা'ব ঘনিষ্ঠ পাঠকবাও অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পাবেননি। 'কবিতা' বন্ধ হযে যাবাব জন্য আক্ষেপ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায ধ্বনিত হল প্রায দু'বছব পবে— চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যায—

'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ হযে গেছে বলে বুদ্ধদেব বসুব উপব বাগ কবতে পাবি না। তবু তিনি অন্তত ২৬ বছব চালিযেছেন। শুধু মনে হয, প্রথম লিখতে আবম্ভ কবাব সময আমবা ভাবতুম যদি কখনো 'কবিতা' পত্রিকায আমাব বচনা ওঠে, তবে জীবন ধন্য হবে। স্টলেব সামনে দাঁড়িযে থাকতুম 'কবিতা' পত্রিকাব দিকে চেযে, মলাট ওলটাতে সাহস হত না, যদি সূচিপত্রে আমাব নাম না দেখি। এখন যাবা কবিতা লিখতে শুরু কববেন— তাঁদেব জন্য এ স্বর্গ বইল না। তাঁবা কোন কাগজে নিজেব লেখা দেখে জীবন ধন্য কববেন? কোনো কাগজ নেই আব। "

লেখাটি অস্বাক্ষবিত— গদ্য শৈলী দেখে মনে হয সুনীল গঙ্গোপাধ্যাযেব লেখা।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

জাপানি জর্নাল লিখলেন নভেম্বব ও ডিসেম্ববে। দশ বছব ধবে লিখে শেষ কবলেন 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা : ববীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেব প্রবন্ধগুলি।

জানুযাবিতে বেবোল 'শার্ল বোদলেযাব : তাঁব কবিতা'। 'কবিতা'ব চৈত্র ১৩৫৫ সংখ্যায প্রথমে ছ'টি অনুবাদ বেবোয— তাবপব দশ বছব ধবে প্রকাশিত হয মোট ১১৭টি কবিতাব অনুবাদ। আধুনিক বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এটি একটি স্তম্ভস্বৰূপ গ্রন্থ, এবং এব বিশাল ভূমিকায বিধৃত হযে আছে আধুনিকতাব আত্মা। 'অনুবাদকেব বক্তব্য'তে লিখলেন :

"...ফবাশি ভাষা আমি বিধিবদ্ধভাবে কখনো শিখিনি, কিন্তু অভিধান ও একাধিক ইংবেজি অনুবাদকেব সাহায্যে.. প্রতিটি মূল বচনা প্রণিধান কবে নিযেছি , লক্ষ বেখেছি, ইংবেজি অনুবাদ কোথায এবং কী-ভাবে মূলকে লঙ্ঘন কবেছে, এবং অনুবাদকালে বোদলেযাবেব নিজস্ব ভাষাব দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখতে ভুলিনি। অন্ততপক্ষে এ বিষযে আমাব সন্দেহ নেই যে ইংবেজি ভাষায আমি যতটা অভ্যস্ত ফবাশিতে ঠিক ততটা হ'লেও, আমাব এই অনুবাদগুচ্ছ যা হযেছে তা থেকে ভিন্ন কিছু হ'তো না।..."

এই সময়েব তরুণ কবিরা এই অনুবাদগুলির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই অনুবাদের বিশেষ বিশেষ পঙ্‌ক্তি তখন তাঁদের মুখে মুখে ফিরত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই পর্বের কবিতার উপর বোদলেয়ারের প্রভাব

খুব স্পষ্ট। এমনকি, এর কিছুদিন বাদেই যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' প্রকাশিত হল দেখা গেল উৎসর্গপত্রে বোদলেয়ার থেকে একটি পঙক্তি— "প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে, যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার"।

বোদলেয়ারের সঙ্গে পরিচয় . অনুবাদের পশ্চাৎপট

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রাবস্থার শেষ বছরে—খুব সম্ভব সুইনবার্ন মারফৎ এই ফরাশি কবির অস্তিত্ব আমি প্রথম জেনেছিলাম, ইংরেজি অনুবাদে তাঁর একটি কাব্যসংকলনও আমার হাতে এসেছিলো এবং এতদূর পর্যন্ত মনে ধরেছিলো যে দুটি তিনটি গদ্য কবিতার তর্জমাও আমি ক'রে ফেলেছিলাম। কিন্তু এর পরেই বইটি হারিয়ে যায়, আমার দিগন্ত থেকে বোদলেয়ার অপসৃত হন, আমার কলকাতার জীবনের বিবর্ধমান ব্যস্ততা ও বিক্ষেপের ভিড়ে হয়তো আমি আর তাকে খুঁজেও পেতাম না— যদি না একদিন, প্রায় কুড়ি বছর পরে, হঠাৎ আমার চোখে পড়তো পার্ক স্ট্রিটের এক বইয়ের দোকানে একটি রোগা বই, যার জ্যাকেটের উপর বিরাট অক্ষরে BAUDELAIRE নামটি অঙ্কিত। সেদিন আমি নির্দিষ্ট কোনো বইয়ের খোঁজে যাইনি, আমার তল্পিও ছিলো যৎকিঞ্চিৎ— বইখানাকে উল্টে পাল্টে দেখে রেখে দিতে হ'লো। ফিরে এলাম পরের দিন— পকেটে দশটাকার নোট, আর মনে দুরুদুরু ভয় পাছে বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকে, যা হাতে করে সেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম তাকে ক্রীত কোনো সামগ্রীর বদলে অদৃষ্টের উপহার বললেই ঠিক হয়। মনে পড়ে ফিরতি ট্রামে ভিড় ছিলো, আমি জানলায় ঠেশান দিয়ে দাড়িয়ে বইখানা চাখছি— একটি, দুটি, তিনটি কবিতা, অথবা হয়তো একটাই বারবার। অনুবাদ ছিলো সরল ও আক্ষরিক গোছের, বাঁয়ের পৃষ্ঠায় মূল ফরাশি ছাপানো ছিলো— কিন্তু ফরাশি ভাষায় আমার অনভিজ্ঞতা ও ইংরেজি অনুবাদকের শিল্পহীনতা অতিক্রম করে বোদলেয়ার আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন, আমার মন যেন জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো বাইরের ঐ পড়ন্ত রৌদ্রেরই মতো— যেন এই কবিরই অপেক্ষায় আমি ছিলাম এতদিন, যেন আমি নিজের অজান্তে এ-মুহূর্তে যা প্রার্থনা করছিলাম, এই কবিতাগুলি ঠিক তা-ই। সেবারেও একগুচ্ছ অনুবাদ আমি করেছিলাম ও পত্রিকায় ছেপেছিলাম. কিন্তু 'কালিদাসের মেঘদূত' বইটা বেরোবার পর আমি যখন বোদলেয়ার অনুবাদে হাত দিলাম, তখন আমার আগেকার প্রয়াসগুলিকে আমি বাতিল ক'রে দিয়েছি— কেননা ততদিনে, প্রায় দশ-বছর-ব্যাপী সহবাসের ফলে, বোদলেয়ারের কবিতা ও ব্যক্তিত্ব ও জীবনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গভীর হ'য়ে উঠেছে।

একটা সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি তখন নতুন-খোলা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করছি ; শীতকাল। আমি ক্লাশ পড়াই সকালবেলায় ; বেলা একটা নাগাদ আটের-বি বাস এ ব'সে আমার ভাবতে ভালো লাগে যে বাড়িতে আমার জন্য বোদলেয়ার অপেক্ষা করছেন। আমি আহার সেরে ব'সে যাই টেবিলে ;

শীতেব বেলা দেখতে-দেখতে প'ড়ে আসে, উল্টো দিকেব বাস্তাটাকে কযেক মুহূর্তেব জন্য বঙিন ক'বে তোলে স্কুল-ছুট মেযেদেব দল, শুকনো হাওযায খাতাব কাগজ কুঁকড়ে যায, খুলে-বাখা ফাউন্টেনপেনেব মুখে কালি যায শুকিযে— আমাব উত্তবমুখো ঘব অন্ধকাব আব ঠাণ্ডা, আমি একটাব বদলে দুটো ফ্লুওবেসেন্ট বাতি জ্বেলে একটাব পব আব-একটা অনুবাদে হাত লাগাই। কখনো-কখনো বাত্রে ঘুমেব সময পর্যন্ত বোদলেযাবকে নিযেই কেটে যায আমাব— হযতো আবো-একবাব পড়ি তাঁব 'অন্তবঙ্গ ডাযেবি' বা চিঠিপত্র, আবো একবাব কোনো চিবনতুন কবিতা — অথবা পাতা-খোলা বইযেব দিকে তাকিযে চুপচাপ ভাবি এই কবিতাটাব অনুবাদ আমাকে দিযে হতে পাবে কিনা।"

কবিতাব শত্রু ও মিত্র কবিতা ও আমাব জীবন

১৯৬২ ।। বয়স চুয়ান্ন

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

দশ বছর আগে ১৯৫৩ সালে যখন প্রথমবার আমেরিকা গেলেন বুদ্ধদেব, আমরা দেখেছি প্রতিভা বসুর তখন হাতে ছিল মাত্র চব্বিশ টাকা। দশ বছরে এই অবস্থাটা বদলেছে খানিকটা। ধনী হননি, তবে সচ্ছলতা এসেছে। পারিবারিক সাক্ষ্যে জানা যায়, ১৯৫৪-তে আমেরিকা থেকে ফেরার পর প্রথম রেফ্রিজরেটর এসেছিল তাঁদের বাড়িতে— এবং টেলিফোন। ব্যক্তিগত অভ্যাসেরও পরিবর্তন হল কিছু-কিছু। আগে ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া পরতেন না, আমেরিকা যাবার সময় প্রথম সুট করিয়েছিলেন। দেশে ফিরে, বাড়িতে পরার পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি বিদ্যাসাগরি চটি থাকলেও, বাইরে বেরোবার পোশাক সাধারণতই প্যাণ্ট শার্ট হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই পোশাকেই যেতেন, শীতকালে সুট পরতেন। এই সময়কার আর্থিক সাচ্ছল্যের একটা কারণ অবশ্যই তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান হিশেবে স্বস্তিকর বেতন ; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো কারণ ছিল, প্রতিভা বসু এই সময়ে তাঁর লেখকজীবনের সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছিলেন। প্রকাশকরা তাঁর একটি উপন্যাস পাবার জন্যে আগাম টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন— যা লেখেন তার অনেকটাই রূপান্তরিত হয়ে যায় সিনেমায়। এই সাফল্যের ছাপ তাঁদের জীবনযাত্রায়ও পড়ছে কিছু-কিছু। প্রতিভা বসুর অনেককালের শখ মিটিয়ে গাড়ি কেনা হল একটি, পুরোনো গাড়ি। সদ্য আমেরিকায় পি.এইচ.ডি করতে যাওয়া কনিষ্ঠা কন্যাকে লিখছেন :

> "... আসল কথাই বলিনি— তোর মা জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়েছেন— গাড়ি। তিনি নভেম্বরেব মাঝামাঝি থেকেই এই 'তাল তুলেছিলেন', কিন্তু আমি বিশ্বাস কবিনি সম্ভব হবে— তেমন প্রয়োজনও বোধ কবিনি গাড়ির, এখনো করি না। বাহাদুর যাঁর ফার্মে কাজ করেন, সেই ভদ্রলোকের দশ বছরের পুরোনো একটা Standard Vanguard কেনা হ'লো সাড়ে তিন হাজার টাকায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকার জোগাড় ছিলো না, কিন্তু প্র. ব-র বইয়ের জন্য পাব্লিশাররা এমন লোলুপ যে, আশাতীতভাবে অর্থেরও সংস্থান হ'লো। চার দরজার বড়ো গাড়ি, ছ-জন পর্যন্ত বসা যায় (মিমির মতে দশজন), চেহারাটা তেমন ঝকমকে আর কী করে হবে... আমার মত ছিলো না— এ এক রাক্ষুসে খরচের ব্যাপার (আমরা কতটুকু বেরোই সত্যি বলতে?)..."
>
> —কনিষ্ঠা কন্যাকে চিঠি (৭/১২/১৯৬২)

কনিষ্ঠা কন্যাকে পত্রধারা

এখান থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত, পাঠক লক্ষ করবেন, তথ্যের আকর হিশেবে কনিষ্ঠা কন্যা দময়ন্তী (রুমি) কে লেখা অজস্র চিঠি ব্যবহার করা হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর আশি বছর-পূর্তি উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকায় এই চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এক বছর ধরে (১৯৮৮-৮৯)। পত্রধারাটির শিরোনাম ছিল, 'বুদ্ধদেব বসুর চিঠি : কনিষ্ঠা কন্যাকে'। তাঁকে লেখা যত চিঠির উল্লেখ পাওয়া যাবে, পাঠক যেন অনুগ্রহ করে ধরে নেন যে সেগুলি এই পত্রধারা থেকেই সংকলিত।

বুদ্ধদেবের যাদবপুরে অধ্যাপনার প্রায় পুরো সময়টা ধরেই তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে তাঁর ছাত্রী ছিলেন রুমি। তারপর চলে গেলেন পি. এইচ. ডি করতে আমেরিকায়। সেখান থেকে ফিরেও কলকাতায় আসা হল না তাঁর, চলে যেতে হল কানপুরে। বহুকাল ধরে প্রবাসী হবার ফলে বুদ্ধদেবের চিঠি পাবার সুযোগও তাঁর বেশিই ঘটেছিল ; আর চিঠিগুলি পড়ে ধারণা হয়, তাঁকে লেখা চিঠিতে নিজের মন উন্মোচিত করতেও পারতেন বুদ্ধদেব। এই চিঠিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে, শুধু পিতৃহৃদয়ের ভালোবাসা ও বেদনা ও উদ্বেগ নয়, নিজের অন্তরের কথা, নিজের জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার বোধ, নিজস্ব অনুভূতিমালা। বুদ্ধদেব বসুকে বুঝতে হলে এই চিঠিগুলি অবশ্য-পাঠ্য।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বক্তৃতা

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে পাঁচটি বক্তৃতা দিলেন, বিষয় : রবীন্দ্রনাথ। এই বক্তৃতাগুলি নিয়ে বছরের শেষে বই হল, Tagore : Potrait of a poet.

প্রথম বক্তৃতাটি (His personality)-র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে যে দুটি পরস্পরবিরোধী অভিযোগ আছে— অত্যধিক রবীন্দ্রপ্রীতি, ও অত্যধিক রবীন্দ্রবিদ্বেষ— তার দ্বারা তিনি ব্যাখ্যা করছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে :

> "Recently, in Bengal, a magazine which claims to be *avant-garde* roundly deplored my 'blind devotion' to Tagore. Others, finding me lacking in reverence for the great man, attacked me with exemplary gusto. It did not surprise me that the two charges were contraditory. For many a time before this I have been hauled up as an idolater or an iconoclast, or both at once. To you, possibly, this would be an indication of how peculiar and personal my relationship is with Tagore. That of journeyman and master it certainly is, and of a hungering reader and a poet who is apparently

inexhaustible, but these, I must say, are only minor aspects of this complex and vital relationship. I should compare it, if I may, to a long-drawn love-affair, continued over several decades or rather a whole lifetime, with avowals and reversals, periods of truancy or weariness. moods of recoils and revolt followed by inevitable reconciliation. What is involved here is not taste, nor affiinity of temperament, but the sense of one's having been formed by a power beingly manifested in words, and of having lived much of one's life though that single experience.. For I have the awful feeling that if Tagore had not existed, I as I am today would not have existed either."

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই জীবনব্যাপী সম্পর্কের ইতিহাস— যাকে তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন Complex and vital relationship বলে, এবং এমন সংরাগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন যাতে পাঠকের মনে সম্পর্কটি প্রতিভাত হয় — প্রায় বৈষ্ণব কবিতার রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্কের মতো, সঘন ও রহস্যময় — তার সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনা তাঁর বাংলা প্রবন্ধে কোথাও নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই প্রবন্ধটি তিনি বাংলায় পুনর্লিখন করেননি, তাঁর অন্যান্য অনেক ইংরেজি রচনার মতো।

অ্যালেন গীনসবার্গের বিদায়

কনিষ্ঠা কন্যাকে চিঠি, ৭/১২/১৯৬২ :

"কাল ফ্রীডম হাউসে অ্যালেন গীন্‌সবার্গ এসেছিলো— শিগগিরই চলে যাচ্ছে কাশীতে, সেখান থেকে ধীরে-ধীরে স্বদেশের দিকে, কলকাতায় আর ফিরবে না। মনটা একটু খারাপ লাগলো ওর জন্যে, মনে হ'লো আরো একটু ঘন-ঘন ওকে আপ্যায়ন করা বোধহয় উচিত ছিলো আমার। কিন্তু সেটা জ্যোতি পুষিযে দিয়েছে — জ্যোতি খুব ভালোবাসে অ্যালেনকে, আমি ততটা বাসি না। ন্যুইয়র্কে ওকে ভালো লেগেছিলো, কিন্তু সেই ভালো লাগা কলকাতায় ক্রমশই হ্রাস পেয়েছে — (তার কারণ হলো : গাঁজা, আফিম, নোংরা পোশাক, আজে-বাজে সাধু সন্নেসির প্রতি আকর্ষণ, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি টান)— অথচ যখনই দেখা হয়েছে তখনই বুঝেছি ওর মধ্যে খাঁটি কিছু আছে। (কিন্তু ওর সঙ্গী বা 'সঙ্গিনী' অর্‌লভস্কিকে অসহ্য লাগে আমার— সেটাও একটা কারণ, যার জন্য অ্যালেনের প্রতি কিছুটা উদাসীন ছিলুম।"

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটি লেখা শেষ হল—

'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি'। ভাসো আমার ভেলা' গ্রন্থের গল্পগুলিও রচনা শেষ হল।

মে মাসে বেরোল গত বছরের দশদিনেব জাপান ভ্রমণের স্মৃতিকথা, 'জাপানি জর্নাল'। তাঁর অন্যান্য ভ্রমণ স্মৃতির সঙ্গে এই বইটির তফাৎ এই, প্রতিটি রচনায় তারিখ দেয়া : সেইজন্যই সম্ভবত বইটির এই বকম নাম। অগস্টে বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোল Tagore : Portrait of a Poet.

১৯৬৩।। বয়স পঞ্চান্ন

আমেরিকা থেকে আবার নিমন্ত্রণ : ছুটি পাওয়া নিয়ে গোলযোগ

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেডারেশন অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাণ্ড লিট্‌রেচার্‌স (FILLM) সংস্থা তাঁদের নবম আন্তর্জাতিক অধিবেশনে বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করলেন, ভারতীয় সাহিত্যের কোনো একটি দিক নিয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য। তুলনামূলক সাহিত্যেব জন্যই এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান। বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ভারতবর্ষের তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালযিক কেন্দ্রের বিভাগীয় প্রধান হিশেবে। অধিবেশনের তারিখ ২৫ থেকে ৩১ অগস্ট।

পুজোর ছুটি সে-বছর খুব দেরিতে পড়েছিল— অক্টোবরের মাঝামাঝি। বুদ্ধদেব দু-মাসের ছুটি চাইলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যাতে একেবারে পুজোর ছুটিটাও ওদেশে কাটিয়ে ফিরতে পারেন। তিনি আশা করেছিলেন, মার্কিনি শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁর বন্ধুরা এই নিমন্ত্রণের কথা জানলে, আরো কিছু অর্থকরী বক্তৃতার ব্যবস্থা করে দেবেন তাঁর জন্য। সেই মর্মে অনুরোধ জানিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন তাঁদের। তাঁরাও সাড়া দিলেন উৎসাহজনক, আরো কিছু বক্তৃতার অনুরোধ এল।

অপ্রত্যাশিতভাবে আরেকটি নিমন্ত্রণও এল। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমেস্টারের জন্য (সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ থেকে জানুয়ারি ১৯৬৪) অতিথি-অধ্যাপক হিশেবে পড়াবার জন্য। বুদ্ধদেব, যাদবপুরের কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমোদন পেয়ে তাঁর সানন্দ সম্মতি জানিয়ে দিলেন ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এবং বিনা বেতনে ছ'মাসের ছুটির আবেদন করলেন।

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ :

"... ১৯৬৩ সালের শেষে আমরা আবার [আমেরিকা] গেলাম। সেই সময় ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান সেবাটিকেলে [১] যাচ্ছিলেন এক বছরের জন্য। ... তিনি বুদ্ধদেবকে এই একটা বছর [এক সেমেস্টার] সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পরিবর্তে কাজের অনুবোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন। বুদ্ধদেব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকটর ত্রিগুণা সেনকে সেই চিঠির কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন, একটা

---

১ : সেবাটিকেল (Sabbatical) : আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রমুখ বিদ্বজ্জন বিদ্যাচর্চা এবং তজ্জনিত ভ্রমণ ইত্যাদির জন্য যে বিশেষ ছুটি পান।

সেমেস্টারের জন্য তাঁকে ছুটি দেওয়া যেতে পারে কিনা। ত্রিগুণা সেন বেশ খুশির সঙ্গেই রাজি হলেন। বুদ্ধদেবও সেইমতো সম্মতি জানিয়ে তার জবাব দিলেন।

এঁদের আমন্ত্রণ এক বছর আগে থেকেই আসে। সুতরাং ১৯৬২-তে যে আমন্ত্রণ তিনি পেলেন সেটা ১৯৬৩-তে কার্যকর হবার কথা। ইতিমধ্যে আরো একটি আমন্ত্রণ এল। নিউ ইয়র্কে একটি কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছে, পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দিকপালরাই যোগ দিচ্ছেন সেখানে, বুদ্ধদেব যদি দয়া করে যান তাহলে তাঁরা কৃতার্থ হবেন। তাঁরা সম্পূর্ণ এক বছর থাকার জন্য একটি টিকিট পাঠাবেন, অধিবেশন তিন দিনের, তারপর তিনি ইচ্ছে করলে এক বছর সেই টিকিটেই থাকতে পারেন। আমন্ত্রণটিতে দেখা গেল বুদ্ধদেব যখন ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন এই কংগ্রেস অধিবেশনও সেই সময়েই হচ্ছে।"

—*জীবনের জলছবি*, প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ ২৩৪

এইখানেই পাকিয়ে উঠল গোলযোগ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরিচালকবর্গের মধ্যে একটি শক্তিশালী বুদ্ধদেব-বিরোধী 'লবি' ছিল— তাঁরা চাইলেন বুদ্ধদেবকে হতমান করতে। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন বুদ্ধদেব যাতে ছুটি না পান। এই সময়ে লেখা তাঁর কয়েকটি পত্রাংশ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩

রুমি,

কনফারেন্সওয়ালাদের চিঠি এসেছে ; ওঁরা আমার যাওয়া-আসার জন্য টিকিট পাঠাবেন, কনফারেন্সের ক'দিন (২৫-৩১ অগস্ট) থাকার ব্যবস্থাও করবেন ওঁরা। এবার পুজোর ছুটি খুব দেরিতে পড়েছে ; অক্টোবরের মাঝামাঝি বন্ধ হ'য়ে নভেম্বরের মাঝামাঝি খুলবে ; আমি তাই ভাবছি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এই দু-মাস আমেরিকায় কাটিয়ে আসবো— যদি যথেষ্ট বক্তৃতা জোগাড় হয়। ডেকার, ডিমক, রবাইনস্টাইনকে চিঠি লিখেছি— অন্যদেরও ধীরে-ধীরে লিখব।... কীরকম উত্তর আসে দেখা যাক।

তোর মা'র যাওয়া সুদূরপরাহত— সে-আশা না-করাই ভালো। আমাদের আর্থিক অবস্থা এখন একটু কাহিল (আর কোনো কালেই এমন ছিলো না যে হুট ক'রে ছ'সাত হাজার টাকা খরচ করা যায়) ; গাড়ির খরচ, ইনকাম ট্যাক্স, নাকতলার বাড়ি— সব মিলিয়ে এখন বেশ ভাবতে হচ্ছে।...

আমি কোন কনফারেন্সে যাচ্ছি তা তোর জেনে রাখা ভালো—International Federation of Modern Languages and Literatures (FILLM)-এর ninth International Congress এটা— ঘটনাস্থল আমার পূর্বপরিচিত ন্যুইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়। আমাকে কোনো ভারতীয় বিষয়ে বলতে হবে। নানা দেশের C. L ও অন্যান্য সাহিত্যের অধ্যাপক অনেকেই থাকবেন।..."

১৫ ফেব্রুযাবি ১৯৬৩

রুমি,

...আজ হঠাৎ ফ্রেনজ-এব চিঠি পেলাম গ্যোটিঞ্জেন থেকে আমি কি এক সেমেস্টাবেব জন্য (সেপ্টেম্বব ১৯৬৩-জানুযাবি ১৯৬৪) ইণ্ডিযানাতে পডাতে যেতে পাববো? অবিলম্বে জবাব চেযেছেন, হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিযেছেন মনে হয। কী আশ্চর্য ভেবে দ্যাখ, একেবাবে তোব ব্লুমিংটন থেকেই আহ্বান। শুধু ভাবছি, মাত্র দেড বছব পবে আবাব এক ধাক্কায ছ'মাস ছুটি চাইলে যাদবপুবেব কর্তৃপক্ষ সেটা কী ভাবে নেবেন। ত্রিগুণাবাবুকে তিন মাসেব কথা আগেই বলেছিলাম, কোনো আপত্তি কবেননি, সোমবাব আব-একবাব তাঁব সঙ্গে কথা ব'লে ফ্রেনজকে উত্তব লিখবো। হ্যাঁ, একটা কথা, Stallnecht-এব পুবো নাম আমাকে পত্রপাঠ জানাবি, এটা জরুবি, কেননা তাঁকেও আমাব সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। তিনি কি বর্তমানে C L-এব চেযাবম্যান? ”

২২ ফেব্রুযাবি

রুমি,

. ফ্রেনজ আব স্টলনেকট দু-জনকেই জানিযে দিলাম যে ইণ্ডিযানাব প্রস্তাবে আমাব সানন্দ সম্মতি আছে। যাদবপুব থেকে ছুটি পাওযা মনে হচ্ছে অসম্ভব হবে না, আপাতত কনফাবেন্সওযালাদেব কাছ থেকে আব-একটা চিঠিব অপেক্ষায আছি। ”

২ মার্চ, ১৯৬৩, বাত্রি

রুমি,

.. হঠাৎ ইণ্ডিযানা থেকে আমাব নিমন্ত্রণ, যে-ইণ্ডিযানাতে তুই আছিস, এটাকে ভাগ্যেব দযা ছাডা আব কী বলবো।. . কিন্তু তুই ঠিকই ধবেছিস, মনে-মনে একটু অস্বস্তিও আছে আমাব। যাদবপুব থেকে ছুটি পাওযা যাবে মনে হচ্ছে, বিভাগও অচল হবে না— যদিও আগামী সেশানেও গেলোবাবেব মতো এম. এ. তে কুডি-বাইশজন ভর্তি হ'লে একটু চিন্তাব কাবণ হ'তে পাবে।. .

২৮/৩/৬৩

রুমি,

... স্টলনেখটকে যে চিঠি লিখেছিলুম, আমি Spring-এ গেলে চলে কি না তাব উত্তব এখনো আসেনি— যদি ওঁবা বলেন fall-এই চাই তাহ'লে সেই অনুযাযী ব্যবস্থা কবতে হবে।...

৫ মে ১৯৬৩

“... আমাব ছুটিব প্রস্তাব আবাব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে আসবে দশই মে— মনে তো হচ্ছে হ'যে যাবে। ইতিমধ্যে ফ্রেনৎসের একটা কার্ড পেয়েছি, খুব জোব দিয়েই বলছেন যে তাঁবা আমাকে fall-এই চান।...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা দিয়েও, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেননি। উল্লিখিত ২ মার্চের চিঠির পাদটীকায় পত্রপ্রাপক কন্যা দময়ন্তী জানিয়েছেন :

"এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাবা ইণ্ডিয়ানাতে ঠিকই গিয়েছিলেন, কিন্তু এর জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছিল প্রচুর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জ্ঞানীগুণী' খচিত কমিটি বাবাকে বিনা বেতনে ছ'মাসের ছুটি মঞ্জুর না করে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। যাদবপুরের ইতিহাসে এ ঘটনার বিশদ বিবরণ থাকা উচিত নেহাৎ ঐতিহাসিক কারণেই।"

দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব যাবার বহু আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন, এবং ছুটিও যে চেয়েছিলেন তাও বিনা-বেতনে। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ছুটি মঞ্জুর করলেন না। এদিকে কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমোদন পেয়ে বুদ্ধদেব তাঁর সম্মতির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েও দিয়েছিলেন তাঁর আমেরিকার নিয়োগ-কর্তৃপক্ষ ও ব্যবস্থাপকদের— বাক্যদান করবার পর সেখান থেকে আর পেছিয়েও আসা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। আজ মনে হয়, সুপরিকল্পিতভাবে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ :

"... [বুদ্ধদেব বসুর] ছুটি নিয়ে শেষ মুহূর্তে ভারি বিশ্রী একটা গণ্ডগোল হল। বারে বারে একজন মানুষ সম্মানিত অতিথি অধ্যাপক হয়ে বাইরে যাবার সুযোগ পান সেটা কোনো-কোনো কর্মী ঠিক সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা মিলিতভাবে চেষ্টা করলেন এই ছুটি যাতে মঞ্জুর করা না হয় এবং তার জন্য বারে বারে মিটিংয়ের পর মিটিংও ডাকতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ছুটিটা সত্যিই নামঞ্জুর করিয়ে দেখতে লাগলেন এবার বুদ্ধদেব বসু কী করেন। চাকরিতেই পদত্যাগপত্র দেন বা বিদেশের আমন্ত্রণটাই প্রত্যাখ্যান করেন।

যদিও এক বছর আগেই এই ছুটি রেকটরকে জানিয়ে তাঁর অনুমোদন পেয়েই বুদ্ধদেব বিদেশের নিমন্ত্রণটি গ্রহণ করেছিলেন, সহসা সেই রেকটরই যখন সেটা নামঞ্জুর করলেন, সেটা মেনে নিতে যে বুদ্ধদেবের যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিদেশের কর্তৃপক্ষকে কথা দিয়ে তার খেলাপ করা মানে তাঁদের শুধু বিপদে ফেলাই নয়, নিজেকেও ছোট করা। চাকরির মোহ বুদ্ধদেবের ছিল না বটে কিন্তু তিনি মোহাচ্ছন্ন ছিলেন তাঁর নতুন বিভাগটির ব্যাপারে, সহকর্মীদের জন্য এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য। পদত্যাগপত্র লিখতে [১]

---

১. এই পদত্যাগপত্রের কোনো নকল তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে সন্ধান করে পাওয়া যায়নি, এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শৃঙ্খলার যা মান, তাতে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার

বুদ্ধদেবের যে কত কষ্ট হয়েছিল তা তাঁর ঘনিষ্ঠতমরা সবাই জানেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এইরকম ক্ষেত্রে তাঁর কী করা উচিত। আমি বললাম, আমবা তো কায়ক্লেশে দিনযাপনে চিরদিনই অভ্যস্ত, কিন্তু এখানে একটা আত্মসম্মানের প্রশ্ন আছে। সেটা ভেবে যা করবার তা করো। আমার মনে হয় পদত্যাগ করাই উচিত। ওদের সেমেস্টার মানে ছ'মাস, তারপর আমাদের ফিরতে হবে, ফিরেই আবার সেই অনটনের মুখোমুখি হতে হবে ভেবে যে ভালো লাগছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য।...

যেদিন আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম, সে রাতটি ভোলবার নয়। কবি নরেশ গুহ ততদিনে সমালোচকদের মুখে তুড়ি দিয়ে তার ডিগ্রিটি পকেটে নিয়ে ফিরে এসেছে, তারই হাতে বিভাগের হালটি ধরিয়ে দিয়ে এসেছিলেন বুদ্ধদেব। এবং এই বিভাগের আব একটি শক্ত খুঁটি অথবা শক্ততম খুঁটি প্রথম বছবের ছাত্র অমিয় দেবও ততদিনে পাশ করে সেই বিভাগেই অধ্যাপনাব কাজে নিযুক্ত হযেছে। এতদিনে তার বয়স বেড়েছে, ডিন হয়েছে,[১] কিন্তু তখন সে নিতান্তই একটি অল্পবয়সী যুবক মাত্র। কিন্তু তখনি তার বিচক্ষণতা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততা তুলনাহীন ছিল। তার প্রতি বুদ্ধদেবেরও অখণ্ড বিশ্বাস। সমস্ত কর্মে এবং সংকটে অমিয় তাঁব ডান হাত, বাঁ হাত। সবাই এয়ারপোর্টে এসেছে ; বিদায়েব সময হযে গেলে নরেশ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল। অমিয কম্পিত কণ্ঠে তার মাস্টারমশায়ের হাত ধরে পরম প্রত্যয়ের স্বরে বলল, 'আপনি ভাববেন না, আমবা আছি।' বুদ্ধদেবও চোখ মুছলেন।"

—*জীবনের জলছবি*, প্রতিভা বসু। ৩য় মু, পৃ. ২৩৫

'ভাসো আমার ভেলা' : প্রচ্ছদ নিয়ে চিন্তা

শেষের দিকে বুদ্ধদেবের প্রিয় প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। শেষ কুড়ি বছরের অধিকাংশ বইয়ের প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দুর করা। বইয়ের অঙ্গসজ্জা বিষয়ে বুদ্ধদেবের কতদুর গভীর চিন্তা ছিল তা এই বইটির প্রচ্ছদ নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীকে লেখা এই দুটি চিঠি থেকে বোঝা যাবে। চিঠিদুটির তারিখ পাওয়া যায়নি—আভ্যন্তরিক প্রমাণে অনুমান করা যায়, জুলাই বা অগস্ট মাসে লেখা।

"আমার আর-একটা বই ছাপা হচ্ছে—আনুপূর্বিক আমার সমস্ত ছোট গল্প থেকে

নথি খুঁজে বের করা পাগলের প্রস্তাব। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শুনেছি এটি এক আশ্চর্য দলিল : তাঁর অনুপস্থিতি-কালে বিভাগে কী-কী করণীয় আছে, সমস্ত কাজের তালিকা করে, প্রতিটি কাজ উপযুক্ত সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, প্রতিটি সমস্যা অনুমান করে তার সমাধান নির্দিষ্ট করেছিলেন। সবশেষে লিখেছিলেন, যদি এর কোনোটাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণযোগ্য বলে মনে না করেন, তাহলে এই চিঠিকে যেন তাঁর পদত্যাগপত্র বলে ধরে নেয়া হয়। দুর্ভাগ্য আমাদের, চিঠিটি উদ্ধার করা গেল না।

১. ড. অমিয় দেব বর্তমানে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

বেছে নিয়ে তিরিশটি গল্পের একটি সংকলন। অনেক দিন আগে আমার যে 'গল্প সংকলন' বেরিয়েছিলো— দেখেছিলে কিনা জানি না— তারই পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ বলতে পারো। বইটা প্রকাশ করছেন এম. সি সরকার, ছাপা হচ্ছে নাভানায়। নাম দিয়েছি—'ভাসো, আমার ভেলা'। বেশ মোটা বই হচ্ছে, অন্তত ৩৫ ফর্মা। সুপ্রিয় কাপড়ে বাঁধাতে রাজি হয়েছে। একটা জ্যাকেট থাকবে, তার রূপসজ্জার জন্য তোমার দ্বারস্থ হচ্ছি। আমি ভাবছি শুধু বইয়ের নাম ও লেখকের নামের লেটারিং থাকবে, কোনো হালকা রঙের জমির উপর গাঢ় রঙে ছাপা। এ ছাড়া আরো একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে— তা হ'লো, বইয়ের নামে যে-দুটো 'ভ' ও একটা 'আ' আছে, সেগুলোকে, বা তার কোনো একটি বা দুটিকে যদি সাংকেতিক ও সূক্ষ্মভাবে, ভেলার ডিঙি নৌকার আকার দেয়া যায়। মনে হচ্ছে সবগুলোকে না-ক'রে একটা বা দুটো করাই ভালো হবে। লেটারিং ছাড়া অন্য কোনো সাংকেতিক অলংকরণ থাকবে কি না সেটা তোমার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। বইয়ের আকার ডিমাই ১/৮।

এই তো গেলো জ্যাকেট ভিতরে, কাপড়ের উপর আমি ভাবছি শুধু লেখকের নাম বা শুধু বইয়ের নাম সোনালি জলে engraved থাকবে, পুটে বইয়ের নাম প্রেস-টাইপেও দেয়া যায়।

আমি আর পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে বিদেশে চলে যাচ্ছি, যাবার আগে কভারের সব ব্যবস্থা হওয়া দরকার— সেইজন্য তোমাকে অনুরোধ, যদি খুব অল্প সময়ের মধ্যে জ্যাকেটের ডিজাইন করে এনে আমাকে দেখিয়ে নাও। এই লেটারিঙে বিদ্যাসাগরী টাইপ চাই না— কিছুটা নতুন ধরনের কোরো— মহাসমুদ্রের তীরে দাড়িয়ে লেখক তাঁর ক্ষুদ্র ভেলা ভাসিয়ে দিচ্ছেন, কখন ডুবে যায় তার ঠিক নেই — এই ভাবটা শুধু লেটারিঙেই যদি ইঙ্গিত করা যায়। Encounter এর একটা পাতা ছিঁড়ে এই সঙ্গে পাঠালাম, তাতে কয়েকটা ভালো লেটারিং— strudbergটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তোমাকে ঠিক ঐ ধরনের করতে বলছি— কিন্তু ওটার মধ্যে এমন একটা গুণ আছে যাতে দেখতে-দেখতে অনেক কিছু কল্পনা করা যায়, সেটা বাংলা হরফের চরিত্র বজায় রেখে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব কিনা ভেবে দেখো।..."

পরের চিঠি :

পূর্ণেন্দু, এবারে তোমার ছবিটি ঠিক হয়েছে ; আমি মনে-মনে যা ভাবছিলাম সেটাই তুমি ফুটিয়ে তুলেছো। ছবিটি আমি সুপ্রিয়কে পাঠিয়ে দিয়েছি : তুমি তার কাছ থেকে নিয়ে এবারে Key drawing ক'রে ফ্যালো। ছবি ছাপার সময় তুমি দেখাশোনা করবে, এতে সুপ্রিয়র অমত নেই।

পুটের জন্য লেটারিং করবে—ধরনটা একই হবে অবশ্য। তোমার ছবি ছাপা হচ্ছে জ্যাকেটে। বই কাপড়ে বাঁধাই হবে, ভিতরের পুটে প্রেস-টাইপে বইয়ের নাম সোনার জলে ছাপা থাকবে।

শুধু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে— 'ভেলা'র 'ভ' অক্ষরটা এবারে যেন

বডো বেশি নিটোল হয়েছে, আব-একটু কম finished চেহাবা হ'লে (কিছুটা আগে যেমন ছিলো) ভাবেব পক্ষে বেশি অনুকূল হবে না কি? অর্থাৎ 'ভ' টাতে ঈষৎ যদি ভাঙা ভাব থাকে— কোথাও-কোথাও নুনে খেয়ে গেছে যেন, তাহ'লে কি আবো ভালো হয না? অবশ্য সেই সঙ্গে নযনলোভন হওয়া চাই, কভাবেব যেটি ব্যবসাযিক দিক সেটিও ভাবতে হবে। আমাব এই প্রস্তাব তুমি বিবেচনা কবলে সুখী হবো।

মোটেব উপব লেটাবিং চমৎকাব হযেছে, সেটাকেই ছোটো ক'বে নিযে টাইটেল ছাপাতে বলেছি, বিজ্ঞাপনেও ব্যবহাব কবা যাবে। ঐ গোলাপি বংটা যাতে ছাপাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে দৃষ্টি বাখা দবকাব।

আমি প্রস্তাব কবেছি কভাবও নাভানায ছাপা হোক— তাহ'লে বিবামবাবুব পবামর্শ ও সাহায্য পাওযা যাবে। 'ভেলা'ব চেহাবা ও লেটাবিঙেব বং নিযে তাঁব সঙ্গে আলোচনা কবতে পাবো— তাঁব রুচিব উপব আমাব আস্থা আছে, তোমাব সঙ্গে তাঁব মতেব খুব গবমিল হবে না মনে হয। ছাপাব সময দুটো বঙেবই তিন-চাবটে shade তুলে দেখতে হবে— কোনটা সবচেযে ভালো দেখায। কভাব ছাপাব সময আমি এখানে থাকবো না, তাই তোমাকে সব বুঝিযে বলাব চেষ্টা কবছি।"

—বিশ্বভাবতী পত্রিকা, নবপর্যায ৩। মাঘ-চৈত্র ১৪০১

নাকতলায নিজেদের বাড়ি হল

বাডি কবায বুদ্ধদেবেব কোনো আগ্রহ ছিল না। এ বিষযে কোনো আলোচনাও শুনতে চাইতেন না, বেগে গিযে বলতেন, "আমি কি বুর্জোযা যে বাডি বানাব?" (পাবিবারিক সাক্ষ্য)

বলতে কী, বাবু উপাধিধারী বঙ্গীয ভদ্রলোক এই পরিণত মধ্যবযসে পৌঁছে জীবন ও ভাগ্যেব কাছে যা-যা কামনা কবেন তার কোনোটি নিযেই কোনো শিবঃপীড়া ছিল না বুদ্ধদেব বসুব— বিষযী বিচক্ষণ প্রৌঢ়দেব সঙ্গ চিরকাল এডিযে চলেছেন, এই গ্রন্থে নানাস্থানে তাব সাক্ষ্য আছে। বাড়ি— ব্যাঙ্কে টাকা— সন্তানদেব প্রতিষ্ঠা— মধ্যবিত্তেব সামাজিক মর্যাদার প্রতীকচিহ্নগুলি উপার্জন কবতে কখনো তো উৎসাহিত হনইনি, বরঞ্চ সে-বিষয়ে এক ধরণের অনীহাই পোষণ করেছেন সাবা জীবন। খবরও রাখতেন না ছেলেমেযেরা কে কোন ক্লাশে পড়ে, তাঁর কাছে এক মাস পড়তে পেয়েছিলেন ভাগ্যক্রমে, লিখেছেন জ্যেষ্ঠা কন্যা মীনাক্ষী। সেই ৪৭ নং পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে থেকে দিনের বেলা পত্রিকা আর বিশ্ববিদ্যালয়, সন্ধ্যায় আড্ডা আর রাত জেগে লেখাপড়া— এর বাইরেও যে জীবনের অন্য একটা স্থূলতর দিক আছে সেকথা যেন কখনো মনেই আসত না তাঁর। শান্তিনিকেতনে জমি কেনার পিছনে জমির লোভ ছিল না— পূর্বপল্লির

জঙ্গলে ভবা জলহীন জনহীন ডাঙাজমি কিছু লোভনীয় প্রস্তাবও তখন ছিল না — বুদ্ধদেবেব মূল আকর্ষণ ছিল, জমিটা কিনলে বিশ্বভাবতীব আজীবন সদস্যপদ প্রাপ্তি। বৈষ্ণবঘাটাব জমি প্রতিভা বসু কিনেছিলেন চিত্রপবিচালক দীনেন গুপ্তব সাহায্যে, ১৯৫৪ সালে ; আব সে জমি শুধু চোখেব দেখা দেখতে বুদ্ধদেবকে নিয়ে যেতে পেবেছিলেন সাত বছব পব, ১৯৬১ সালে। নাকতলাব জমিটি কিনে প্রতিভা বসুকে উপহাব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে-জমিতে বাড়ি কবাব কাজ প্রতিভা বসুকে একাই কবতে হয়েছিল, এমনকি বুদ্ধদেবকে না জানিয়ে। জমি, বাড়ি, সম্পত্তি—এসব গৃহস্থবৃত্তিতে কোনোকালেই বুদ্ধদেবেব— উৎসাহ ছিল না বললে কম বলা হয়, অনুমোদন পর্যন্ত ছিল না। অনেক কাজ প্রতিভা বসুকে কবতে হয়েছে বুদ্ধদেবকে আদৌ কিছু না বলে।

এ-সম্পর্কে প্রতিভা বসু লিখেছেন ·

"জমি জায়গা বিষয়ে বুদ্ধদেবেব যত বিবমিষা, আমাব ততই আগ্রহ। আমি ভাবতেই পাবি না মানুষেব নিজস্ব কোনো বাড়ি থাকবে না। আমবা পূর্ববাংলাব মানুষ, সেটাই আমাদেব মাতৃভূমি। এখন যখন সেই মাতৃভূমি নেই, এটাই মাতৃভূমি হয়েছে, তখন বাড়ি তো একটা চাই-ই চাই। আসলে আমাদেব দু'জনেব জীবন দুই স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। আমি একটি বৃহৎ পবিবাবেব মেয়ে, ঢাকা শহবেই চাবটে বাড়ি, গ্রামেব বাড়ি তো আছেই। কত লোক থাকে সেখানে, কত ফুর্তি, কত আনন্দ পুজোব সময় সবাই একসঙ্গে হলে। সেই হিসেবে বুদ্ধদেব নেহাতই একজন একা মানুষ। জন্মেব চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যে মাতৃবিয়োগ, পিতা দ্বিতীয়বাব দাবপবিগ্রহ কবে দূবেব মানুষ, দিদিমা দাদুব স্নেহ তাকে পিতামাতাব স্বাদ দিলেও, অতি অল্প বয়সেই সেই পিতৃতুল্য অথবা তাব চেয়েও অনেক বেশি দাদামশায়কে হাবিয়ে দিদিমাব সঙ্গে এবাড়ি ওবাড়ি কবে মতামতটা স্থিতিশীলতাব বিপক্ষে গড়ে উঠেছে। সেই কাবণেই আমি যেমন একটা শিকড়েব সন্ধানে তৎপব, উনি শিকড়েই বিশ্বাসী নন।

বৈষ্ণবঘাটাব জমিটাব খোঁজ আমাকে দীনেন দিয়েছিল। ফিল্ম ডিবেক্টাব দীনেন গুপ্ত। সেটা সম্ভবত ১৯৫৪ সালে। সাড়ে তিন হাজাব টাকায় তেবো কাঠা জমি এবং পাঁচ কাঠা একটা ডোবা কিনেছিলাম। জমিতে অনেক ফলেব গাছ ছিল। পুকুবে মাছ ছিল। আমাব উপার্জন তখন ঊর্ধ্বগামী। তথাপি সংসাবেব চাহিদা মিটিয়ে হাতে বিশেষ কিছুই থাকত না। দুজনেবই বিলাসী স্বভাব, পয়সা জমাতে শিখিনি। ওটা আমাব বা বুদ্ধদেবেব দুজনেবই ধাত নয়। শখ, সাধ, স্বাচ্ছন্দ্য আব আতিথেয়তাব পায়েই সব জলাঞ্জলি দিতে ভালো লাগে। থাকা-খাওয়াব ধবনে অবস্থাব অতিবিক্ত থাকা স্বভাব।...

... তাবপবেই হঠাৎ একদিন হয়তো একটা বই বিক্রি হয়ে গেল সিনেমাব জন্য। এই কবতে কবতে এক বছরেব চেষ্টায় সুন্দব একটা ছোট্ট বাড়ি উঠে গেল বৈষ্ণবঘাটায়। বাড়িটা উঠল ষাট সালে। একদিন বুদ্ধদেবকে দেখাতে নিয়ে গেলাম

দেখে থু থু করতে করতে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'কী একটা জঘন্য জায়গায় তুমি বাড়ি করেছ বল তো? এখানে মানুষ থাকে?' এই সব শুনতে শুনতে হেঁটে বড়ো রাস্তার দিকে আসছিলাম, সত্যের অপলাপ না করলে বলা যায় মনটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা লোক আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবু কি জমি খুঁজছেন? খুব ভালো একটা জমি আমার হাতে আছে, বলেন তো দেখাতে পারি।' আমি বারণ করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই বুদ্ধদেব বললেন, 'কোথায় সেই জায়গা? এখন দেখাতে পারো?'

লোকটি বলল, 'হ্যা হ্যাঁ, কেন পারব না? চলুন এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি।' বুদ্ধদেবের বদান্যতায় আমি অবাক। একটি রিকশা চড়িয়ে লোকটা তখন এই নাকতলাতেই নিয়ে এসেছিল আমাদের। উল্টোদিকে গঙ্গা (জল ছিল তখন), একটি বটগাছ, তার পাশে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাবার জন্যে কাঠের একটা সাঁকো। হঠাৎ বুদ্ধদেবের ভীষণ ভালো লেগে গেল জায়গাটা। এই ভূখণ্ডটি কিনে বুদ্ধদেব আমাকে উপহার দিলেন।

আমি ঐ জমিতেও একদিন বাড়ি করতে শুরু করলাম। সেটা বাষট্টি সালে শুরু করে শেষ হল তেষট্টিতে। স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দেখলাম আলিপুরে একটা সাহেববাড়ি ভাঙা হচ্ছে, দরজা জানলাগুলো বিক্রি হবে। আমার সকল কর্মের সারথি আমার ভ্রাতাটিকে বললাম, 'লারু, চল দেখে আসি।' লারু বলল, 'এগুলো কী দেখবে, যত সব পুরোনো ঝরঝরে জিনিস।'

আমি বললাম, চল না, দেখতে দোষ কী? বেড়ানো তো হবে?'

'তবে চল।'

আমি আর লারুই গেলাম। খুবই নিঃশব্দে। বোধহয় অন্য কোনো কাজের দোহাই দিয়ে। সদ্য সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরে এসে পরিবার পরিজনের জন্য বিচ্ছেদ বেদনার অনুভূতি নতুন নতুন একটু বেশি থাকার দরুন স্ত্রীকে দৈবাৎ একটি জমি কিনে দিয়েছেন বলেই যে সে আবার সেখানে বাড়ি বানাতে বসবে ততটা সহ্য করবেন না। করবেন না বলেই এই সব লুকোচুরি। একসঙ্গে দুটো বই ছবির জন্য বিক্রি হওয়ায় আমার হাতের মুঠো বেশ ভরা ছিল। ভরা মুঠোতেই গিয়েছিলাম। দরজা জানলার কাঠ দেখে সাইজ দেখে আমি মুগ্ধ।

তারপর সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ আশার অতিরিক্ত সস্তায় কিনে ফেললাম সব। সত্যিই একেবারে জলের দামে। শুধু দরজা জানলাই নয়, ইটগুলো, যেগুলো ওরা রাবিশ বলে ধরে রেখেছে, বিনা দ্বিধায় অতি সামান্য দামে সেগুলোও কিনে ফেললাম। লারু ইট কেনা বিষয়ে খুবই দ্বিধান্বিত ছিল। আমি একটা ইট তুলে ওকে দেখিয়ে বললাম, 'দ্যাখ এই ইটগুলো মার্টিন বার্নের ইট, এই ইট আমরা এখন কোথায় পাব?' আরো কিনলাম দোতলায় উঠবার একটি কাঠের সিঁড়ি। সবই বার্মাটিকের। সিঁড়িটি রাজসিক, কী অপূর্ব তার রেলিং আর কী প্রশস্ত তার প্রতিটি ধাপ। কেবল মাত্র ইটগুলো রেখে আর সব একটা লরিতে করে বৈষ্ণবঘাটা বাড়ির মাঠে এনে ফেলে রাখলাম। সারা বাড়ির মাল মাত্র চোদ্দ হাজারে কেনা হয়ে গেল।

তারপর আর কী? বসে থাকো চুপচাপ। টাকা কোথায়? আবার পাব তবে তো? একটা সুবিধা ছিল, বুদ্ধদেব তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন, সংসার মোটামুটি সেই টাকাতেই চলে যাচ্ছিল। আমার উপার্জনটা আমি বাড়ি বানাতে খবচ করলে সেখানে বিশেষ কোনো টান পড়ত না। সুতরাং ভ্রাতাব সাহায্যে, যথেষ্ট সময় লাগলেও এই নাকতলার বাড়িটাও হয়ে গেল একদিন।"

—*জীবনের জলছবি*/৩য় মু, পৃ. ২৭১

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

কনিষ্ঠা কন্যাকে লেখা চিঠি থেকে :

২ মার্চ ১৯৬৩, রাত্রি

... আমি কী লিখছি জিজ্ঞাসা করেছিস। 'দেশে' একটা আধা-রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখছি 'স্বাধীনতাব মূল্য' নাম দিয়ে, 'উল্টোরথে'র জন্যে একটা গল্প লিখলাম বাচ্চাদেব 'ইংলিশ-মিডিযাম' স্কুলে পডাবার বিরুদ্ধে— একটা গল্প ইংরিজিতে অনুবাদ কবতে হবে Illustrated Weekly-র জন্য, শবৎচন্দ্র বক্তৃতা লিখতে হবে। গ্রীষ্মেব ছুটিব আগে 'শবৎচন্দ্র' পর্যন্ত শেষ করতে চাই। ছুটির মধ্যে ন্যুইযর্ক কনফাবেন্সেব জন্য প্রবন্ধ লিখতে হবে, Univ. of Maryland-এব 'Comparative Literature Studies' পত্রিকায একটা লেখা দেবো কথা দিযেছি। সেদিন হঠাৎ মনে হ'লো— একটা উপন্যাস লিখলে পারি, কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ধীবে-ধীরে কিছু লেখার সময় এ-বছর আব পাবো না। 'দেশান্তর' এখনো অসমাপ্ত আছে— অথচ আর গোটা চারেক প্রবন্ধ লিখলেই হ'যে যায়— বইটা এ-বছর বেরোবার আশা নেই, তবে বিদেশ যাত্রার আগে 'গল্পসংকলনে'র একটা নতুন সংস্করণ বের করা সম্ভব হবে ব'লে মনে হচ্ছে।— 'কবিতা' আর বেরোলো না, আমার নিজেরই উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে।"

জানুয়ারিতে বেরোল 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ'। জুলাইতে 'দময়ন্তী : দ্রৌপদীর শাড়ি' যুগ্ম সংস্করণ। যে বইটির প্রচ্ছদ নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীকে চিঠিগুলি লেখা, সেই 'ভাসো আমার ভেলা' বেরোলো সেপ্টেম্বরে— তাঁর ১৯২৮ থেকে আজ পর্যন্ত বচিত ছোটো গল্প থেকে একটি নির্বাচিত সংস্করণ। আশ্বিনে 'ছোটোদের ভালো ভালো গল্প' নামক শ্রীপ্রকাশ ভবনের সিরিজে তাঁর একটি গল্পসংকলন যুক্ত হল।

১৯৬৪ ।। বয়স ছাপ্পান্ন

আমেরিকায় অধ্যাপনা

আমেরিকার যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমেস্টাব পদ্ধতি চলিত সেখানে একটি শিক্ষাবর্ষকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগগুলোকে বলা হয় এক একটি সেমেস্টার। ফল (হেমন্ত) সেমেস্টার অগস্টেব মাঝামাঝি আরম্ভ হযে ডিসেম্বর শেষ হয়। স্প্রিং (বসন্ত) সেমেস্টার জানুয়ারির মাঝামাঝি আবম্ভ হয়ে শেষ হয় মে-তে। এ ছাড়া আছে সামার টার্ম— মে থেকে অগস্ট পর্যন্ত।

সাময়িক অধ্যাপককে সাধাবণত এক সেমেস্টাব বা এক বছবের জন্য পড়াতে ডাকা হয়। এক বছর মানে হেমন্ত ও বসন্ত, এই দুটি সেমেস্টার— সামার এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। সামারেব জন্য পৃথক নিয়োগ এবং পৃথক বেতন দেযা হযে থাকে।

১৯৬৩-ব হেমন্ত সেমেস্টারে বুদ্ধদেব বসু পড়ালেন ইণ্ডিয়ানা বাজ্যের ব্লুমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে বসন্ত সেমেস্টারে (জানুয়ারি-মে) ব্রুকলীন কলেজে ; সামারে (মে-সেপ্টেম্বর) কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপবে পুরো একটি শিক্ষাবর্ষের জন্য গেলেন ইলিনয় রাজ্যের ওয়েসলিয়ান কলেজে। পরের বছর (১৯৬৫) সামারের জন্য গেলেন হনলুলু— হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈস্ট ওয়েস্ট সেণ্টারে। সেখান থেকে জাপান হয়ে দেশে ফিরবেন ১৯৬৫-র অগস্টে।

বুদ্ধদেবের পড়াবার বিষয় ছিল, 'পূর্ব ও পশ্চিমি সংস্কৃতির সম্পর্কের বিচার'। এই উপলক্ষে গ্রিক ও ভারতীয় মহাকাব্যের তুলনা করে, তাদের মধ্যেকার চরিত্রগত সাদৃশ্য, বিরোধ ও বিরোধাভাসগুলির আলোচনা করতে গিয়েই 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে।

আমেরিকা বুদ্ধদেবের ভালো লেগেছিল :

"...মোটের উপর মার্কিনি জীবনে আমি যা অনুভব করেছি, তা এমন একটি সহজ মানসিক ভঙ্গি, যা পথিকের মুহূর্তগুলিকে স্বাদু করে তোলে। যাঁরা গুণী বা বিদ্বান তাঁদের প্রীতি ও উদারতা অন্যান্য দেশেও ভোগ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে ;... কিন্তু যারা জনসাধারণ, নামহীন এবং ক্ষণকালীন, এবং যাদের সঙ্গে সংযোগ ভিন্ন বেঁচে থাকা যায় না, তাদের বিষয়ে উল্লেখ না করলে আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লণ্ডনের ট্যাক্সিওলাদের বিষয়ে আমার মনে একটি স্বাস্থ্যকর ভীতি গ্রথিত হয়ে আছে, কিন্তু আমেরিকায় ঐ সম্প্রদায় আমাকে শুধু স্থান থেকে

স্থানান্তরে পৌঁছিয়ে দেয়নি, অনেকে প্রবৃত্ত হয়েছে আলাপে, তারিফ করেছে তেনজিং বা (ফিল্মে দেখা) তাজমহলের, আমি কৌতূহলবশত কোনো প্রশ্ন করলে তার যথোচিত উত্তর দিয়েছে, দু-একটা রসিকতা করাও তার অধিকারের বহির্ভূত ব'লে ভাবেনি, কখনো বা গন্তব্যে পৌঁছে একথাও বলেছে, আপনাকে চালিয়ে এনে খুব ভালো লাগলো আমার। গুড বাই। গুড লাক।' কোনো নতুন দেশে বা শহরে পৌঁছনোমাত্র একটি মানুষের স্পর্শ যদি পাওয়া যায়, তাতে যে প্রবাসীর মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে তা বোধহয় বুঝিয়ে বলার দরকার করে না।... প্রায় সর্বদাই দেখেছি, দোকানের কর্মী ও কর্মিনীরা চোখে চোখে তাকায়, হেসে কথা বলে, একটু অবকাশ পেলে কিঞ্চিৎ ঘরোয়া গল্প করে নেয়, এমনকি কখনো-কখনো 'হানি' বা 'ডার্লিং' ব'লে সম্বোধন করতেও বাধে না তাদের। যাদের কাছে ঘনঘন যেতে হয় তারা বলে— 'আজ আপনি কেমন আছেন? কদিন থাকবেন এদেশে? জানেন আমার স্বপ্ন কী? একবার ভাবতে যাওয়া'। এ সবের কোনো অর্থ নেই তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু কোনো মূল্য নেই তা কেমন করে বলি? শুধু ব্যবসায়িক সম্বন্ধের জন্য নয়, আমাকে যে একজন ব্যক্তি ব'লেও স্বীকার ক'রে নেয়া হচ্ছে, এই চেতনাটুকু দিনযাপনকে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ করে তোলে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

—*দেশান্তর* ১ম সং, পৃ. ১৭২

আসলে নিজের লেখাপড়ার বাইরে বুদ্ধদেব ভালোবাসতেন মানুষের সঙ্গ — নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গ, বন্ধুদের সঙ্গ, ছাত্রদের সঙ্গ— কিছুই যদি না পাওয়া যায়, তাহ'লে অন্তত অচেনা লোকের সঙ্গ— দোকানি, ট্যাক্সিওলা, এমনকি

"সেবারে পিটসবার্গে ক্রিসমাসের ছুটিতে কলেজের ডাইনিংরুম বন্ধ ছিলো, ক্যাম্পাস জনহীন, আমাকে খেতে হ'তো পরিচারিকাদের সঙ্গে বেসমেন্ট ব'সে; সেই স্থূলকায়, অসংস্কৃত, মধ্যবয়সী মহিলারা যে-রকম যত্ন ক'রে খাওয়াতেন আমাকে, গল্পগুজবে নিঃসঙ্গ বিদেশীকে সান্ত্বনা দিতেন, তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না-ক'রে পারি না।"

—দেশান্তর, ১ম সং, পৃ ১৭৩

যেখানে এই মনুষ্যসঙ্গ পাওয়া যেত না, সেখানে গিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকতেন বুদ্ধদেব। নরেশ গুহকে লেখা একটি অপ্রকাশিত চিঠিতে দেখছি :

(ব্লুমিংটন, ইলিনয়, ২ ডিসেম্বর ১৯৬৪) : "... তোমাদের এভান্সটনের চেয়েও গাঢ়তর মফস্বল এই শহর— ঠিক এ-রকম অবস্থায় ও পরিবেশের মধ্যে কোনো দেশেই আগে কখনো থাকিনি। হ্রদ, সমুদ্র, পাহাড় কিছুই নেই— এবং আমরা যে-পাড়ায় আছি সেখানে রাস্তায় কাউকে হাঁটতে দেখলে তাকিয়ে থাকি, বরফের উপর কুকুর বেড়াল চলতে দেখলেও আনন্দ হয়। সারা সপ্তাহ অপেক্ষা ক'রে থাকি সোমবারের জন্য, সেদিন বিকেলে রবিবাসরীয় ন্যু ইয়র্ক টাইমস পাওয়া যায়, জগতের প্রতিবিম্ব ক্ষণিকের জন্য ভেসে ওঠে। রানুর স্বজনরহিত বিমর্ষতার কথা ভেবে একটা পুরোনো টি. ভি. কিনেছি— রানুকে সেটা আশানুরূপ বিনোদ জোগাচ্ছে না, কিন্তু আমি সাড়ে পাঁচটার খবরের জন্য উৎসুক হ'য়ে থাকি— বার্তা

শুধু নয়, নানাদেশেব ছবিও যে ওতে পাওয়া যায় সেটাই আমাব কাছে প্রধান আকর্ষণ। পঁচিশ সেন্ট দিয়ে একটা মস্ত গ্লোব কেনা হয়েছে... সেটাকে ঘুবিযে-ঘুবিযে দেখি মাঝে-মাঝে, কয়েকমাস আগেকার ব্রুকলিন ও কলোবাডোর কথা ভেবে মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হ্যে যাই। স্মৃতি— এবং স্মৃতির সন্তান স্বপ্ন, এবাই অবশেষে আমাদেব সঙ্গ দেয।"

নরেশ গুহকে লেখা পত্রধারা

কবি নরেশ গুহ বুদ্ধদেবেব অন্যতম প্রিয শিষ্য। রিপন কলেজে তিনি বুদ্ধদেবের ছাত্র ছিলেন, সেই থেকে তাঁব সঙ্গে পবিচয়। তারপব থেকে বুদ্ধদেবের মৃত্যু পর্যন্ত সর্ব কর্মে তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। প্রথমবার বিদেশে যাওয়ার সময় তিনি নরেশ গুহর উপরই 'কবিতা' পত্রিকার ভার অর্পণ করে যান, 'কবিতা'র সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তিতে সেকথা পাঠকদের জানিয়েও দিয়েছিলেন। ১৩৬১-ব পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৬৫-র পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত তিনি 'কবিতা'র সহকারী সম্পাদকও ছিলেন— সমর সেনের পব এই দায়িত্ব বুদ্ধদেব আর কাউকে কখনো দেননি। যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়েও বুদ্ধদেব তাঁকে সহকর্মী করে নিযে এসেছিলেন, এবং বুদ্ধদেব পদত্যাগ কববাব পব তিনিই হন বিভাগীয প্রধান।

অজস্র চিঠি তাঁকে লিখেছেন বৃদ্ধদেব— এবং পারিবাবিক বৃত্তেব বাইবে, নরেশ গুহই বোধহয একমাত্র যাঁকে লেখা চিঠিতে বুদ্ধদেব তাঁর হৃদয উন্মোচন করতেন। এই পত্রাবলি কোনোদিন প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব বসুব ব্যক্তিত্বের একটি অজ্ঞাতপূর্ব দিক আমাদেব জ্ঞানগোচর হবে।

নবেশ গুহ আমাকে এই চিঠিগুলির একটা বড়ো অংশ ব্যবহার কববার সস্নেহ অনুমতি দিয়েছেন। এইগুলি ব্যবহার করতে না পারলে বুদ্ধদেব-জীবনীতে গুরুতর অসম্পূর্ণতা থেকে যেত।

যাদবপুরের তু. সা. বিভাগ নিয়ে চিন্তা

নিজের প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ ছেড়ে আসতে হয়েছে— কিন্তু বিভাগের শুভাশুভ নিয়ে এখনো তিনি উদ্বিগ্ন। নরেশ গুহকে লেখা আরেকটি অপ্রকাশিত চিঠি থেকে :

Hotel Bossert
ব্রুকলিন, ন্যুইয়র্ক
২৭ মে, ১৯৬৪

নরেশ,

আজ ঘুম থেকে উঠেই টেলিফোনে নেহরুর মৃত্যু সংবাদ পেলাম; দুঘণ্টা পরে মিমির চিঠিতে জানা গেল যে যাদবপুর তু. সা বিভাগ তুলে দিচ্ছে। দুপুরবেলা

মল্লিক[১] এলেন ; তুমি তাঁকে সে-চিঠি লিখেছ সেটাও দেখাব সুযোগ হ'লো। তাবপব থেকে অত্যন্ত বিচলিত হ'যে আছি।

আমাকে সবে আসতে হ'লো, কিন্তু বিভাগ থাকবে না এটা আমাব পক্ষে এখনো মর্মান্তিক— এই এক বছবে আমি যেটুকু অনাসক্তি অর্জন কবেছিলুম তা আব নিজেব মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না।.. কিন্তু এটা মাত্র প্রথম ধাপ ; এব পবে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল আছে, তাবও পবে 'ইউনিভার্সিটি'। মল্লিকেব ফিবতে একমাস মাত্র বাকি— এই অল্প সময়ে সবগুলো ধাপ এবা পেবোতে পাববে ব'লে মনে হয় না। তুমি সংগ্রামেব জন্য প্রস্তুত হও। আপাতত অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে এটাকে নাকচ ক'বে দেবাব চেষ্টা কবতে হবে।..

নবেশ, তুমি অভিমানবশত নীববে থেকো না, A C -ব মীটিঙে সোচ্চাব হ'তে হবে তোমাকে। আমি কার্যত সব কিছু পাবি না, কিন্তু কী ভাবে কী হয, আব মীটিং মানেই বা কী, তাব থিওবিটা এই ক-বছবে যাদবপুবে শিখে নিয়েছি। মীটিং ভণ্ডুল ক'বে দেবাব— এবং অন্ততপক্ষে সিদ্ধান্ত পেছিযে দেবাব— একটা টেকনীক হ'লো অনববত আপত্তি তোলা, এবং খুব চেঁচিযে বাগি ধবনে কথা বলা — লোকেদেব এতদূব পর্যন্ত উত্যক্ত কবা যাতে তাবা— অন্ততপক্ষে বাড়ি ফিবে গিযে মাছেব ঝোল ভাত খাবাব আবামটুকুব জন্য— অগত্যা বলে— 'আচ্ছা, ব্যাপাবটা আবাব ফ্যাকাল্টিতে ফিবে যাক। এটুকু যদি হয তাহ'লে তুমি আপাতত জিতলে..।

... যদি সব চেষ্টা সত্ত্বেও মূর্খতা জযী হয, যদি... সত্যিই এই বিলুপ্তিব প্রস্তাব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে পাশ কবিযে নিতে পাবে তাহ'লে, আমাব মনে হয, খববটা সর্বসাধাবণে পৌঁছিযে দেযা আমাদেব কর্তব্য। আমবা যে ট্যাক্সো দিই সেই টাকাতেই বিশ্ববিদ্যালয চলছে,... সেখানে খেযাল খুশিমতো ঘটনা ঘটলে সে-বিষযে কথা বলবাব অধিকার সকলেবই আছে। আমাব পদত্যাগেব সময স্টেটসম্যান লেখাব জন্য উঁচিযে ছিলো, আমিই বিশেষভাবে বলেছিলুম যেন কোথাও কিছু না বেবোয[২]। কিন্তু এখনকাব ব্যাপাবটাতেও কোনো একজন ব্যক্তিব প্রশ্ন নেই, অনেকগুলো শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী, একটা পুবো বিভাগ, এবং একটা

১. প্রবীবচন্দ্র বসুমল্লিক : বাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকেব বংশধব, যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রথম বেজিস্ট্রাব। ছাত্রদেব সঙ্গে সস্নেহ সম্পর্কেব জন্য ছাত্রদেব শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ছিলেন বুদ্ধদেবেরও বিশিষ্ট বন্ধু। তাব পদত্যাগেব পবও তাঁকে ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা কবেছিলেন। সে-চেষ্টা সফল হয়নি তাঁব— উপরন্তু এই ঘটনাব অব্যবহিত পরে বিশ্ববিদ্যালযে অন্তর্দ্বন্দ্বেব ফলে তাঁকেও পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

২. দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেব ইচ্ছে করলেই স্বপক্ষে জনমত সংগঠিত করবার কাজে সংবাদপত্রেব সহায়তা পেতে পারতেন; স্টেটসম্যান তৈবি ছিল, অন্য দুয়েকটি বহুলপ্রচাবিত পত্রিকার সাহায্যও তিনি পেতে পারতেন না তা নয়। কিন্তু তাঁব স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ তাঁকে এই পদক্ষেপ নিতে বাধা দিয়েছিল, নিজেব ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানকল্পে জনমতগঠনের চেষ্টা করতে রুচিতে বেধেছিল তাঁব।

আদর্শ এর সঙ্গে জড়িত।... আমার মনে হয় আনন্দবাজার ও স্টেটসম্যান 'তু. সা আন্দোলনে'র বিরোধী হবে না— ছাত্রছাত্রীদের সমবেত স্বাক্ষরে সেখানে চিঠি ছাপানো যায়, 'বিশেষ প্রবন্ধ' লেখা হ'তে পারে। কলকাতার অ্যাসেম্রিতে প্রশ্ন তোলানোও অসম্ভব নয়। — এগুলো অবশ্য সর্বশেষ উপায়, কিন্তু প্রয়োজন হ'লে সম্পূর্ণ বৈধ ও ব্যবহার্য।..."

আরেকটি পত্রাংশ (অপ্রকাশিত : নরেশ গুহকে লেখা) :

ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানা
২৯ জুন ১৯৬৪

"... বিভাগের চাইতে আমাকে বড়ো ক'রে দেখা হোক, এ আমি কখনোই চাইনি ; আমাকে যারা ভালোবাসে বিভাগের জন্যেও তাদের দরদ বেশি হবে, এই আমি ভেবেছিলাম। আমার পক্ষে মানসিকভাবে যাদবপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবার বাধা ছিলো না এখন, কিন্তু আমাদের দেশে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা আমি এখনো চাই...।'

শেষ পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের সংকট কাটিয়ে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ টিঁকে গিয়েছিল— এবং বুদ্ধদেবও পুনরায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন যাদবপুরে। নরেশ গুহকে লেখা আরেকটি অপ্রকাশিত চিঠি :

১৫০২ নর্থ ফ্র্যাঙ্কলিন
ব্লুমিংটন, ইলিনয়
৬ নভেম্বর '৬৪

"...কিছুদিন আগে রেজিস্ট্রারের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। যাদবপুর আমাকে আবার আহ্বান করলে আমি রাজি হবো কিনা, তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে আমি জানিয়ে দিয়েছি ফিরে যেতে আমার 'মৌলিক' কোনো আপত্তি নেই। জবাব দেবার আগে অনেক ভাবতে হয়েছে আমাকে। যাদবপুর বিষয়ে আমি এতদিন কোনো উচ্চবাচ্য করিনি তার জন্য তুমি কি অভিমান করো? কিন্তু তুমি তো বোঝো, যাদবপুর আমার পক্ষে এক গভীর ক্ষতস্থান ব'লেই আমি নীরব থাকি এবং থাকতে চাই— যদিও বিভাগের বিলুপ্তির আশঙ্কায় আমার উত্তেজনা এখনো বেসামাল। তোমার ও মল্লিকমশায়ের যৌথ চেষ্টায় বিভাগ যে টিঁকে গেলো— বা টিঁকে যাবে মনে হচ্ছে— এর জন্যে ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ আছি।... আমি লিখেছি, আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে তাঁদের স্পষ্ট ও সঠিক প্রস্তাব আমার জানা প্রয়োজন, কেননা সেই অনুসারে আমাকে ভবিষ্যতের কর্মধারা স্থির করতে হবে। তবে যাদবপুরীয় মহাত্মরা [মহাত্মারা] যা-ই স্থির করুন, তুমি কিন্তু কখনো হাল ছেড়ে দিয়ো না।..."

নরেশ গুহকে লেখা আরো একটি অপ্রকাশিত চিঠি :

১৫০২ নর্থ ফ্র্যাঙ্কলিন
ব্লুমিংটন, ইলিনয়
৮ ফেব্রুয়ারি '৬৫

"... মল্লিক মশাইয়ের কোনো চিঠি আমি এখনো পাইনি। তুমি না-হয় এ নিয়ে তাঁকে আর জিজ্ঞাসাবাদ না-ই করলে— কেননা তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা না-ও হ'তে পারে— একজন বন্ধুকে বিব্রত ক'রে লাভ কী? যদি তু. সা বিভাগ ভেঙেই যায়, না-হয় তা-ই হ'লো।.. সত্যের পরাভব যুগে-যুগেই ঘটেছে, তার দ্বারা আহত হবার বয়স আমরা পেরিয়েছি। আমার বিষয়ে অন্য অনেকে যা বহুদিন ধ'রেই জানে আমি তা মাত্র সম্প্রতি উপলব্ধি করলাম— আমার স্বভাবে উৎসাহ বেশি সতর্কতা কম, আমি আবেগের ঝোঁকে চলি, যুক্তির বড়ো ধার ধারি না— এর ফলে দুঃখ পেয়েছি ব'লে দুঃখ করি না (কেননা আনন্দও কম পাইনি) — মনস্তাপ এইজন্যে যে আবেগের বশে অনেক নির্বোধ ও পাষাণ্ডকে বিশ্বাস করেছিলাম। আর যে-ক-বছর বেঁচে আছি— যদি সরীসৃপদের সংস্রব এড়িয়ে চলতে পারি, তাহলেই আমি ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।..."

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে 'প্রফেসর' পদে নিয়োগের জন্য পরামর্শ দিতে ইউ-জি-সির নির্বাচন কমিটির বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন। তিনি প্রাক্তন অধ্যাপককেই ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তখনই রেজিস্ট্রার প্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক (যিনি বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন) তাঁকে পুনরাগমনের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞের পরামর্শও মানলেন না -- তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান হিশেবে বুদ্ধদেব বসুর পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব উঠেও পুনর্বার বিলীন হয়ে গেল।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বিষয়ে মন্তব্য

নিজের বৃত্তি নিয়ে সমস্যা, নিজের প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ নিয়ে, অন্যান্য নানা বিষয় নিয়েও এত মন-খারাপ-করা সমস্যা— এর মধ্যেও, বিদেশে বসেও, খোঁজ, রাখছেন তরুণ প্রজন্মের কবিতার। 'কবিতা' পত্রিকা উঠে গেছে, কিন্তু নতুন কবিতার প্রতি তাঁর দুর্মর আগ্রহে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। আমেরিকা থেকে রুমিকে লিখছেন (১৯/১১/৬৪) :

"...পূজা-সংখ্যা দেশ এসেছে, তার মারফৎ জানা গেলো কেতকী এক ইংরেজকে বিয়ে করেছে, তার পদবি এখন তাইসন। কবিতা যেটা লিখেছে সেটাও নিজের বিয়ের বিষয়ে, বোঝা গেলো প্রেমাহত যুবকটি লণ্ডন থেকে লং ডিসটেন্স করেছিল। কেতকীর লেখার হাত খুলছে, কিন্তু ইংরেজ স্বামী, এবং সম্ভবত ইংরেজিভাষী সন্তান নিয়ে ইংলণ্ডে বসবাস ক'রে সে কি বাংলা ভাষায় কবি হ'তে পারবে? রাজলক্ষ্মীর কবিতাও আমার ভালো লাগলো এই সংখ্যায়— অবশেষে কি বাংলা ভাষায় মহিলা-কবি দেখা দেবেন দু-একজন— আশা হয়, কিন্তু এই

পথে শতেক বাধা। তাবাপদর বিযের পর তার প্রথম যে কবিতা পডলাম সেটা বডো নৈরাশ্যজনক— আশা করছি এটা হানিমুন-প্রসূত অযত্ন, ঘোব কেটে গেলে আবার আত্মস্থ হবে। সুনীল মাঝে-মাঝে ভালো লাইন লেখে, কিন্তু পুবো কবিতাটা প্রাযই যেন দাঁড়াতে চায় না— বীট প্রভাব এবং বিজ্ঞাপন ওব পক্ষে ভালো হ'লো কিনা কে জানে...”

কবিতাভবনে বই চুরি

বুদ্ধদেব বসু যখন সপরিবারে আমেরিকায়, সেই সময় একদিন কলকাতার কবিতাভবনে রহস্যময় ভাবে বই চুরি হল। সে-সময় ফ্ল্যাটে থাকতেন তাঁদের পারিবারিক বন্ধু কল্যাণী মুখোপাধ্যায়— তাঁরও অনুপস্থিতিতে বুদ্ধদেবদের বহুকালের পুরোনো পরিচারক গণেশ বহু মূল্যবান বইপত্র চুবি করে। সেসব বইয়ের মূল্য প্রায়-নিরক্ষর গণেশের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এই চুরির খবরে বই-অন্ত-প্রাণ বুদ্ধদেব একেবারে ভেঙে পড়েন। ব্লুমিংটন, ইলিনয় থেকে রুমিকে লিখছেন (৩১/১২/৬৪)।

“... মিমিব আব কল্যাণীব চিঠিতে জানা গেলো যে গণেশ প্রধানত বই সবিয়েছে — আব সেটা বেশ বড়ো মাপেব চুরি। জ্যোতিরা থানা-পুলিশ কবেছে, গণেশ ধরাও পড়েছিলো, কিছু বই নাকি উদ্ধাবও হয়েছে— কিন্তু সঠিক বিববণ কিছুই এখনো জানি না। ‘ববীন্দ্র-বচনাবলী’, ছবির বইগুলো, কবিতাব বইগুলো, মহাভাবত, দামি-দামি সব অভিধান— সবই গেছে হযতো। আব যদি স্টীলেব আলমারি ভেঙে থাকে তাহলে তো কবিতার সেটও গেছে। কত কাগজপত্র, চিঠি, পাণ্ডুলিপি— আমার সাবা জীবনের একমাত্র সঞ্চয়। ঘটনাটা ঘটেছিলো পুজোব ছুটিতে— তখন কল্যাণীবা ছিলো না— একেবাবে দুই হাতে লুঠ করে নেবার বাধা কী ছিলো? কথাটা যতবাব ভাবছি আমার বুকের মধ্যে হিম হয়ে যাচ্ছে, নিশ্বাস নিতে পারি না যেন। আমি আর্তভাবে চিঠি লিখেছি আলাদা-আলাদা জ্যোতি, নরেশ, মিমিকে— কতগুলো বিশেষ-বিশেষ বই আছে কি নেই তা জানাবাব জন্য — কতদিনে জবাব আসবে কে জানে। অনুনয় ক'রে বলেছি, আমাব কষ্ট বাঁচাবার জন্য সত্যের কোনো অংশ গোপন না-করতে— এই অনিশ্চয়তার অশান্তি অনেক বেশি, আমার এখন মনের অবস্থা এমন যে, একটা ছায়াব মতো অস্তিত্ব কোনোরকম টেনে-টেনে চলেছি। এমনকি সামনের বছর যে কলকাতায় ফিরব তা ভেবেও এ-মুহূর্তে কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না।”

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

‘দেশান্তরে’র স্মৃতিকথা লিখছেন— লিখছেন কবিতা, অনেকদিন পর। ‘মরচে-পড়া পেরেকের গান’ গ্রন্থে অন্তর্ভূত হবে এসব কবিতা।

এ বছর কোনো বই বেরোল না।

১৯৬৫ ।। বয়স সাতান্ন

দেশে ফিরে এলেন

আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসে তারপর কী করবেন তা নিয়ে নানারকম ভাবছেন— কিছু ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে চিঠিতে ।

ব্লুমিংটন, ইলিনয়। ১১ জানুয়ারি '৬৫

"... আজ মল্লিকমশাইয়ের চিঠি পেলাম— যেমন সুন্দর চিঠি তেমনি বেদনায় ভরা, এখন যাদবপুরে বটনা যে মল্লিক চেয়েছিলেন ব'লেই আমাকে ছুটি দেয়া হয়নি — আমাকে ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছাতেও তিনি নিঃসঙ্গ— আর পুনশ্চ চাকরি করবার ইচ্ছা আমার শূন্য থেকে শূন্যতরতে ঠেকছে। যে-যাদবপুরকে এত ভালোবেসেছিলাম তার কথা ভাবতে এখন বিবমিষা হয় আমার— আর মিমি জ্যোতি নরেশ চিনুকে বাদ দিয়ে— কলকাতাতেই বা কোন সুখ অপেক্ষা করছে জানি না। রুমি, এবার কলকাতায় ফিরে একটা থিয়েটার খোলার (এবং নাটক লেখার) কথা মাঝে-মাঝেই ভাবি, কিন্তু তারপরেই মনে পড়ে আগামী নভেম্বরে আমার বয়স হবে সাতান্ন, নতুন কিছু আরম্ভ করার সময় নয় এটা, জাল গুটোবার সময়— কিন্তু আমার জালে যদি বা কিছু ধরা পড়ে বাজারে তার খদ্দের জোটে না, অতএব সেটাও পণ্ডশ্রম।..."

[রুমিকে লেখা]

কয়েকদিন পরে লেখা আরেকটি চিঠিতেও যাদবপুরের তু. সা. বিভাগের উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, তাঁর চরিত্রের অন্য একটি মানবিক দিক প্রকাশ পেয়েছে এখানে। রুমিকে লিখছেন :

ব্লুমিংটন, ইলিনয়,
২৫ ফেব্রুয়ারি '৬৫

"... সুহৃতার চিঠি প'ড়ে আমার মন কেমন দ্রব হ'লো— ও যে জীবনের একটি পরম লগ্নে আমাকে স্মরণ করেছে, এতে আমি কত সুখী হয়েছি বলতে পারবো না। কল্যাণীর কাছ থেকে শুধু ছাপানো চিঠি পেয়েছিলাম, কিন্তু সুহৃতা অন্য নানা কথার পরে শেষ লাইন লিখেছে— "আগামী অমুক তারিখে আমার বিয়ে।" শুধু এইটুকুই। এতে বুঝলাম যে... আমাদের কাছে সাহিত্য পড়া ওর ব্যর্থ হয়নি। আমার মাষ্টারি জীবনের শ্রেষ্ঠ উপার্জন এই ছাত্রছাত্রীরা— সেই মহলে ত্রিগুণা সেন বা পদ্মজা নাইডুরও সাধ্য নেই হস্তক্ষেপ করেন। তুই নিশ্চয়ই ওকে চিঠি লিখেছিস?

(আমি তক্ষুনি জবাব দিয়েছি, একটা বইও পাঠিয়েছি।) ছোটোখাটো কিছু উপহাবও পাঠাস— বই পাঠালে ট্যাক্সের ভয় নেই।... ভালোবাসা ও বন্ধুতাব মতো মূল্যবান কিছুই নেই আমাদের জীবনে।"

অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে আরো একটি চিঠিতে— আগেরটির আড়াই বছর আগে লেখা, কলকাতা থেকে :

১৮-৯-৬২

"... হযতো সজনীকান্তব কন্যা-জামাতাব সঙ্গে তোব দেখা হযে যাবে— যদি হয, কোনো অপ্রিয প্রসঙ্গ তুলিস না, অপ্রীতিব কারণ যখন পরলোকে তখন সেটা নিতান্তই অবাস্তব, তাছাড়া পিতাব দোষ সন্তানে বর্তায না, এবং আমবা ইটালিযানও নই যে বংশপবম্পবায যুদ্ধ চালাবো। যদি পবস্পবকে ভালো লেগে যায, সেটাকেই সযত্নে বক্ষা কববি।..."

[রুমিকে লেখা]

উদ্দিষ্ট মানুষটি সজনীকান্ত দাস, 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক, যিনি সারা জীবন শত্রুতা করেছেন বুদ্ধদেবের সঙ্গে— পত্রিকার মাধ্যমে এবং পত্রিকার বাইবেও। এই চিঠি লেখার সাত মাস আগে সজনীকান্ত মারা গেছেন (১১/২/১৯৬২)। (শিবনারায়ণ রায় দময়ন্তীকে জানিয়েছেন, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সজনীকান্ত তাঁর মাধ্যমে বুদ্ধদেবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন।) কয়েক মাস পরে হাওয়াই থেকে লেখা আরেকটি চিঠিতেও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। দুশ্চিন্তা, আবার সেই সঙ্গে খানিকটা 'যা-হবার-হবে' মনোভাব :

হনলুলু, হাওয়াই
২৮ জুলাই ১৯৬৫

"... তোর মা'র চিঠির সুবে একটা বিষাদ ধরা পড়ে— আমরা সকলেই মনে-মনে জানি যে আমেরিকার এই স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের পক্ষে মরীচিকামাত্র, কিন্তু দেশে ফেরামাত্র তার উপলব্ধি একটু রূঢ় মনে হ'তে পারে— তার উপর এ-মুহূর্তে আমাব কোনো নির্দিষ্ট উপার্জনও নেই। বৈষ্ণবঘাটা বিক্রি করতে হ'লেও তার পিছনে তিন হাজাব টাকা ঢালতে হবে, এদিকে হাওয়াইতে আমার আশানুরূপ টাকা জমলো না। যাকগে— এ-সব ভেবে লাভ নেই, কিছু-একটা ব্যবস্থা হবেই, সকলে যেন ভালো থাকে এবং আমার স্বাস্থ্য যেন চলনসই থাকে এই কথাই মনে-মনে বলি বার-বাব। শবীর যদি ভেঙে না পড়ে তাহ'লে হয়তো হেরে যাবো না।..."

[রুমিকে লেখা]

হনলুলু থেকে টোকিয়ো হয়ে, সেখানকার রেডিয়োর জন্য একটি বক্তৃতা রেকর্ড করে দিয়ে, কলকাতায় ফিরলেন ৫ অগস্ট। উঠেছেন ২০২-তেই, কিন্তু মনের তলায়-তলায় এই ভাবটা কাজ করছে যে শিগগিরই এই বাড়ি ছেড়ে যেতে

হবে। নাকতলায নতুন বাডি তৈবি কবিযেছেন প্রতিভা বসু— বিপুল সাহস ও দুঃসাহসেব পবিচয দিযে। তা ছাডা এ বাডিতে স্থানাভাব, বই বা জিনিশপত্র বাখবাব জাযগা নেই আব একেবাবেই, বাডিব সামনেকাব বাসবিহাবী অ্যাভেন্যু হকাবেব ভিডে বীভৎস চেহাবা নিযেছে— চলে যেতে হবেই নাকতলা। এই বিষাদ বুদ্ধদেবেব মন থেকে ছডিযে পডছে চিঠিপত্রেও। রুমিকে লিখেছেন ·

২০২ ইত্যাদি

৬ অগস্ট '৬৫

" কলকাতায একদিন মাত্র কাটলো, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন। বাত একটায দমদমে নামা থেকে শুরু ক'বে লোকজন কথাবার্তাব বিবাম নেই। ২০২-এব বিযেবাডিব মতো অবস্থা— কিংবা যেন বেলস্টেশনে অপেক্ষা কবছি, সব-কিছু অগোছালো, তোব মা সংসাব বিষযে উদাসীন, যেন হাওযায ভাসছি সবাই। যা দেখছি, নাকতলায যেতেই হবে, হযতো তোবা ফেবাব আগেই। "

পাঁচদিন পবে লেখা আবেকটি চিঠিতেও দুশো-দুই এবং নাকতলাব তুলনা— যেন নিজেকেই নিজে বোঝাচ্ছেন দুশো-দুই আব তাঁব পক্ষে বাসযোগ্য নেই, নাকতলায যেতেই হবে এবাব— রুমিকে লেখা।

কলকাতা

১১।৭।৬৫

"...কলকাতায ভ্যাপশা ভাদুবে গবম চলছে, বৃষ্টি নেই, তাব উপব এই ২০২-এ জলেব অভাব, ট্র্যাফিকেব শব্দ, এবং ঝুলন উপলক্ষে লাউডস্পীকাবেব চীৎকাব— অবস্থাটা খুব সুখেব বলা যায না।... জিনিশপত্রেব এত ঘেঁষাঘেঁষি যে চলাফেবা দায, কোনো বইযেব আলমাবি খুলতে হ'লে সেটা বেশ খাটা-খাটনিব ব্যাপাব। মোটেব উপব অনেকটা বিশৃঙ্খলভাবে দিন কেটে যাচ্ছে আমাব— ভাবটা যেন দু-দিনেব জন্য বেডাতে এসেছি, বইযেব প্যাকেট খোলা হচ্ছে, জামা-কাপড স্যুটকেসেই আছে— খাতাপত্র বেব ক'বে যে কোনো লেখায মন দেবো এমন শাবীবিক বা মানসিক অবস্থা খুঁজে পাচ্ছি না। আশায আছি, নাকতলায গিযে গুছিযে বসা যাবে— কিন্তু তাও আবো তিন-চাব মাসেব ব্যাপাব। জাহাজেব মালগুলো পৌঁছলে সেগুলোও নাকতলায তোলা ভিন্ন উপায নেই, তিলধাবণেব ঠাঁই নেই কবিতাভবনে।..."

কিন্তু যুক্তি দিয়ে মনকে যতই বোঝান; দুশো-দুইযের পাট চিরতরে চুকিয়ে দিয়ে নাকতলায় নির্বাসনে যাবার সম্ভাব্য তারিখ যতই অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে, ততই খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাঁব মন। এমনকী লেখাতেও মনঃসংযোগ করতে পাবছেন না। আরেকটি পত্রাংশ থেকে তাঁর মানসিক অবস্থা বোঝা যায়। রুমিকে লিখছেন :

কলকাতা ২৯
১৫/১১/৬৫

"..বৈষ্ণবঘাটা বিক্রিব জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে, যদি বিক্রি হ'যে যায তাহ'লে আব নাকতলায না-যাবাব কোনো কাবণ থাকবে না। এ-মুহূর্তে আমাব মনে হচ্ছে যে আমাব পক্ষে নাকতলায় যাওযা আব দ্বীপান্তবে যাওযা একই কথা — কিন্তু এও জানি যে গেলে পবে কিছুদিনেব মধ্যে নাকতলাই অভ্যেস হ'যে যাবে— আব বিবিধ কাবণে, বিশেষত পাপ্পাব জন্যে, শেষ পর্যন্ত ওখানে না-গিযে বোধহয আমাদেব উপাযও নেই। তোবা মেযে— আমাদেব সঙ্গে কাটিযে গেছিস এই ২০২-এ, তা ছাডা তখন উপাযও ছিল না— কিন্তু আমেবিকা-ফেবৎ যুবকপুত্রকে আলাদা ঘব দেযা যখন সম্ভব তখন তা দেযাই উচিত। নানাবকম যুক্তি দিযে আমি আমাব মনকে বোঝাচ্ছি।.. কলকাতায ফিবে এসে প্রথম কিছুদিন লেখায খুব উৎসাহ পেযেছিলাম, কিন্তু তাও যেন নিবে যাচ্ছে ধীবে-ধীবে— যা-কিছু ভাবি, মনেব মধ্যে কে যেন ব'লে ওঠে— "কী হবে।"

ন'দিন পবে লেখা আবেকটি পত্রেব অংশ, রুমিকে :

কলকাতা ২৯
২৪/১১/৬৫

".. বৈষ্ণবঘাটা বিক্রিব জন্য আমবা যে-বিজ্ঞাপন দিযেছিলুম তাব উত্তবে বহু টেলিফোন এসেছে ও আসছে, কিন্তু গুটি পাকতে দেবি হবে মনে হচ্ছে। যা দেখছি শেষ পর্যন্ত নাকতলায না-গিযে উপায নেই (যদিও আমাব তা ভাবতেই কান্না পায) কিন্তু বৈষ্ণবঘাটা বিক্রি না-হওযা পর্যন্ত বাডি-বদলেব মতো বিবাট ব্যাপাবে অবতীর্ণ হ'তেও ভবসা হয না। নাকতলায মস্ত বাডি, তাব জন্যে বহু নতুন আশবাব চাই, পাখা চাই, ইত্যাদি।.. এসব সাংসাবিক ভাবনা বিশ্রী লাগে আমাব, কিন্তু এখন এমন অবস্থায পডেছি যে না ভেবেও পাবছি না।"...

এখানে উল্লেখ থাকা দবকাব যে 'সাংসাবিক ভাবনা'ব উল্লেখ থাকলেও, ভাবনাটা ভাবতেন মূলতই প্রতিভা বসু; সাংসারিক বুদ্ধিহীন বুদ্ধদেব বসু কষ্ট পেতেন শুধু দুর্ভাবনায। জমি কেনা থেকে বাড়ির মালমশলাব সন্ধান, অর্থ সংগ্রহ, বা সঞ্চয় কবে বাডি বানানো, নিলামে গিয়ে জিনিশপত্র কেনা, তাবপব বাডি বদল — সমস্ত ভাবনা প্রতিভা বসু একাই ভেবেছেন, সমস্ত সিদ্ধান্ত একাই নিয়েছেন। বুদ্ধদেব অনেক সময় খবরও রাখতেন না।

বৈষ্ণবঘাটা বিক্রির প্রসঙ্গে কন্যা দময়ন্তী এই চিঠিব পাদটীকায় জানিয়েছেন : "সত্যিই আমাদেব পরিবাবে জমি-বাড়ি করাব মতো অর্থবল ছিল না। ইচ্ছাপূবণ কবতে বহুকাল আগে গড়িয়ার অভ্যন্তরীণ গ্রামাঞ্চলে মা অতি শস্তায় পুকুবসহ গাছ-গাছালি ভবা এক কৃষকেব কিছুটা জমি কেনেন। সেই জাযগাটাই বৈষ্ণবঘাটা। এই সময়ে অবশ্য শেষ পর্যন্ত জমিটা বিক্রি হয়নি। অনেক পরে, জলেব দামে

বৈষ্ণবঘাটা বিক্রি করা হয় মা যখন অসুস্থ হন।"

এই সময়ে লেখা আরেকটি চিঠি, যাতে প্রকাশ পেয়েছে আত্মসমালোচনা— নিজের সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা— এটিও রুমিকে লেখা।

২০২ রাসবিহারী অ্যাভেন্যু
৬ ডিসেম্বর '৬৫

"... তুই আমার বিষয়ে তোর মা-কে যে-চিঠি লিখেছিস তার উত্তরে আমার দু-একটা কথা বলবার আছে। আমি যে সব সময় মন-খারাপ ক'রে থাকি তা কিন্তু নয়, আর এ-মুহূর্তে মাস্টারি করছি না ব'লে আমার কোনো আক্ষেপও নেই। আমি পড়াতে ভালোবাসি তা ঠিক, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে তবেই তো তা উপভোগ্য হয়। নরেশ এখনো আশা করছে যাদবপুর আবার আমাকে ডাকবে, কিন্তু তুই বুঝবি যে যাদবপুর থেকে আমার চিত্ত একেবারে স'রে এসেছে, এমনকি সেই এলাকার মধ্যে ঢুকতে হবে ভাবলেও আমার কেমন গা শিউরে ওঠে। নরেশ সমারোহ ক'রে ইয়েটস-উৎসব করছে যাদবপুরে, নিতান্ত নরেশের জন্যেই একদিন যেতে রাজি হয়েছি, নয়তো দূরেই থাকতাম। একটা সমস্যা আছে আর্থিক— তা সেটার কোনোরকমে সমাধান হবেই, আর যতদিন আমার কাগজের উপর কলম চলছে ততদিন আমার বেকার হ'য়ে পড়ারও আশঙ্কা নেই। মুশকিলটা এইখানে যে বছরের প্রতিটি দিন সৃষ্টিশীলভাবে লেখা যায় না, কিছু হ্যাক-ওঅর্ক থাকাটা সেইজন্যে জরুরি, আর সেই হ্যাক-ওঅর্কও আমাকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। তুই জানিস যে আমি হাড়ে-হাড়ে শ্রমিক-জাতীয় জীব, একটা দিনও বিনা কাজে থাকতে পারি না, আর আমার পক্ষে বই পড়াটাও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে গণ্য। আপাতত হাতে যে দু-একটা কাজ আছে সেগুলো চুকে গেলে ভাবছি হয় একটা উপন্যাসে, নয় মহাভারত বিষয়ে বই লেখায় হাত দেবো— যাতে অনেকদিন ধ'রে মেতে থাকা যাবে।

আমার আর-একটা সমস্যা হ'লো সন্ধেগুলোকে নিয়ে। যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহ'লে সকাল-নটায় সাড়ে-নটায় শুরু ক'রে— দুপুরের খাওয়া আর বিকেলের চা বাদ দিয়ে— রাত্তির আটটা পর্যন্ত লেখা যায়, কিন্তু তারপরে আর সম্ভব নয়। কলকাতায় থাকলে বেশ জমজমাট সন্ধের জন্য আশা জাগে (আমেরিকায় সেই আশা নেই তাই অভাববোধও থাকে না), কিন্তু রোজই মনোমতো সঙ্গী বা কথাবার্তা পাওয়া যায় না, নাকতলায় গেলে সে-সম্ভাবনা আরো ক'মে যাবে। আমার স্বভাবের খুব গভীরে একটা বিষাদবোধ আছে— বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তা স্বভাবতই বেড়ে চলেছে— কিন্তু বাইরের দিক থেকে আমি মানুষটা ফুর্তিবাজ গোছের, একটু উশকোনি পেলেই দপদপ করে উঠি— আমার ভালো লাগে হাসি গল্প তর্ক আড্ডা রসিকতা— সেই দিকটা বুভুক্ষু থাকলে নিজেকে কেমন

নির্জীব লাগে।... কিন্তু এতদিনে আমি এটাও বুঝে নিয়েছি যে আমার প্রীতিসাধনের জন্যেই জগৎটার সৃষ্টি হয়নি।"

'আরোগ্যের তারিখ' কবিতার (১৯৬৫) জন্মকথা। কবিতাটি 'মরচে পড়া পেরেকের গান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

"... কোনো-কোনো কবিতা লিখে উঠতে আমার সময় লেগেছে পাঁচ থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত। এই কথাটায় একটুও অত্যুক্তি নেই, কেননা 'লেখা' বলতে শুধু কাগজের উপর কলম চালানোকেই বোঝায় না; আদি কল্পনা ও তৈরি লেখাটার মধ্যে, কোনো অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কাবণে, কখনো-কখনো মস্ত ব্যবধান ছড়িয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই নেপথ্যে চলে অনেক আয়োজন, অনেক নতুন বিন্যাস ঘটে কবির জীবনে, অনেক আহরণ ও বর্জন ও সমন্বয়— কিন্তু সেগুলিব সঙ্গে অলিখিত ও অপেক্ষমাণ কবিতাটির সম্পর্ক কী, কেমন ক'রে সেটিকে তা পুষ্টি দেয় ও জন্মের জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলে, সেই প্রক্রিয়াটি ঘটে সচেতন ও অচেতন মনেব সীমান্তরেখায়— কবি তার কিছুটা মাত্র টের পান, বাকি অংশ অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন থাকে।'মরচে পড়া পেরেকের গান', 'একদিন : চিরদিন' ও 'স্বাগতবিদায়'— আমার এই শেষ তিনটে কবিতার বইয়ে এর অনেকগুলো উদাহবণ আছে।

সেদিন ছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময, জাপানি বোমাব ভয়ে কলকাতা কাঁপছে। কোনো একটা লম্বা ছুটি আসন্ন, আমরা শিগগিবই বোমাতঙ্কহীন ঢাকা যাচ্ছি;— হযতো স্বগৃহ ছেড়ে বেরোতে হবে ব'লে, বা অপবাহ্নের মলিনতাব জন্য, আমার মন বিষণ্ন হ'য়ে আছে।... আমি তাকিয়ে দেখলাম সারা আকাশ ধোঁযাটে আব ফাঁকে-ফাঁকে অসুস্থ ধরনের হলুদ-রঙা, হাওয়া বইছে জোলো আব এলোমেলো— যেন চারদিকে কোনো অমঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে-ছড়িয়ে। কোনো-এক আদিম কুসংস্কারের বশবর্তী হ'য়ে আমি অনুভব করলাম এ যেন কোনো চিরবিদাযেব মুহূর্ত, কোনো দূরযাত্রার ইঙ্গিত— আমার মনে ছবি ফুটে উঠলো এক হালকা নৌকো উত্তাল ঢেউয়ের উঁচু-নিচু পেরিযে চলেছে, দিগন্ত সন্ধ্যার রঙে লাল। 'আকাশ কান্নায অন্ধকার / বাতাসে বিদ্যুৎ কম্পমান—' এই লাইন দুটো ভেসে উঠলো আমার মনে, আমি ঘরে এসে খাতার কোণে তা লিখেও রাখলাম, সঙ্গে আরো এক-আধটা লাইন, এবং কয়েকটা সম্ভবপর মিল। কিন্তু সেই প'ড়ে-পাওয়া লাইনদুটো তেমনি প'ড়ে রইলো তার পরে— বছরের পর বছর, আর অবশেষে, "আরোগ্যের তারিখ' বলে যে-কবিতাটায় আশ্রয় পেলো, তার পিছনে ছিলো আমার সেবারকার 'কুইন ম্যারি' জাহাজে আটলান্টিক-পাড়ির স্মৃতি [১৯৫৪], অন্তর্বর্তী আরো দু-একটা অভিজ্ঞতা, এবং আমার আসন্ন বার্ধক্যের হিম অনুভূতিও ছিলো।"

কবিতার শত্রু ও মিত্র : কবিতা ও আমার জীবন

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

'দেশান্তর'-এর শেষ প্রবন্ধ-ক'টি শেষ করলেন। প্রবন্ধ-সংকলনের শেষ প্রবন্ধটি লিখে উঠলেন : প্রবন্ধের নাম 'যে আঁধার আলোর অধিক', প্রবন্ধের বিষয় : রেমব্রান্ট। দেশে ফেরার পথে য়োরোপ হ'য়ে ফিরছেন (১৯৬১) :

"... সেই যে এক বৃষ্টি-পড়া মলিন সন্ধ্যায় ন্যুয়র্ক ছেড়েছিলুম, তারপর থেকে দু-সপ্তাহ ধ'রে অনবরত ঘুরছি— স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, হোটেল থেকে প্লেন, এবং প্লেন থেকে আবার এক অন্য হোটেলে। মন চায় জগৎটাকে গ্রাস করতে, কিন্তু দেহের সাধ্য সীমিত। রাস্তায়, চিত্রশালায়, আর মালবাহী অবস্থায় বিমানবন্দবগুলোতে মাইলের-পর-মাইল হেঁটে-হেঁটে আমার একটা পা খোঁড়া হ'য়ে গেছে, প্যারিসে এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছি পায়ে, কিন্তু এখনো স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছি না।..."

প্রবন্ধ-সংকলন : 'যে আঁধাব আলোর অধিক' প্রবন্ধ

বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় চিত্রশিল্পী ছিলেন রেমব্রান্ট, সুদূরভাবে হয়তো তাঁর সঙ্গে এক ধরনের একাত্মতাও বোধ করতেন তিনি; প্রমাণ করার প্রশ্ন ওঠে না — কিন্তু নিচের এই অনুচ্ছেদটিতে, রেমব্রান্টজীবনী তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন, ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে এই ঘটনাগুলি তাঁর নিজের জীবনেও কি ঘটেনি?

"যুগপৎ বিখ্যাত ও দরিদ্র হবার বেদনা আমরা কেউ-কেউ প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি। দারিদ্র্য শুধু কষ্টের নয়, তা অসম্মানজনক, তা আমাদের বাধ্য করে হৃদয়ের দিক থেকেও সংকুচিত হ'তে, নানা ধবনের ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দিতে। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে দারিদ্র্য তাই সহজে মেলে না, প্রতিভাবানকে বিকল ক'রে দেবাব ক্ষমতা আছে তার। এই অবরোধ ও মালিন্যের মধ্যেই রেমব্রান্ট কাটালেন তাঁব জীবনের শেষ অধ্যায়, কিন্তু সাংসারিক দুর্গতি তাঁর সৃষ্টিকে ব্যাহত কবতে পারলে না। পুত্র টিটুস ও বুদ্ধিমতী হেনড্রিকিয়ে-র প্রযত্নে কোনোরকমে সংসার চলে : যা-কিছু তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর আজীবন-সঞ্চিত শিল্প-সামগ্রী, কিছুই আর নেই এখন, উঠে এসেছেন ছোটো বাড়িতে, কিন্তু অটুটভাবে স্বধর্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে প্রিয়তমা হেনড্রিকিয়ে ও টিটুসেবও মৃত্যু হ'লো, তবু তিনি সৃষ্টিশীলতায় অবিচল। শুধু যে অবিরাম চিত্ররচনা করছেন তা-ই নয়, শুধু যে অবক্ষয়ের কোনো চিহ্ন নেই তা নয়, দুর্দিনে আরো গভীর হয়েছে তাঁর শিল্প, আরো মনস্বী, হ'য়ে উঠেছে বিশ্ববেদনার চিত্ররূপ। মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তি রইলো কিছু জীর্ণ বস্ত্র, ছবি আঁকার সরঞ্জাম— আর রইলো অমরতা।..."

—তদেব।

এ-বছরও তাঁর কোনো বই বেরোল না।

১৯৬৬ ।। বয়স আটান্ন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র-বক্তৃতামালা

জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎচন্দ্র বক্তৃতা' দিলেন— রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক চারটি বক্তৃতা; সেগুলি পরে গৃহীত হল 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। ভূমিকায় লিখলেন :

'বর্তমান গ্রন্থের প্রথম চার পরিচ্ছেদেও ইংরেজি বইটির মূল উপাদান আংশিকভাবে ব্যবহার করেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র-বক্তৃতামালারূপে এগুলোই এ-বছর জানুয়ারি মাসে— ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে— প্রদত্ত হয়েছিলো। (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বক্তৃতা আমার দেবার কথা ছিলো ১৯৫৭ সালে, কিন্তু নানা কারণে ১৯৬৬-র আগে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।)...

... বাংলা ভাষায় রচনাকালে আমার বক্তব্য প্রভূতভাবে প্রবৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়েছে; বহু নতুন তথ্য, যুক্তি, উদাহরণ ও মন্তব্য যোগ করেছি। ইংরেজিতে যা ছিলো ক্ষীণ ইঙ্গিত মাত্র এখানে তা পূর্ণ রূপ পেয়েছে, এবং এখানে এমন অনেক প্রসঙ্গ আলোচিত হ'লো যা ইংরেজিতে উল্লেখ পর্যন্ত করিনি।"

নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'।

কলকাতা ২৯
১২/২/৬৬

"... হঠাৎ একটা নাটক লেখায় হাত দিয়েছি— দুটো অঙ্কের খশড়া তৈরি হয়েছে, আর-এক অঙ্ক হ'লে শেষ হয়, কিন্তু সেটাই সবচেয়ে শক্ত। লিখি আর ভাবি, কী হবে? হয়তো অভিনয়যোগ্য হবে না, বই বেরোলেও বিক্রি হবে না। (আমার বইয়ের এমনিতেই বিক্রি নেই, আর নাটকের শুনেছি সবচেয়ে কাটতি কম, "রক্তকরবী" মাঝে-মাঝে পাঠ্য হয় ব'লেই দু-চার কপি নড়ে-চড়ে।) তোর মা যাকে বলেন "লাভ নেই বাণিজ্যে কচকচি সার," হয়তো ব্যাপারটা তা-ই দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত। তবু শঙ্খ খুব উৎসাহ দিচ্ছে আমাকে, আর শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের নাটুকে দল বেশ কয়েকটা তৈরি হয়েছে আজকাল, তাদের পুঁজি বেশির ভাগ বিদেশী নাটকের অ্যাডাপ্টেশন, সেদিক থেকে অন্তত একটা সম্ভবপর চাহিদা আছে। দেখা যাক।..."

[রুমিকে লেখা]

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (প্রথম প্রকাশ অগস্ট ১৯৬৬) নাটক রচনার পশ্চাৎপট :

"একবার একটা নাটক ভেবেছিলাম সাবিত্রীকে নিয়ে— বহুকাল ধরে লালন

করেছিলাম মনে-মনে— অবশেষে সেটা পর্যবসিত হ'লো একটি দীর্ঘ কবিতায়, রোম আর কীটসের মত্যু দিয়ে যার আরম্ভ, এবং যার শিরোনামায় ছাড়া সাবিত্রীর নাম উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু আরো ভালো উদাহরণ হয়তো 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' — ঐ নাটকটাকেও কাব্যজাতীয় রচনা ব'লে ধ'রে নিচ্ছি— সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবেমাত্র উত্তরতিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতেব আস্বাদ; সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খসমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান প'ড়ে চমকে উঠেছি— এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের "পতিতা"র বাইরে কিছুই জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েবা, অম্লান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়েব আশ্চর্য মুহূর্ত— এই সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিলো তখন, রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিলো এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' নাটকটা। মনে পড়ে লিখেও ফেলেছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের মুখের প্রথম দুটো লাইন— সে-দুটো দিয়েই 'তপস্বী ও তবঙ্গিণী'র আরম্ভ, যদিও সাতমাত্রা ছন্দ ও প্রথম দুটো শব্দ ছাড়া আদি লেখনেব আব কিছুই সেখানে রক্ষিত হয়নি। এ-ক্ষেত্রে আমি বোধহয় জানি আগে লিখে উঠতে পারিনি কেন, কেন আমাকে— বা রচনাটিকে— এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। প্রথম পরিকল্পনার সময় আমি ঋষ্যশৃঙ্গ বিষয়ে যথেষ্ট জানতাম না, বিষয়টির মর্মস্থলে প্রবেশ করিনি তখনও, সেটিকে একটি স্বকীয় রচনায় জীবন্ত করে তোলার মতো তহবিল আমার ছিলো না। সেগুলি সংগৃহীত হ'লো নানাদেশে ঘুরে বেডাবার ও ক্লাশ পড়াবার সময়, পড়াবার জন্য অনেক বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে, আর বিশ্বপুরাণে আমার বিবর্ধমান কৌতূহলবশত। যাকে গবেষণা বলে সেটা পণ্ডিতমহলেব মনোপলি নয়, মাঝে-মাঝে কাব্যরচনাতেও তার প্রয়োজন ঘটে, এই কথাটি বোঝার জন্য আমাকে অনেকগুলো বছুর বছর বাঁচতে হয়েছিলো।

—*কবিতার শত্রু ও মিত্র* : কবিতা ও আমার জীবন

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' সম্পর্কে বুদ্ধদেবের নিজের ব্যাখ্যা

নাটকের অন্তে 'প্রযোজনার জন্য পরামর্শ' শিরোনামে কয়েকটি অনুচ্ছেদ যোগ করেছেন বুদ্ধদেব। সেখানে 'অভিনয়' অংশে লিখছেন :

"লোকে যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে ক'রে থাকে তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো— নাটকটির মূল বিষয় হ'লো এই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তবঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা; এই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হ'লো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'— যে-ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় বর্ণিত আছে ঠিক সেইভাবেই। 'রোমান্টিক প্রেম' অর্থ হ'লো, কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব, অবিচল, অবস্থানির্বিশেষ, এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি— যার প্রতীক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে

ট্রিস্টান, এবং আমাদেব সাহিত্যে বাধা (তবঙ্গিণী সেই আবেশ আব কাটিযে উঠতে পাবলে না, তাই চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে প্রথমে নিবাশ হ'লো সে; এবাবে যেন দ্বিতীয় অঙ্কেব ঘটনাটি উল্টে গেলো— অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গই চাইলেন তবঙ্গিণীকে 'ভ্রষ্ট' কবতে, আব তবঙ্গিণী খুঁজলো ঋষ্যশৃঙ্গেব মুখে সেই স্বর্গ, যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তাব মুখে দেখেছিলেন, এবং যাব পুনরুদ্ধাবে সে বদ্ধপবিকব। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গই তবঙ্গিণীকে বুঝিযে দিলেন, কোথায মানুষেব সব কামনাব চবম সার্থকতা।. ”

শেষ পর্যন্ত স্থাযীভাবে নাকতলাব বাড়িতে

অনেক দ্বিধা ও টালবাহানাব পব, শেষ পর্যন্ত জুন মাসে পাকাপাকিভাবে দুশো-দুই বাসবিহাবী অ্যাভেনিযুব বাস তুলে দিযে চলে এলেন নাকতলায নবনির্মিত বাড়িতে। খাবাপ লেগেছিল খুব— বুদ্ধি দিযে মানিযে নিতে চেষ্টা কবছেন, কিন্তু পাবছেন না। এই সমযকাব বেশ কিছু চিঠি দুশো-দুই ছেড়ে আসাব বিষাদে বিধুব। আমেবিকা-প্রবাসী জামাতা জ্যোতির্ময দত্তকে লিখছেন ·

৫ মে ১৯৬৬

“ কাল সন্ধ্যায প্র ব তাব নাকতলাব ছাতে আমাদেব একটা পূর্ণিমা-পার্টি দিলেন, মেঘেব জন্য জ্যোৎস্না তেমন উজ্জ্বল হযনি। কিন্তু মৃদুমন্দ বাতাস ছিলো — সমযটা নেহাৎ মন্দ কাটলো না। অধিকাংশ বই ও বইযেব আলমাবি সবানো হবাব পব ২০২-এব ঘবটাকে বিধবাব মতো দেখাচ্ছে— এখন আব নাকতলায বদলি না-হ'যে উপায নেই, পযলা জুন থেকে আমাদেব ঠিকানা P-364/19 Netaji S C Bose Road, Cal-47 মে-ব শেষ সপ্তাহ থেকে ঐ ঠিকানায চিঠি প্রেবিতব্য। এ-মাসেব শেষে ২০২ এ আমাদেব ঊনতিবিশ বছব পূর্ণ হবে, যখন এসেছিলাম আমাব বযস তখন ঊনতিবিশ, মিমিব দেড, আব প্র. ব তখন বাইশ বছবেব ছুকবি। ”

—কলকাতা পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, ১৯৭৪

নাকতলায প্রথম এসে রুমিকে লিখছেন :

কলকাতা-৪৭

২৭/৬/৬৬

“.. নাকতলায এসে আমি উল্লসিত হবো এটা নিশ্চযই তোবা আশা কবিসনি — আমি তো প্রকৃতিপ্রেমিক নই, বোদলেযাব-ভক্ত নাগবিক। আমি আছি একতলাব দক্ষিণেব ঘবটায, তোব মা-ব বুকে দাগা দিযে পুব দিকেব বিবাট দবজাটা বুকশেলফ দিযে স্থাযীভাবে বন্ধ ক'বে নিযেছি— অধিকাংশ সময অধিকাংশ জানলাও বন্ধ কবে বাখি, বেশি আলো-হাওযা ভালো লাগে না আমাব, ঘব একটু অন্ধকাবমতো না-হ'লে কাজে মন দিতে পাবি না।...”

সপ্তাহতিনেক পরেকাব আবো একটি চিঠিতে নাকতলা-বিষয়ক মন্তব্য : এটিও রুমিকে লেখা :

কলকাতা ৪৭
১৮/৭/৬৬

"... নাকতলায আসাব পব থেকে আমি অত্যন্ত মন-মবা হ'যে আছি। বাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাফিকেব গোলমাল, বাস্তাব ভিড, বহুকাল বসবাসেব ফলপ্রসূত ঘনিষ্ঠতাবোধ— এ-সবেব অভাব আমি ভুলতে পাবছি না এখনো, কতদিনে পাববো কে জানে। ২০২-এ লোকজন না-এলেও বাস্তাটা আমাকে সঙ্গ দিতো, সাবাদিনেব গোলমালেব পবে উপভোগ করতাম বাতেব নীববতা— কিন্তু এখানে কোনো প্রতিতুলনা নেই, দিন আব বাত্রি সমান নীবব আব সন্ধেব পবে অন্ধকাব যেন মৃত্যুব মতো। এই পাড়া, বাস্তা, মফস্বলি গ্রাম্য পবিবেশ, পাঁচ নম্বব বাস-এব গ্রাম্য ভিড— সব অতি বিশ্রী লাগে আমাব, এক-এক সময যেন বিমর্ষতায ও নির্বেদে ডুবে যাই। এতে তোব মা খুব কষ্ট পান, এক-এক সময ভীষণ বেগে যান আমাব উপব— কিন্তু আমি কী কবতে পাবি, বল।..."

অক্টেবরেব গোড়ায় কযেক দিনেব জন্য শিমলা ঘুবে এলেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর অধ্যক্ষ নীহাববঞ্জন বায আমন্ত্রণ জানিযেছিলেন, আধুনিকতা বিষযে একটি সেমিনাব উপলক্ষে।

জীবনযাপনে পরিবর্তন আসছে

এই ১৯৬৬ সাল থেকে বুদ্ধদেবেব জীবনে— বহিবঙ্গে ও অন্তর্জীবনে— একটি তাৎপর্যপূর্ণ পবিবর্তন আরম্ভ হযেছিল। বহিরঙ্গের দিক দিযে, বাড়িবদল করলেন— নাগরিক রাসবিহাবী অ্যাভেনিয়ু থেকে মফস্বলী নাকতলায়— করে, আরো নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। চিবকালই— সেই পুরানা পল্টনের দিনগুলি থেকেই — বুদ্ধদেব নিজে কোথাও যান না, তাঁর বাড়িতেই সবাই আসেন আড্ডা দিতে। এই নিয়মের কখনো ব্যত্যয হয়নি। বুদ্ধদেবকে আমরা যেতে দেখি, সারা জীবনে, কখনো কখনো যামিনী বায়ের বাড়িতে, আর ক্বচিৎ হয়তো রাসেল স্ট্রিটে সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতে। এখন এই ষাট ছোঁয়া প্রৌঢ়ত্বে, তিনি বন্ধুদের সঙ্গলাভের জন্য সারাজীবনের অভ্যাস বদলে ফেলবেন একথা কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই প্রান্তিক পল্লি নাকতলায় সকলে সব সময় এসে উঠতে পারেন না। তদুপরি, তাঁরা নাকতলায় আসার বছর দুইয়ের মধ্যে শুরু হয়ে গেল নকশালপন্থী তাণ্ডব, নাকতলা, বেহালা ইত্যাদি পাড়াগুলো যোগাযোগহীন দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরোনোর অভ্যাস এমনিতেই কম ছিল তাঁর, এখন একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন।

পরিবর্তন ঘটল তাঁর অন্তর্জীবনেও। এই সময় থেকে নাটক লেখার কাল আরম্ভ হল। এর আগে যেসব নাটক লিখেছেন তার সঙ্গে এখনকার নাটকগুলির মৌলিক পার্থক্য আছে। আগেকার নাটক— যেমন 'অনুরাধা', 'মায়া-মালঞ্চ'— সেগুলি লিখেছেন নাটক হিশেবেই, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল নাটকীযতা এবং অভিনয়যোগ্যতা। লিখছেন, একই সঙ্গে সে-নাটকের মহলা চলছে— লিখতে লিখতে বদলেছেন, সে-সব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল নাটকটিকে মঞ্চযোগ্য করে তোলা, হয়তো কোনো কথোপকথনকে বিশেষ কোনো অভিনেতার সুবিধের কথা ভেবে বদলে দেযা। কিন্তু এই সময় থেকে, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' থেকে, তাঁব নাট্যরচনার যে-পর্যায় শুরু হল, সেখানে দেখতে পাচ্ছি মঞ্চযোগ্যতাই তাদের একমাত্র গুণ নয়। নাটকের ফর্মটি ব্যবহার করে কাব্যরচনা— এবং পুরাণের পুনর্জন্মদান— এই দুটি এই পর্যায়ের নাটকের আসল লক্ষ্য। যাঁরা এ বিষযে বিশদভাবে ভাবতে চান তাঁরা কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহাব' গ্রন্থটি দেখে নিতে পারেন। এখানে এটুকু বললেই হয়তো যথেষ্ট হবে যে এই নাটকে বুদ্ধদেব মহাভারতেব ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিব উপাখ্যানকে পবিণত কবেছেন একটি আধুনিক কাহিনিতে, যাব মধ্যে মানুষের কাম ও প্রেমের সম্পর্কের সমস্যা একটি চিরকালীন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

'একটি অভিজ্ঞতা' কবিতার জন্মকথা (১৯৬৬)

কযেক বছব আগে আমি একদিন পার্ক স্ট্রিটেব মোড়ে চৌরঙ্গি পাব হচ্ছিলাম। উল্টো দিকে লাল আলো ছিলো, আমি শাদা সংকেতবেখাব উপর দিযে হেঁটে যাচ্ছি— হঠাৎ, আমি যখন ট্রামলাইনের কাছাকাছি, সমস্ত চৌরঙ্গি অস্থিব হ'যে দুলে উঠলো, আমি শুনলাম একপাল দোতলা বাস-এর গর্জন, দেখলাম মোটবগাড়িগুলোব অপ্রতিহত তীব্রতা— আমাব ডাইনে, আমাব বাঁযে, আমাব সামনে। 'এ-ই শেষ—' কথাটা ভাবতে-না-ভাবতে আমার সংবিৎ যেন অস্পষ্ট হ'য়ে এলো, আমার অস্তিত্ব ক্ষীণ সূত্রে ঝুলে আছে— তারপর দেখলাম আমি ট্রামষ্টপে দাঁড়িযে আছি, আমার সামনে পুকুর, চারদিকে বোদ্দুর-মাখা দিন, গাছে একটা পাখি উড়ে এসে বসলো। ট্রামে যেতে-যেতে আমার অবাক লাগলো যে আমি ঠিক আগেব মতোই আছি, আমার জ্ঞান নষ্ট হযনি, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অক্ষত আছে; আমাব সাবা মন জুড়ে ঘণ্টার মতো বেজে উঠলো— 'কী ভালো এই জীবন, কী ভাগ্য আমি বেঁচে আছি!' বাইরে যা-কিছু দৃশ্য— চৌরঙ্গি, ভবানীপুর, কালিঘাট, টালিগঞ্জ, তারপর ছ'নম্বর বাস— ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, বস্তি, পলেস্তরা-খসা জীর্ণ বাড়ি, বারান্দাব রেলিঙে হেলান-দিয়ে-দাঁড়ানো মহিলা— এই আকাশ, রোদ, এই মানুষের ভিড়— আমার চিরচেনা, কিন্তু আজ সব আমার চোখে নতুন, সব আশ্চর্য; আমার শান্ত চুপচাপ গাছের-ছায়া-পড়া বাড়িটি ছবির মতো সুন্দর।

ভেবে এসেছিলাম বাড়ি ফিবে প্রথমেই আমাব স্ত্রীকে বলবো ঘটনাটা, কিন্তু বলতে গিযে থেমে গেলাম। কী বলা যায?' জানো, আজ আমি প্রায বাস-চাপা পড়ছিলাম... জানো, আমি আজ মবতে-মবতে বেঁচে গিযেছি।' তিনি বলবেন, 'তুমি কেন বাস-এ ট্রামে ঘোবো বলো তো? ট্যাক্সি নিতে পাবো না?'— কী সাধাবণ, কী তুচ্ছ এই কথাগুলো, কত দূবে এ-সব থেকে বাস্তব। সত্যি সেই আতঙ্কেব মুহূর্তে আমাব কেমন লেগেছিলো, তা কি আমাব পঁযত্রিশ বছবেব জীবনসঙ্গিনীকেও আমি বোঝাতে পাববো? না কি তুলনীয অবস্থায তিনি আমাকে বলতে এলে আমিই তা বুঝতে পাবতাম? আমবা পবস্পবকে যতই না ভালোবাসি, আমাদেব শবীব দুটো তো আলাদা, শবীবেব মধ্যে দুই জীবনও আলাদা। অত্যন্ত আপন জনকেও কোনো আসল কথা বলা যায না, পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ একলা। সেদিন এই ভাবনাটাই ঘুবে-ফিবে মনে পড়লো আমাব, পবেব দিন এটাকে একটা কবিতাব মধ্যে গেঁথে ফেললাম— তাব নাম দিলাম "একটি অভিজ্ঞতা"। আমাব সাম্প্রতিক বচনাব মধ্যে এটাকে বলা যায সেই জাতেব, যা মনে হওযামাত্র বেবিযে আসে, কিন্তু "শীতবাত্রিব প্রার্থনা"ব মতো আবেগেব ধাক্কা ছিলো না এব পিছনে; আমাকে লিখতে হ'লো ভেবে-ভেবে, থেমে-থেমে, কাটাকুটিব জঙ্গল পেবিযে— ততদিনে চাক্ষুষ কাটাকুটি বিষযে ভযেব ভাবটা আব নেই আমাব, হযতো নিজেব উপবে আবো একটু আস্থাবান হতে পেবেছি। এই কবিতায যেটুকু 'প্লটে'ব অংশ, বা তথ্য, সেটাকে আমি খুব ঝাপসা বেখেছিলাম এই আশায যে কেউ-না-কেউ কখনো হযতো বুঝে নেবে; সেটা কোনো পত্রিকায ছাপা হবাব পব একজন পাঠকেব মন্তব্য শুনে মনে হযেছিলো আমাব চেষ্টা একেবাবে ব্যর্থ হযনি। কবিবা ভাগ্যবান; তাঁবা অজানাব উদ্দেশে বলতে পাবেন।"

কবিতাব শত্রু ও মিত্র : কবিতা ও আমাব জীবন

সমকালীন কবিতা বিষয়ক চিন্তা

আমরা দেখেছি, 'কবিতা' পত্রিকা চলাকালীন যেমন, পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পরও বুদ্ধদেব সমকালীন কবিতার তেমনই নিবিষ্ট পাঠক। কিন্তু রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের পব থেকে বাংলা কবিতার জগতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিশেষত গীন্‌সবার্গ তাঁর বৎসরাধিক কাল কলকাতা বাসকালে, তরুণ কবিদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন অটোম্যাটিক রাইটিং বা স্বতশ্চললেখনের দর্শন—তার ফলে কবিতা লেখা ব্যাপারটা অন্তহীনভাবে সহজ হয়ে গেছে তরুণ কবিযশোপ্রার্থীর পক্ষে। বুদ্ধদেবের মতো পরিশ্রমী কবিতাকর্মীর কাছে তাঁদের প্রয়াস কেমন লাগছে, তার একটি দর্পণপ্রতিম বর্ণনা পাচ্ছি নিচের এই পত্রাংশটিতে, 'কবিতা-ঘটিকী' বিষয়ে তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় :

"... আর তরুণ 'কবিদের' 'কবিতা'র দৈনিক, "কবিতা" ঘন্টিকী (ঘন্টায়-ঘন্টায় বেরোবে, বাৎসরিক ২০০০ টাকা চাঁদা।), চন্দননগরে "কবিতা"র দৈনিক,

সুন্দববনে "কবিতা"ব পাক্ষিক— মনে হয জ্যোতিব হিশেবে ভুল হযেছিলো, এই মুমূর্ষু মহাদেশে বেশ্যাদেব চেযেও বর্তমানে বোধহয "কবি"ব সংখ্যা বেশি। আব কোন দেশে "কবিতা" এমন বিসূচিকাব মহামাবীব মতো প্রাদুর্ভূত হয, বা বোমকূপ থেকে ঘাসেব মতো, অথবা সুস্থ যুবকেব বৃক্ক থেকে মূত্রেব মতো এমন অনর্গলভাবে বেবিযে আসে, তা কি তোমবা বলতে পাবো?

আমি আশীর্বাদ কবি— আমাব দুই দৌহিত্র চাদে যাক, বা আন্দামানেব অ্যাডমিনিস্ট্রেটব হোক, বা হিমালযে আলুব ফসল ফলাক, অথবা হোক প্রথম বাঙালি ন্যাকামি-মুক্ত চিত্রকব— কিন্তু কবিতাব ক-অক্ষব কখনো যেন তাবা না জানে।"

—বুদ্ধদেব বসুব লেখা চিঠি, ৫ মে ১৯৬৬

কলকাতা পত্রিকা, বুদ্ধদেব বসু স্মৃতি সংখ্যা এপ্রিল ১৯৭৪

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

ফেব্রুযাবিতে লিখলেন 'তপস্বী ও তবঙ্গিণী' নাটক। মার্চ এপ্রিলে 'পাতাল থেকে আলাপ' উপন্যাস। মে-জুনে 'বাত ভ'বে বৃষ্টি' উপন্যাস।

এপ্রিলে বেবোল 'দেশান্তব' (বিদেশভ্রমণেব স্মৃতিকথা) ও 'প্রবন্ধ সংকলন' ১৯৩২ থেকে বচিত প্রবন্ধ ও সমালোচনাব নির্বাচিত সংগ্রহ। বুদ্ধপূর্ণিমায বেবোল ছোটোদেব জন্য গল্পগ্রন্থ, 'বই ধাব দিযো না'। ছোটোদেব জন্য লেখা তাঁব শেষ বই এটি। অগস্ট বেবোল 'তপস্বী ও তবঙ্গিণী' নাটক। ডিসেম্ববে কাব্যগ্রন্থ 'মবচে পড়া পেবেকেব গান'।

১৯৬৭ ।। বয়স উনষাট

নাকতলার 'গণসংস্কৃতি'র সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা

কনিষ্ঠা কন্যাকে চিঠি :

১৬/২/৬৭

"... আমরা আপাতত কিঞ্চিৎ উত্তেজনার মধ্যে আছি। সরস্বতী-পুজোর চাঁদা চাইতে অসংখ্য দল এসেছিলো, (কারো-কারো কথাবার্তা শুনে মাথায় আগুন ধবে!—) আমরা দু-তিন বারের বেশি দিইনি, দেয়া সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। সপ্তাহ দুই আগে একটি চাঁদাপ্রার্থী দলকে প্রত্যাখ্যান করার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাইরের পর্দা দুটি চুরি হ'য়ে গেলো। তারপর সরস্বতী পুজোর পূর্ববর্তী রাত্রিটায় অনবরত গেইট খোলার শব্দ, তোর মা টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠছেন, আর কুচো থেকে যুবক পর্যন্ত নানা বয়সের ছেলেরা পালিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে রাত চারটে নাগাদ আমাদের একটি মুর্গি চুরি হ'লো।... সেই রাত্রে [সরস্বতী পুজোর রাত্রে] তোর মা ফটকের আলো দুটো জ্বেলে রাখলেন— ওতে দুর্বৃত্তেরা নিবৃত্ত হবে, এই আশায়। সকালে উঠে দেখা গেল ফটকের আলোর ডোম দুটো ভেঙে দিয়েছে, সিঁড়ির একটি কাচও ফাটিয়েছে ঢিল ছুঁড়ে (বলতে ভুলেছি, আগের রাত্রে অন্ধকার থেকে ঢিলও পড়েছিলো)। দ্বিতীয় রাত্রে তাপস সেনের বাড়িতেও কাচ ভেঙেছে, দরজায় বিষ্ঠালেপন করেছে, ডাক্তার দাশগুপ্তের ভাইয়ের বাড়ির বাগান তছনছ করেছে।

দেখছি পাড়াটা বেশ গুণ্ডা-অধ্যুষিত (ঠিক আমাদের পাড়া নয়, আশেপাশে, বিবিধ কলোনির বরপুত্র তারা)— কিন্তু সারা কলকাতার বা সারাদেশেরই আজ এই অবস্থা, আর যেহেতু আমার মাসিক দশ হাজার টাকা আয় নেই, মস্ত কম্পাউন্ডওলা পাঁচিল-তোলা বাড়িতে বা দশতলায় এয়ার-কন্ডিশন্ড ফ্ল্যাটে থাকতে পারি না, তখন আর পালিয়েই বা কোথায় যাবো? 'টীন-বয়সি'দের সমস্যা আমাদের দেশেও এখন গুরুতর— এই সব দুষ্কর্ম যারা ক'রে বেড়ায় তারা অনেকেই খুব সচ্ছল ঘরের ছেলে, মেয়েরাও এসব দলে নেই তা নয়, পাশ্চাত্য দেশের ধনসম্পদ শিক্ষাসভ্যতা কিছুই নেই আমাদের, তার ব্যাধিগুলি কেমন পৌঁচচ্ছে দ্যাখ! এক-এক সময় দেশের অবস্থা ভেবে হতাশায় ডুবে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।..."

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেলেন।

উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছেন, 'পাতাল থেকে আলাপ'। ৫/৪/৬৭-তে রুমিকে লিখছেন :

"... আমার উপন্যাসটা এই সপ্তাহ্ থেকেই 'অমৃতে' বেরোচ্ছে, আমার হৃৎকম্প উপস্থিত— আমাকে অনেক কষ্ট দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ এগোচ্ছে এই লেখাটা, এখনো শেষের কাছাকাছি আসতে পারিনি, মন তাই সব সময় উদ্বিগ্ন। দিল্লি যাবাব আগে শেষ হবার কোনো আশা দেখছি না, এদিকে দিল্লি উপলক্ষ্যে সাকুল্যে সপ্তাহ্খানেক কামাই যাবে। এ-সময়ে মহীশূরেও একটা নিমন্ত্রণ ছিলো, সেটা বাদ দিলাম— দিল্লিরটায় রাজি হলাম এইজন্যে যে রেডিয়োতে শুধু মৌখিক আলোচনার ব্যাপার ওটা, কোনো রচনা প্রসব করতে হবে না..."

প্রতিভা বসুর অনেকগুলো গল্প এই সময়ে ফিল্মে রূপান্তরিত হয়েছে বা হচ্ছে— 'মধ্যরাতের তারা', তার হিন্দি ভাষান্তর 'আস্‌রা'— 'সবুজ পাতা' অবলম্বনে ছবি, চিত্রনাট্য অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা দীনেন গুপ্ত (এই ছবিই দীনেন গুপ্তকে বিখ্যাত করে)— ফলে তাঁদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল এখন। জীবনযাপনে তাঁর ছাপ পড়ছে। বুদ্ধদেবের নাটকও মঞ্চে অভিনীত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—

"... তোকে কি লিখেছিলাম বম্বাইয়ের একটি মহিলা The Leaves fall মঞ্চস্থ করতে চাচ্ছেন? তিনি আরেকটা নাটক চান— ভাবছি 'বাবু ও বিবি'টা দেবো, সেটার অনুবাদ মেরী লেগো ইতিমধ্যে পাঠিয়েছে, পরিমার্জনা বাকি।... 'কলকাতা'র পব 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' লিখিস কেন রে? ওটা হল কলকাতাকে অপমান করা।"

—দময়ন্তীকে লেখা চিঠি : ১৫ অগস্ট '৬৭

মঞ্চে ও পর্দায় বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেবের জীবিতকালে তাঁর কোনো গল্প ফিল্মে রূপান্তরিত হয়নি। সত্যজিৎ বায 'একটি জীবন' করতে চেয়েছিলেন, কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি [১]। এই সময় হেমেন গাঙ্গুলি তাঁর 'পাতাল থেকে আলাপ' নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন, সে প্রস্তাবও বাস্তবিত হয়নি শেষ পর্যন্ত। প্রথম যৌবনে রচিত 'রাবণ' নাটক নিয়ে অনেক আশা ছিল তাঁর, নাটকটি পছন্দ করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত নাট্যপ্রযোজক হারান ঠাকুরতা। নাট্যনিকেতনে অভিনয় হবে, শ্রেষ্ঠাংশে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শিশির ভাদুড়ি নীহারবালা, রিহার্সাল থেকে পোস্টার-পড়া পর্যন্ত এগিয়ে গেল নাটক— কিন্তু তারপরে কোনো রহস্যময় কারণে বন্ধ হয়ে গেল, নাটকের পাণ্ডুলিপিটি পর্যন্ত বুদ্ধদেব উদ্ধার করতে পারেননি। [২]

১. এই গল্প নিয়ে ছবি করেন রাজা মিত্র, ১৯৮৮ সালে। ছবিটি পরিচালকের প্রথম প্রয়াস হিশেবে সেবছর রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছিল।

২. 'রাবণ'-এর একটি পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসুর কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

দুটি নাটক লিখে উঠলেন : 'কলকাতার ইলেকট্রা', ও 'সত্যসন্ধ'। 'কালসন্ধ্যা' নামে আরেকটি কাব্যনাট্য লিখতে আরম্ভ করলেন।

'স্বাগতবিদায়' গ্রন্থের কবিতা রচনা আরম্ভ হল।

ছোটো গল্প লিখছেন— এগুলি গ্রথিত হবে 'প্রেমপত্র' গ্রন্থে। 'গোলাপ কেন কালো' লিখছেন।

জানুয়ারি মাসে বেরোল 'পাতাল থেকে আলাপ' উপন্যাস। এপ্রিলে বেরোল 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' উপন্যাস— এটি নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগে মামলা হবে ১৯৬৯-৭০ সালে। অগস্টে বেরোল 'তুমি কেমন আছো' গল্প ও নাটিকার সংকলন।

ভূমিকা ও টীকা সংবলিত 'হ্যেল্ডারলিনের কবিতা' প্রকাশিত হল ডিসেম্বরে। এই গ্রন্থের 'অনুবাদকের বক্তব্য' অংশে লিখলেন :

"আমি হ্যেল্ডার্লিন থেকে প্রথম কয়েকটি অনুবাদ করেছিলাম ১৯৫৪-৫৫ তে... সম্প্রতি [১৯৬৬-৬৭] এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে, আবো কিছু অনুবাদ, এবং সেই সঙ্গে পুরোনোগুলোর পরিমার্জনা করলাম।... অনুবাদকর্মে আমার অবলম্বন ছিলো অনেকগুলি ভিন্ন-ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ, কবিতাগুলির মূল লেখন, এবং একটি জর্মান-ইংরেজি অভিধান। কবির অভিপ্রায় ও শব্দপ্রয়োগ বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি অভিধানের সাহয্যে, একই কবিতার বিভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ তুলনা করে, কখনো বা সমালোচকের ব্যাখ্যার পরামর্শ নিয়ে। এই ভাবে মূল ভাষায় আমার জ্ঞানের অভাবের কতদূর পরিপূরণ হয়েছে জানি না, তবে মূলের পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ও স্তবকবিন্যাস সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছি, এবং আশা করি চিত্রকল্পগুলি অনাহত আছে, আর কবিতার সারবস্তুও বিকৃত হয়নি। অন্য একটি বিষযেও আমি নিরন্তর মনোযোগী ছিলাম— যাতে বাংলা ভাষাব কবিতা হিশেবে অনুবাদগুলি পাঠযোগ্য হয়, কেননা আমার বিশ্বাস যে কবিতার অনুবাদের পক্ষে কবিতা হ'য়ে ওঠাই সবচেয়ে জরুরি দরকার। সহৃদয় পাঠকদের অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন বইখানাকে 'হ্যেল্ডার্লিন-প্রবেশিকা' হিশেবে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই কবির সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানোই এর উদ্দেশ্য।..."

কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে বুদ্ধদেব

দীর্ঘকাল ধ'রে সংস্কৃত ও য়োরোপীয় কবিতা থেকে অনুবাদ করছেন বুদ্ধদেব— কালিদাস, রিলকে, বোদলেয়ার, হ্যেল্ডারলিন। এইসব অনুবাদে কেন প্রাথমিকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার আলোচনা করেছেন নিজেই :

"... এমন সময় মাঝে মাঝে আসেই যখন কবিতা লেখার জন্য আঙুল যেন নিশপিশ করে অথচ নিজের কোনো বলার কথা জ'মে ওঠেনি। এ-রকম সময়ে একটিমাত্র সন্নিকট বিকল্প হাতে আছে আমাদের : তা হ'লো অন্যের কবিতার অনুবাদ-বচনা। এই বিকল্পটি আমি অনেকবার ব্যবহার করেছি— 'যে-আঁধার আলোর অধিক' লেখার সময় থেকে বলা যায় প্রায় ধারাবাহিকভাবে, এই সেদিন পর্যন্ত। আমাব সমগ্র কাব্যবচনার মধ্যে অনুবাদগুলিকে আমি নগণ্য ব'লে ভাবি না; এরাও আমাব সচেতন প্রয়াসের ফলাফল, এবং কিছুটা দৈবেবও দান।

সেবাব বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর আমি কয়েকমাস একটি ইংরেজি প্রকাশন-সংস্থাব সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। সপ্তাহে তিন দিন আমাকে আপিশে যেতে হয়;... সে-বছর, কলকাতার প্রখর গ্রীষ্মে ট্রামে যেতে-যেতে, চলতি পথের পঁচিশ মিনিটে তিনটি অথবা চারটি ক'রে শ্লোকে নিবিষ্ট হ'তে-হ'তে, আমাব মনে হ'লো 'মেঘদূতে'ব অন্তর্নিহিত সব সৌন্দর্য ও বিস্ময় আমি এই প্রথম অনুভব কবছি। এব কয়েকমাস বা বছরখানেক পরে একদিন জ্বরে শুয়ে-শুয়ে পূর্বমেঘের প্রথম কয়েকটা শ্লোক অনুবাদ ক'রে ফেললাম— নেহাৎই খেলাচ্ছলে, বা রোগের নিষ্ক্রিয়তা কাটাবার জন্য। সে-সময়ে কল্পনা করিনি পুরো কাব্যটির অনুবাদ আমাব সাধ্যে কুলোবে; কিন্তু আরম্ভে যা ছিলো খেলা, তা-ই যখন হ'যে উঠলো একটা কাজ, একটা দায়িত্ব— যা আমি মেনে নিয়েছি মাথা পেতে, স্বেচ্ছায়— তখন দেখলাম যে ধীরে-ধীরে, অনেক চেষ্টায়, সেই দায়িত্বপালনের শক্তিও আমি পেয়ে যাচ্ছি নিজেব মধ্যে। এমনি দেখেছি আমি বার-বার— বোদলেয়ার, রিলকে, হ্যেল্ডার্লিন অনুবাদ করতে গিয়েও; অসম্ভব ভেবে অনেকদিন পর্যন্ত যে-কবিতাটার কাছে ঘেঁষিনি, অথচ যেটাব প্রতি আমার আকর্ষণ প্রবল, হঠাৎ কোনো শুভ লগ্নে সেই অপ্রবেশ্যার দ্বার খুলে গেছে আমার জন্য। যতক্ষণ আমরা কানে-কানে ধনুকের ছিলা না-টানছি ততক্ষণ আমরা আমাদের ক্ষমতার সীমা জানতে পারি না।— লেখকের জীবনে ধৈর্য ও পরিশ্রমই সব।"

কবিতার শত্রু ও মিত্র : কবিতা ও আমার জীবন

১৯৬৮ ।। বয়স ষাট

নাটক রচনা : নতুনভাবে

হঠাৎ মন গেছে নাটকে। প্রথম যৌবনে— ঢাকায় ছাত্রাবস্থায় কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন, জগন্নাথ হল-এ অভিনয়ও হয়েছিল। ঢাকা থেকে চলে আসার সময় সঙ্গে এনেছিলেন 'রাবণ' নাটকের পাণ্ডুলিপি, শ্যামবাজারি মঞ্চে অভিনীত হবার আশা নিয়ে; অভিনয় তো হলই না, নাটকের পাণ্ডুলিপি শুদ্ধ হারিয়ে গেল (দ্র. ১৯৩২)। মাঝখানে 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, 'মায়ামালঞ্চ' নামে বই হয়েও বেরিয়েছিল কবিতাভবন থেকে। তার বাইশ বছর পরে হঠাৎ নাটক লেখায় হাত দিলেন আবার, লিখে উঠলেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। সেই থেকে নাটকে যেন নেশা লেগে গেল তাঁর। জীবৎকালের অবশিষ্ট আট বছরে নাটক রচিত হবে আরো দশটি, তার কোনো-কোনোটি মঞ্চসাফল্য অর্জন করবে, অন্তত একটি নাটক পার করবে শততম অভিনয়রজনী [১]। তাঁর এই সময়ে রচিত নাটকের তালিকাটি এখানে তুলে দিই :

নাটক	রচনাকাল		প্রথম প্রকাশ
তপস্বী ও তরঙ্গিণী	জানু-ফেব্রু '৬৬		অগস্ট '৬৬
পাতা ঝ'রে যায়	'তুমি কেমন আছো'		অগস্ট '৬৭
বাবু ও বিবি	গ্রন্থে সংকলিত		অগস্ট '৬৭
কলকাতার ইলেকট্রা	১৯৬৭	একগ্রন্থে	জুন '৬৮
সত্যসন্ধ	১৯৬৭	প্রকাশিত	
কালসন্ধ্যা (কাব্যনাট্য)	১৯৬৭-৬৮		ফেব্রু '৬৯
পুনর্মিলন	১৯৬৯		মে '৭০
অনাম্নী অঙ্গনা (কাব্যনাট্য)	১৯৬৯	একই	নভে '৭০
প্রথম পার্থ (কাব্যনাট্য)	১৯৭০	গ্রন্থভুক্ত	
সংক্রান্তি/প্রায়শ্চিত্ত (কাব্যনাট্য) 'য়েট্‌স-এর নাটকের অনুলিখন	১৯৭০-৭১		জুলাই '৭৩
ইক্কাকু সেন্নিন (কাব্যনাট্য) কোম্পারু মোতায়াসু-র একটি নো-নাটকের অনুবাদ		একই গ্রন্থভুক্ত	

১. নাটকটি হল 'পাতা ঝরে যায়'। 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠী ষাটের দশকের শেষদিকে 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করতেন এটি।

এবং শুধু লেখা নয়। সারাক্ষণই নাটক নিয়েই ভাবছেন— সেই ভাবনা উপচে পড়ছে চিঠিপত্রে। রুমিকে লিখলেন :

৫/২/৬৮

"সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে একটি বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো, তাতে কানপুরের নন্দন সংঘ কর্তৃক অভিনীত "কলকাতার ইলেকট্রা"য় শ্রীমতী কল্যাণী সরকার শম্পার ভূমিকায় "শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী" রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। এই খবরটা দৈবাৎ 'অমৃতে' চোখে পড়লো। কী আশ্চর্য দ্যাখ, অন্তত সৌজন্য হিশেবেও আমার একটা অনুমতি নেয়া উচিত ছিলো, কিন্তু আমাকে ঘুণাক্ষরেও কিন্তু জানায়নি। যাই হোক কানপুরেব এই নন্দন সংঘ কারা, এবং কল্যাণী সরকাব ব্যক্তিটিই বা কে, এই খবরটা কি তোদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে?...কানপুরে ও-বকম একটা নাটক অভিনয় করার মতো একটি বাঙালি গোষ্ঠী আছে, এই খবরটা তোদের পক্ষেও উৎসাহজনক।"

'কালসন্ধ্যা' নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত লেখন আকাশবাণী কলকাতা থেকে সম্প্রচারিত হয়েছিল ২৫ এপ্রিল। সে-সম্পর্কে লিখছেন রুমিকে :

"৩১/৩/৬৮

আমার ন্যাশনাল প্রোগ্রামে নাটকেব তারিখ পঁচিশে এপ্রিল, রাত্রি সাড়ে-ন'টায় শুরু। বোম্বাইতে 'পাতা ঝ'রে যায়' ও 'বাবু ও বিবি' একবার অভিনয় হ'য়ে গেছে — ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে— তা কি তোকে বলিনি? (পঁচাত্তর টাকাও পেয়েছি সেজন্য।) এপ্রিলে আর-একবার হবার কথা আছে। আমি ডলি রিজভিকে বারবাব উৎসাহ দিয়েছি কলকাতায় একবার করার জন্য, হয়তো উনি নিয়ে আসবেন কোনো সময়। একটি অভিনেতা কলকাতার বাইরে থাকার জন্য 'পাতা ঝরে যায়'/ 'চিড়িয়াখানার গল্প' বন্ধ ছিলো কিছুদিন; এখন আবার হচ্ছে, সপ্তাহে একদিন ক'বে।"

আরো একটি পত্রাংশ, রুমিকে :

"২৯/৪/৬৮

আমার নাটকটা তুই ভালোমতো শুনতে পাসনি ব'লে আক্ষেপ করিস না, কলকাতায় ব'সে আমবাও শুনতে পাইনি। আবহসংগীত এত উচ্চ, উগ্র ও গতানুগতিক ছিলো যে তার তলায় চাপা পড়ে গেলো সেই ছন্দোবদ্ধ কথাগুলো, যা আমি বহু পরিশ্রম ক'রে রচনা করেছিলাম। সমস্ত জিনিশটা একটা বিশ্রী গোলমাল ব'লে মনে হচ্ছিলো আমার। শ্যামল ও তার সহকর্মীরাও খুব নিরাশ হয়েছে। আর-একটা দোষ হয়েছিল যে আমার স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও স্তব্ধতার কোনো মুহূর্ত ছিলো না। মেয়েদের কথাগুলো একেবারে রুদ্ধশ্বাস বেগে উচ্চারিত হবার জন্য তার বোধগম্যতা বা নাটকীয়তা কোনোটাই পরিস্ফুট হতে পারেনি। শ্যামলের নিজের অভিনয় ভালো হ'লেও এ-যাত্রায় অন্যদের তেমন যথোপযুক্ত মনে হলো না— সেও একটা দুঃখের কারণ।..."

হঠাৎ একটি চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি নিজের পাঠকগোষ্ঠী কারা সে-বিষয়ে অপ্রত্যাশিত মন্তব্য। এটিও রুমিকে লেখা।

"৯/৫/৬৮

আমাব বইয়ের যারা পাঠক তারা এরাই— তারা থাকে কাশীতে কানপুরে ঘিঞ্জি বাঙালিটোলায়, কলকাতার গলিতে, ছাত্রদের শস্তা মেস্-এ, হয়তো ঢাকুরিয়ার নোংবা নর্দমার আশেপাশে, তাদের সঙ্গে কোনো ককটেল-পার্টিতে দেখা হয় না, তারা কখনো বিদেশে যায়নি, যাবেও না, তুই খুবই আশ্চর্য হবি— আমার দুরূহ বইযেরও অনুরাগী এদেব মধ্যে যা পাওয়া যায়, 'উচ্চ' সমাজে তার শতাংশও নয়।"

নাটক নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, মঞ্চসফল নাটক রচনা করতে হ'লে মঞ্চশৈলী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার—

"১৩/৮/৬৮

'কলকাতাব ইলেকট্রা' মঞ্চস্থ করার একটা কথা উঠেছে; পাপ্পা পরিচালক, একজন অভিনেত্রী অবশ্য মিমি, কিন্তু তুই এখানে না-থাকাতে অন্য অভিনেত্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।... তোর মা মাঝে-মাঝে বলেন যে তিনিই সব ভার নিয়ে করাবেন, তাহ'লে দ্রুত এগিয়ে যাবে ব'লে আমার বিশ্বাস। আমার অর্থবল থাকলে আমরা নিজেরাই একটা নাটুকে দল গ'ড়ে তুলতে পারতাম— সে-রকম কিছু থাকলে অর্থলাভ ও আনন্দলাভ দু-ই হতে পারতো, আর নাটক বিষয়ে কিছু-কিছু ব্যাপার শিখেও নিতে পারতাম, যা মঞ্চে না-ফেললে ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু আমার জীবন অনেক বিষয়েই অকৃতার্থ থেকে গেল, এটাও তার মধ্যে একটা।"

[রুমিকে লেখা]

জর্মানির ইন্টারনাশিয়নেস্ সংস্থার আমন্ত্রণে জর্মানিতে কাটিয়ে এলেন কয়েক সপ্তাহ— মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত।

"... আমার ভ্রমণকাহিনী সংক্ষেপে লিখছি : জর্মানিতে ঘুরলাম স্টুটগার্ড ট্যুবিঙ্গেন ম্যুনিখ বের্লিন বন্ ফ্রাঙ্কফুর্টে, প্রথম সাত দিন শরীর ভালো ছিলো না,... প্রায়ই মনে হচ্ছে এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাই। ম্যুনিখে এসে আমার মানসিক আবহাওয়ার একটু পরিবর্তন হলো; বন্-এর বাড গোডেসবার্গের হোটেলটা বেশ পছন্দ হয়ে গেলো— দেখা হ'লো পুরোনো বন্ধু ফিশার ও রেহ্ফেল্ডের সঙ্গে—। ট্যুবিঙ্গেনের হ্যেল্ডার্লিনটুর্ম আমাকে ঈষৎ নিরাশ করলো— ছবিতে যতটা সুন্দর দেখায় আসলে যেন ততটা নয়, তাছাড়া হ্যেল্ডার্লিনের নিজের ঘরটা সংস্কারের জন্য বন্ধ ছিলো ব'লে দেখা হ'লো না। ফ্রাঙ্কফুর্টে গ্যেটের বাড়ি দেখলাম, আর দেখলাম ফোটোগ্রাফের একটি উৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী— "নারী : ১৯৬৮"।... বের্লিনে একটা নতুন আর্ট-গ্যালারি হয়েছে, তাতে মাক্স বেক্মান্‌কে বিশেষ ভালো লাগলো, আর বাড়িটাও দর্শনযোগ্য।...

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে এলাম রোমে, ডারিনা সিলোনির নিমন্ত্রণে। এঁর কথা তোকে অনেকবার বলেছি— ঔপন্যাসিক ইগনাৎসিয়ো সিলোনির স্ত্রী।... আপাতত জর্মানির স্মৃতি আমার মনে ম্লান হয়ে গেছে— কেবল মনে পড়ছে বোম ও ফ্লরেন্সের ঐশ্বর্য আর ডারিনার আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব।... পথে একদিন তেহেরানে থেমেছিলাম স্টার্লিনের জন্য— পশ্চিম এশিয়াকে একটুখানি চাখা হ'লো— এখন আবার সেই চিবচেনা কলকাতার সঙ্গে নতুন কবে চেনা করছি।..."

[রুমিকে লেখা]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিদেশে ভ্রমণে গিয়েও যা কিছু সাহিত্য বা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত শুধু সেসব বিষয়েই তাঁর উৎসাহ; তার চিঠিতে ক্বচিৎ পাওযা যায় নিসর্গবর্ণনা, বা সাধারণভাবে দেশবর্ণনা। এমনকি মানুষজনও, কোনো-না-কোনোভাবে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলে সাধারণত তাঁর কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে পারে না।

আরেকটি চিঠিতে বর্ণনা দিচ্ছেন নিজের জন্মদিনের। এই উৎসবটি তাঁদের পরিবারে হালে আরম্ভ হয়েছে— বন্ধুরা আসেন, ছোটোখাটো উপহার, হাসি-গল্প-গানে মুখরিত সন্ধ্যা। কিন্তু এই নিতান্ত সাধারণ বিষয়ের বর্ণনা থেকেও নির্ভুলভাবে চিনে নেয়া যায় বুদ্ধদেব বসু নামক মানুষটিকে, তাঁর সমস্ত ধ্যানধাবণা শুদ্ধ :

৪/১২/৬৮

"... সেদিন আশাতীত জনসমাগম হয়েছিলো— অনেকেই মদ্য উপহাব এনেছিলেন কিন্তু সুখের বিষয় তার ব্যবহার সীমাতিক্রান্ত হয়নি, তোব মা খাওযালেন বীফ রোস্ট আর কাবাব; সাগবময [ঘোষ] "বাঁশিতে ডেকেছে কে" গাইলেন, তোর মাকে দিয়েও গাওয়ানো গেলো; কিন্তু শেষ দফায় মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে যথোপযুক্ত অঙ্গসঞ্চালন ও কটাক্ষপাত-সমেত টপ্পা গেযে সকলেব হৃদয-মন একেবারে লুঠ করে নিলো সমরেশ [বসু]। ভুল বলেছি— তোর মা গাইলেন সমরেশের পরে, আর টপ্পার পরে রবীন্দ্র-সংগীত শুনে আমার মনে হ'লো যেন ভোগলিপ্সু সংসার ছেড়ে স্বর্গে উঠে এলাম। তাই ব'লে টপ্পাকে খারাপ বলছি না, তাতেও এক ধরনের 'খাঁটিত্ব' আছে। য়োরোপের ম্যুজিক-হলের গানের মতো সেটাতে আমাদের লৌকিক কামনা-বাসনা প্রকাশ পেয়েছে— বেশ ফুর্তিবাজ গান, করুণ নয়। সেদিন আমার (আর অন্য অনেকেরই) সমরেশ মানুষটাকে খুব ভালো লাগলো— ওর মধ্যে একটা চমৎকার সহজাত সরলতা আছে (যা কোথাও বোকামিতে অধঃপতিত হয় না), যেন প্রকৃতির মাতৃক্রোড়ে আছে এখনো, ইনহিবিশন খুব কম, একটু বেশি আবেগপ্রবণ, সাহিত্যিকসুলভ হিংসাদ্বেষ ইত্যাদি কুবৃত্তি থেকে একেবারে মুক্ত— সব মিলিয়ে যাকে বলে 'মন-

মাতানো' মানুষ, নজরুল ইসলামের পরে এ-রকম একটি রমণীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের সাহিত্যে আর দেখা যায়নি।"

[রুমিকে লেখা]

'প্রজাপতি' মামলায় সাক্ষ্য

এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগের মামলায় সাক্ষী দিলেন। ১৭ নভেম্বরের 'আনন্দবাজার' পত্রিকা থেকে সেই সাক্ষ্যদানের বর্ণনা :

"শ্রীবুদ্ধদেব বসু যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ান তখন আদালত জুড়ে নিস্তব্ধতা। দর্শকের আসনগুলি ভর্তি। বহু লোক দাঁড়িয়ে। কালো লাউঞ্জ সুট পরা শ্রীবসু প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে জেরার উত্তর দেন।

প্রশ্ন · আপনি 'দেশ' পত্রিকার শারদসংখ্যায় প্রকাশিত [১৩৭৪] 'প্রজাপতি' উপন্যাসটি পড়েছেন?

বু ব হ্যাঁ পড়েছি। পত্রিকাতেও পড়ি। তারপর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পরও পড়েছি।

প্রশ্ন : বইখানি কি অশ্লীল বলে মনে করেন?

বু.ব . মোটেই না।

প্রশ্ন · আপনি কি বলবেন বইটির অংশবিশেষ অশ্লীল?

বু ব না।

প্রশ্ন এই বইয়ের ১৭৬ পৃষ্ঠার চিহ্নিত অংশ সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন?

বু ব · আমি বুঝতে পারছি না এই লাইনগুলি কেন চিহ্নিত করা হল। এর মধ্যে গর্হিত কিছু নেই।

প্রশ্ন : ১৯৮ পাতার দুয়ের কলমে 'দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাবড়ে চুমু খাচ্ছিল—' এই বাক্যগুলি কি অশ্লীল মনে করেন?

বু.ব : আমার উত্তর— না। আমার বক্তব্য, এই বইয়ের নায়ক বা অনায়ক সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের রকবাজ ছেলেদের টাইপ। এরা আমাদের সকলেরই পরিচিত। এই যুবকেরা সাধারণত যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাতেই এই উপন্যাস লেখা। এই বইয়ে এত বেশি স্ল্যাং ব্যবহারের এটাই যৌক্তিকতা। এই স্টাইল জীবন্ত এবং জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি। এখানেই এই উপন্যাসের প্রধান সাফল্য।

প্রশ্ন : যদি কেউ বলেন সাহিত্যের পক্ষে পবিত্রতা অত্যন্ত দরকার— আপনি কী বলবেন?

বু.ব : পবিত্রতা রসায়নশাস্ত্রের কথা। এর সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। (আদালতকক্ষে হাস্যরোল) সাহিত্যে কোনটি পবিত্র কোনটি অপবিত্র তা আমরা জানি না।..."

এই প্রশ্নোত্তর ইংরেজিতে হয়েছিল— আনন্দবাজারে বঙ্গানুবাদ ছাপা হয়েছে। 'পবিত্রতা'— মূলে সম্ভবত purity শব্দটি ছিল, যে-কারণে বুদ্ধদেব রসায়নশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। বাংলা অনুবাদে 'বিশুদ্ধতা' হওয়া উচিত ছিল।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

যেসব কবিতা লিখছেন, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে দুটি গ্রন্থে : 'একদিন : চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা', এবং 'স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা'। উপন্যাস লিখছেন 'আয়নার মধ্যে একা', 'বিপন্ন বিস্ময়'। অনুবাদ করছেন রিলকে-র কবিতার। নাটক লিখছেন : 'কালসন্ধ্যা', 'পুনর্মিলন', 'অনাম্নী অঙ্গনা' ও 'প্রথম পার্থ'।

'গোলাপ কেন কালো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হল ফেব্রুয়ারিতে, 'আয়নার মধ্যে একা' অক্টোবরে। 'কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ' প্রকাশিত হল জুন মাসে। ছোটোদের জন্য বেরোল একটি সংকলন : 'হাসির গল্প'।

১৯৬৯ ।। বয়স একষট্টি

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মৃত্যু

১৯৩২ সালে কুমিল্লা থেকে 'পূর্বাশা' পত্রিকা বের করেছিলেন— সেই থেকে বুদ্ধদেবের সঙ্গে পরিচয়, বয়সে তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোটো। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নানা কারণে বারবার বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়েছে, পুনশ্চ মিলন হয়েছে— এই গ্রন্থে অন্যত্র তার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুর (৪/২/৬৯) পর কনিষ্ঠা কন্যাকে লিখছেন (১১/২/৬৯) :

> "সঞ্জয় ভট্টাচার্য মারা গেলেন— তুই জানিস কিনা জানি না। সেদিন সকালে নরেশ ফোন ক'রে জানালে, তোর মা আর আমি চ'লে গেলাম তক্ষুনি। ভোরবেলা বা শেষরাত্রে স্ট্রোকে মৃত্যু— সত্যপ্রসন্ন বোঝেননি প্রথমে— ঠিক সুধীন্দ্রর মৃত্যুর মতো। আমাকে কিছুদিন আগে জন্মদিন উপলক্ষে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেই থেকে যাবো-যাবো করছিলাম— ঢাকুরিয়ার দুর্গম অংশে বাড়ি, একা খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে ভেবে সুবীরকে বলেছিলাম সঙ্গে যেতে— সে সানন্দে রাজি ছিলো— কিন্তু যেমন হয়, যাই-যাচ্ছি ক'রে যাওয়া হ'লো না। বহু বৎসর ধ'রে দেখছিলাম, তিনি হঠাৎ-হঠাৎ চিঠি লেখেন আমাকে বা তোর মাকে, মাঝে-মাঝে কবিতাও পাঠাতেন— আজ ভাবতে খারাপ লাগছে যে এই নিঃসঙ্গ রুগ্ন মানুষটির স্নেহের আমরা যথাযোগ্য প্রতিদান দিইনি। আমি মাঝে-মাঝেই সত্যপ্রসন্নর কথা ভাবছি এ-ক'দিন— তাঁর জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য রইলো ন, লক্ষ্য রইলো না— একেবারে রিক্ত হয়ে গেলেন।"

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা ছিল— তারপর বারো বছরের মধ্যে 'কবিতা'য় তাঁর আর কোনো লেখা বেরোয়নি, দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁর একটি কবিতা যাওয়া নিয়ে মতদ্বৈধ তার কারণ। গদ্যকবিতা নিয়ে মতবিরোধের পর প্রেমেন্দ্র মিত্রও 'কবিতা' পত্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় 'নিরুক্ত' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সময় বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করে রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল 'পূর্বাশা'য়। কিন্তু পরে সঞ্জয় ভট্টাচার্যই পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করেন, বুদ্ধদেবও তাঁর স্বভাব-অনুযায়ী কোনো তিক্ততা মনে রাখেননি। একথা বোঝা যাবে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পর্কে 'আমার যৌবন' গ্রন্থে তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও তাঁর 'পূর্বাশা' পত্রিকার ঐতিহাসিক স্থান, এবং বুদ্ধদেবের জীবনে তার মূল্য— এই সবই এই স্মৃতিচারণে প্রকাশ পেয়েছে—

"আরম্ভকালে সঞ্জয় চেয়েছিলেন 'কল্লোলে'র শূন্য স্থান পূরণ করতে, তাঁর আতিথ্যে পুনর্মিলিত হয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য আমি আর প্রেমেন আর অচিন্ত্য— লোকেরা যাদের তখনও বলছে 'কল্লোলের ট্রায়ো'—তখন-পর্যন্ত-অনতিখ্যাত জীবনানন্দকেও তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। অচিন্ত্য আর আমি তাঁকে বার-বার লিখছিলাম তাঁর পত্রিকা নিয়ে কলকাতায় চ'লে আসতে; এবং সেই বদলটি ঘটবার পর কিছুদিনের মধ্যে পূর্বাশার আসর জ'মে উঠলো, আধুনিক সাহিত্যের পরিমণ্ডলে সঞ্জয় একটি নিজস্ব স্থান ক'রে নিলেন।"

—*আমার যৌবন।* ১ম সং, পৃ. ৭১

'রাত ভ'রে বৃষ্টি' : অশ্লীলতার অভিযোগ

'রাত ভ'রে বৃষ্টি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল দু-বছর আগে, ১৯৬৭ সালে। তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার আইনগত অভিযোগ এল এই বছর— আনলেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের নীলাদ্রি গুহ। অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি হাকিমের আদালতে মামলা নং সি/৪৫৭ (১৯৬৯)। জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁর সম্পাদিত 'কলকাতা' পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৮ম সংকলনে (১৯৭৩) এর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

"এই মামলার শুরুই হয়েছিল কলকাতার এক বিকারে। উনিশশো উনসত্তর সালে অনেক সুস্থ মানুষও দিশেহারা হয়ে নানান দলবদ্ধ পাগলামিতে মেতে উঠেছিলেন। ... বাঙালি সমাজ হাবিয়ে ফেলেছিল আত্মবিশ্বাস, ক্ষীণ হয়ে এসেছিল জীবনেব উপভোগ।... এ রকম আবহাওয়ায় বুদ্ধদেব বসুর মতো নিভৃত ও কর্মী মানুষ সমাজের শত্রুরূপে চিহ্নিত হবেন, তাতে আশ্চর্য কী? আর সমাজের শালীনতার রক্ষকরূপে যে-অবতার আবির্ভূত হলেন তাঁর এক হাতে বোমা, অন্য হাতে চাঁদার খাতা। এই আমহার্স্ট-স্ট্রিট-ত্রাস নীলাদ্রি গুহের সঙ্গে আমার প্রায়শই সে সময় দেখা হত কারণ 'কলকাতা' তখন ঐ অঞ্চলেই ছাপা হচ্ছে। এই মামলার উভয় পক্ষকেই আমি চেনার সুযোগ পেয়েছিলাম।... নীলাদ্রি উকিলরূপে অবলম্বন করেছিল এমন একটি চরিত্রকে যার শারীরিক ও মানসিক স্থূলতা কেবল বালজাক বর্ণনা করতে পারেন। মনস্তত্ত্ববিদ মানসী দাশগুপ্তকে— যিনি তাঁর অভিজ্ঞতা নিচে লিপিবদ্ধ করেছেন— সওয়াল করার সময় কৌঁসুলি কেবল সাক্ষীর শরীরে হাত দিতে বাকি রাখেন। এঁরাই ছিলেন সেই রুগ্ন কলকাতার নৈতিকতার রক্ষক! আর আসামির খাঁচায় ছিলেন একষট্টি বছরের বুদ্ধদেব বসু, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, রাষ্ট্রের সম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট নাগরিক, যিনি ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ, অনুবাদ করেছেন কালিদাস ও বোদলেয়ার ও রিলকে, শ-দেড়েক গ্রন্থের রচয়িতা, 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক, 'বন্দীর বন্দনা'র কবি।..."

বুদ্ধদেব নিজেও এই মামলাব কিছু-কিছু বিববণ প্রবাসী কন্যাকে লিখে পাঠিযেছিলেন। তাঁব নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই বর্ণনা পাঠকেব কৌতূহল জাগাতে পাবে :

১৪/৭/৬৯

"।. এদিকে জনৈক ল-কলেজেব ছাত্র 'বাত ভ'বে বৃষ্টি'ব বিরুদ্ধে অশ্লীলতাব মামলা এনেছে, লেখক, প্রকাশক সুপ্রিয সবকাব, মুদ্রক নাভানাব গোপাল বায — সকলকেই জডিযেছে। ঘটনাটাকে একেবাবে অপ্রত্যাশিত বলা যায না— বাংলাদেশ পাগল হ'যে যাচ্ছে— তবু একটা উৎপাত তো বটেই— সময নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট, কিছুটা অর্থনাশও সেই সঙ্গে। সুপ্রিয মামলা লডাব জন্য উৎসাহিত এই একটা আশাব কথা।... কাল করুণাশঙ্কবকে নিযে জ্যোতি এসেছিল— করুণাই ডিফেন্ড কববে এবাবও— কিন্তু আমাব বিশ্বাস শাস্তি হবেই। জ্যোতি বলছে আমাব জবিমানা না দিযে প্রতিবাদেব ভঙ্গি হিশেবে জেলে যাওযা উচিত, আমি প্রস্তাবটা বিবেচনা কবছি— বাডিব মহিলামহল (তিতিব সমেত) এব ঘোব বিবোধী, তোব মত কী জানাস। "

৪/৪/৭১

" .. চাবদিকে শুধু মন-খাবাপ-কবা ব্যাপাব, কিন্তু একটা ঈষৎ ভালো খবব আছে। 'বাত ভ'বে বৃষ্টি'ব বায বিভিশনেব জন্য করুণাশঙ্কব যে-আবেদন কবেছিল সেটা মঞ্জুব হযেছে। এটা আপীল নয, যা হাইকোর্ট গ্রহণ কবতে বাধ্য (২০০ টাকাব ঊর্ধসংখ্যা জবিমানা না-হ'লে আপীল হয না)— এটা নামঞ্জুব হবাব সম্ভাবনা খুবই ছিলো। এবং মঞ্জুব হবাব মানেই হ'লো যে হাইকোর্টেব জজেব মতে নিম্ন-আদালতেব বায আইনেব দিক দিযে ভুল হযেছিলো। নিম্ন আদালতকে কাবণ দর্শাতে বলা হযেছে কেন তাব বায বাতিল ক'বে দেযা হবে না— শুনানি হবে চাবমাস পবে। করুণাশঙ্কব এবাব খুবই আশান্বিত, তবে বেশি আশা না-কবাই ভালো। তবে আপাতত বইটা আবাব ছাপা হ'তে পাববে, এটুকুই লাভ।..."

১০/৮/৭১

" .. 'বাত ভ'বে বৃষ্টি'ব মামলা হাইকোর্টে উঠছে— করুণাশঙ্কব যে উদাবচেতা জজেব আশায ছিলো তাঁব এজলাসে পডেনি, বিবোধী পক্ষ দুই সেট কৌঁসিলি পেযেছে (এক সেট সবকাবি খবচে), টেলিফোনে করুণাব গলা খুব উৎসাহী শোনালো না, বইটা (আপাতত) নিহত হবে ধ'বে নে।..."

শেষ পর্যন্ত তা হযনি অবশ্য— বুদ্ধদেবেব আশঙ্কা ব্যর্থ প্রমাণিত ক'রে তাঁর অনুকূলেই হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছিল (দ্র. ১৯৭৩)।

বুদ্ধদেবের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে 'কলকাতা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল— সম্পাদনা করলেন নরেশ গুহ ও অরুণকুমার সরকার।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

নাটক লিখছেন পরপর। 'কালসন্ধ্যা', 'পুনর্মিলন', 'অনাম্নী' অঙ্গনা', 'প্রথম পার্থ'। নিজের লেখা সম্পর্কে অতৃপ্তি :

"... আমার অবস্থা ভালো যাচ্ছে না, সারাদিন ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করি, লেখা থামিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকতে ইচ্ছে করে। এরই মধ্যে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে একটা নাটক লিখলাম— 'দেশ'-এ পাঁচ সংখ্যায় বেরোবে। এখন চেষ্টা করছি 'বিপন্ন বিস্ময়' আর 'শ্রীমতী ও আরতি' কে মিলিয়ে একটা চলনসই উপন্যাসে দাঁড় করাতে — কিন্তু যা লিখেছিলাম তার কিছুই যেন পছন্দ হচ্ছে না— কেটে আবাব লিখছি, আবার সেই নতুন লেখাও কেটে দিচ্ছি, এমনি ক'রে দিনগুলি কেটে যাচ্ছে।...'

—দময়ন্তীকে চিঠি : ৬/৩/৬৯

কালসন্ধ্যা' কাব্যনাট্য প্রকাশিত হল ফেব্রুয়ারিতে। দশ বছর ধরে লেখা 'বিপন্ন বিস্ময়' উপন্যাস বেরোল সেপ্টেম্বরে। এত দীর্ঘদিন ধরে আর কোনো উপন্যাস তিনি লেখেননি।

১৯৭০ ।। বয়স বাষট্টি

পুত্রের বিবাহ : ভাবী বধূর সঙ্গে পরিচয়

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ থেকে :

"পাপ্পা তার একটি ছাত্রীকে বিবাহ করেছিল। আমার ছোট কন্যা তখন এখানে ছিল এবং পাপ্পা খবরটা প্রথমে তার মনের কথা বলার বন্ধু ছোড়দিকেই জানিয়েছিল। এই মেয়েটিকে সে বিবাহ করবে স্থির করেছে। রুমি তো মহাখুশি এবং সাবা বাড়িতে খবরটা ঘোষণা করে দিল। পাপ্পার বেশ লজ্জা লজ্জা ভাব। আমি বললাম, 'ওমা, সেই মেয়েটিকে আমাদের একবার দেখাবি না নাকি?'

মাথা নেড়ে সহর্ষে বলল, 'নিশ্চয়।' তারপর একদিন নিয়ে এল তাকে। আমি তো দেখে তখুনি মায়া মোহে আক্রান্ত। পাপ্পা তার বাবার কাছে নিয়ে যেতেই ভয় পাচ্ছে। বাবা তার নির্বাচিত ছাত্রীটিকে কী কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন সে বিষয়ে যদিও ও বেশ ভালো হাতেই তালিম দিয়ে এনেছিল, তথাপি ভয়, মেয়েটি প্রথম পরীক্ষাতেই ফেল করবে।

বাবাকে জানান দিয়ে যখন সে ভাবী বধূকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো, চেয়ার ঠেলে উঠে 'আরে এসো এসো' বলে সাদর অভ্যর্থনায় দারুণ খুশি হয়ে স্বাগত জানালেন। দু'এক কথার পরেই বললেন, 'তুমি কী ভালোবাসো? চা না কফি?'

ঐ সময়টাতে বুদ্ধদেব এক কাপ চা খেতেন। এই উত্তরটা পাপ্পা শিখিয়ে আনেনি। স্বাতী নিজেই ভেবেচিন্তে বলল, 'কফি।'

আর যায় কোথায়। 'কফি! নাহ্, আমার সঙ্গে তাহলে আর তোমার মিল হল না। শেষে তুমি চা ছেড়ে কফি ভালোবাসলে?

এদিকে পাপ্পা তার বাবার দিকে পিছন ফিরে যে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে 'চা চা' বলছে সেটা লক্ষই করেনি স্বাতী।

এর পরের প্রশ্ন, 'আচ্ছা, তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে শেলফে একসঙ্গে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছ, বল তো কার? স্বাতী একবাক্যে বলে উঠল, 'কীটস'।

'গ্র্যাণ্ড! দারুণ' বুদ্ধদেব মহাখুশি, 'চা দিতে বলো রানু, বুঝলি পাপ্পা, ওকে আমি ঠিক চায়ের নেশাই ধরিয়ে দেব। ওসব কফিটফি আর তখন খাবে না। কিন্তু এটা তো বলতে পারলো!'

পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা যে আসতে পারে এটা আন্দাজ করে পাপ্পা আগেই শিখিয়ে এনেছিল। একেবারে ফার্স্টক্লাশ নম্বর পেয়ে গেল।

পাপ্পার বিয়ে হয়েছিল ১৯৭০ সালের ফাল্গুনে। দুপক্ষ কুটুম্বই আমরা পরস্পবকে ভালোবসে খুব সুখী হয়েছিলাম। বৌ আমাদের সকলের নয়নতারা। বৌভাতের দিন ক্যালকাটা ক্লাব থেকে উর্দিআঁটা সব পরিবেশক আনা হয়েছিল, রান্নাটা হয়েছিল বাড়িতে। আর বাজার কবেছিল পাপ্পার বন্ধু, আমাদের পুত্রতুল্য একটি আমেবিকান ছেলে ক্লিণ্টন বি সিলি আর ওদেব লারুমামা। ক্লিন্ট জীবনানন্দ বিষয়ে গবেষণা করছিল[১], সুন্দর বাংলা বলতে শিখেছিল। এই বিবাহে সে বরকর্তার পার্ট নিযে মহা গর্বিত।"

—*জীবনেব জলছবি*, ৩য় মু, পৃ. ২৮৬।

প্রেরণার সংজ্ঞা : তাঁর কাছে, এখন

আসন্ন শীতের এক সন্ধ্যায়, প্রেরণার এক আশ্চর্য সংজ্ঞা লিখে পাঠালেন কন্যাকে। প্রথমটা পড়ে আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে কবে না— এই সেই বুদ্ধদেব। 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী'র বুদ্ধদেব। তারপর ধীবে-ধীরে, তাঁর সমস্ত জীবনের পশ্চাৎপটের কথা মনে পড়ে যখন, প্রেরণার এই সংজ্ঞা আমাদের কাছে ক্রমশ বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে থাকে।

৬/১১/৭০, সন্ধ্যা

"... নিজের মনে প্রেরণা না-থাকলে কোনো কাজই কবা যায় না, আমি প্রদীপ ডক্টব ফ্যুর্স্ট তিনজনেই তোকে এই কথা বিভিন্নভাবে অনেকবাব বলেছি। কিন্তু প্রেরণাটাও প'ড়ে পাওয়া জিনিশ নয়— সেটাকেও নিজের মধ্যে তৈবি ক'রে নিতে হয় কখনো-কখনো, এবং তৈরি করে নেয়া যে সম্ভব তা আমি খুব ভালোভাবেই জানি। তুই কি ভাবিস আমি সম্প্রতি যত লেখা লিখেছি সবই প্রেরণার তাগিদে? কত সময় আমার শূন্য মনে হয় নিজেকে, যেন কিছুই ভাবতে পারছি না, একটা কথাও মাথায আর খেলছে না— তবু মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে কিছু-একটা বের করেছি। ধরতে চেয়েছি, সাহস ক'রে শুরু করে দিয়েছি, প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য নিয়ে যুদ্ধ ক'বে-ক'রে এগিযেছি— আমার সেই কষ্টের কথা কাউকে বলার নয।— কেন করি বল্ তো? প্রথমত, স্থূল খাওয়া-পরার তাগিদে, দ্বিতীয়ত (সেটাও কম জরুরি নয়) সময় কাটাবার জন্য। (যদি আমি বহু অর্থের অধিকারী হতাম তাহলেও এমনি করে দিন কাটতো আমার— বছরে দু-একবার হয়তো দেশভ্রমণে বেরোতাম, এ ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য তফাৎ হ'তো না।) কিন্তু এই কষ্টও আমাকে এক ধরনের

১. ক্লিণ্টন বি. সীলি (Clinton B. Seely) জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে গবেষণা করতে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর জীবনানন্দ-জীবনী A poet apart : A Literary Biography of the Bengali poet Jivanananda Das ১৯৯০ সালে নিয়ুইয়র্কের য়ুনিভার্সিটি অব ডেলাওয়ার প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত এটি জীবনানন্দের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ বলে পরিচিত।

সুখ দেয়। আর সেই সুখানুভূতি থেকেই কিছুক্ষণ পরে মনটা বেশ তেতে ওঠে যেন, সেই 'গরম' অবস্থাটারই অন্য নাম বোধহয় প্রেরণা। ধৈর্য—ধৈর্যই সব। অথবা বাধ্যতা।"

[রুমিকে চিঠি [

'পদ্মবিভূষণ' খেতাব

জাতীয় সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' প্রাপ্তির খবর এল। বুদ্ধদেব বসু খেতাবদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি, শুধু তাই নয়, খেতাবের প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করেননি। প্রথমে ভেবেছিলেন প্রত্যাখ্যান করবেন ; কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলেও খেতাবের গুরুত্ব বাড়ে, তা ছাড়া সংবাদমাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। তাই পারিবারিক ও বন্ধুমহলে আলোচনা করে, এই অযথা সরকারি সম্মানকে অবহেলা করার দ্বারাই তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

এখানে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। বুদ্ধদেব বসু 'পদ্মবিভূষণ' খেতাব পেয়েছিলেন, 'পদ্মভূষণ' নয়। তাঁর একাধিক জীবনপঞ্জিতে এই ভুল তথ্য উল্লিখিত হতে দেখেছি।

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

কবিতা লিখছেন— এগুলি প্রকাশিত হবে 'একদিন : চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা', এবং 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থে, আগামী বছর। মে মাসে বেরোল 'পুনর্মিলন' নাটক। 'রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা', অগস্ট ; 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ' কাব্যনাট্য, নভেম্বর।

বুদ্ধদেব বসুর শেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ হল 'রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা'। অনুবাদকের বক্তব্য অংশে তিনি লিখেছেন :

"প্রায় পঁচিশ বছর আগের রিলকে বিষয়ে আমার আগ্রহ জেগেছিলো, পরবর্তী বছর পনেরোর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গুটি কয়েক কবিতার অনুবাদও করেছিলাম। কিন্তু এই বইয়ের অনুবাদগুলির মধ্যে অধিকাংশই গত তিন বছরের রচনা।...

... বোদলেয়ার ও হ্যেল্ডার্লিন থেকে আমি যে-ভাবে অনুবাদ করেছিলাম, এখানেও তা-ই ছিলো আমার পদ্ধতি। আমার সামনে ছিলো মূল রচনা ও অনেকগুলি ইংরেজি অনুবাদ... বিভিন্ন ইংরেজি লেখন তুলনা ক'রে, এবং অভিধান ও ভাষাবিদ বন্ধুদের সাহায্যে, মূলের অভিপ্রায় ও চিত্রকল্প বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি।...

কেন তিনি, পঁচিশ বছর ধরে, অন্য সব কাজের ফাঁকে-ফাঁকে, এতখানি সময় দিয়েছিলেন রিলকে-কে, করে তুলেছিলেন নিজের জীবনের অংশ? তিনি

কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য অনুধাবন করা হয়ত অসম্ভব নয়। রিলকে-র মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন নিজেরই এক পূর্ণতর প্রতিচ্ছবি— তিনি নিজে যা হতে চেয়েছিলেন, নিজেকে যা-তে পরিণত করে তুলতে চেয়েছিলেন, রিলকে যেন তারই পরিপূর্ণতম, বিশুদ্ধতম রূপ। এই ভাবনাটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থের ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদটিতে :

> "এমন এক কবি, যিনি সর্বতোভাবে কবি হ'তে চেয়েছিলেন। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে কবি। দৈনন্দিনতম জীবনেব অর্থহীনতম মুহূর্তেও। ভ্রমণে ও মননে, বাক্যে, ব্যবহারে, পত্ররচনায়। যখন তিনি কবিতা লিখছেন না বা লিখতে পাবছেন না, তখনও। যখন তিনি অসুস্থ বা হতাশ, বা মনঃক্ষুণ্ণ, তখনও।... যাঁর কাছে তাঁব জীবন ছিলো তাঁর অন্তর্নিহিত অনলের ইন্ধনমাত্র : যত দেশ ও ভূদৃশ্য তিনি দেখেছিলেন ; যত পশু, পাখি, ফুল, ফল, বৃক্ষকে গ্রথিত করেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতায় ;... যত পুরুষ তাঁকে বন্ধুতা দিয়েছিলো ; যত নাবী তাঁকে উৎসর্গ করেছিলো সৌহার্দ্য, ভক্তি, আতিথেয়তা, ও দেহমনের প্রণয় ;... এই সব-কিছুর মূল্য যেন শুধু ততটুকুই, যতটুকু তাঁর চুল্লিতে তারা জ্বালানি হতে পাবে। যাঁব বিষয়ে আমাদের প্রায় সন্দেহ হয় যে তিনি সাধারণ অর্থে 'বেঁচে থাকতে' কখনো চাননি, চেয়েছিলেন শুধু নিজেকে কবিতাব একটি বাহন করে তুলতে— এমন এক ধনুর্গুণ, যা লক্ষ্যবোধের জন্য সর্বদা টান হ'য়ে আছে, সর্বদা প্রস্তুত। এমনি ছিলেন, রাইনাব মারিয়া বিলকে।"

১৯৭১ ।। বয়স তেষট্টি

আবার উপার্জনের চিন্তা

উপন্যাস লিখতে আর ইচ্ছে করছে না বুদ্ধদেবের। সেই বুদ্ধদেব বসু— এক বছরে যাঁর পাঁচখানাও উপন্যাস বেরিয়েছে এক সময়। এখন তিনি মগ্ন হয়ে থাকতে চাচ্ছেন নিজের মধ্যে, 'মহাভারতের কথা'র প্রবন্ধ রচনার মধ্যে—এবং হয়তো মাঝে-মাঝে একটি নাটক, বা ক্বচিৎ একটি কবিতা লিখে ওঠা। এই সময় তিনি চাচ্ছিলেন এই অর্থচিন্তা থেকে অন্তত সাময়িক মুক্তি, অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও, যাতে নিশ্চিন্তে, উপন্যাস জাতীয় অর্থপ্রসবী লেখার চাপে বিব্রত না হ'য়ে, অনন্যমনভাবে শেষ করে উঠতে পারেন 'মহাভারতের কথা'। ১৮ চৈত্র ১৩৭৮ সংখ্যা থেকে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকবে 'দেশ' পত্রিকায়। শিমলার ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্স্‌ড স্টাডিজ-এ বৃত্তির জন্য চেষ্টা করেছিলেন এই সময়। কনিষ্ঠা কন্যাকে লেখা চিঠি থেকে (১/২/৭১) :

"... নীহাররঞ্জন ['বাঙালির ইতিহাস' রচয়িতা নীহাররঞ্জন রায়, তখন শিমলা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ছিলেন] আমার চিঠির আশাপ্রদ উত্তর দিয়েছেন— যদি শিমলার ব্যাপাবটা হ'য়ে যায় তাহ'লে ভাবছি সত্যি বাড়ি-বদলের চেষ্টা করবো। এ-বিষয়ে তুই কী বলিস? স্পষ্ট দেখছি, লেখনী দ্বারা জীবিকা উপার্জন কবা আর সম্ভব হচ্ছে না, আমাকে অন্য একটা কিছু জোটাতেই হবে।..."

শিমলার কাজটা শেষ পর্যন্ত হয়নি— অথচ অন্য কোনো অর্থকরী কাজেও মন দিতে ইচ্ছে করছে না :

"পুজোয় একটা উপন্যাস একটা নাটকের কথা দিয়েছি— আজ মে মাসের মাঝামাঝি হ'তে চললো, অথচ কোনোটাই মনে ধরা দিচ্ছে না— আমার অবস্থা শোচনীয়। টেনেবুনে নাটকটা যদি-বা শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি, এ-মুহূর্তে উপন্যাস অসম্ভব মনে হচ্ছে— কোনো একটা বিবরণ লিখতে হবে, ঘটনা বানাতে হবে ও সাজাতে হবে, তা ভাবতেই যেন ক্লান্তি আসে। ভাবছি সামনের বছর থেকে উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেবো— যদিও রোজগার সেটাতেই।..."

—কনিষ্ঠা কন্যাকে চিঠি, ১২/৫/৭১

এ-বছর জুন মাসে লিখে উঠলেন তাঁর জীবনের শেষ উপন্যাস— 'রুক্মি'।

শেষবার বিদেশযাত্রা— এয়ার-ইণ্ডিয়ার আমন্ত্রণে চারদিনের জন্য লণ্ডন ভ্রমণ।

"১৭/৫/৭১
এদিকে আমি এয়ার ইণ্ডিয়া কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছি— ওদের নতুন জাম্বো জেট-এ চারদিন লণ্ডনে বেড়াবার জন্য। কলকাতা থেকে ছাড়ছি ২২শে রাত্রে, ২৩শে সারা দিনরাত বম্বাইতে। ২৪শে সকালে যাত্রা করে সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় লণ্ডন। চেষ্টা করছি ফেবার পথে প্যারিসে কয়েকদিন কাটাতে। যদি কোনো আর্থিক ব্যবস্থা হয়। প্যাবিসে যাওযা হলে জুনের ৩/৪ তারিখ নাগাদ কলকাতায় ফিরবো।"

[রুমিকে চিঠি]

যে নাকতলায় আসতে হবে ব'লে, বহুদিনের পরিচিত রাসবিহারী অ্যাভিনিউকে ছেড়ে আসার বেদনায় প্রায় মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিলেন, চার-পাঁচ বছরে সেই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে এখন। নকশাল আন্দোলনজনিত বিশৃঙ্খলায় কলকাতা যত মলিন হচ্ছে, ততই যেন তাঁর আরো বেশি করে ভালো লাগছে মফস্বলি চরিত্রের নাকতলাকে। লিখছেন রুমিকে :

"২৪/৮/৭১ রাত্রি। কলকাতা ৪৭
... বুঝতে পারছি, তুই দূরে আছিস ব'লেই নাকতলা বা কলকাতা নিয়ে এত ব্যাকুল হয়েছিস, এখানে থাকলে ভিন্ন অনুভূতি হ'তো। সত্য, বিজয়গড়ে সম্প্রতি খুব বাড়াবড়ি গেলো, একেবারে জ্বরবিকারের অবস্থা, মিলু মল্লিকা লালা কয়েকদিন বেরোতে পারেনি। নতুন উপসর্গ : ছ'নম্বর বাসে অগ্নিসংযোগ, যার ফলে এখন আমরা ব'লে থাকি যে ছ-নম্বর বাস মাঝে-মাঝে চলে। পাঁচ, পঁয়তাল্লিশ ইত্যাদি অনাহত আছে, এবং প্রতিবার একই জায়গায় দহনানন্দরা বেরিয়ে আসে— তাদের প্রাতঃকালীন ব্যায়াম ও আমোদ সাঙ্গ হলে স্থানীয় রিকশাওলাদের উপার্জন ডবল বেড়ে যায়। দ্যাখ— সব ঘটনারই কিছু-না-কিছু ভালো দিক আছে। প্রায় কাঁদিদের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু এর একটা গভীরতর কারণও তোকে বলি শোন। কলকাতার বৈদ্যুতিক বিশৃঙ্খলা (শুধু গড়িয়া-নাকতলার নয়,, সারা শহরের) তুই যা দেখেছিলি সে তুলনায় এখন পরিবর্ধিত— কবিতার প্রেরণার মতো, বা ঈশ্বরের অনুভূতির মতো এই আসছে এই যাচ্ছে (এটা কিন্তু লোডশেডিং, শ্রমিক সংক্রান্ত গোলযোগ বা তার কাটার ব্যাপার নয়।) সন্ধের পরে বালিগঞ্জ থেকে নাকতলা পর্যন্ত মাঝে-মাঝেই দু-তিন ঘণ্টা তিমিরাবৃত থাকে। আশ্চর্যের কথা এই যে আমি আর বিরক্ত বোধ করি না, খুব জরুরি কাজের মধ্যেও হঠাৎ আলো নিভে গেলে আমার মুখের একটি পেশিও কম্পিত হয় না, মোমবাতি দেশলাই টর্চ নিয়ে তৈরি হ'য়ে থাকি, সাধ্যমতো কাজ চালিয়ে যাই— আর এ বছর, ঈশ্বরের দয়ায় কলকাতায় গরম পড়লোই না, না জ্যৈষ্ঠে না ভাদ্রে, নানা দিকে এত উত্তাপ দেখে গ্রীষ্ম ঋতু ভীত হয়েছে মনে হয়। আমার চরিত্রের উন্নতি হচ্ছে, রুমি, আমি ব্যবহারিক জীবনে ধৈর্য শিখছি, আমার কুখ্যাত অস্থির স্বভাব বহুল-পরিমাণে সংশোধিত হয়েছে

— এবং এই আত্মশোধনেব সুযোগ, তুই-ই বল পৃথিবীব আব কোথায় পাওযা যেতো।

আব সেইসঙ্গে, যে-নাকতলা বিষযে আমি এত বিরূপ ছিলাম, তাব কিছু গুণপনাবও আমি সমাদব কবতে শিখেছি। এত বড়ো বাড়ি, তোবা সবাই এসে থাকতে পাবিস, এত আকাশ বাতাস গাছপালা ইত্যাদি, আমাব বইগুলো বহাল-তবিযতে আছে— এগুলো পুবোনো কথা। কিন্তু অপর্যাপ্ত জলেব জোগান, সেটাই কি কম কথা। আব জল কী ঠাণ্ডা, কী ভালো লাগে সকালে স্নান কবতে। যখন ভাবি যে 'খাঁটি' বালিগঞ্জে পাঁচশো টাকা ভাড়াব বাড়িতে ফ্লাশ টানলে জল বেবোয না, তখন বালিগঞ্জেব প্রতি ঔৎসুক্য আমাব ক্ষীণ হ'যে যায। আমাদেব সামনেকাব যে-জলধাবাকে আমবা এতকাল নালা, নর্দমা ইত্যাদি ব'লে অবজ্ঞা কবেছি, সে এবাবে প্রমাণ ক'বে দিযেছে যে সে সত্যিকাব গঙ্গা, 'আদি গঙ্গা'— এই এক মাসেব মধ্যে অন্তত দশ-বাবো দিন তাব বানেব টানে নে সু.চ.ব বোড প্লাবিত হযে গিযেছে — আমিও দু-একদিন ছাদ থেকে সেই দৃশ্য উপভোগ না ক'বে পাবিনি। (ভুল কবিস না, এটা বাস্তায জল দাঁড়াবাব মতো ব্যাপাব নয, স্কুল-ফেবতা ছোটো মেযেদেব জানুস্পর্শী জল যেমন আধ ঘণ্টাব মধ্যে নিশ্চিহ্ন হ'যে যায সেও কম আশ্চর্য নয— সাধে কি বলে ভগবানেব কাজ ভগবান কবেন।) আজকাল বোদালো দিন পাওযা যাচ্ছে, আমাকে একদিন ব্যাঙ্কে যেতে হযেছিলো, বহুকাল পব বেবিযে এত ভালো লাগছিলো বাইবেব হাওযা (দুপুববেলাতেও স্নিগ্ধ), আব স্রোতস্বিনী আদিগঙ্গা আব সাঁকো আব ওপাবেব বাড়িগুলো— যে বোমাণ্টিক মোহে আমি অকস্মাৎ নাকতলায জমি কিনতে উদ্বুদ্ধ হযেছিলাম, মুহূর্তেব জন্য তাব স্বাদ যেন আবাব পাওযা গেলো। মোদ্দা কথা, আমি এখন নাকতলার বাড়ি ছাড়তে নিতান্ত নাবাজ। আমাব এখানে কোনো অসুবিধে নেই, আমি বেশ আছি।

[রুমিকে চিঠি]

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

রচনা করছেন 'মহাভারতেব কথা'র প্রবন্ধগুলি—কোনো-কোনো পাঠকের মতে এটি তাঁর সর্বোত্তম গ্রন্থ। তাঁর জীবিতকালে এটি বই হয়ে বেরোবে না, তবে বইয়ের সব কাজই তিনি শেষ করে উঠতে পেরেছিলেন—এমনকি হাত দিয়েছিলেন দ্বিতীয় খণ্ড রচনায়। রুকমি উপন্যাস লিখে উঠলেন। তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হল : 'একদিন : চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা', 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা'। বাংলা সাহিত্যের সম্পাদিত ইংরেজ সংকলন বেরোল ম্যাকমিলান থেকে : An Anthology of Bengali Writing. লিখে উঠলেন 'সংক্রান্তি' কাব্যনাট্য, ইয়েট্সের 'পার্গেটরি' নাটকের অনুলিখন 'প্রায়শ্চিত্ত', এবং কোম্পারু মোতায়াসু-র একটি নো নাটকের অনুলিখন 'ইক্কাকু সেন্নিন'।

১৯৭২ ।। বয়স চৌষট্টি

'মহাভারতের কথা'

> "এই মহাভারতেব বইটা বড্ড আমাকে ভোগাচ্ছে, রুমি, এত খেটেও এখনো নামাতে পারছি না ঘাড থেকে।"

লিখেছিলেন কনিষ্ঠা কন্যা দময়ন্তীকে ১৯৭২ সালের ৩ মার্চ। এই সময়ে এর প্রথম লেখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 'দেশ' পত্রিকায়। কী বিপুল শ্রম অধ্যয়ন ও নিষ্ঠা এই গ্রন্থটির পশ্চাতে নিয়োজিত হয়েছিল তার সামান্য আভাস পাওয়া যায় গ্রন্থের ভূমিকাটি পাঠ করলে। এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল, যাতে তার প্রারম্ভিক আবেগটি ধরা পড়ে :

> "আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে [১৯৬৩-৬৪] আমি একবার মার্কিনদেশের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাব অধ্যাপনার একটি প্রসঙ্গ ছিলো তুলনামূলক ইন্দো-য়োরোপীয় এপিক—একদিকে ইলিয়াড, অদিসি, ঈনীড, অন্যদিকে মহাভারত ও রামায়ণ। সেই সূত্রে কিছু পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হয় আমাকে, আমার গোচরে আসে অনেক তথ্য, সংকেত, প্রতিসাম্য, অনেক সম্বন্ধস্থাপনেব সম্ভাবনা আমাকে চঞ্চল করে ; আমি টের পাই আমার মনেব দু-একটা পূর্বার্জিত ভ্রূণাকার ভাবনা ধীরে-ধীরে পরিণত হ'য়ে উঠছে।... মহাভারত বিষযে একটি বই লেখার ইচ্ছে সেই সময়েই আমার মনে অঙ্কুবিত হয়েছিলো — আমেরিকার আরো কয়েকটা বিদ্যালয়ে ঘুরে অনুশীলনের আরো সুযোগও পেয়েছিলাম।
>
> দু-বছর পরে, মনের মধ্যে সেই ইচ্ছার তাড়না ও ব্রিফকেসে দু-খাতা-ভর্তি নোট নিয়ে, আমি ফিরে এলাম আমার অভ্যস্ত জীবনে, কলকাতায়। ভেবেছিলাম গুছিয়ে ব'সেই লিখতে শুরু ক'রে দেবো, কিন্তু যথোপযুক্ত অবকাশ আর জোটে না— মাস, বছর, অন্য নানা ব্যাপারে কেটে যায়। এমন নয় যে অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে মহাভারতের সঙ্গে আমার কখনো বিচ্ছেদ ঘটেছিলো— বরং আমি যে ক্রমশ আরো জড়িয়ে পড়ছিলাম, আমার সাম্প্রতিক অনেক নাটকে ও কবিতায় তার নিদর্শন আছে। তবু : গদ্য বইটির কথা ভাবলেই আমি যেন ভয় পেয়ে পেছিয়ে যাই : আমার কেবলই মনে হয় আমি এখনো যথেষ্ট প্রস্তুত হতে পারিনি ; পরিকল্পনা ও রচনার মধ্যে বিপুল ব্যবধান পেরোবার মতো সম্বল আমার হাতে নেই। তারপর একদিন ভেবে দেখলাম আমরা যাকে প্রস্তুতি বলি সেটা সর্বদাই এক আপেক্ষিক ব্যাপার ; যে-বিন্দুটিকে এখন ভাবছি অভীষ্ট সেখানে পৌঁছনোমাত্র অভীষ্টতরর

সম্ভাবনা দেখা দেবে, আর আমার বয়সে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করাও চলে না। তা ছাড়া, যে মানুষকে প্রতিদিনের শ্রমে প্রতিদিনের জীবিকা অর্জন করতে হয় তার পক্ষে অব্যাহত দীর্ঘ অবকাশ সুদূরপরাহত। যদি কল্পনাটিকে বাস্তবে উত্তীর্ণ ক'রে দিতেই হয়, তা করতে হবে প্রস্তুতির অনটন নিয়েই, সাংসারিক বিরুদ্ধতাবই মধ্যে। অগত্যা, আমার বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব সুসম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্তভাবে, আমার প্রাথমিক কয়েকটি ভাবনা-ধারণাকে এখানে উপস্থিত করছি।"

—ভূমিকা : মহাভারতের কথা

এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কী ধরনের পড়াশুনো করতে হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যাবে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত ভাষাবিদ শ্রীপ্রবাল দাশগুপ্ত ও কনিষ্ঠা কন্যাকে লেখা তাঁর কিছু-কিছু পত্রাংশ থেকে :

প্রবাল দাশগুপ্তকে লেখা :

২৩/৮/৭২

"সম্প্রতি আমার হাতে একখানা 'ভাগবতপুরাণ' আসার ফলে আমাব মনের প্রশ্নগুলির আপাতত নিরসন হয়েছে, তাই ডক্টর হাজরাকে আর বিব্রত করিনি। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরির 'অর্থববেদ' তোমার পক্ষে চোখে দেখা ও নাড়াচাড়া করা কি সম্ভব? আমি জানতে চাই বইখানাতে বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদ আছে কিনা, কোনো টীকা আছে কিনা— থাকলে সেটা কোন ভাষায় রচিত। পুরোটা সংস্কৃত হ'লে আমার পক্ষে দুর্বোধ্য হবে।

সংস্কৃত কলেজের বই আমি কি ঋণ পেতে পারি—কোনো অধ্যাপকের সাহায্যে?"

২১/৯/৭২

"আমার পক্ষে আক্ষরিক অনুবাদই ঠিক হবে—তুমি হুইট্‌নির দুটো খণ্ড [অথর্ব বেদের ইংরেজি অনুবাদ] ছুটির আগে আমাকে এনে দিয়ো। এক মাস সময়ের মধ্যে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উদ্ধার ক'রে নিতে পারবো আশা করছি।...

রোমান হরফে মূল লেখন মুদ্রিত আছে, অথর্ববেদের এমন একটিও সংস্করণ কি তোমাদের লাইব্রেরিতে নেই?... এ-প্রসঙ্গে আরো একটা বই উল্লেখ কবছি —মৈত্রী উপনিষদ। সময় পেলে ছুটির আগে খোঁজ নিয়ে রেখো।"

২৯/৯/৭২

"কাল তোমাকে বলতে ভুলে গেলাম যে ছুটির মধ্যে একখানা মৈত্রী উপনিষদ পেলে আমি বিশেষ উপকৃত হই। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি থেকে আনা যাবে কি? এটার কিন্তু মূল অবশ্যই চাই (বাংলা, রোমান বা দেবনাগরী হরফে), সঙ্গে চলনসই অনুবাদ।"

২৭/১/৭৩

"ইতিমধ্যে সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার থেকে একখানা বাংলা হরফে ছাপা কৌষীতকী

সংগ্রহ কবেছিলুম, তবু তোমাব পাঠানো কাওয়েল-সংস্কবণটি কাজে লাগলো। সেটি, তুমি এব পব যেদিন আসবে, ফেবৎ দিতে পাববো।

তোমাকে শ্বেত ও কৃষ্ণ যজুর্বেদেব কথা বলেছিলুম। তোমাব কলেজ লাইব্রেবি থেকে আনানো যাবে কি? ইংবিজি অথবা বাংলা অনুবাদ সমেত মূল সবচেয়ে কাঙ্ক্ষণীয়— আব অবশ্য ভূমিকা টীকা ইত্যাদি।

যুধিষ্ঠিবই মহাভাবতেব নায়ক, এই কথাটা আমাব প্রথম মনে হয়েছিলো ইণ্ডিয়ানাতে, যখন সেখানে এপিব সংক্রান্ত একটি কোর্স পড়াচ্ছিলাম।"

২৩/৭/৭৩

"প্রবাল, গাইগাব-এব বইতে উল্লেখ দেখলাম, হ্বিণ্টাবনিৎস-এব 'A History of Indian Literature'-এব দ্বিতীয় খণ্ডে পালি সাহিত্য বিষয়ে বিস্তাবিত আলোচনা আছে। কিন্তু আমাব কাছে, যে-পাঁচ ভল্যুম হ্বিণ্টাবনিৎস আছে, তাতে পালিব নামগন্ধ নেই— মনে হচ্ছে পুবো বইটা আমি সংগ্রহ কবতে পাবিনি। সেই পালি-সংক্রান্ত খণ্ডটা তোমাব কলেজ-লাইব্রেবি থেকে আমাকে এনে দাও তো খুশি হবো। আব— সেদিন যা বলেছিলাম— সংস্কৃত-পালি ইত্যাদি মিশিয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যেব একটা ইতিহাস—আশা কবি কেউ-না-কেউ সে-বকম বই লিখেছিলেন।"

১০/১০/৭৩

" 'যস্য বাগো ' ব উৎসেব সন্ধান পেয়ে সুখী হয়েছি। আমাব সবচেয়ে জরুবি প্রয়োজন ছিলো 'পাণং ন হানে'— ইতিমধ্যে তোমাব হস্তলিপি-অঙ্কিত আব-একটি টুকবো কাগজ খুঁজে পেলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাতেও ঐ উক্তিটি নেই। ওটি কোনো-না-কোনোভাবে উদ্ধাব কবতে পাববো এই আশা এখনো ছাড়িনি।"

২০/১০/৭৩

"ফেবাবি 'পাণং ন হানে'-কে অবশেষে গ্রেপ্তাব কবতে পাবলে এটা সত্যি সুসংবাদ। এবাবে শ্লোকটিকে আমাব নোটবইয়ে বন্দী কবলাম— অগ্নি, বন্যা বা ভূমিকম্পেব মতো দুর্যোগ না-ঘটলে আব পালাতে পাববে না আশা কবি। সম্পৃক্ত অন্যান্য তথ্য তুমি কলেজ খুললে সুবিধেমতো জানিয়ো—আমাব সবুব সইবে।"

ডাকছাপ ১৯/১১/৭৩

"ঋগ্বেদ ১ : ৯২ : ১০, ৩ :৬১ : ১, ও ৩ : ৬১ : ৩— এই তিনটি সূক্ত তুমি আমাকে লিখে পাঠালে সুখী হবো, আমাব ভাণ্ডাবে সংস্কৃত বই নেই। মূলেব সঙ্গে একটা যথাসম্ভব আক্ষবিক অনুবাদ থাকা ভালো। বমেশ দত্তব অনুবাদে ৩ : ৬১ : ১-এ 'পুবাতনী' ও ৩ : ৬১ : ৩-এ 'নবতবা' শব্দেব ব্যবহাব আছে —এগুলি মূলে কী ছিলো বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা কবি।"

২৭/১২/৭৩
"প্রবাল, অথর্ববেদ ৪ ১৬ বরুণ-সূক্তেব একটি পঙক্তি বিষযে আমাব কৌতূহল হচ্ছে—মনিযব-উইলিযমস যাব অনুবাদ কবেছেন 'He wields the universe, as gamesters handle dice' আক্ষবিক বঙ্গানুবাদ সমেত মূল পঙক্তি তুমি কি আমাকে লিখে পাঠাতে পাববে?"

এবাব কন্যা দমযন্তীকে লেখা কযেকটি পত্রাংশ উদ্ধাব কবি। এগুলোব সুব যদিও একটু আলাদা কিন্তু বক্তব্য একই।

২৯/৪/৬৮
"শোন— Lin Yu Tang-এব 'Widom of India & China" আব Jessie Weston-এব 'From Ritual to Romance", এ-দুটো বই আমাব দবকাব—তোকে দিযেছিলাম, মনে পডছে— এবাবে আসাব সময নিযে আসিস।"

৪/১২/৬৮
"এবাবে কিন্তু লিন ইউ টান এব বইটা আনতে ভুলিস না। "Wisdom of India & China" —বাধানো বই।"

১৩/৯/৬৯
"আব—আব-একবাব বলি—লিন ইউ-তান-এব "The Wisdom of India & China" খোঁজ ক'বে দেখিস। আমি ওটা স্বচক্ষে দেখেছিলাম তোদেব আগেব বাডিব সিঁডিব বেলিঙে— মডার্ন লাইব্রেবি "জাযেন্ট"— আব কানপুব আই.আই টি ক্যাসপাস এমন স্থান নয যে ও বই অপহৃত হ'তে পাবে। বাডি-বদলেব ধাক্কায কি বেবিযে পডেনি বইটা?"

১/১২/৭১
"লিন-ইউ-টান-এব বইটা কি খুঁজে পেলি দৈবাৎ?"

১৫/১২/৭১
"মনে কবিযে দিচ্ছি তোব থীসিসেব একটা কপি আমি চাই, "Time and Eternity" বইটাও আমাব দবকাব। ও-দুটো আনতে ভুলিস না। .. বুযানকে বলিস [পৌত্র : বযস সাত] আমি তাব কাছে হিন্দি শিখতে চাই, বইগুলো যেন নিযে আসে।"

৫/১/৭২
তোব থীসিস পেযে প্রথমেই চক্ষুঃপ্রীতি অনুভব কবছি— কী সুন্দব অক্ষব ও কাগজে, কী চমৎকাব বাঁধাই। বই কিন্তু একটা পাঠিয়েছিস— "Time and Eternity" —অন্যটা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলি শেষ মুহূর্তে। অন্যটা কী? সেই লিন-ইউ- তান কি পাওযা গেলো শেষ পর্যন্ত?"
প্রায চার বছর ধরে কন্যাকে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন— একটি গ্রন্থের জন্য।

সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায, বুদ্ধদেবের 'একটি জীবন' গল্প নিয়ে ছবি কববেন বলে ভেবেছিলেন, কথাবার্তা কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়েও কাজ হয়নি। চিরকালই— সেই ১৯৩০ সালেব 'রাবণ' নাটক থেকে— মঞ্চ বা ছাযাছবিব জগতের সঙ্গে বুদ্ধদেব অনেকবার অনেক সম্ভাবনার কাছাকাছি এসেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো প্রস্তাবই কখনো বাস্তবে পবিণত হয়নি।

১/৪/৭২

"ইতিমধ্যে সত্যজিৎ বায ফোন কবেছিলেন। তিনি 'একটি জীবন' বিষযে মনস্থিব কবেছেন, মে মাসেব মাঝামাঝি শুটিং শুরু কববেন। আর্থিক ব্যাপাবে তিনি বলেছেন পাঁচ হাজাব, আমি বলেছি সাত। একটা মাঝামাঝি বফা হবে আশা কবা যাচ্ছে। এই টাকাটা একসঙ্গে হাতে এলে আমি যে কতভাবে উপকৃত হই তুই তা ধাবণা কবতে পাববি।"

[রুমিকে চিঠি]

১৩/৪/৭২

"সত্যজিতেব প্রযোজকেব নাম সমসেব জং বাহাদুব বানা—কোটিপতি লোক, বেসেব ঘোড়া আছে তাব— সে আমাকে বাব-বাব টেলিফোন কবছে পাঁচ হাজাবে বাজি হবাব জন্য। আমি আট বা সাত চাইনি— ভেবে-চিন্তে ছয বলেছি, আমি সেখানেই টিঁকে থাকতে চাই। আমাব বযসে আমাব অবস্থায সাধাবণ বেটেব ওপবে আমাব চাওযা উচিত এবং পাওযা উচিত তুই কি তা মানবি না? ফিলমটাব পেছনে কোন না লাখচাবেক টাকা খবচ হবে— শুধু লেখকেব এক হাজাব টাকাব জন্যই গলা শুকিযে যাচ্ছে শ্রীযুক্ত বানাব; কিন্তু টাকা নিযে দব-কষাকষি কবা বড়ো ক্লান্তিকব ব্যাপাব, আমি সত্যজিৎকে বলেছি তিনি যেন ব্যাপাবটাব নিষ্পত্তি ক'বে দেন, তিনি তা কববেন বলেছেন। বানাকে আমি শেষ কথা এই বলেছি যে সত্যজিৎ যা বলেন আমি তাতেই বাজি হবো— আমাব বিশ্বাস সত্যজিৎ আমাব চাহিদাকে অত্যধিক বলে ভাবছেন না। এ-মুহূর্তে এইখানে ঝুলছে ব্যাপাবটা, সপ্তাহখানেকেব মধ্যে চুক্তি হযে যাবে মনে হয।"

[রুমিকে চিঠি]

এই চুক্তি সম্পাদিত হয়নি শেষ পর্যন্ত। ছবিটি যে শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি তা তো সবাই জানেন। অনেকদিন পর, ১৯৮৮ সালে এই গল্পকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন রাজা মিত্র, পরিচালকের প্রথম ছবি হিশেবে শ্রেষ্ঠ ছবি বিবেচনায় জাতীয় পুবস্কারও পায়। গর্কি সদনে প্রারম্ভিক শো'তে সত্যজিৎ রায়ও ছবিটি দেখতে এসেছিলেন।

প্রতিভা বসুর চিকিৎসা-বিভ্রাট

এপ্রিল মাসে ঘটল বসুপরিবারের শোচনীয়তম দুর্ঘটনা— জলাতঙ্কের ইঞ্জেকশনের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিভা বসুর সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। এই সাংঘাতিক ঘটনার কথা বুদ্ধদেব খুব রেখেঢেকে জানিয়েছেন কন্যাকে— প্রতিভা বসুর কষ্ট, নিজের উদ্বেগ, কোনো কিছুই যেন খুব বেশি প্রকাশ না পায়। যে চিঠিতে 'একটি জীবনে'র চিত্রস্বত্বের দামদস্তুর করার কথা লিখেছেন সেই একই চিঠিতে, পরের অনুচ্ছেদ :

১৩/৪/৭২

"ইতিমধ্যে আমাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা হ'য়ে গেলো। আমাদের সাদু কুকুরটা মারা গেছে— বেলগাছিয়ার হাসপাতালের পোস্টমর্টেমে ধরা পড়েছে তার রেবিস হয়েছিলো। এখন আমরা বাড়িশুদ্ধ সবাই পাস্তুরের ইঞ্জেকশন নিচ্ছি, ভুতোকেও [তাঁদের বাড়ির পোষা আরেকটি দিশি কুকুর] ইঞ্জেকশন দেয়া হচ্ছে। এ নিয়ে তোর মা আর মল্লিকা কী-রকম বিপুল পরিশ্রম করছে তা এখানে এসে শুনবি। ... ইতিমধ্যে একটা জর্মান টেলিভিশন কোম্পানি আমাকে ইন্টার্ভিয়ু ক'রে গেলো। আচমকা চারশো টাকা পেয়ে গেলাম—তাইতে কুকুর-সংক্রান্ত খরচ চলছে।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

জর্মান টেলিভিশনের 'আচমকা পাওয়া চারশো টাকা' খরচ হচ্ছে—সংসারে নয়, বই কিনতে নয়—কুকুরের চিকিৎসায়!

২৫/৪/৭২

সাদুর মৃত্যুর পব আমাদের বাড়িসুদ্ধু সকলকে ইঞ্জেকশান নিতে হ'লো—তোর মা'র উপর তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, আবার তার চিকিৎসা চলছে এখন, ডাক্তার বলছেন সারতে একটু দেরি হতে পারে।'

[রুমিকে লেখা চিঠি]

১০/৫/৭২

"সাদু কুকুরটাকে মৃত্যুর পর আমাদের সবাইকে জলাতঙ্ক নিবারক ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিলো— তোর মা, গঙ্গামণি আর মল্লিকার (যারা বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলো) চোদ্দটা অন্যদের সাতটা ক'রে। আমাদের কারো কিছু হয়নি, কিন্তু দশম ইঞ্জেকশনের পরে তোর মা-র ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, এখনো তার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটেনি, শয্যাশায়ী আছেন।... তোর মা-র মতো প্রতিক্রিয়ার কেস অত্যন্ত বিরল, কিন্তু কারো-কারো দৈবাৎ কখনো হ'য়ে যায়, আধুনিক চিকিৎসায় সকলেই আরোগ্য লাভ করেন।...

আমি আকস্মিকভাবে পাঁচ হাজার টাকার একটা পুরস্কার পেয়ে গেলাম— আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে[১]। টাকাটা খুব কাজে লেগে

---

১. আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বছরে বিশেষ আনন্দ পুরস্কার দেয়া হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু, বিমল কর ও সন্তোষ কুমার ঘোষকে।

যাবে এই সময়ে, তোর মা-র চিকিৎসার কোনো কার্পণ্য করতে হবে না, সংসার-খরচাও কিছুদিন চ'লে যাবে। পুজোর লেখার চাহিদা শুরু হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমি ঠিক নিবিষ্ট হতে পারছি না, তাছাড়া সকলেই চায় উপন্যাস, আর উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আমার মন থেকে চ'লে গিয়েছে।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

ব্যাপারটা আসলে ঠিক কী ঘটেছিল তার বর্ণনা আছে প্রতিভা বসুর 'জীবনের জলছবি'তে :

"সকলকেই ছ'টা করে ইনজেকশন দেবার কথা, কেবল আমার, মল্লিকার আর গঙ্গামণির চোদ্দটা। একদিন অন্তর অন্তর দেয়া হত সেই ইনজেকশান। ছ'টা নিয়ে সকলেই রেহাই পেল। আমি রেহাই তো পেলামই না উপরন্তু বেশি বেশি রকম জ্বর শুরু হল। তারি মধ্যে আরো চারটা যখন নিলাম তখনই প্রতিক্রিয়া হ'লো। অর্থাৎ যেদিন দশটা দিল তার পরের দিন জ্ঞান হারালাম। প্রথমেই দেহের নিচের দিকটা অবশ হয়ে গেল, দুপুর হতে হতে সর্বাঙ্গ এমনকি গলার আওয়াজটাও বন্ধ হয়ে গেল।

প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সবই চলছে কৃত্রিম উপায়ে। বুদ্ধদেব আমার এ অবস্থা দেখে খুব ভেঙে পড়লেন। কলকাতা শহরের বড় বড় ডাক্তারদের আনাগোনা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছু করবার নেই বলে কারো কারো চলে যাওয়া, আবার কেউ কেউ ওষুধ দিয়ে পরিজনদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা 'যাবে, সেরে যাবে, ভাববেন না— এক মাস ধরে এই চলল। শেষে একজন ডাক্তার বললেন, 'হাসপাতালে নিতে হবে। লাম্বার পাংচার করতে হবে।' আর এই সময়েই আর একজন ডাক্তার বললেন, 'ফিজিওথেরাপি করে দেখতে পারেন, এ ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।'

বৈষ্ণবঘাটার বাড়ি ও জমি জলের দামে বিক্রি করে দিতে হল চিকিৎসার খরচ জোটাতে। "যে রাজসিকভাবে চিকিৎসা চলছিল এবং যত দীর্ঘদিনের জন্য এই ব্যয় অব্যাহত থাকার কথা সেটা চালানো কখনোই সম্ভব হত না বুদ্ধদেবের পক্ষে। এই টাকাটা পেয়ে সেই ভাবনা থেকে বুদ্ধদেব মুক্তি পেলেন।"

কিন্তু প্রতিভা বসু আর ভালো হলেন না। ব্যায়াম-চিকিৎসায় উন্নতি হচ্ছিল, পায়ে ক্যালিবার পরিয়ে হাঁটানোও আরম্ভ হল, একদিন গিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসে সকলের সঙ্গে খেতেও আরম্ভ করলেন। অনেকটা যখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, সেই সময় একদিন খাবার টেবিল থেকে বিছানায় ফিরে আসতে গিয়ে সেবিকার হাত ফশকে পড়ে গেলেন, পায়ের হাড় তিন টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

ক্রমে বুদ্ধদেবও বুঝতে পারলেন, যে প্রতিভা বসু— সেই অসম্ভব রকম কর্মিষ্ঠা হাসিখুশি মহিলা— জীবনের আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। একথা হৃদয়ঙ্গম করে বুদ্ধদেব একেবারে ভেঙে পড়লেন। সাংসারিক ব্যাপারে চিরকাল

পরনির্ভর তিনি— ছোটোবেলা নির্ভরশীল ছিলেন দিদিমার উপর, বিবাহের পর নির্ভরশীল হয়েছিলেন স্ত্রীর উপর। প্রতিভা বসুও নিজের সমস্ত শক্তি উদ্যম স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে দশদিক থেকে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁকে, সংসারের কোনো আঁচ কখনো তাঁর গায়ে লাগতে দেননি। বুদ্ধদেব এতদিন জীবন কাটিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়েই। তালায় চাবিটা পর্যন্ত লাগাতে পারতেন না— ১৯৫২ সালে হাসপাতাল-বাসের সময় দেখেছি আমরা। প্রবল অর্থাভাবের সময় প্রতিভা বসু নিজের হাতে জামা শেলাই করে ছেলেমেয়েদের পরিয়েছেন, প্রথমবার বুদ্ধদেব বিদেশে গেলে নিজের হাতে বই পর্যন্ত বাঁধাই করে বিক্রি করেছেন, সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও সংসার অচল হয়ে পড়লে গয়না বিক্রি করে চালিয়েছেন— বুদ্ধদেব কিছু জানতে পারেননি। 'জীবনের জলছবি'তে বর্ণনা আছে প্রথমবার কী করে গয়না বিক্রি করেছিলেন— পরে লিখেছেন, 'তারপরে অবিশ্যি গয়না বেচা আমার কাছে জলভাত হয়ে গিয়েছিল' (৩য় মু, পৃ. ১২৭)।

কিন্তু শুধু যে নির্ভরশীলের সারা জীবনের নির্ভর নষ্ট হয়ে যাবার ফলেই বুদ্ধদেব অবসন্ন হয়েছিলেন, তা নয়। এখানে আমরা প্রতিভা বসুকে লেখা তাঁর কোনো চিঠিপত্র ব্যবহার করিনি, কিন্তু ছেলেমেয়েদের কাছে লেখা চিঠিপত্রে, প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথায়, স্পষ্ট ধরা পড়ে স্ত্রীর প্রতি তাঁর মনোভাব। প্রতিভা বস অসুস্থ হলে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া তাঁর মন তৃপ্ত হত না— ব্যয়বহুল মার্কিনদেশেও এই ব্যবস্থা বহাল ছিল, আমরা স্মৃতিকথায় দেখতে পাই। সন্তানজন্মের সময় স্ত্রীকে আরোগ্যশালায় পাঠাবার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান আপত্তি ছিল, তিনি যখন-তখন গিয়ে দেখতে পারবেন না। ফলে বাড়িটাই পরিবর্তিত হয়ে যেত হাসপাতালে, পুত্রের জন্মবর্ণনায় তাও আমরা দেখেছি।

যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এই জীবনে সম্ভবত প্রতিভা বসু আর নিজবলে চলে ফিরে বেড়াতে পারবেন না, তখন এই একান্তভাবে নির্ভরশীল ও স্নেহময় মানুষটি একেবারে ভেঙে পড়লেন। হয়তো এই ঘটনা তাঁর জীবনাবসানকে ত্বরান্বিত করে থাকবে। তাঁর চেহারায়ও ক্লান্ত পরিবর্তন এসেছিল — আগেকার ফটোর সঙ্গে শেষ দু'বছরের তোলা ফটো (যেমন এই গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র) পাশাপাশি রাখলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। জুন মাসে একবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন— ভাগ্যক্রমে দময়ন্তী তখন এ বাড়িতে ছিলেন। ডাক্তার সন্দেহ প্রকাশ করলেন, হৃদ্‌রোগের মৃদু আক্রমণ হয়ে থাকবে। চিকিৎসকের নির্দেশে খাদ্যাভ্যাস বদলাতে হল। বাদ গেল তাঁর প্রিয় খাদ্য গোমাংস— এই রোগে চিকিৎসক যেমন বিধান দিয়ে থাকেন, সেইমতো হালকা ও প্রধানত শস্যনির্ভর খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকতে শিখতে হল। শুধু ছাড়তে রাজি হলেন না ধূমপান। দিনে প্রায় পঞ্চাশটা সিগারেট খেতেন, সেই অভ্যাস বজায় রইল।

কয়েকমাস পরেকার একটি চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি তাঁর ভাষায় সেই সুর লাগছে, মানুষ সম্পূর্ণ নিরাশ হলে যে সুর লাগে :

২১/৯/৭২

"... 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে'— এটা লাখ কথার এক কথা। আজ আমি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি যাদবপুর থেকে বিচ্যুত হয়েছিলাম, জগৎটাকে চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম নানা দেশের নানা মানুষের বন্ধুতা — তারপর বানপ্রস্থের বয়সে— অনিচ্ছায় চ'লে এসেছিলাম এই নাকতলায়। যেখানে অসুবিধে অনেক, কিন্তু যেখানে বাজে লোকেদেব বাজে গসিপ শুনে সময় নষ্ট কবতে হয় না। আমি চাই এখন নিজের দু-একটা অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে, আব চাই— অনবরত চাই— তোর মা সেরে উঠুন, তোব মা ভালো হয়ে উঠুন — তোর মাকে নীরোগ দেহে অর্থাভাবের ঊর্ধ্বে রেখে আমি যেন বিদায় নিতে পারি।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

এই দুর্গতির মধ্যে, একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর নিজের কাজ। কাজের মধ্যে ডুবে থাকছেন, ডুবিয়ে দিতে চাইছেন সমস্ত দুঃখ ও দুশ্চিন্তা। এর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে দময়ন্তীকে লিখেছেন :

২৯/৮/৭২

"তুই আমাকে বই কেনার জন্য এক হাজার টাকা দিতে চাচ্ছিস, এতে আমি চমৎকৃত। ঠিক যেন তেষ্টার সময়ে ঠাণ্ডা জল নিজে-নিজেই এগিয়ে এল। মহাভারতের জন্য অনেক বই আমার দরকার— এই সংকটেব মধ্যেও কিছু-কিছু কিনছি— আড়াইশো টাকা দামে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জাতকের সেট কিনলাম সেদিন। আরো কিনতে হবে। তাই বলে আমি তোর সব টাকা চাই না। অর্ধেক পেলেই খুশি। আমার একটা তৃপ্তি এই যে আমার জীবনের এই দারুণ দুঃসময়েও, মনে অনবরত অশান্তি নিয়েও আমি পুজোর লেখার সব ক-টা ফরমাশ মেটাতে পেরেছি। এক মাস আগেও ভাবিনি পেরে উঠবো। এই অতি কষ্টে অর্জিত অর্থের একটা অংশ বইয়ের জন্য খরচ কবতে আমার বিবেকে বাধছে না।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

আরো একটি চিঠি :

৫/৯/৭২

রাত্রি (বিদ্যুৎ নেই)

এই রৌদ্রহীন হিমার্ত ঋতুর বিরুদ্ধে আমি মহাভারত দিয়ে একটি পাতার কুঁড়েঘর তুলে কোনোমতে দিনযাপন করছি— কিন্তু সেই ঘরটিকে কত দিনে সম্পূর্ণ করতে পারবো তা এখনো অনুমান করতে পারছি না। গল্প-উপন্যাস লেখা বিষয়ে মহতী বিতৃষ্ণা অনুভব করছি, তবু ভাবছি ১৯৭৩-এর জন্য কিছু কথাসাহিত্য এ-বছরই লিখে রাখবো... তারপর মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ডে হাত দেবো। তোর মা-র

আরোগ্য এবং ও-বইটা লিখে ওঠা— এ দুটোই এখন আমার পক্ষে সবচেয়ে কাম্য ও প্রার্থনীয়। এবং এ-দুটো চিন্তাই আমার মাথায় ঘুরছে সারাক্ষণ।

...চারটে মোমবাতির আলোয়, বিশ্রী গরমে, নিজের হাতের ছায়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে-ক'রে এই দু-পৃষ্ঠা লিখে আমার চোখ এখন টনটন করছে— অতএব ইতি।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

২১/৯/৭২
আমি গত দু-তিনমাসের মধ্যে (আমার পক্ষে) অনেক টাকার বই কিনলাম— মহাভারতের জন্য কিনতেই হ'লো— তুই U G C -র গ্র্যান্ট পেয়ে আমাকে কিছু অংশ দিবি এই আশায় আমার সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছে।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

৩০/১০/৭২
তুই কি জানতে পারছিস ইউ.জি.সি-র টাকা কবে নাগাদ পাবি বা বইয়ের গ্র্যান্ট কবে হবে? আমার আরো কিছু বই না-কিনে উপায় নেই অথচ তল্পি ফুরিয়ে আসছে— নানারকম দুশ্চিন্তা হয় মাঝে-মাঝে, কিন্তু দুশ্চিন্তা চাপা দেবারও একটা উপায় হ'লো বই।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

বহুকাল পর মায়ের কথা মনে পড়ছে

মানসিক, পারিবারিক, আর্থিক, সমস্ত দিক দিয়ে যখন দুশ্চিন্তায় অবসন্ন, তখন ছেলেবেলার কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে মায়ের কথা— যে মাকে তিনি কখনো দ্যাখেননি, তাঁর জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রসবোত্তর ধনুষ্টঙ্কার রোগে যাঁর মৃত্যু হয়। 'আমার ছেলেবেলা' লিখতে গিয়ে মায়ের কথা লিখছেন :

"... আমার দিদিমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে একটি ফোটোগ্রাফ ছিলো... ক্ষীণাঙ্গ এক যুবক, তার কাঁধে মাথা রেখেছে এক তরুণী— তরুণীটির মুখখানা গোল ছাঁদের, পিঠ-ছাপানো একঢাল চুল, কিন্তু চোখ তার বোজা, যুবকটি তাকে কোমরে জড়িয়ে ধরে আছে। মৃতা পত্নীকে নিয়ে আমার পিতা এই ছবি তুলিয়েছিলেন, তা জেনেও ছবিটির প্রতি কোনো আকর্ষণ বা আগ্রহ আমি অনুভব করিনি।... খুব স্বাভাবিকভাবেই ছবিটা হারিয়ে গেলো একদিন— কবে, আমি তা লক্ষ করিনি, তা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ অথবা অবকাশ আমার ছিলো না। কিন্তু এখন আমার ষাট-পেরোনো প্রান্তিক নির্জনতায় ব'সে আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে ছবিটিকে, সেটি হারিয়ে গেছে ব'লে ঈষৎ যেন দুঃখও হয়। আমার কৌতূহল মেটাবার জন্য কেউ যখন আর বেঁচে নেই, তখনই আমার জানতে ইচ্ছে করছে কেমন ছিলো—আমার নাতনির বয়সী না-দেখা ঐ মেয়েটি ; কেমন ছিলো সে

দেখতে, কেমন পছন্দ-অপছন্দ ছিলো তার, বই পড়তে ভালোবাসতো কিনা, আমার মধ্যে তার কোনো-একটি অংশ কি কাজ ক'রে যাচ্ছে? মনে হয়, আমাকে জন্ম দেবার পরিশ্রমে যে-মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিলো, তার কিছু প্রাপ্য ছিলো আমার কাছে, তা দেবার সময় এখনো হয়তো পেরিয়ে যায়নি। ”

—*আমার ছেলেবেলা*, ১ম সং, পৃ ১৮

সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থপ্রকাশ

তার সমস্ত সময় অধিকার করে আছে 'মহাভারতের কথা'— লেখা ও পড়াশোনা। ফাকে ফাঁকে লিখে উঠলেন আমার ছেলেবেলা'।

জুনে বেরোল তাঁর শেষ উপন্যাস, 'রুকমি'। অক্টোবরে বেরোল ছ'টি ছোটোগল্পের সংকলন, 'প্রেমপত্র'।

১৯৭৩।। বয়স পঁয়ষট্টি

জীবনরসিক বুদ্ধদেব

আনন্দবাজারে চার কিস্তিতে প্রকাশিত হল তাঁর 'ভোজনশিল্পী বাঙালি'। একেবারে অন্যধরনের রচনা— তাঁর সারাজীবনের লেখার বিষয়ের সঙ্গে কোথাও কোনোরকম মিল নেই, অথচ ছত্রে-ছত্রে অভ্রান্তভাবে চেনা যায় বুদ্ধদেব বসুরই লেখা বলে। অন্য এক বুদ্ধদেব বসুর দেখা পাই এখানে আমরা— যিনি গ্রন্থকীট নন, সাবাদিন টেবিলে-বসে কাটানো নিবিষ্টচিত্ত লেখক নন ; যিনি জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতাগুলির দিকে অবিরলভাবে উন্মুখ— যিনি খেতে ভালোবাসেন, পেটুকের অর্থে নয়, সূক্ষ্ম ও শিল্পিত রুচিবান রসিকের অর্থে। লেখাটির প্রথম অংশ জুড়ে আছে ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা ; মহাকাব্য থেকে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত বাঙালি খাবারের বর্ণনা পেরিয়ে তিনি ক্রমে এসে পৌঁছন তাঁর সমসাময়িক কালে। আর তাঁর চোখ দিয়ে চিরাভ্যস্ত বাঙালি খাবারকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পাই আমরা, নিজেদের ভোজনরুচির জন্য গর্ববোধ করতে শিখি। যে-বুদ্ধদেব নাকি কখনো বাইরের দিকে চোখ তুলে তাকান না : নিজের লেখা ও পড়া, নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গে আড্ডা ও নিজের অভ্যস্ত ঘরটির বাইরে কোনো কিছুই নাকি যাঁর মনোযোগের যোগ্য নয়, সেই মানুষটি যে কী প্রবলভাবে জীবনবিলাসী, কী সুকুমারভাবে পৃথিবীর রূপরসগন্ধস্পর্শের স্বাদগ্রহণে পারদর্শী, তা বুঝে উঠে অবাক হয়ে যেতে হয় আমাদের। রচনাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করি :

"আমাদের মাতৃভাষা একটি বিভাগে অসামান্যরকম পটীয়সী— তা হ'লো বিবিধ খাদ্যপ্রকরণের নামকরণ। ফরাশিরা বাগবহুল বিশেষণ বসিয়ে তাদের মেনুগুলোকে জমকালো ক'রে তোলে, কিন্তু ছোট্ট এক শব্দের নাম বানাতে বাঙালির মতো ওস্তাদ কেউ নেই। এ কি আশ্চর্য নয় যে দম জিনিশটা অনন্যভাবে শুধু আলুরই অধিকারভুক্ত, এবং তিনি এতই সতী সাধ্বী যে আলুর সঙ্গে কুমড়ো জুড়ে দিলেই তিনি দম-ত্ব হারিয়ে ছক্কায় নামান্তরিত হন। আর পটোল অথবা ফুলকপির সংযোগে আবার ডালনায়, পৃথিবীর অগুনতি ফসলের মধ্যে পটোল ছাড়া আর কোনোটি দিয়ে 'দোলমা' তৈরি হয় এমন কথা কি সাতপুরুষে কোনো বাঙালি শুনেছে? না কি এমনও কেউ কল্পনা করতে পারে যে ধোঁকা মানে ডালের একটা মশলাশ্রিত ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য কিছু? অবশ্য ভাঁওতা অর্থেও ধোঁকা বলি আমরা, কিন্তু ব্যঞ্জনটিও তো চারিত্রিকভাবে তা-ই— কেননা সে শস্যরচিত হয়েও ভান

করে যেন মাংস— তাকে নকল মাংস বা নিরামিশ মাংস বললে দোষ হয় না: তার নামের মধ্যে একটা রসিকতাও প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা রোজই খাচ্ছি চচ্চড়ি বা ঘণ্ট, কিন্তু ও-দুটোয় তফাৎ কী তা জিজ্ঞেস করলে আমরা অনেকেই মাথা চুলকোবো; দুটোতেই পাঁচ তরকারি লেপটে মিশে থাকে, দুটোতেই কুচো মাছ বা মাছের কাঁটার সংযোগ সম্ভব; বহু চিন্তা ক'রে শুধু এই তফাতটি খুঁজে পাওয়া যাবে যে.চচ্চড়িতে যে-মশলাটি খুব স্বাদাধিক সেই শর্ষে মেশালে ঘণ্টর আর জাত থাকে না। চচ্চড়ির আর এক প্রকরণ হলো ছ্যাঁচড়া বা ছেঁচকি— খুব অল্প তেলে পোড়া-পোড়া রান্না হয় বলে তাকে আলাদা একটি নাম দেওয়া হ'লো। একই পাঁচমিশেলি ধরণের অন্য একটি দ্রব্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি : 'লাবড়া' — বৈষ্ণবরা যা ভক্তিসহযোগে আহার করে থাকেন, যার পবিত্রতা আমিষের লেশ সংস্রব এড়িয়ে চলে, এবং জগন্নাথ দেবের প্রসাদ হবার গৌরবের জন্য যাতে সব রকম শব্জিও অনুমোদিত নয়— থোড় মোচা শিম বেগুন মুলো আর মিঠে-কুমড়োই প্রশস্ত। লাবড়ার আর-একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে শব্জিগুলো প্রায় গ'লে যায় — চচ্চড়ি-ঘণ্টার সঙ্গে এইটে তার টেকনিকল তফাৎ। বাংলার মেয়েরা, রাঁধুনিরা, যুগযুগ ধরে ঘরে-ঘরে যত নতুন দ্রব্য উদ্ভাবন করেছেন— হোক না তারা এক গোত্রের, এক গোষ্ঠীর প্রায় একই উপাদানমিশ্রণে তৈরি— স্বাদে অথবা রান্নার কৌশলে সূক্ষ্মতম তফাৎ থাকলেও বাঙালি বুদ্ধি আস্ত একটি নতুন নাম না দিয়ে ছাড়েনি।...

সেই চিরায়ত মাছের ঝোলটাকে ধরা যাক। শুধু তো ঝোল নয়— স্বাদের মৃদুতা বা তীব্রতা অনুসারে কোনোটা ঝোল, কোনোটা ঝাল, কোনোটা আবার কালিয়া। কোন মাছ, কত বড়ো, গন্ধ কী-রকম; তার মাংস আঁটো না শিথিল, দৃঢ় না কোমল, এই সব তারতম্য অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন পাকপ্রণালী নির্দিষ্ট হয়ে আছে— আছে মৎস্যকুলের প্রতিটি প্রতিনিধির জন্য আলাদা-আলাদা শব্জি-মশলার সমন্বয়, আর কুচো মাছ রান্নার এমন সব মেধাবী টেকনীক, যাতে পেঁয়াজকলির সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ-সমান ট্যাংরা দিয়েই এক থালা ভাত খেয়ে ওঠা যায়। তাছাড়া আছে বিশেষ কয়েকটি উচ্চকুলীন, বিশেষ কোনো-কোনো মৎস্যের সঙ্গেই যাদের নির্বন্ধ : কিশমিশ আর দারচিনি-বাটার দই-মাছের জন্য পাকা রুইয়ের পেটির অংশটি নির্ঘাত চাই, যেমন চাই নারকেলের দুধ দিয়ে রাঁধা তথাকথিত মালাইকারির জন্য বাগদা-চিংড়ি— কোনো বিকল্প চলবে না। 'তেলকই' নামে আলাদা একটা রান্না বেরোলো, শুধু পুষ্ট বড়ো-বড়ো কইমাছেরই এলাকাভুক্ত— ছোটো রুইয়েরও নয়— কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তেল-রুই বা তেল-কাতলের সৃষ্টি হ'লো না, এতেই বোঝা যায় বাঙালি রাঁধুনির ঔচিত্যবোধ কত তীক্ষ্ণ। তেমনি আবার 'মুঠিয়া' খেতে হ'লে চিতলমাছের গাদা আপনাকে জোটাতেই হবে— সেই ঘন কণ্টকিত জলজ মাংসকে কেমন ক'রে একটি নিরাপদ সুখাদ্য ক'রে তোলা যায়, সেটা বঙ্গসংস্কৃতির আনন্দমেলায় পূর্ব বাংলার এক বিশিষ্ট অবদান। আর সেই রজতবর্ণ মনোহরদর্শন মৎস্যকুলরাজ মহান ইলিশ— সে এক দেহে এতটা প্রতিভা

ধারণ করে যে, শুধু তাকে দিয়েই তৈরি হতে পারে একটি পঞ্চপদী নানাস্বাদযুক্ত ভোজনের মতো ভোজন— যদি অবশ্য ভাগ্যে জোটে যথাযোগ্য রন্ধনকারী বা কারিণী। আরম্ভে এলো মুড়োর সঙ্গে স্নিগ্ধ লাউ, তারপর ঝড়তি পড়তি কাঁটা দিয়ে রাঁধা ঘন মুগডাল, সঙ্গে কালচে-ব্রাউন কড়কড়ে ভাজা গলকাঁটা। তৃতীয় দফায় কাঁচাকুমড়ো যোগে কালোজিরে-ছেটানো পাৎলা ঝোল—কুমড়ো মাছ দুটোই থাকবে অনতিপক্ক, আর বাঙাল ভাষায় যাকে 'লুকা' বলে সেই বস্তুও যেন সমাদৃত হয়— কেননা ইলিশই একমাত্র মাছ যার যকৃৎটিও উপাদেয়। চার নম্বরে এলো সর্ষপমণ্ডিত তপ্তবাষ্পাকুল 'ভাতে' অথবা কলাপাতায় মোড়া 'পাতুরি' ; আর সব-শেষে, জিভ জুড়োবার জন্য, চিনি-মেশানো পাতিলেবুর একটা ঠাণ্ডা অম্বল— যাতে বিন্দু-বিন্দু কালোজিরে, আর দু-একটা সুবাস-নিস্রাবী কাঁচা লংকার সঙ্গে ইলিশের ওঁচা অংশ ল্যাজার দিকটা ভাসমান— রান্নার গুণে সেই অধমও এখন উত্তম। কিন্তু মনে রাখবেন কোনো রান্নাই তেমন জমবে না যদি টুকরোগুলোক ত্রিকোণ ক'রে কাটা না হয়, আর— এই মীনসত্তমের ধারে-কাছে যেন আদা-পেঁয়াজ ঘেঁষতে না পায়, কেননা পেঁয়াজহীন কালিয়ার মতোই পেঁয়াজ-যুক্ত ইলিশও অচিন্তনীয়। আর যদি আপনি ভুলেও কখনো ইলিশের সঙ্গে আলুর কোনো সংযোগ ঘটান, সেটা হবে রীতিমতো এক মহাপাতক।

...

কিন্তু এ-সবের চেয়েও আশ্চর্য হ'লো সেই নিরামিষ রন্ধনশৈলী, যাকে বলা যায় বৈধব্যপ্রথারই একটা উপজাতক। শুনতে অদ্ভুত কিন্তু কথাটা সত্য, যে এই উপবাসকারিণী একাহারিণী ভগিনীদের হাতেই বাঙালি রান্না পেয়েছে তার সূক্ষ্মতম, সুকুমারতম ব্যঞ্জনা— যদিও ভক্ষ্য বিষয়ে শত শাসনে তাঁরা আবদ্ধ, অথবা হয়তো সেইজন্যেই। য়োরোপের মধ্যযুগে যেমন খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা, তাঁদের সংসারচ্যুত মঠের নিভৃতে, ধীরে-ধীরে জারিত করেছিলেন দ্রাক্ষারস থেকে অভিনব মদিরাপর্যায়, তেমনি আমাদের বিধবারা, সব খ্যাতিমান সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, সমাজের উপর মহৎ প্রতিশোধ নিয়েছিলেন রসনায় সূক্ষ্মতর বোধ উদ্রিক্ত ক'রে, বাঙাল ভাষায় যাকে বলে 'তার'। পেঁয়াজ তাঁদের নিষিদ্ধ, গরম মশলা নিষিদ্ধ, এমনকি মুসুর ডালের মতো নিরীহ শস্যও চলে না— এ অবস্থায় তাঁরা হাত পাকিয়েছেন একটি নতুন স্টাইলে অসামান্য রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে। স্টাইলটিকে আমি বলবো শুদ্ধ এবং সুন্দর— ভূষণরিক্ত ব'লে শুদ্ধ, আর সুন্দর এই অর্থে যে ন্যূনতম উপকরণে তা সম্পন্ন করা যায়। অন্যদের যা অনাদৃত ও পরিত্যক্ত, সেই কুমড়োর বিচি ও লাউয়ের খোসাকেও তাঁরা স্বাদু ক'রে তুলতে পারেন ; তাঁদের ভাঁড়ারে স্থান পায় খিড়কি-পুকুরের শালুক-ডাঁটা, সবচেয়ে শস্তা বাজারের শাক, আর উঠোনের মাচায় লাউপাতা আর কুমড়োফুল। কিন্তু এই দৈন্যকেই ধন্য ক'রে তোলে তাঁদের 'ডাল-পাতুরি'—দেশে-দেশে অভিনন্দনপ্রাপ্ত হংসযকৃৎ-পিষ্টকের মতোই যা সুখদায়ক, বাসন্তিক অ্যাসপারেগসের মতো নধর সরস সজনে-ডাঁটা, কচি বেগুন আর কলাই-ডালের বড়ির সঙ্গে আর্দ্র স্নিগ্ধ লাল শাক, ঈষৎ-

মধুর মাংসল কাঁঠাল-বিচি দিয়ে রাঁধা অনবদ্য মটর-ডাল, আর কখনো হয়তো সরষেবাটায় মখমল-মসৃণ কচুসেদ্ধ। যদি আপনি হন প্রকৃত একজন ভোজনতত্ত্ববিদ, তাহ'লে এই দ্রব্যগুলিকে তেমনি বিরল ও বিশেষ ব'লে জানবেন, যেমন জাপানি জলের অরুণকান্তি কাঁচা মাছ, কাস্পিয়ান হ্রদের কাভিয়ার, বা ফ্রান্সের মাটির তলায় লুকিয়ে-থাকা কৃষ্ণবর্ণ শিলীন্ধ্র— অর্থাৎ 'ব্যাঙের ছাতা'। এমন কি ভাতেরও আছে আলাদা একটি বিধবাসম্মত প্রকরণ যেহেতু তাঁরা অধিকারী শুধু পাথরের থালায় আতপ চালে ;— নিছক ভাত জিনিশটা কত ভালো হ'তে পারে তা জানতে হ'লে নিরিমিষ-ঘরের টাটকা-গরম সুঘ্রাণ গোবিন্দভোগের স্বাদ নেয়া চাই।..."

মানসিক পরিবর্তন

ধীরে-ধীরে গুটিয়ে আনছেন নিজেকে— যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রস্তুত হচ্ছেন আসন্ন বিদায়ের জন্য। তাঁর এই সময়ের চিঠিগুলিতে নিরাসক্তির সুর স্পষ্ট। যিনি মাছকেও নিরামিষ বলতেন তিনি মাংসভোজন বর্জন করেছেন, মাছও প্রায় খান না— "ফল শব্জিশস্য থেকে কী-ভাবে যথোচিত পুষ্টি পাওয়া যায় তা নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে যাই এক-এক সময়।" এই নির্বেদের জন্য অবশ্যই দায়ী প্রধানত পারিবারিক দুর্যোগ, প্রতিভা বসুর অচিকিৎস্য ব্যাধি ; কিন্তু নিজের মনের দিক থেকেও ক্রমশ নিঃসঙ্গতাকেই সঙ্গী ক'রে তোলবার চেষ্টা যেন অনবরত অভ্যাস করে চলেছেন এই সময়। পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া :

১৪/১১/৭৩

এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে আমার জীবন আরো একটু নিরানন্দ হবে (বলতে যাচ্ছিলাম "আমাদের জীবন", কিন্তু রানু ঈশ্বরের বরপ্রাপ্ত, তার মন সর্বদাই আলোর দিকে, আর আমার চোখে অন্ধকারই বেশি)—

বন্ধুবান্ধব যাও বা মাঝে-মাঝে আসতো এতকাল, এখন তাও বন্ধ হ'য়ে যাবে। অথচ, তোরা জানিস, আমি স্বভাবত নিরানন্দ মানুষ নই, আমার মধ্যে একটা হাসিখুশি খোলামেলা আমোদপ্রিয় দিক আছে, এককালে আড্ডার জন্য বিখ্যাত ও কুখ্যাত ছিলুম—কিন্তু আমার সেই বৃত্তিগুলি খোরাকির অভাবে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে, বয়স বেড়েছে ব'লেই নয়। গত দুই বছরে আমাদের পারিবারিক ঘটনাগুলি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবি কেমন ক'রে আমার আনন্দের উৎসগুলিতে পাথর চাপা পড়েছে এক-এক ক'রে— তারপর নরেশের অসুখ, সন্তোষ ঘোষের অসুখ, আর শেষ পর্যন্ত সাগরময়ের অসুখও যুক্ত হ'লো। পেট্রোল-অনটনও এই তালিকায় ধতর্ব্য—বছরে এক-আধদিন কোথাও বেরোনো, তাও বন্ধ হ'য়ে গেলো। দেখছি নাকতলায় হোম-ইনটার্নড হয়েই আমার বাকি জীবন কেটে যাবে— যা মানুষ

স্বেচ্ছায় করে এবং যা বাধ্য হ'য়ে করতে হয়, এ-দুটো একই কাজ হ'লেও কত তফাৎ বেশ বুঝতে পারছি।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

গ্রন্থাবলি প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে— সেও যেন, এক হিশেবে, শেষেরই শুরু। সম্পাদনার ভার দিয়েছেন সুবীর রায়চৌধুরী ও অমিয় দেবকে, তাঁর প্রাণতুল্য প্রিয় দুই শিষ্যকে। সুবীর যদিও প্রত্যক্ষত তাঁর ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু নিজের অধ্যয়নের বিস্তার, সাহিত্যিক বোধ ও বিশেষত গবেষণাধর্মী প্রবণতার কারণে বিশেষভাবে বুদ্ধদেবের প্রিয় ছিলেন। প্রথম খণ্ড যতদিনে বেরোয়, তার কয়েক মাস আগেই বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়েছে। ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় লিখেছিলেন (প্রথম খণ্ড · মাঘ ১৩৮২) :

" এই সংগ্রহের কাজ বুদ্ধদেব বসুর তত্ত্বাবধানেই আরম্ভ হয়। গ্রন্থনার রীতি কী হবে, প্রথম খণ্ডে কোন-কোন রচনা থাকবে, গ্রন্থবিশেষের যে-ক্ষেত্রে একাধিক সংস্করণ হয়েছে সে ক্ষেত্রে কোন সংস্করণের পাঠ নেওয়া হবে, কোনো ধরনের কোনো পরিমার্জনা আদৌ করা হবে কিনা, ইত্যাদি সব বিষয়ে মূল নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। এমনকি প্রথম কয়েক ফর্মার প্রুফও তিনি দেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। .

অন্য সব কিছুর মতো, তার বানান বিষয়েও বুদ্ধদেব বসুর খুব স্পষ্ট নির্দেশ ছিলো তিনি চেয়েছিলেন তার এখনকার বানানই যেন আগাগোড়া ব্যবহার করা হয়। সেই অনুসারে তাঁর পূর্ব-অনুসৃত বানানে আমরা প্রয়োজন ও সাধ্যমতো সংস্কারসাধন করেছি।"

মন ভালো নেই তাঁর

কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর চিঠির ভাষায় একটা উদ্বেগ— একটা লড়াইয়ের প্রকাশ লক্ষ করা যেত। অনুভব করা যেত একজন প্রৌঢ় মানুষ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করে চলেছেন— অসমাপ্ত কাজ, অপালিত দায়িত্বের ভার যেন ক্রমাগত দংশন করছে তাঁকে। কন্যাকে অবিরলভাবে উদ্বেজিত করে যাচ্ছেন গবেষণাপত্র সমাপ্ত করা নিয়ে : 'মহাভারতের কথা' লিখছেন, যত লিখছেন কাটছেন তার চেয়ে বেশি, অভ্রান্ত শব্দের সন্ধানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত, সহায়ক গ্রন্থের সন্ধানে তোলপাড় করছেন কলকাতা শহর, এমনকি বিদেশ। এরই মধ্যে ফরমাশি লেখার কাজ সারতে হচ্ছে অনিচ্ছার উজান ঠেলে ঠেলে; দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী প্রাণাধিক পত্নীর সেবা, চিকিৎসার জন্য অর্থসংস্থানের চেষ্টা। চোখে ছানি পড়তে আরম্ভ করেছে বেশ কিছুদিন হ'লো, তাঁর সেই মুক্তাপঙ্‌ক্তিনন্দিত বিখ্যাত হস্তাক্ষর এখন জড়িয়ে

জড়িয়ে যায়, কোথাও কোথাও এমনকি দুষ্পাঠ্য। ছবিটা একজন ব্যস্ত, চিন্তিত, হয়রান হওয়া মানুষের— যে-মানুষটি শুধু যেন হারবেন না বলেই হারছেন না, ক্লান্ত দেহমন নিয়ে অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন একসঙ্গে অনেকগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে।

আস্তে আস্তে এই ছবিটা বদলে গেল। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থাকতে অন্য একটা সুর লাগতে আরম্ভ করেছে তাঁর চিঠিপত্রে। কোনো কোনো কাজ সমাপ্ত হয়েছে, আর কোনো কোনোটা— যেন বুঝতে পারছেন, লড়াই করে আর লাভ নেই। লড়াই তাঁকে ছেড়ে গেছে যেন, যেন মনে হচ্ছে এই বর্মচর্মগুলো বড্ড ভারি, এবার এগুলো নামিয়ে রাখা যাক। মায়ের কথা মনে পড়ছে আমরা দেখেছি, চিঠিপত্রে আরো দেখছি মনে পড়ছে ছেলেবেলাব কথা :

"... প্রাযই মনে পড়ে পুবানা পল্টন, কাল খুব স্টিমাব-ভ্রমণের কথা মনে পড়েছিলো, শীতকালে অন্ধকাব থাকতে গোয়ালন্দে নামা, নদীব ওপব কুয়াশা, কাঁচা বোদ্দুব..."

—কনিষ্ঠা কন্যাকে : ১ বৈশাখ ১৩৮০

যে-নিসর্গের দিকে কখনো তাকিয়ে দেখতে চাইতেন না, অনুষঙ্গহীন নিষ্প্রাণ নিসর্গপ্রেমের প্রতি এক ধরনের তাচ্ছিল্যের ভাবই ছিল, আমরা এখন অবাক হয়ে দেখছি সেই নিসর্গের ছোটো ছোটো টুকরোর প্রতি তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টি সঞ্চালিত হচ্ছে—

"... এ-বাড়িব নতুন পুষ্যি হযেছে দুটি শিশু ঘুঘুপাখি। কী-ভাবে তারা সংগৃহীত হ'লো এসে শুনবি— কিন্তু ওই অতি সুন্দব প্রাণীদুটিকে দেখে আমি খুব সুখ পাচ্ছি।..."

—তদেব

যখন ব্যক্তিগত কথা লেখেন চিঠিতে, একটি ক্লান্ত, প্রায় দান-ছেড়ে-দেয়া মানুষের ছবি পাওয়া যায়—

১৬/৬/৭৩

"... আমি নিরতিশয় ক্লিষ্টভাবে কালাতিপাত করছি— পূজা সংখ্যাব লেখা নিয়ে এগোতে পারছি না, অথচ টাকার জন্য সাধ্যাতীত নিয়ে নিয়েছি— এ-বছর পুজো আবার খুব শিগগির। এর ওপর আছে মহাভারতের প্রুফ, 'দেশ' পত্রিকার প্রুফ, দুর্বল দেহ, মলিন চক্ষু ইত্যাদি। সর্বদা গীতার কথা ভাবি— সুসম্পন্ন পরধর্মের চেয়ে আংশিকভাবে স্বধর্মপালন ভালো—যতদিন বেঁচে আছি ও দেহে-মনে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য আছে—এই কাজই ক'রে যেতে হবে আমাকে— ভালোভাবে হোক আর মন্দভাবে হোক।

তাছাড়া, রুমি— এই সংসারচালনা, চাল চা শর্ষের তেলের হিশেব, মাছের

দব নিযে মাথাব্যথা, কোন বেলা কী বান্না হবে সেই ভাবনা— এগুলো আমাব সহ্যেব সীমা ছাডিযে যাচ্ছে। তুই যে বলেছিলি স্বাতীব হাতে ছেডে দিতে, সেটা ঠিক প্র্যাকটিকল নয— এবং তাতে আমাব দাযিত্বেব ভাবও হালকা হবে না। সাবা জীবন পাযে পা তুলে ফুলবাবু হ'যে কাটিযেছি—এবাবে তাব দাম চুকিযে দিতে হচ্ছে— একেই বলে নেমেসিস।"

[রুমিকে লেখা চিঠি]

ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত।

প্রতিভা বসুব স্মৃতিকথা থেকে :

"জানি না কেন কদিন যাবৎ আমাব মনে কেমন একটা ভয ঢুকেছে। অকাবণেই আতঙ্ক। গঙ্গামণিবও ঠিক তাই। বুদ্ধদেবেব শবীব খাবাপ হযনি, আমাকে আস্তে আস্তে ভালো হযে উঠতে দেখে মনও ভালো আছে, বাডি বিক্রিব জন্যে আর্থিক অবস্থাটাকেও সামাল দেযা গেছে, তবু যে তাকে নিযে কী ভয কেন ভয জানি না। খুব বোগা হযে গিযেছিলেন সেটা ঠিক। আশ্চর্য নয, আমাব এই অবস্থা নিযে তো কম কষ্ট যাচ্ছে না সাবা পবিবাবে। ছেলেমেযেবাও অত্যন্ত ব্যাকুল, পবিজনেবাও তাই। ডাক্তাব ওঁকে বলেছিলেন, লেখা নিযে সমস্তক্ষণ বসে থাকেন, একটু হাঁটা ভালো। সেই থেকে বাডিব ছাদে গিযে নিযমিত দু-চাব পাক হাঁটতেন। চিবকাল বিদ্যাসাগবী চটি পবতেন। ছাদে ওই চটিব শব্দ ছাদেব তলাকাব মানুষদেব কানেও বেশ ভালোভাবে পৌঁছত। একদিন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চটিব শব্দ বন্ধ হ'যে গেল। আমি রুদ্ধশ্বাসে সেই শব্দ শোনাব জন্য উৎকণ্ঠিত হযে বইলাম। এপাশ ওপাশ তাকিযে আযাকে দেখতে না পেযে 'গঙ্গামণি, গঙ্গামণি' বলে ডাকতে লাগলাম। গঙ্গামণি সিডি দিযে নেমে এসে বলল, 'আমাব একটা কী হযেছে মা, বাবুব জন্য যেন কেমন ভয কবে। রুটি কবছিলাম, মনে হল বাবুব পাযেব আওযাজটা থেমে গেল, অমনি দৌডোলাম ওপবে। গিযে দেখি ছাদে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, মস্ত চাঁদ। বাবু সেই চাদেব দিকে তাকিযে দাডিযে আছেন।"

—*জীবনেব জলছবি*। ৩য মু, পৃ ৩১৩

পূর্বগামিনী ছাযা গঙ্গামণিব মনেও প্রভাব বিস্তাব কবেছিল।

১৯৭৪।। বয়স ছেষট্টি

শেষ চিঠি

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে মৃত্যুর সাত দিন আগে কনিষ্ঠা কন্যাকে লেখা এই চিঠিটি তাঁর শেষ চিঠি। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দময়ন্তী যখন কানপুর থেকে ছুটে আসেন, এ-চিঠিটি তখন পেয়ে আসেননি। পরে, এই চিঠি লেখা হয়েছিল জানতে পেরে এক বন্ধুর সাহায্যে কানপুরের ডাকঘর থেকে এটি সংগ্রহ করেন। অংশত উদ্ধার করা হল :

১১/৩/৭৪

রুমি,

কাজেব স্তূপ জ'মে আছে, আমি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কতবাব বিদ্যুতেব অভাবে থামতে হয়, চোখ দুটোকে জিবোবার জন্যেও ক্ষান্ত দিই কখনো, মাঝে-মাঝে ক্লান্তিব ভারে নুয়ে পড়ি।...

আমি ধ'বে নিয়েছি এ-বছব গ্রীষ্মে বর্ষায বিদ্যুৎ-সংকট চবমে উঠবে, মনে-মনে এও স্থির করেছি যে তা নিয়ে 'ভাবনা করা চলবে না'।... আমি বিকল্প ব্যবস্থাব সন্ধানে, অগত্যা প্রকৃতির প্রেমিক হ'য়ে উঠেছি। বেদব্যাসকে [পৌত্রেব আদবেব ডাকনাম] স্থান দেবাব জন্য পাপ্পার পড়ার টেবিল এখন তার দরজাব বাইবে সিঁড়ির চাতালে ; সেখানে, ছাদের দরজা খুলে দিলে, বিকেলের দিকে প্রচুব আলো পাওয়া যায়— সুখের বিষয়, গরমে আমার তেমন কষ্ট হয় না। সকালেব দিকে ঘণ্টাগুলি ছোটো দেড়তলা বোদে ভেসে যায়— সেখানে পুবমুখো বসতে পারলে বিদ্যুতেব জন্য পরোযা কীসের! কিন্তু তোর মা-র বাড়িতে এত বেশি এবং এত বাহুল্য আশবাব— মিলুর বিয়ের ডবল বেড জুড়ে আছে সেই সুন্দর ঘরটি ; সেটা আমার ব্যবহার্য ক'বে নিতে একটু সময় লাগবে। আর বড়ো দেড়তলায়— আমরা যেটাকে বলি 'রুমির ঘর', বৈকালিক রোদের জন্য তার পশ্চিম দিকটা আইভিয়েল— কিন্তু সেখানেও তোর মা দেয়াল-বেঞ্চি বসিয়েছেন— আর আমার, জানিস তো, আপিশ-স্টাইল টেবিল-চেয়ার ছাড়া চলে না। তবু অবশ্য নৈশ তিমিরের সমস্যা মিটছে না, আমার অতি প্রিয় ঘন বর্ষার দিনগুলি বেকার কাটবে আশঙ্কা করছি— আর সেইজন্যে অভ্যেস করছি আগের তুলনায় অনেক বেশি চুপচাপ ব'সে থাকা। আমার কথা বলার লোক নেই, কথা বলার বেশি বিষয়ও নেই, সত্যি বলতে ; — তাই মগজের চাকাগুলো একই বৃত্তে ঘুরতে থাকে সারাক্ষণ— চোখের জন্যে বেশি পড়তেও ভরসা পাই না। এমনি কাটবে আমার দিন— এরই মধ্যে আমি

চেষ্টা করছি চলনসই শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক প্রসন্নতা নিয়ে আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে— আর বছর দশেক টিকে যেতে পারলে কয়েকটা কাজ সমাধা হয়। আমার বর্তমান লেখার রেট : সারাদিনে আট ঘণ্টা খেটে পঁচিশ-তিরিশ লাইন গদ্য— সময় বেশি চাই। .

মনে হয় নেহাৎ ঈশ্বরের দয়াতেই আমরা বেঁচে-বর্তে আছি এবং হয়তো থেকেও যাবো। তোরা একুশ শতক দেখবি— দ্বৈপায়নবাবু একুশ শতকেই মানুষ হবেন, অনির্বাণ ও ঋত্বিকা ও মৌলিনাথবাবুও [বুদ্ধদেবের পৌত্র-পৌত্রীরা] তা-ই, তাদের আমি ঠিক ঈর্ষা করতে পারছি না। ”

[রুমিকে লেখা চিঠি]

মৃত্যু

১৮ মার্চ সন্ধ্যায় সহসা সংজ্ঞালোপ— মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। রাত পৌনে তিনটের ক্যালকাটা হসপিটালে মৃত্যু।

পুত্র শুদ্ধশীলের স্মৃতিচারণ

“[বাড়িতে] ঢুকতেই দেখি মা বিষণ্ণ মুখে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন। ‘চলে এলি? ভালো করেছিস।’ ‘হ্যাঁ, ভালো লাগছিল না, কিন্তু ভালো করেছিস বললে কেন?’ ‘তোর বাবা বেশি আলো পাবেন বলে দেড়তলার ঘরে গিয়ে কাজ করেছেন আজ দুপুরে। সুবীর [রায়চৌধুরী] আসবে সন্ধ্যেবেলা, ওর সঙ্গে নাকি অনেক কথা আছে, মনে হচ্ছে শরীরটা ভালো নেই কিন্তু টেবিল থেকে উঠবেন না। একবার প্রেশারটা মাপিয়ে দেখলে হয়।’ আমি সোজা বাবার কাছে গিয়ে বললুম, ‘তোমার নাকি শরীর খারাপ। তুমি টেবিলের চেয়ার থেকে নেমে নিচু সোফা-চেয়ারটায় বোসো।’ ‘— all bunkum, মা বলেছে, আমায় বিরক্ত করিস না, আমার সময় নেই, সুবীর আসবে এক্ষুণি, অমিয়ও [অমিয় দেব] আসবে।’— বলা হয়নি, আমি যখন বাবার ঘরে ঢুকি, আমার দৃশ্যটা একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল। পেছন থেকে দেখলাম চেয়ারে বসে আছেন, ধূসর আধা বাবরি চুল, কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে শুকনো, দেখলেই মনে হয় লোকটা ভয়ানক ক্লান্ত কিংবা অসুস্থ। আমি ছাড়িনি, জোরজার করে সোফায়, তার নিজস্ব বইপড়ার চেয়ারে বসতে বাধ্য করলাম, ওদিকে আমার বোন পাড়ার ডাক্তারকে ডাকতে বেরিয়ে গেল। সোফায় বসেই সিগারেট ধরাতে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে আমি দেখলাম যে লোকটা ৫০ বছর ধরে সিগারেট খায় সিগারেট ধরাতে পারছে না। কাঠি বাক্সকে বারে বারে মিস করছে। আর সিগারেটটা ধরালেন যখন সিগারেটটা মুখের ফেনায় আধখানা ভিজে যাচ্ছে। ডাক্তার এলেন, মা এক ধমক দিয়ে নিজের ঘরের খাটে শোয়ালেন বাবাকে, প্রেশার নরমাল।— যায় কোথায়, লাফিয়ে উঠে

বিদ্যাসাগরি চটিতে পা গলিয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন চা খাবো কিনা, আর ডাক্তার বলেছিলেন সামান্য কিছু খেতে— তিন কাপ চা আর মেটে টোস্ট অর্ডার দিয়ে মার ঘরের উল্টোদিকে বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুমের ছিটকিনি বন্ধ হল, ফ্লাশ টানারও শব্দ পাওয়া গেল, কিন্তু তারপর ছিটকিনি নিয়ে খটর খটর আওয়াজ হতে লাগল। বাইরে থেকে আমরা দরজায় টোকা মারছি, সোজা ছিটকিনি, না খোলাব কারণ নেই। এমন সময় হঠাৎ দড়াম করে ছিটকিনিটা খুলে গেল। বাথরুমের বাঁ পাশের দেয়ালে বইয়েব শেল্‌ফ। সেখানে হেলান দিয়ে সটান দাঁড়িযে আছেন বুদ্ধদেব বসু। তাকানো চোখ, দৃষ্টিহীন। কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দেওযা হল। সুবীরদাব টেলিফোন এল এর মধ্যে। শরীর খারাপ জানাবাব জন্য, কিন্তু আমাব মুখে কিছু একটা শুনে 'এক্ষুনি আসছি' বলে রেখে দিলেন। আমি ছুটলুম উল্টোদিকে আমাব এক ব্যবসায়ী বন্ধুব বাড়িতে, শ্রীকিঙ্কর মুখার্জি। দপ করে লোডশেডিং হযে গেল, বন্ধু তার দুটি গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে পাঠিযে দিলেন। নিজে ছুটে এলেন, তার স্ত্রী ছুটতে ছুটতে নিয়ে এলেন ইমার্জেন্সি আলো। কিঙ্কবের কৃপায় অক্সিজেন আনা গেল। ইতিমধ্যে আমার দিদি, জ্যোতি নবেশদা চিনুদি সব এসে গেছেন। গাড়ি ক্যালকাটা হসপিটালের দিকে ছুটল। বাবা বিছানায শোযানোব পর কিছু একটা বলাব চেষ্টা করেছিলেন, বোঝা যায়নি, তারপব গভীব ঘুম। হাসপাতালে লোকজন এসে পড়েছে। ডাক্তারেব দল ছোটাছুটি কবছে। সেবিব্রাল এ্যাটাক। অমিয় দেব, দিদি, সন্তোষ ঘোষ, আব আমি থেকে গেলাম। বাত তিনটে নাগাদ তিনি চলে গেলেন।"

—'সেই দিন', শুদ্ধশীল বসু
৩০শে নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৭

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণ

"যেদিন তিনি গেলেন, সেদিনও টেবিলের ওপর তাঁর অর্ধসমাপ্ত লেখাটি সমাপ্ত হবার আশায় পড়েছিল। সকালবেলা যথানিয়মে বেলা সাড়ে আটটার সময় স্নান করে এসে প্রাতরাশের টেবিলে বসে বলছিলেন সাগরবাবুর ['দেশে'ব সম্পাদক সাগরময় ঘোষ] লেখাটি এবার খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আমাকে। বাইরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'এই পৃথিবীটা বড়ো সুন্দর, কে যেতে চায় এই পৃথিবী ছেড়ে?' আরো একটি কথা বলেছিলেন, 'ধ্যেৎ, যা দেখছি নিজের শ্রাদ্ধের চিঠিটা নিজেকেই লিখে যেতে হবে।' আসলে সেই সময়ে ডাক এসেছিল, অন্যান্য চিঠির মধ্যে একটা শ্রাদ্ধের চিঠিও ছিল। সেটা পড়েই এই প্রতিক্রিয়া। আমি বললাম, 'হঠাৎ একথা কেন? চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, 'দেখছো না, কী বিশ্রী বাংলা— ইহকাল পরকাল— একেবারে যাচ্ছেতাই।"

—নিবেদন। প্রতিভা বসু
কবিতাভবন বার্ষিকী, ১৯৮৭

১৯/৩/৭৪ (মঙ্গলবাব) আনন্দবাজাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েব প্রতিবেদন

বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসান

"... ববিবা শেষবাত্রে বাংলা সাহিত্যেব বিবাট পুরুষ, সব্যসাচী বুদ্ধদেব বসুব জীবনাবসান হযেছে। মৃত্যুব কাবণ সেবিব্রাল থ্রম্বোসিস। তাঁব বযস হযেছিল ৬৬।

বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ অসুস্থ হযে পড়েন ববিবাব সন্ধ্যায, চা খাওযাব সময। তাব খানিক পবেই স্ট্রোক। সংজ্ঞালুপ্তিও। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিযে যাওযা হয হাসপাতালে। ডাযমণ্ডহাববাব বোডেব ক্যালকাটা হাসপাতালে। সেইখানে বাত পৌনে তিনটা নাগাদ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবেন।

.. আকাশবাণী সোমবাবেব প্রভাতী সংবাদ শুরু কবে এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দিযে। . তাঁকে হাসপাতাল থেকে নিযে আসা হযেছে বাড়িতে, শুইযে বাখা হযেছে চাবদিকে বই আব লেখাব প্রুফ ছড়ানো নিজেব ঘবে।..

লোকেবা আসছেন, চলে যাচ্ছেন, আবও আসছেন। বাত থেকেই ছোটাছুটি কবছেন সন্তোষকুমাব ঘোষ, সোমবাবেব ভোবে নাকতলাব বাড়িতে দেখলাম বণক্লান্ত সৈনিকেব মতো সোফায গা এলিযে বসে আছেন। আব উদভ্রান্তেব মতো ছোটাছুটি কবছেন জ্যোতির্মযয দত্ত ও ইন্দুভূষণ বায। খানিক বাদেই এলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাবপব অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন. আমাব বিযেতে মাত্র দুজন ববযাত্রী গিযেছিল, বুদ্ধদেব আব অচিন্ত্য।. .

শোককাতবদেব ভিড়ে অসংখ্য পবিচিত মুখ। মনোজ বসু, সমব সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায, ডঃ অমলেন্দু বসু, ফাদাব আতোর্যাঁন, নবেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌবকিশোব ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, সুশোভন সবকাব, অশোক মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায, অরুণকুমাব সবকাব, সুমথনাথ ঘোষ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, নবেশ গুহ, শংকব চট্টোপাধ্যায, তাবাপদ বায, অববিন্দ গুহ, অম্লান দত্ত, প্রবীবচন্দ্র বসুমল্লিক, গৌবী আইযুব দত্ত, মানসী দাশগুপ্ত, বিমল বাযচৌধুবী, শবৎকুমাব মুখোপাধ্যায, তপতী মুখার্জি, অরুণ দাশগুপ্ত, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, কবিতা সিংহ, শান্তি লাহিড়ী, বমাপদ চৌধুবী, দিব্যেন্দু পালিত, সুবীব বাযচৌধুবী, অমিয দেব, অসিত গুপ্ত, দক্ষিণাবঞ্জন বসু, সুধীববঞ্জন মুখোপাধ্যায, ভবানী মুখোপাধ্যায, আবও অনেক নাম। দুপুব বাবোটায আমি চলে এসেছি। তাবপব এসেছেন আবও অনেকে। তাছাড়া এসেছেন তাঁব ভাইযেবা, অন্যান্য স্বজনেবা। কেওড়াতলা শ্মশানে এসেছেন আবও অনেক গুণীজ্ঞানী। সাগবময ঘোষ, কমলকুমাব মজুমদাব, মঙ্গলাচবণ চট্টোপাধ্যায, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ।

মৃতদেহ বাড়ি থেকে প্রথমে নিয়ে যাওযা হয় তাঁব প্রিয ২০২ বাসবিহাবী এভিনিউযেব কাছে, যেখানে বুদ্ধদেববাবু আগে থাকতেন, যেখানে বসত সাহিত্যেব মজলিস, বেবোত 'কবিতা' পত্রিকা। সেখানে কৈশোবেব সঙ্গী, যৌবনেব সুহৃদ সাহিত্যচর্চাব দোসব অজিত দত্ত অসুস্থ দেহ নিয়ে নেমে আসেন প্রিয বান্ধবকে

শেষ দেখা দেখতে। সেখান থেকে কনিষ্ঠ কবিরা অগ্রজকে কাঁধে করে নিয়ে আসেন কেওড়াতলায়।

বুদ্ধদেববাবু তার ছেলেমেয়েদের আগে অনেকবার বলেছিলেন, তাঁকে যেন গাড়িতে করে শ্মশানে না নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষ মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের তলা দিয়ে— এর চেয়ে মহৎ মহাযাত্রা আর কী হতে পারে।

সকালবেলা তার ঘরে যখন ঢুকি, সর্বাগ্রে দেখতে পাই চারদিকে প্রুফ ছড়ানো। মৃত্যুর দিনও অনবরত দেখে গিয়েছেন। রচনাবলী বেরোচ্ছে, তারই প্রুফ। 'দেশ' পত্রিকায় আগামী সাহিত্য সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পত্রালাপ বের হচ্ছে। তাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রুফও দেখলাম ছড়ানো। এক একটা লেখার প্রুফ দেখতেন অন্তত পাঁচ-ছবার করে। এমন খুঁতখুতে ও পরিশ্রমী লেখক, বদলেয়ারের পর, বিশ্বসাহিত্যে আর কেউ ছিলেন কিনা, আমি অন্তত জানি না।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন খাঁটি অর্থে সাহিত্যিক। সাহিত্যের জন্য তিনি সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। একবার প্রবাসে থাকার সময়, তিনি একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন, যেখানেই যাই, যত সুন্দরই কোনো দৃশ্য দেখি না কেন, সেই প্রসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের কোনো না কোনো মহারথীর রচনা আমার মনে পড়ে যাবেই। কখনো কখনো এজন্য একটু বিরক্ত হই। আবার বুঝতে পারি, সাহিত্যের ভাণ্ডারেই আমার সব আনন্দ জমা আছে।

হয়তো সেই জন্যই তিনি নিজেও সাহিত্যের কোনো শাখাতেই হাত ছোয়াতে দ্বিধা করেননি। প্রধানত যিনি কবি, তিনি ছোট গল্প রচনার জন্যও এককালে সমালোচক ও আদালতের রোষে পড়েছিলেন , উপন্যাসে এনেছেন নতুন স্বাদ, এককালে রবীন্দ্র বিরোধী থেকেও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে সবচেয়ে পাঠযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন, অনুবাদের জন্য কতটা নিষ্ঠার প্রয়োজন হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, নাটক, কাব্যনাটক, এমনকি শিশুসাহিত্যেও দিয়ে গেছেন অমূল্য সম্পদ।

সেই মানুষ এখন শুয়ে আছেন কেওড়াতলা শ্মশানের চত্বরে। এক এক সময় বিভ্রম হয়।

ফাদার আতোয়ান পাঠ করলেন উপনিষদের শ্লোক। তারপর তিনি নিজেই গান ধরলেন, 'আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে—' সমবেত অনেকের কণ্ঠেই গুঞ্জরিত হয় সেই গান।

এবার বৈদ্যুতিক চুল্লিতে নিয়ে যাবার পালা। শেষ মুহূর্তে একটি অনুষ্ঠান আছে, মুখাগ্নি। তার একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীল (পাপ্পা) শোকে ভেঙে পড়েছে, গত রাত্রে ঠিক এই সময়ে সে তার বাবার সঙ্গে গল্প করেছে। আজ এই সময়ে সে কী করে সেই মুখে আগুন ছোঁয়াবে? কিন্তু এটা একটা নিয়মরক্ষা মাত্র। আমরা কয়েকজন তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাই। পাটকাঠি জ্বলে ওঠে, সেই পাটকাঠি ধরা পাপ্পার হাত দারুণ কাঁপতে থাকে— আমরা কয়েকজন তার সঙ্গে হাত মেলাই।

যতই দোষ করি, যতই অধম হই, তবু বাংলা সাহিত্যজগতে আমরা সকলেই বুদ্ধদেব বসুর পুত্রবৎ।..."

মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার!

'স্বাগতবিদায়' কাব্যগ্রন্থের জন্য মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার দেয়া হল তাঁকে!

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতে সাহিত্য পুরস্কার দেবার প্রস্তাব তিনিই প্রথম তুলেছিলেন, 'কবিতা' পত্রিকায়, বত্রিশ বছর আগে। সেকালে এসব পুরস্কার-টুরস্কার দেবার প্রথা দূরে থাক, ধারণাই ছিল না। তারপর, পুরস্কার প্রবর্তিত হলে, তার পদ্ধতি যাতে লেখকের পক্ষে অসম্মানজনক না হয়, লেখককে যেন পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে না হয়, তা নিয়েও লড়াই করে জিতেছিলেন তিনি। তারপর কত কী করলেন বুদ্ধদেব, কত নতুন নতুন দিকচিহ্ন স্থাপন করলেন বাংলা সাহিত্যে। 'কবিতা' পত্রিকা চালালেন ছাব্বিশ বছর ধরে, 'তিথিডোর' লিখলেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পাদনা করলেন, বাংলা কবিতাকে স্থাপন করলেন আন্তর্জাতিক কবিতাচিত্রে, অনুবাদ করলেন মেঘদূত বোদলেয়ার হ্যেল্ডারলিন রিলকে, রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার নতুন মান স্থাপন করলেন, বাংলাভাষায় জন্ম দিলেন প্রতীকী কাব্যনাট্যের, পুরাণের পুনর্জন্মের ধারণার— কিন্তু তাঁর জীবৎকালে তাঁর নাম এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হল না।

অথবা, দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, এই আশঙ্কায়ই কি কর্তারা তাঁর নাম বিবেচনা করেননি কখনো?

প্রতিভা বসু তাঁর হয়ে এই পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল ৫০০০ টাকা— আর বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালে তাঁর ব্যাঙ্কে ছিল ৭৯০ টাকা। প্রতিভা বসুর পক্ষে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়নি।

স্বনির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে নিমগ্ন অবস্থায়, অজস্র অসমাপ্ত কাজ চারপাশে ছড়িয়ে রেখে চলে গেলেন বুদ্ধদেব বসু। টেবিলে পড়ে রইল 'মহাভারতের কথা'র প্রুফ— দেরাজে রইল 'আমাদের কবিতাভবন'-এর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। ২৪ পরিচ্ছেদ লিখে শেষ করেছিলেন, লেখার প্যাডের উপর ২৫ পরিচ্ছেদের নম্বর বসিয়ে তিন-চার লাইন লিখেছিলেন। এই অবস্থাতেই এটি প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকার পরবর্তী শারদীয় সংখ্যায়, ১৩৮১ বঙ্গাব্দে।

সুবীর রায়চৌধুরীর সেদিন সন্ধ্যায় আসবার কথা ছিল 'বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডের বানানপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে। 'মহাভারতের কথা' প্রকাশিত হয় পরের মাসে, ১ বৈশাখ ১৩৮১।

পরবর্তী প্রজন্মের শ্রদ্ধাঞ্জলি

এলেজি : বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি
—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরসা পেতো কবি, ছায়া পেতো, স্বচ্ছলতা পেতো
সুন্দর নির্ভরযোগ্য কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হিমানী পেতে পেতে মনে হয়
আজো পাবো সহসা সন্ধ্যায়, ক্ষণকাল, ব্যস্ত তুমি, সৃজনের শান্ত কবি তুমি
তাও স্বচ্ছ নিমন্ত্রণ, এসো এসো, কী খবর বলো, সুনীল কেমন আছে,
তারাপদ, আত্মীয়স্বজন?
সকলে নিশ্চিত ভালো, যতখানি ভালো থাকা যায়

নষ্ট ফল, ভিতরে গভীর কীট— মানুষের সকল হৃদয়ে ছোটো ও সংক্ষিপ্ত দুঃখ
কিন্তু তুমি, প্রান্তর যেমন সীমাহীন, পারহীন সমুদ্রের আলেখ্য যেমন
তেমনই অব্যর্থ, দীর্ঘ কবিতার অগ্রজ কুসুম
তোমার হাসির তীব্র বাল্যকাল আমাকে ছুঁয়েছে
ভিতরের ভূকম্পনে স্থাপিত ভ্রান্তির ভাঙা ইট গুঁড়িয়ে হয়েছে ধুলো
যতগুলো পথ ছিলো উঁচু নিচু সংহত হয়েছে ছন্দে, আনন্দে আনন্দে
কেটে গেছে কত দিন। এখন কীভাবে যাবে? কোনভাবে যাবে?

তবু যায়। সমুদ্রের মৌন নিয়ে শোকযাত্রা চলে গঙ্গাতীরে...
শান্ত ও ঘুমন্ত মুখ কবিতার নীরব ভাষা কথা বলে শোনা যায়—
কোনো-কোনো শোকসঙ্গী শোনে
পাথরের চোখে জল, মনে হয় ধুলোই পড়েছে
জল, নুন, দারুণ দুকূলে ক্ষয়, ধ্বংস হলো কলকাতা শহর এইমাত্র
জ্বলে গেলো চিৎকারে, ঝড়ের হাতে, ক্রন্দনে সমস্ত ঘরবাড়ি
এ কী অকস্মাৎ যাওয়া, ঘর ছেড়ে পরের দুয়ারে।
স্বর্গ তো আপন নয়, তোমার নিজস্ব স্বর্গ ছিলো
ছেড়ে গেলে, কিন্তু কেন গেলে?

—'দেশ'। ২০ এপ্রিল ১৯৭৪